আল-জিহাদ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

আল-জিহাদ

____

____

________________ কে
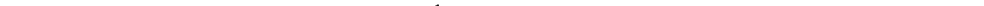
প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৬৪

৪র্থ প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪২২
আষাঢ়	১৪০৯
জুলাই	২০০২

নির্ধারিত মূল্য : ১৫৬.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
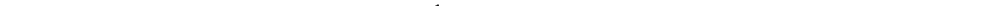
الجهاد فى الاسلام -এর বাংলা অনুবাদ

AL JIHAD by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Net Price : Taka 156.00 Only.
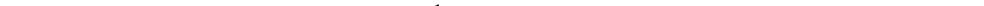
ঈসায়ী ১৯২৬ সালে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একজন আততায়ীর হাতে নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে অ–মুসলিমগণ আল–কুরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবার এক মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। গোটা দক্ষিণ এশিয়া উপ–মহাদেশের অ–মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত পত্র–পত্রিকাগুলো আল–কুরআনের ওপর আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখতে শুরু করে। তাদের প্রচারণার সার কথা ছিলোঃ আল–কুরআনের শিক্ষাই মুসলিমদেরকে হিংস্র করে তোলে, তাই বিশ্ববাসীর কর্তব্য হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চিরদিনের জন্যে আল–কুরআনের চর্চা বন্ধ করে দেয়া। এ প্রচারণা এতোদূর গড়িয়েছিলো যে গান্ধীজীর মতো সহিষ্ণু রাজনীতিবিদও বলেন "ইসলাম এমন পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যে, তার চূড়ান্ত শক্তির উৎস আগেও তরবারী ছিলো এখনও তরবারীই আছে।"

এ ব্যাপক প্রচারণার ফলে লোকেরা বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হতে থাকে।

এ নাজুক মুহূর্তে আল–কুরআনের শিক্ষা, বিশেষ করে জিহাদ সম্পর্কীয় ইসলামের নীতিমালা মুসলিম অ–মুসলিম নির্বিশেষে সকলের সামনে উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে।

এ গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যে এগিয়ে আসেন চব্বিশ বছরের যুবক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফসল "আল–জিহাদ ফিল ইসলাম।"

এই গ্রন্থে তিনি কেবল ইসলামের জিহাদ নীতিই তুলে ধরেন নি, সংগে সংগে তুলে ধরেছেন অতীত ও বর্তমান কালের বিভিন্ন জাতির অনুসৃত যুদ্ধ নীতি।

ইসলামী জিন্দেগীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য জিহাদ সম্পর্কে তিনি যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন তা মুসলিম মিল্লাতের চলার পথে আলোক বর্তিকা রূপে কাজ করবে। অন্যদিকে অ–মুসলিমগণও তা থেকে জিহাদের সঠিক ধারণা লাভ করে ইসলামী বিধানের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

–প্রকাশক

সূচীপত্র

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অন্যান্য ধর্মে যুদ্ধ ৩৩০

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

গ্রন্থকারের ভূমিকা

বর্তমান যুগে ইউরোপ স্বীয় হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে ইসলামের বিরুদ্ধে কতকগুলো অপবাদ রটনা করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে জঘন্য অপবাদ হলো এই যে, ইসলাম একটা রক্ত–পিপাসু, হিংস্র ও নরখাদক ধর্ম। নিজের অনুসারীদেরকে সে হত্যা ও রক্তপাতের শিক্ষা দেয়। বাস্তবিক পক্ষে এ অপবাদে যদি কিছুমাত্র সত্যতা থাকতো তা হলে এখন থেকে বহু শতাব্দী আগেই তা রটিত হতো। যে সময়ে ইসলামের বীর সেনাদের দিগ্বিজয়ী তরবারী সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, যখন বিশ্ববাসীর মনে সত্যি সত্যি এরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারতো যে, মুসলমানদের এ বিজয় হয়তোবা কোন হিংসাত্মক শিক্ষার পরিণতি, তখনই ছিল এ অপবাদ প্রচারের যথার্থ ও স্বাভাবিক সময়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ অপবাদের জন্ম হয়েছে ইসলামের সূর্য অস্তাচলে যাওয়ার অনেক পরে। সত্য বলতে কি, এই উদ্ভট ধারণাটির প্রচার যখন আরম্ভ হয়েছে তখন ইসলামের তরবারীতে মরিচা ধরে গিয়েছিল। আর অপবাদ রটনাকারী ইউরোপের শানিত তরবারী নিরীহ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল। একটি অতিকায় অজগর সাপ যেমন ছোট ছোট কীট–পতংগ ও জীব–জন্তুকে দংশন ও গ্রাস করতে করতে অগ্রসর হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইউরোপ দুনিয়ার দুর্বল জাতিগুলোকে গ্রাস করতে আরম্ভ করেছিল। বিশ্ববাসী যদি যথার্থ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারতো, তাহলে এ অপবাদের বৈধতা অবশ্যই চ্যালেঞ্জ করতো। যে মানবগোষ্ঠী নিজেরাই বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় দুশমনে পরিণত হয়েছে, যারা নিরীহ মানুষের রক্ত দিয়ে ভূ–পৃষ্ঠকে বারবার রঞ্জিত করেছে, যারা দুনিয়ার দরিদ্র জাতিগুলোর ওপর পাশবিক লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি অব্যাহত রেখেছে, তাদের কি অধিকার ছিল, যে দোষে নিজেদেরই ইতিহাস কলংকিত, তা অন্যের ঘাড়ে চাপানো? ইউরোপের সামনে এ প্রশ্ন তুলে ধরার সত্যিই প্রয়োজন ছিল।

তাদের সামনে এ প্রশ্নও উত্থাপন করার প্রয়োজন ছিল যে, আজ ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তাগণ যে চুলচেরা তত্ত্বানুসন্ধান চালিয়ে ইসলামের তথাকথিত কলংক উদঘাটনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সেটা আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা নয়তো? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী হত্যাযজ্ঞের ফলে বিশ্ববাসীর মনে যে আক্রোশ ও বিক্ষোভ ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়েছে সেই আক্রোশের গতি ইসলামের দিকে ফিরেয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য কিনা? কিন্তু এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নি। বস্তুত মানুষ যখন রণাঙ্গনে পরাজিত হয় তখন শিক্ষাঙ্গনেও পরাভূত হয়, তরবারীর কাছে পর্যুদস্ত হলে কলমের কাছেও করে আত্মসমর্পণ। এটা তার স্বাভাবিক দুর্বলতা। এ দুর্বলতার কারণেই প্রত্যেক যুগে পৃথিবীতে 'অসি আর মসি' এ দুটো শক্তি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে। যে হাতের তরবারী বিজয়ী হয়েছে, সেই হাতের লেখনীরও বিজয় সূচিত হয়েছে, অস্ত্র বলে বলীয়ান যারা তারাই চিন্তা ও আদর্শের জগতেও পরাক্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। একই কারণে ইউরোপ জিহাদ–এর ব্যাপারেও বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছে। আর বিশ্বের দাস মনোভাব সম্পন্ন জাতিগুলোও ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে ইউরোপীয় দৃষ্টিভংগীকে এমন অম্লান বদনে মেনে নিয়েছে যে, অমনভাবে তারা কোন ঐশীবাণীকেও বোধ হয় কখনো গ্রহণ করেনি।

গত শতাব্দীতে এবং বর্তমান শতাব্দীতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বারবার এ অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে। এ বিষয় নিয়ে এত বেশী লেখা হয়েছে যে, এখন ওটা একটা গতায়ু বিষয় বলে মনে হয়। কিন্তু এসব জবাবী লেখাগুলোতে আমি প্রায়ই একটা ত্রুটি লক্ষ্য করেছি। দেখেছি, ইসলামের সাফাই দিতে গিয়ে তারা ইসলাম বিরোধী লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন এবং অপরাধীর মতই দোষ স্খলনের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছেন। এ চেষ্টায় কেউ কেউ এতখানি নীচে নেমেছেন যে, নিজেদের বক্তব্যকে শক্তিশালী করার জন্য ইসলামের মূলনীতি ও আইন–কানুনে পর্যন্ত নিজেদের মনগড়া 'সংশোধনী' সংযোজন করতে চেয়েছেন। বিরোধীদের অভিযোগে তারা এমনভাবে বিহ্বল হয়ে গেছেন যে, ইসলামের যেসব ঘটনা ও বিষয়কে তারা মারাত্মক ও

ভয়ংকর মনে করেছেন, সেগুলোকে ইতিহাসের পাতা থেকে একেবারেই গায়েব করে দিয়েছেন, যাতে বিরোধীদের নজর সেদিকে না যায়। কিন্তু যারা এতটা দুর্বল পথ অবলম্বন করেননি তাদের লেখাতেও অন্তত একটা ত্রুটি অবশ্যই রয়েছে। তারা 'জিহাদ' ও 'কেতাল' (সশস্ত্র যুদ্ধ) সংক্রান্ত ইসলামের নীতিমালাকে যথাযথ সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরেন না। বরং এর অনেকগুলো দিক এমন অস্পষ্ট রেখে দেন যে, তাতে সন্দেহ -সংশয়ের প্রচুর অবকাশ থেকে যায়। আসলে ভুল ধারণার অপনোদনের জন্য প্রয়োজন ছিল আল্লাহর পথে জিহাদ ও আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের যা আইন ও বিধান আছে তা কোরআন, হাদীস ও ফেকাহর গ্রন্থাবলীতে যেরূপ বর্নিত হয়েছে ঠিক সেইরূপভাবে বর্ণনা করা। তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও কমানো-বাড়ানো বা ইসলামের মূল উদ্দেশ্য ও তার আদর্শের প্রাণ শক্তিকে বিকৃত করার কোন আবশ্যকতা ছিল না। আমি নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতিকে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে পরিবর্তিত করে পেশ করার নীতিগতভাবেই বিরোধী। পৃথিবীতে এমন একটি বিষয়ও নেই যার সম্পর্কে সকল মানুষ ঐক্যমত সহকারে একই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেকটি মানব গোষ্ঠী নিজস্ব স্বতন্ত্র মত পোষণ করে থাকে এবং তাকে নির্ভুল মনে করে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ-

প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠী নিজেদের যা আছে- তা নিয়েই খুশী।

সুতরাং আমরা অন্যদের দৃষ্টিভংগীর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস ও মূলনীতিকে যতই রদবদল করি না কেন, পৃথিবীর সমস্ত ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠী সমূহকে আমাদের আদর্শ গ্রহণে সম্মত করা ও আমাদের ঐ মনগড়া মতবাদকে তাদের মনপুত করা অসম্ভব। তাই সবচেয়ে ভালো পন্থা হলো, ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস, আইন-কানুন ও নীতিমালাকে তার স্বকীয় রূপে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। এইগুলোর স্বপক্ষে আমাদের যা যুক্তি-প্রমাণ আছে তাও সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা উচিত। অতপর জনসাধারণের বিবেক-বুদ্ধির ওপর সব ছেড়ে দেয়া উচিত-ইচ্ছা হয় কেউ তা গ্রহণ করুক বা না করুক। যদি কেউ গ্রহণ করে তবে সেটা

সৌভাগ্যের কথা। আর যদি গ্রহণ না করে তাহলেও আমাদের ক্ষতি নেই। এটাই হলো দাওয়াত ও তবলীগের সঠিক মূলনীতি। নিষ্ঠাবান ও কৃত সংকল্প মনীষীগণ চিরকাল এই নীতিই অবলম্বন করে এসেছেন। স্বয়ং নবীদেরও কর্মপন্থা ছিল এটাই।

আমি দীর্ঘদিন ধরে এ প্রয়োজনটা উপলব্ধি করে আসছিলাম। কিন্তু প্রয়োজন উপলব্ধি করা ছাড়া বাস্তব কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারিনি। কারণ এ কাজের জন্য প্রচুর অবসর প্রয়োজন। অথচ একজন সাংবাদিকের কাছে অবসর নামক বস্তুটারই বড় অভাব।

কিন্তু ১৯২৬ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যায়। সেই ঘটনা আমাকে সমস্ত সমস্যা উপেক্ষা করে উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করে। উক্ত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সহসা গুপ্ত–ঘাতকের হাতে নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে অজ্ঞ ও সংকীর্ণমনা লোকেরা ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে ভুল ও ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালাবার একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। কেননা, দুর্ভাগ্যবশত একজন মুসলমান এই হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার হয়। উপরন্তু পত্র–পত্রিকাগুলোও এরূপ প্রচার চালাতে আরম্ভ করে যে, উক্ত ঘাতক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আপন ধর্মের শত্রু মনে করেই হত্যা করেছে এবং উক্ত সৎ কাজ দ্বারা সে বেহেশ্‌ত পাওয়ার আশা পোষণ করে। প্রকৃত সত্য কি, সেতো আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তবে জনসমক্ষে এটাই প্রকাশিত হয়। এসব প্রচারণার ফলে ইসলাম বিরোধীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইসলামে যে আদতেই হিংসাত্মক কার্যকলাপের স্থান নেই, সে কথা ইসলামের অতীত ও বর্তমানের সকল ওলামা এবং ইসলামী পত্র–পত্রিকা ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। সে পটভূমিতে শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাবলীকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে ইসলাম বিরোধীরা এ ঘটনার জন্য গোটা মুসলিম জাতিকে এবং ইসলামের মূল আদর্শকেই দায়ী করতে আরম্ভ করে। তারা পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, কোরআনের শিক্ষাই মুসলমানদেরকে হিংস্র করে তোলে এবং তা সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সহাবস্থানের পরিপন্থী। এর শিক্ষা মুসলমানদেরকে এতটা জেদী ও গোড়া বানিয়ে দিয়েছে যে, তারা

প্রত্যেক অমুসলিমকে হত্যার যোগ্য বলে মনে করে এবং সেই হত্যাকে বেহেশ্‌ত লাভের উপায় বলে গণ্য করে। এমনকি কেউ কেউ ধৃষ্টতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে এ কথাও বলেছে যে, পৃথিবীতে যতদিন কোরআনের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই সমগ্র মানব জাতির ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোরআন চর্চা ও শিক্ষা বন্ধ করা উচিত। এই ভ্রান্ত কথাবার্তা এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে যে, সুস্থ বিবেক–বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাও বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে। গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্ব–যিনি হিন্দু জাতির মধ্যে সবচাইতে পরিপক্ক বুদ্ধির অধিকারী–তিনিও এ প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলতে থাকেন যে ঃ "ইসলাম এমন পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যে, তার চূড়ান্ত শক্তির উৎস আগেও তরবারী ছিল এখনও তরবারীই আছে।"

এসব কথাবার্তার পেছনে কোন গভীর তত্ত্বগত ভিত্তি ছিলো না। কেবল তোতাপাখীর মত 'পুরাতন' ওস্তাদের শেখানো বুলিই আওড়ানো হচ্ছিল। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা এই অলীক ধারণাকেই বাস্তবের খোলস পরিয়ে দিয়েছিল। ফলে অজ্ঞ লোকেরা সহজেই প্রতারণার শিকার হতে পারতো। এ ধরনের কু–ধারণা বাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লে তা ইসলাম প্রচারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে। তাই এরূপ পরিস্থিতিতেই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি তা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যাতে কুজ্ঝটিকা দূর হয়ে সত্যের সূর্য প্রজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। এজন্য আমি আর অবসরের অপেক্ষা করতে পারলাম না। পত্রিকার সম্পাদনার কাজ সেরে হাতে যেটুকু সময় বাঁচতো সে সময়টুকুতেই আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে লেখা শুরু করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে 'আল–জমিয়তের' মঞ্চেও তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে লাগলাম। প্রথমত শুধুমাত্র একটা সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখার ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু লিখতে গিয়ে বিষয়বস্তুর দিগন্ত এত প্রসারিত হতে লাগলো যে পত্রিকার মঞ্চে আর তা স্থান সংকুলান হলো না। এজন্য বাধ্য হয়ে ২৩/২৪টি সংখ্যা প্রকাশের পর আমি পত্রিকায় এ নিবন্ধের প্রকাশ বন্ধ করে দিলাম। বর্তমানে সেই রচনাই পুস্তকের আকারে পাঠকের সামনে সমুপস্থিত। যদিও বিষয়টির অধিকাংশ দিক এ গ্রন্থের আওতাভুক্ত হয়েছে তথাপি আমি দুঃখিত যে, সময়াভাবে বেশ কয়েকটি দিক নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করতে পারিনি। যেমন বক্তব্য তুলে ধরার জন্য একটা আলাদা অধ্যায় রচনা করা প্রয়োজন

ছিল, আমি তা দুই তিনটি বাক্যেই সমাপ্ত করতে বাধ্য হয়েছি। এ গ্রন্থে আমি একটা ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছি, নিজের কিংবা অন্য কারো ব্যক্তিগত ধ্যান–ধারণাকে কোথাও তুলে ধরিনি। বরং সমস্ত মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিধিমালাকে পবিত্র কোরআন থেকেই গ্রহণ করে পেশ করেছি। যেখানে ঐসব বিধিমালার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেখানে হাদিস, ফেকাহ ও নির্ভরযোগ্য তফসীর গ্রন্থাবলীর সাহায্য নিয়েছি। এরূপ সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্য হলো, পাঠকগণ যেন বুঝতে পারেন যে, সমসাময়িক পরিস্থিতি দেখে কোন নতুন বিধিমালা আবিস্কার করা হয়নি বরং এতে যা কিছু বর্নিত আছে তার ভিত্তি আল্লাহ, রসূল ও ইসলামের মহান মনীষীদের কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

যেসব অমুসলিম কেবলমাত্র অন্ধ গোঁড়ামির ভিত্তিতে ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন না, তাদের কাছে আমার আবেদন এই যে, তারা যেন এই গ্রন্থে যুদ্ধ ও জিহাদ সংক্রান্ত ইসলামের আসল শিক্ষা কি, তা পড়ে দেখেন এবং তারপর এর মধ্যে আপত্তিজনক কি কি পেলেন তা যেন তারা আমাকে জানান। যদি এর পরেও কারো মনে কোন সংশয় অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আমি তা নিরসনের চেষ্টা করবো।

আবুল আ'লা
দিল্লী
১৫ই জুন, ১৯২৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী জিহাদের তাৎপর্য

মানুষের প্রাণের পবিত্রতা

মানব সভ্যতার ভিত্তি যে আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার সর্বপ্রথম ধারা হলো এই যে, প্রত্যেক মানুষের প্রাণ ও রক্ত পরম ও পবিত্র সম্মানার্হ বস্তু। মানুষের নাগরিক অধিকার সমূহের মধ্যে প্রথম অধিকার হলো বেঁচে থাকার অধিকার। আর অপরকে বাঁচতে দেয়া হলো নাগরিক কর্তব্য সমূহের মধ্যে প্রথম কর্তব্য। পৃথিবীতে যতগুলো ঐশী ধর্ম ও সভ্য আইন ব্যবস্থা এ যাবত চালু হয়েছে তার সব কটিতে মানব সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই নৈতিক বিধান অবশ্যই বর্তমান রয়েছে। যে ধর্মে ও যে আইন ব্যবস্থায় এ বিধান স্বীকৃত হয়নি, তা সভ্য মানুষের ধর্ম ও আইন হবার যোগ্য নয়। তেমন ধর্ম বা আইনের অধীন কোন মানবগোষ্ঠী শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন যাপন করতেও পারে না। বস্তুত অনুরূপ কোন ধর্ম বা আইনের বিকাশ এবং অনুরূপ মানবগোষ্ঠীর উন্নতি–অগ্রগতিও সম্ভব নয়। এ কথা অতি সহজেই বুঝা যায় যে, মানুষের প্রাণের যদি কোন সম্মান বা মূল্যই না থাকে, তার নিরাপত্তার যদি কোন ব্যবস্থাই না হয়, তাহলে তারা কি করে একত্রে বাস করতে পারে?তাদের মধ্যে ব্যবসায়–বাণিজ্য, কায়–কারবার কি করে চলতে পারে? শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সম্পদ আহরণ, গৃহনির্মাণ, ভ্রমণ–পর্যটন ও সভ্য জীবন যাপনের জন্য যে শান্তি, নিরাপত্তা বোধ ও একাগ্রতার প্রয়োজন, তা কি করে অর্জন করা যেতে পারে? এই বাস্তব প্রয়োজনের দিকটা বাদ দিয়ে নিছক মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলেও একজন মানুষের পক্ষে আর একজন মানুষকে হত্যা করা তা কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্যই হোক কিংবা স্বার্থ সংক্রান্ত কারণেই হোক–একটা অতীব জঘন্য পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার

কাজ। এ অপকর্মটি সম্পন্ন করার দ্বারা হত্যাকারীর কোন নৈতিক উৎকর্ষ সাধিত হওয়াতো দুরের কথা, তার মনুষ্যত্বের স্তরে বহাল থাকাও অসম্ভব।

পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় আইন সমূহ মনুষ্য জীবনের এই সম্মান ও নিরাপত্তাকে কেবল শাস্তির ভয় ও শক্তির জোরে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু একটা সত্য ধর্মের কাজ হলো মানুষের মন–মস্তিষ্কে এর সঠিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা, যাতে মানুষ যেখানে মানবীয় শাস্তির ভয় নেই এবং যেখানে মানবীয় পুলিশ বাধা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে নেই সেখানেও একে অপরের অবৈধ রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে পারে। এদিক দিয়ে মানুষের জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যেরূপ নিখুঁত ও কার্যকর শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে, এমনটি অন্য কোন ধর্মে পাওয়া দুস্কর। পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় বিচিত্র ভংগীতে এ শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সুরা মায়েদায় হযরত আদম (আঃ)–এর এক পুত্র কর্তৃক অপর পুত্রকে হত্যা করার কহিনী বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط
وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ
ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝ (مائده : ٣٢)

এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলকে এরূপ লিখে দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কিংবা ভূ–পৃষ্ঠে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কোন একটি মানুষেরও প্রাণ রক্ষা করলো,' সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করলো। আমার রসুলগণ তাদের কাছে স্পষ্ট বিধান নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পৃথিবীতে সীমা অতিক্রম করে থাকে। (মায়েদা ঃ ৩২)

অপর এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় লোকদের গুণ–বৈশিষ্ট বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেনঃ

لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ٥ (الفرقان : ٦٨)

আল্লাহ যে প্রাণ–সত্তাকে সম্মানার্হ বলে ঘোষণা করেছেন, বিনা অধিকারে তাকে তারা বধ করে না এবং ব্যভিচারও করে না। আর যে এটা করবে সে তার শাস্তি পাবে। (আল–ফুরকান ঃ ৬৮)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ٥ (انعام : ١٥١)

হে মুহাম্মদ, আপনি এইরূপ আহবান জানান যে, এসো, আমি তোমাদের প্রতিপালক কি কি বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন, তা জানিয়ে দেই। তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পিতা–মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারে ত্রুটি করবে না। নিজেদের সন্তানদেরকে অভাব ও দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করবে না। কেননা তোমাদের জীবিকা যেমন আমিই দিয়ে থাকি, তেমনি ওদের জীবিকাও আমিই দেবো। আর তোমরা অশ্লীলতার ধারে–কাছেও যাবে না। মানুষের প্রাণ–সত্তাকে আল্লাহ সম্মানার্হ বলে ঘোষণা করেছেন। সেই প্রাণ বিনা অধিকারে হনন করবে না। তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্যই আল্লাহ এসব উপদেশ তোমাদের দিয়েছেন।

এ শিক্ষা সর্বপ্রথম এমন একটি মানব গোষ্ঠীকে দেয়া হয়েছিল যাদের কাছে মানুষের জীবনের কোন মূল্যই ছিল না, যারা ব্যাক্তিগত স্বার্থের জন্য নিজেদের সন্তান–সন্তুতিকে পর্যন্ত হত্যা করতে কুণ্ঠিত হতো না। এজন্য

মহানবী (সঃ) তাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য সব সময়ই মানুষের প্রাণ–সত্তাকে সম্মান করার শিক্ষা দিতেন। এ শিক্ষা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবেই দেয়া হতো। হাদিসে এরূপ উক্তি অনেক পাওয়া যায়, যেখানে নিরপরাধ মানুষকে খুন করা নিকৃষ্টতম অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় হাদিস এখানে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন যে, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

اکبر الکبائر الاشراک باللہِ وقتل النفس و حقوق
الوالدین وقولِ الزور۔

বড় গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা, হত্যা করা, পিতা–মাতার অবাধ্যতা করা ও মিথ্যা বলা।

হজরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণীত আছে, হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

لن یزال المؤمن فی فسحة من دینه مالم یصب
دما حراما۔

মুমিন যে পর্যন্ত অবৈধভাবে কাউকে খুন না করে, সে পর্যন্ত সে ইসলামের উদারতার সুযোগ–সুবিধা ভোগ করতে পারে।

নাসায়ীতে একটি সর্বস্বীকৃত হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ

اول ما یحاسب به العبد الصلوٰة واول ما یقضی بین
الناس یوم القیامة فی الدماء۔

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে হিসাব নেয়া হবে তা নামাজের হিসাব এবং সর্বপ্রথম যে বিচার অনুষ্ঠিত হবে তা খুনের বিচার।

একবার এক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) –এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর সাথে

কাউকে তুলনীয় ও শরীক মনে করা। লোকটি জিজ্ঞাসা করলোঃ এরপর সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি? হযরত জবাব দিলেনঃ খাদ্যে ভাগ বসাবে এই ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করা। লোকটি জিজ্ঞাসা করলোঃ এরপর সবচেয়ে বড় গুনাহ্‌ কি? হযরত জবাব দিলেনঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাতে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

বিশ্ব সভ্যতার ওপর ইসলামী শিক্ষার নৈতিক প্রভাব

মানুষের প্রাণ–সত্তার মর্যাদা সংক্রান্ত এ শিক্ষা কোন দার্শনিক বা নৈতিক সংস্কারকের চিন্তা–গবেষণার ফল নয়। তাই এর প্রভাব শুধু মাত্র বই কিতাব ও শিক্ষায়তনের গন্ডীতে সীমিত থাকেনি। এটা আসলে আল্লাহ ও রসুলের শিক্ষা এবং এর প্রতিটি শব্দছিল প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের অংগ। এ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও কার্যকর করণ প্রত্যেক কলেমা বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্য করণীয় বলে গণ্য হতো। তাই সিকি শতাব্দীর ন্যায় ক্ষুদ্র সময়ে এ শিক্ষা এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিল। এর বদৌলতে তৎকালীন আরব জাতির ন্যায় একটি নরখাদক ও হিংস্র স্বভাবের মানবগোষ্ঠীর মনে মানুষের জীবনের প্রতি পূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ এবং শান্তি ও শৃংখলার প্রাতি অটুট আনুগত্যবোধ জন্মলাভ করেছিল। হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল যে, কাদেসিয়া থেকে সান্‌আ পর্যন্ত একটি মেয়ে একাকিনী ভ্রমণ করবে এবং কেউ তার জান–মাল ও ইজ্জতের ওপর হামলা চালাবে না অথচ এই অঞ্চলে ২৫ বছর পূর্বে বড় বড় কাফেলাও নির্ভয়ে চলতে পারতো না। অতঃপর যখন সভ্য জগতের অর্ধেকেরও বেশী অংশ ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভূক্ত হলো এবং ইসলনামের নৈতিক প্রভাব বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন ইসলাম মানব জাতির অন্যান্য ত্রুটি–বিচ্যুতির ন্যায় হিংস্রতা ও নৃশংসতারও মুলোৎপাটন করে। আজকের সভ্য দুনিয়ায় মানুষের প্রাণের প্রতি মর্যাদাবোধ যতখানি গুরুত্ব লাভ করেছে, তা ইসলামের এই সর্বাত্মক বিপ্লবের একটা গৌরবময় অবদান। ইসলামের মহান শিক্ষা বিশ্বের নৈতিক পরিমন্ডলে এ বিপ্লব এনেছিল। অন্যথায় যে অন্ধকার যুগে এ শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতে প্রকৃত পক্ষে মানুষের প্রাণ–সত্তার কোন দামই ছিল না। এ প্রসঙ্গে আরবদের হিংস্রতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথা বিশ্ববাসীর জানাই আছে। কিন্তু যেসব

দেশ সে সময়ে পৃথিবীর সভ্যতা, কৃষ্টি ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের পাদপীঠ ছিল, সেগুলোর অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। রোমের কোলোসিয়াম (Colosseum)– এর কাহিনী আজও ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত। তরবারীর খেলা (Gladiatory) ও রোমক আমীর –ওমরাহদের অন্যান্য আমোদ–প্রমোদের প্রয়োজনে হাজার হাজার মানুষের জান উৎসর্গ হয়ে যেত। অতিথি ও বন্ধুবান্ধবের মনোরঞ্জনের জন্য দাসদেরকে হিংস্র জন্তু দিয়ে খাইয়ে দেয়া হতো,জন্তু–জানোয়ারের মত জবাই করা হতো কিংবা আগুনে পুড়িয়ে আমোদ করা হতো। এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এসব অবাধে চলতো। কোথাও এসবকে নিন্দনীয় মনে করা হতো না। কয়েদী ও দাসদেরকে বিভিন্ন উপায়ে নির্যাতন করে হত্যা করা সে সময়কার একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। শুধু অজ্ঞ ও হিংস্র স্বভাবে ওমরাহগণই নয়, গ্রীস ও রোমের বড় বড় দার্শনিক ও পন্ডিত পর্যন্ত বিনা অপরাধে নরহত্যার কতিপয় অমানুষিক পন্থা সমর্থন করতেন ও বৈধ মনে করতেন। এরিষ্টটল ও প্লেটোর ন্যায় নীতিবাগিশ মনীসীদ্বয় গর্ভপাতকে দুষণীয় মনে করতেন না। ফলে সমগ্র গ্রীস ও রোমে গর্ভপাত বৈধ হয়ে গিয়েছিল। পিতা নিজের সন্তানকে হত্যা করলে আইনত তা অপরাধ হতো না বরঞ্চ রোমক আইন রচয়িতারা সন্তানের ওপর পিতার এমন সীমাহীন ক্ষমতার বিধান থাকায় নিজেদের আইন নিয়ে গর্বিত ছিলেন। অন্য একটি পন্ডিতগোষ্ঠী (Stoicks) এর মতে আত্মহত্যা কোন খারাপ কাজ ছিল না। একে তারা এতটা সম্মানজনক বলে পরিচিত করে তুলেছিলেন যে, লোকেরা বড় বড় জনসমাবেশ আহ্বান করে তার মধ্যেই আত্মহত্যা করতো, এমন কি প্লেটোর মত পন্ডিত ব্যক্তিও একে পাপ মনে করতেন না। তাছাড়া স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে হত্যা করা গৃহপালিত জন্তু জবাই করার মতই আইনসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। গ্রীস আইনে এরজন্য কোন শাস্তির বিধান ছিলনা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর ছিল ভারত। এখানে পুরুষের লাশের ওপর জ্যান্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে দেয়া শুধু বৈধই ছিল না বরং ধর্মত তার ওপর জোর দেয়া হতো।[১] শুদ্রের প্রাণের কোন মূল্যই ছিল না। শুদ্র ব্রহ্মার পা থেকে সৃষ্ট হয়েছে বলে ব্রাহ্মণের জন্য তার রক্ত বৈধ ছিল। বেদের শব্দ শোনা শুদ্রের জন্য এত বড় পাপ ছিল যে, তার কানে গলানো সীসা ঢেলে তাকে হত্যা করা শুধু বৈধই চিল না, জরুরীও ছিল। 'বিসর্জন' প্রথা অনুসারে পিতামাতা তাদের প্রথম সন্তানকে গঙ্গানদীতে ভাসিয়ে দিত এবং একে নিজেদের জন্য মহাপুণ্যের কাজ মনে করতো।

এহেন অন্ধকার যুগে ইসলাম উদাত্ত আহ্বান জানালোঃ

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

মানুষের প্রাণ–সত্তাকে আল্লাহ পবিত্র ঘোষণা করেছেন, একে হনন করো না কেবল সত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ ব্যতীত।

এ আহ্বানে প্রচন্ড শক্তি ছিল। তবে সে শক্তি 'অহিংসা পরম ধর্ম'–এ উক্তির ন্যায় বিবেক ও স্বভাব ধর্মেরসাথে সামঞ্জস্যহীন ছিল না। তাই এ আহ্বান বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তা মানুষকে স্বীয় প্রাণের মুল্যমান সঠিকভাবে অনুধাবন করিয়ে দিয়েছিল। চাই কোন জাতি বা দেশ ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক –তার নৈতিক জীবন এ আহ্বানের প্রভাবথেকে একেবারে মুক্ত থাকেনি। সমাজেতিহাসের কোন বিবেচক পন্ডিত অস্বীকার করতে পারবে না যে, বিশ্বের নৈতিক আইন সমুহে মানুষের প্রাণ–সত্তার পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই আহ্বানের কৃতিত্ব যতখানি, ততটা 'অহিংসা পরম ধর্ম' বা অন্য কোন আহ্বানের নয়।

বৈধ হত্যা

কিন্তু এখানে একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, শুধু–
لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ বলে ক্ষান্ত থাকা হয়নি বরং সেই সাথে اِلَّا بِالْحَقِّ ও (সত্যের তাগিদ ব্যতীত) বলা হয়েছে।

অনুরূপভাবে مَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا (যে ব্যক্তি একটি মানুষকে হত্যা করলো সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো) এ কথাই বলা হয়নি বরং সেই সঙ্গে بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ (বিনা অপরাধে কিংবা পৃথিবীতে গোলযোগ দেখা দেয়া ব্যতীত) বলে ব্যতিক্রমও রাখা হয়েছে। একথা কোথাও বলা হয়নি যে, কোন প্রাণ কোন অবস্থাতেই হনন করো না। এরূপ বলা হলে সেটা আদর্শের ত্রুটি হতো। সেটা সুবিচার হতো না বরং সেটাই হতো সত্যিকার অবিচার। প্রকৃতপক্ষে মানুষকে আইনের বাধ্য–বাধকতা থেকে মুক্ত করে দেয়া আদৌ বাঞ্ছিত ছিল না। মানুষ যত খুশী গোলযোগ সৃষ্টি করুক, যত খুশী অশান্তি ও বিপর্যয় ডেকে আনুক,

যত খুশী জুলুম--অত্যাচার করুক –সর্বাবস্থায়ই তার প্রাণ–সত্তা সম্মানিতই থাকবে–এমন অবাধ স্বাধীনতার প্রয়োজন বিশ্ব–সমাজের কখনোই ছিল না। আসলে প্রয়োজন ছিল পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের, অশান্ত ও গোলযোগের মূলোৎপাটনের। পৃথিবীতে এমন একটি আইন তৈরী ও প্রচলনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যার অধীনে প্রতিটি ব্যক্তি আপন গন্ডীর মধ্যে স্বাধীন থাকতে পারে এবং নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে অন্যদের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুন্ন না করে। এ উদ্দেশ্য সাধনে শুধু لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ এর নিষেধাজ্ঞাই যথেষ্ট হতো না বরং إِلَّا بِالْحَقِّ এর রক্ষাকবচেরও প্রয়োজন ছিল। তা না হলে শান্তির পরিবর্তে অশান্তিই ছড়িয়ে পড়তো বেশী করে।

বস্তুত কর্মফল প্রদানের নীতি থেকে বচ্যুত আইন কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। মানব প্রকৃতি এতটা আনুগত্যপ্রবণ নয় যে, যে নির্দেশ দেয়া হবে তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মেনে নেবে, আর যে কাজ থেকে নিষেধ করা হবে তা খুশী মনে পরিত্যাগ করবে। এমনটি যদি হতো তাহলে দুনিয়াতে অশান্তি ও বিপর্যয় নাম মাত্রও থাকতো না। মানুষের স্বভাবের মধ্যে ভালো ও মন্দ এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার সহজাত প্রবণতা এক সঙ্গেই সমুপস্থিত। এজন্য তার অবাধ্য প্রকৃতিকে আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করার জন্য এমন অইনের দরকার যাতে নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথে তা অমান্য করলে কি শাস্তি এবং নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণের সাতে সাথে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত না থাকার কি পরিণতি, তা জানিয়ে দেয়া ও যথাসময়ে কার্যকরী করার ব্যবস্থা হয়। শুধু মাত্র–

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাতে পুনরায় অশান্তির সৃষ্টি করো না) কিংবা لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ। (মানুষের প্রাণসত্তাকে আল্লাহ সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন, তাকে হনন করো না) বলাই যথেষ্ট হতে পারে না। সেই সাথে এই মহাপাপ থেকে যদি কেউ বিরত না থাকে এবং হত্যা, দাঙ্গা ও অরাজকতার সৃষ্টি করে তাহলে তার কি শাস্তি হবে তাও বলা আবশ্যক।

মানব রচিত আইনে এমন ত্রুটি থেকে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু আলাহর আইনে এমন ত্রুটি থাকতে পারে না। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে,

মানুষের রক্তের পবিত্রতা ও মর্যাদা কেবল ততক্ষণই স্বীকার্য, যতক্ষণ তার ওপর সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে পাল্টা দাবী প্রতিষ্ঠিত না হয়। মানুষকে বেঁচে থাকার অধিকার দেয়া যেতে পারে কেবল তার বৈধ সীমানার মধ্যেই। এই সীমানা অতিক্রম করে সে যদি হাঙ্গামা–বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, কিংবা অন্যদের প্রাণ–সত্তার ওপর অন্যায় হামলা চালায়, তা হলে এ ধরনের কার্যকলাপের দরুন সে তার বেঁচে থাকার অধিকার হারাবে। তার রক্ত আর নিষিদ্ধ ও সম্মানার্হ বস্তু থাকবে না বরং তা বৈধ হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তির মৃত্যুতেই মানব জাতির জীবনের নিরাপত্তা নিহিত। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۔ অর্থাৎ হত্যাতো খুবই খারাপ জিনিস। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ হলো দাঙ্গা–হাঙ্গামা, বিপর্যয় ও অরাজকতা। যখন কোন ব্যক্তি এই বৃহত্তর অপরাধে লিপ্ত হবে তখন তার এই বৃহত্তর অপরাধকে নির্মুল করাই শ্রেয় হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্য কারো প্রাণের ওপর অবৈধ আক্রমণ চালায়, তার জন্য আদেশ রয়েছেঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى নিহত ব্যক্তিদের বদলা গ্রহণের জন্য পাল্টা হত্যার বিধান দেয়া হলো।

আর শুধু বদলার বিধান দিয়েহ ক্ষান্ত থাকা হয়নি, সাথে অন্যান্য অধঃপতিত জাতিগুলোর মধ্যে বদলা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যের প্রথা চালূ ছিল,বড় ও ছোটতে পার্থক্য করার যে রেওয়াজ ছিল তারও বিলোপ সাধন করা হয়। বলা হয়েছেঃ

كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

আসমানী গ্রন্থে আমি প্রাণের বদলে প্রাণ হননের বিধান দিয়েছিলাম।

অর্থাৎ প্রাণের বদলে প্রাণই নেয়া হবে, চাই তা ধনীর হোক কিংবা গরীবের। ধনী গরীবকে মেরে ফেললে কিংবা স্বাধীন মানুষ দাসকে হত্যা করলে তাকে ছেড়ে দেয়া চলবে না। কারন মানুষ হিসেবে সকলেই সমান। আবার শুধু বিধানটি দিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়নি। এই অনিবার্য রক্তপাতের বিধান মেনে নিতে কারো ইতস্তত বোধ হতে পারে এই ভেবে পুনরায় বলা হয়েছেঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّا أُولِي الْأَلْبَابِ۔

হে বুদ্ধিজীবী সমাজ, বদলা হত্যার বিধানকে তোমরা হত্যা মনে করো না বরং এতেই সমাজ জীবনের নিরাপত্তা নিহিত।

সমাজ দেহ থেকে এটি পচা–গলা ও বিপজ্জনক ফোঁড়া কেটে দিয়ে এই নিরাপত্তা অর্জন করা হয়েছে। বদলা হত্যা দ্বারা সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা অর্জনের এই দর্শনটি হযরত রসুলে করীম (সঃ) এক হাদিসে অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

انصر اخاك ظالما او مظلوما তোমার ভাই জালেম হলেও তাকে সাহায্য কর, মজলুম হলেও সাহায্য কর।

শ্রোতারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রসুলুল্লাহ, মজলুমের সাহায্য করার কথাতো বুঝলাম। কিন্তু জালেমকে সাহায্য করার অর্থ কি? হযরত বললেন تاخذ فوق يديه অর্থাৎ তোমরা তার হাত ধরে রাখ এবং তাকে জুলুম করা তেকে বিরত রাখবে। সুতরাং জালেমের জুলুম বন্ধ করার জন্য তার সাথে যে রকমের ও যতখানি কঠোরতা করা হোক না কেন, তা আসলে কঠোরতা নয় বরং সেটাই প্রকৃত মহানুভবতা এবং স্বয়ং জালেমের প্রকৃত সাহায্য। এ জন্যই ইসলামে আল্লাহর ফৌজদারী বিধানকে কার্যকরী করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং একে কল্যাণকর ও আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

اقامة حد من حدود الله خير من مطر اربعين ليلة في
بلاد الله عز وجل۔

আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি সমূহের একটিও যদি কার্যকরী করা হয় তবে তা ৪০ দিন ব্যাপী বৃষ্টি বর্ষণের চেয়েও বেশী কল্যাণকর।

বৃষ্টির কল্যাণে পৃথিবী উর্বর হয়, ভালো ফসল হয় এবং দেশে প্রাচুর্য আসে। কিন্তু একটা খোদায়ী আইন ও তার নির্ধারিত শাস্তি কার্যকরী করার উপকারিতা এর চেয়ে বেশী। এতে জুলুম, অশান্তি ও নৈরাজ্যের বিত্তি নির্মূল

হয়। আল্লাহর সৃষ্ট জীবরা শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পায়। আর শান্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমাজে সেই নিরুদ্বেগ পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সভ্য জীবনের জন্য অপরিহার্য এবং যা উন্নতি ও প্রগতির নিয়ামক।

বৈধ ও অবৈধ হত্যার পার্থক্য

বস্তুত আল্লাহর শরিয়তে অবৈধ হত্যার এমন কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং বৈধ হত্যার ওপর এমন প্রবল তাগিদ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এভাবে আমাদেরকে দুই চরমপন্থার মধ্যবর্তী ন্যায়নীতি ও সমতার সরল ও সোজা পথে চালিত করা হয়েছে। একদিকে রয়েছে সীমা অতিক্রমকারী চরম পন্থী গোষ্ঠী,যাদের কাছে মানুষের প্রাণের কোন দাম নেই, যারা নিজেদের প্রবৃত্তির খেয়াল–খুশীর ভিত্তিতে নিরপরাধ মানুষের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দেয়াকে বৈধ মনে করে। অপর দিকে রয়েছে ভ্রান্ত বুদ্ধি ও ভ্রান্ত দৃষ্টি ভংগীর অধিকারী একটি গোষ্ঠী–যারা রক্তের 'পবিত্রতা'ও রক্তপাতের চিরন্তন অবৈধতার পক্ষপাতি। কোন অবস্থাতেই কোন মানুষকে হত্যা করা তারা বৈধ মনে করে না। ইসলামী শরীয়ত এই উভয় ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগীকে খন্ডন করেছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, মানুষের প্রাণ কাবা শরীফের মত চিরন্তন পবিত্র কিংবা মা–বোনের মত শাশ্বত নিষিদ্ধ বস্তু নয় যে, কোন ভাবেই তা বৈধ হতে পারবে না। আবার তার মূল্য এত কমও নয় যে, প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার জন্য তাকে ধ্বংস করা যেতে পারে। একদিকে সে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছে যে, মানুষের প্রাণ–সত্তা এত সস্তা বস্তু নয় যে, নিছক মনোরঞ্জনের খাতিরে তাকে নির্যাতন করে কিংবা দগ্ধ করে মারা হবে এবং তাকে তড়পাতে ও ছটফট করতে দেখে আনন্দ বোধ করা হবে। মানুষের জীবন এমন নগন্য বস্তু নয় যে, ব্যক্তিগত ও ইচ্ছা আকাংখার পথে বাধা হতে দেখে কাউকে হত্যা করে ফেলা চলবে কিংবা ভিত্তিহীন ও অলীক কল্পনা এবং ভ্রান্ত রসম রেওয়াজের বেদীমূলে তাকে বিসর্জন দিতে দেয়া যাবে। এমন অপবিত্র উদ্দেশ্যে কোন মানুষের রক্তপাত অবশ্যই হারাম ও জঘন্য পাপ কাজ। অপরদিকে সে এ কথাও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, মানুষের প্রাণের চেয়েও মূল্যবান একটা বস্তু থাকে। সে বস্তুটি হলো 'সত্য' ও ন্যায়'। এ বস্তুটি যখন কারো প্রাণ হরণের দাবী জানাতে থাকে তখন তার প্রাণ হরণ শুধু বৈধই নয় বরং অবশ্য

কর্তব্য এবং তা হরণ না করাই এক নম্বরের পাপ কাজ। মানুষ যতক্ষণ সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকে ততক্ষণ তার রক্ত পবিত্র ও সম্মানার্হ থাকে। কিন্তু যখনই সে সীমা অতিক্রম করে 'সত্য' ও 'ন্যায়ে'র ওপর হস্তক্ষেপ করে তখন সে নিজের রক্তের মূল্য হারিয়ে ফেলে। তখন তার রক্ত পানির চেয়েও সস্তা ও মূল্যহীন হয়ে যায়।

অনিবার্য রক্তপাত

এই বৈধ হত্যা দৃশ্যত যদিও অবৈধ হত্যার মত রক্তপাতই বটে তথাপি আসলে এটা অনিবার্য ও অত্যাবশ্যক। কোন অবস্থাতেই এটা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কেননা এ ছাড়া দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় অকল্যাণ ও অরাজকতার মুল উৎপাটন। এ রক্তপাত চাড়া সজ্জনেরা কুজনদের এবং শিষ্টেরা দুষ্টদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে পারে না, পন্ডিতেরা ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে পারে না, ঈমানদাররা ঈমান ও বিবেকের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না, দুর্মদ–অহংকারী লোকদেরকে অত্যাচার থেকে ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না এবং সামগ্রিকভাবে আল্লাহর সৃষ্ট জীবেরা রক্তপাত ও আত্মিক শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয় না।

ইসলামের বিরুদ্ধে এরূপ রক্তপাতের অভিযোগ যদি কেউ আনতে চায়, আনুক। ইসলাম এ অভিযোগ স্বীকার করে নিতে বিন্দুমাত্রও লজ্জাবোধ করেনা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এরূপ অনিবার্য রক্তপাতের দায়ে দোষী নয় এমন আর কে আছে? বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসবাদ সব রকমের হত্যাকেই সর্বকালের জন্য অবৈধ মনে করে বটে; কিন্তু এই ধর্মও শেষ পর্যন্ত ' ভিক্ষু' ও 'গৃহস্থ'–এর মধ্যে পার্থক্য করতে বাধ্য হয়েছে। সবশেষে বৌদ্ধ ধর্ম একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্য মুক্তি (নির্বান) নির্দিষ্ট করে রেখে বাদ বাকী সমগ্র বিশ্ববাসীকে গুটিকয় নৈতিক উপেদশ দিয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে– যে গার্হস্থ্য ধর্মে রাজনীতি , শাসন ও যুদ্ধ সবই রয়েছে। এমনিভাবে খৃষ্টধর্মও প্রথমে যুদ্ধ–বিগ্রহকে পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করার পর শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। রোম সাম্রাজ্যের জুলুম যখন তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন সে নিজেই সাম্রাজ্য দখল করে। তারপর এমন ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু করে

যা 'অনিবার্য রক্তপাত' এর সীমা ছাড়িয়ে বহু দূর অগ্রসর হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মেও শেষের দিকের দার্শনিকেরা 'অহিংসা পরম ধর্ম'-এই মতবাদ প্রচার করেন এবং নরহত্যাকে পাপ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু একই সময়ের ধর্মবেত্তা 'মনু'কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যদি কেউ আমাদের স্ত্রীদের বেইজ্জতি করে, সম্পদ ছিনতাই করে কিংবা আমাদের ধর্মের অবমাননা করে তা হলে আমরা কি করবো? তিনি জবাব দিলেন, "এমন অপরাধী মানুষকে মেরে ফেলা উচিত, সে গুরু কিংবা ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ কিংবা তরুণ, যাই হোক না কেন।"

এখানে ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে এই অত্যাবশ্যক রক্তপাতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার অবকাশ নেই। ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা একটা আলাদা বিষয়। যথাস্থানে আমরা তা করবোও। তখন প্রমাণ হয়ে যাবে যে, যেসব ধর্ম যুদ্ধকে অবৈধ মনে করে সেসব ধর্মও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে পা দেয়ার পর এই অনিবার্য রক্তপাত থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি। আপাতত এখানে আমি শুধু এটুকুই দেখাতে চাই যে, নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে কোন মানবগোষ্ঠী যেকোন উচ্চ কাল্পনিক দর্শনে গিয়ে হাজির হোক না কেন, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এসে তাকে জীবনের সকল সমস্যাই বাস্তব উপায়ে সমাধান করতে হয়। উপস্থিত সমাজ ও পরিবেশ তাকে জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধান বাস্তব ও কার্যকার উপায়েই করতে বাধ্য করে। যে আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন, তাঁর পক্ষেও মানুষের প্রাণের 'পরম পবিত্রতা'সংক্রান্ত কাল্পনিক বিলাসিতা প্রসূত কিছু মজার মজার মূলনীতি ঘোষণা করা মোটেই কষ্টকর ছিল না-যেমনটি অহিংসবাদে করা হয়েছে। এমন ধরনের মূলনীতি যদি কোরআনের অলংকার মন্ডিত ভাষায় সত্যিই প্রচার করা হতো তা হলে বিশ্ববাসীর বুদ্ধি-বিবেক নিশ্চয়ই মোহিত ও হতবাক হয়ে যেত। কিন্তু নিজের ভাষার লালিত্য ও উচ্চমার্গের দার্শনিকতা জাহির করা সেই মহান বিশ্ব স্রষ্টার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি তার বান্দাহদের জন্য একটি সঠিক ও সুস্পষ্ট জীবন বিধান শুধু দিতে চেয়েছিলেন; এমন জীবন-বিধান যা অনুসরণ করে তার বান্দারা নিজেদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করতে পারে। তিনি দেখলেন যে, إِلَّا بِالْحَقِّ এর ব্যতিক্রম অনুমোদন না করলে لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ -এর সাধারণ নির্দেশ কার্যকরী হতে পারে না। আর তা যখন হতে পারেনা

তখন তাঁর ন্যায় নির্দোষ ও নিখুঁত আইনদাতার পক্ষে এটা সম্ভবনয় যে, একদিকে তিনি মানব জাতিকে لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (তোমরা যা নিজে করো না তা অন্যকে করতে বল কেন?) বলে সমালোচনাও করবেন, আবার অপর দিকে তাদেরকে এও শিক্ষা দেবেন যে, মুখে 'অহিংসা পরম ধর্ম' জপ করতে থাক আর হাতে তরবারী চালাতে থাক। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে মানুষের প্রাণের মর্যাদা নির্ধারণের সাথে সাথে হত্যার বদলে হত্যার বিধানও চালু করেন, সেটা তার চরম ও পরম বুদ্ধিমত্তারই স্বাক্ষর। এ ভাবে তিনি আসলে প্রাণের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় যে শক্তিটির ব্যবহার অপরিহার্য সেটাই ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন মাত্র।

সামগ্রিক অরাজকতার প্রতিরোধ

হত্যার বদলে হত্যার এই আইন যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সমষ্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, আলাদা আলাদাভাবে কিছু লোক যেমন বেয়াড়া, উচ্ছৃংখল ও সীমালংঘনকারী হতে পারে, তেমনি জাতি ও গোষ্ঠীও তা হতে পারে। ব্যক্তিরা যেমন লোভ–লালসার বশে সীমালংঘন করে বসে, তেমনি জাতি ও গোষ্ঠী সমূহের মধ্যেও এ জাতীয় নৈতিক ব্যাধি দেখা দিয়ে থাকে। এজন্য ব্যক্তি সমূহকে যেমন আনুগত্যের আওতায় বেঁধে রাখা ও সীমালংঘন থেকে বিরত রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তেমনি দল, গোষ্ঠী ও জাতি সমূহকে ও তাদের ক্রমবর্ধমান অনাচার থেকে বিরত রাখার জন্য যুদ্ধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। উৎপত্তিগত দিক থেকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অরাজকতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রকৃতি ও প্রক্রিয়ার দিক থেকে এ দুই–এ বিরাট পার্থক্য। ব্যক্তি সমূহের বিচ্ছিন্ন বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহ একটা ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত থাকে, অল্প সংখ্যক মানুষ তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মাত্র এক দুই গজ জায়গা রক্তরঞ্জিত করে তা নির্মূল করা সম্ভব। কিন্তু গোষ্ঠী সমূহের বাড়াবাড়ি ও অরাজকতা একটা সীমাহীন আপদ। কোটি কোটি মানুষের জীবন এর দরুন দুর্বিশসহ হয়ে ওঠে। বহুদেশ এবং বহু জাতি তার জন্য শোচনীয় দুর্দশায় পতিত হয়। গোটা সমাজ ও সভ্যতা লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এর মূলোৎপাটন রক্তের সমুদ্র প্রবাহিত করা ছাড়া সম্ভব নয়। কোরআনে একে اثخان فى الارض (ভূ–পৃষ্ঠে রক্তের স্রোত বইয়ে দেয়া) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

গোষ্ঠী সমূহ যখন বাড়াবাড়ি করে তখন শুধু একটা দুটো বিপর্যয় সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকে না। তাদের মধ্যে রকমারি শয়তানী শক্তি এসে জোটবদ্ধ হয় এবং তাদের বদৌলতে হাজারো রকমের হাঙ্গামা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে কিছুসংখক হয় অর্থ লোভী। তারা গরীব জাতি গুলোর ওপর নিষ্ঠুর শোষণ, লুন্ঠন ও দস্যুবৃত্তি চালায়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করে। তাদের শিল্প-কারখানা ধ্বংস করে। তাদের অর্জিত অর্থসম্পদ নানারকম ফন্দি-ফিকির চালিয়ে লুন্ঠন করে এবং নিছক ক্ষমতা মদমত্ত হয়ে ক্ষুধার্থ মজলুম জাতি সমূহের ন্যায্য সম্পদ দ্বারা নিজেদের গোলা ভর্তি করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয় ঘোর প্রবৃত্তি পুজারী। তারা দুর্বল মানুষের খোদা হয়ে বসে এবং আপন লোভ-লালসা ও খেয়ালখুশীর বেদীমূলে তাদের অধিকারগুলোকে বিসর্জন দেয়। সুবিচার ও ন্যায়নীতির মুলোৎপাটন করে জুলুম ও অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালায়। সৎ ও ন্যায় পরায়ন লোকদেরকে দাবিয়ে রাখে এবং অসৎ ও নীচমনা লোকদেরকে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেয়। তাদের অশুভ প্রভাবে জাতি সমূহের চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়। ন্যায়পরায়নতা, মহানুভবতা ও যাবতীয় সৎ গুণাবলীর উৎস সমূহ শুকিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকতা, পরস্ব অপহরণ, ভ্যভিচার, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, নৃশংসতা, বেইনসাফী ও যাবতীয় নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ ও অনাচার সমূহের পুঁতিগন্ধময় নালা প্রবাহিত হয়। এ জাতীয় গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে যাদেরকে পররাজ্য লিপ্সা ভূতের মত পেয়ে বসে। ফলে তারা দুর্বল ও অসহায় জাতিগুলোর স্বাধীনতা হরণ করে, নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, নিজেদের ক্ষমতার উচ্চাভিলাস পূর্ণ করার জন্য চরম অরাজকতার সৃষ্টি করে এবং স্বাধীন মানুষের গলায় পরিয়ে দেয় গোলামীর জিঞ্জির। বলাবাহুল্য এই পরাধীনতাই হলো সকল নৈতিক ব্যাধির উৎস। এইসব শয়তানী অনাচার সমূহের পাশাপাশি যখন ধর্মীয় ব্যাপারেও জোর-জবরদস্তি শুরু হয়ে যায়, যখন জালেম গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী আপন হীন স্বার্থের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করতে থাকে, আল্লাহর বান্দাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত করতে আরম্ভ করে দেয় এবং লোকদেরকে স্বধর্ম ত্যাগ করে হানাদার গোষ্ঠীর ধর্ম গ্রহণ করার জন্য নির্যাতন করা হয় তখন বিপদটা আরো ভয়াবহ বিভীষিকার রূপ ধারণ করে।

যুদ্ধঃ একটা নৈতিক কর্তব্য

বস্তুত এরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ শুধু বৈধই হয় না– অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এমন সময় ওই জালেমদের রক্তে পৃথিবীকে লাল করে দেয়াই হয়ে দাঁড়ায় মানবতার শ্রেষ্ঠতম সেবা। হাঙ্গামা–বিপর্যয় ও অরাজকতা সৃষ্ঠিকারী গোষ্ঠীর অনাচার থেকে মজলুম ও অসহায় মানুষকে মুক্তি দেয়া এ সময়কার প্রধানতম কর্তব্য। কারণ তারা শয়তানের অনুচর হয়ে আদম সন্তানদের ওপর নৈতিক ,আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত বিপর্যয় ডেকে আনে। এসব লোক প্রকৃতপক্ষে মানুষই নয়। তাই মানবোচিত সহানুভুতির যোগ্য বলেও তারা বিবেচিত হতে পারে না। মানুষের আকারে তারা শয়তান এবং মানবতার সত্যিকার দুশমন। তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর কোন কারণ যদি থেকেও থাকে, তবে সে সহানুভূতি তাদের কলংকময় জীবনকে ভূ–পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মধ্যেই নিহিত। তারা নিজেদের অনাচারের দরুনই নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার হারায়। তাদের এবং যারা তাদের অনাচারকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য মদদ জোগায় তাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনই অধিকার নেই। তারা আসলে মানব সমাজ দেহের এমন একটা অংগ, যা বিষাক্ত ও দূষিত উপকরণে ভর্তি হয়ে গেছে, যাকে বহাল রাখলে অবশিষ্ট গোটা দেহে পচন ধরার ও নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। এজন্য ঐ পচা, বিনষ্ট ও বিনাশক অংগকে কেটে ফেলে দেয়াই বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পৃথিবীতে এমন দু'একজন কল্পলোক বিহারী নৈতিকতাবাদী থাকতেও পারেন যিনি এমন জালেমদের হত্যাকেও পাপ বলে মনে করতে পারেন এবং যার কাপুরুষ আত্মা এইসব নরপিশাচদের প্রতিরোধে যে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী, তার কথা ভেবে শিউরে ওঠে। কিন্তু এমন নৈতিকতাবদী আর যাই পারুন, দুনিয়ার সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করতে পারেন না। তিনি জংগলে ও পাহাড়ে গিয়ে নিজের তপস্যা ও সাধনার পরাকাষ্ঠা যত খুশী দেখাতে পারেন, কিন্ত তার আদর্শ ও শিক্ষা দুনিয়াকে অনাচারমুক্ত করতে এবং জুলুম ও অত্যাচার থেকে মানব জাতিকে কখনো রক্ষা করতে পারে না। এ ধরনের নীতিবাগিশ পুরুষ এমন একদল আত্মসম্ভ্রম বোধহীন ও সংসারবিরাগী মানুষ গড়েতুলতে পারেন যারা মজলুমদের সাথে সাথে নিজেরাও জুলুম সহ্য করে যাবে। কিন্তু জুলুম ও অত্যাচারের বিলোপ সাধন

করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং মানবজাতিকে শান্তিতে বসবাস করা ও মানবতার উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছার সুযোগ করে দিতে পারে – এমন একদলমহানুভব ও দৃঢ়সংকল্প মানুষ গড়ে তোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বাস্তব নৈতিকতা একটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের দর্শন। এর লক্ষ্য হলো সঠিক ও নির্ভূল সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এ দর্শনে কাল্পনিক আনন্দ ও তৃপ্তির উপকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যেমন মন ও রসনার তৃপ্তি সাধন নয়, বরং শরীরকে সুস্থ করে তোলাই তার উদ্দেশ্য তা কটু ঔষধ দ্বারাই হোক কিংবা মিষ্টি ঔষধ দিয়েই হোক। ঠিক তেমনিভাবে নৈতিকতার উদ্দেশ্য মন কিংবা চোখের তৃপ্তি ও স্বাদ লাভ করা নয় বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সংশোধন, তা কঠোরতা কিংবা নম্রতা, যে পন্থায়ই হোক না কেন। একজন সত্যিকার নৈতিক সংস্কারক তরবারী ও কলম– এ দুটো জিনিসের যে কোন একটি দিয়েই সংস্কার ও সংশোধনের কাজ সম্পাদন করবেন এমন প্রতিজ্ঞা করতে পারেন না। তার গোটা দায়িত্ব ও মিশন সম্পন্ন করতে উভয় জিনিসেরই সমান প্রয়োজন। শুধুমাত্র প্রচার, শিক্ষা ও উপদেশ দ্বারা যদি উগ্র স্বভাবের ও অপরাধপ্রবণ মানুষগুলোকে মানবতা ও নৈতিকতার পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় তা হলে তাদের বিরুদ্ধে তরবারী ব্যবহার করা অবৈধ ও হারাম। কিন্তু যখন মনে হবে যে, একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অসততা ও নীচতা এতটা বেড়ে গেছে যে, উপদেশ ও নসিহত দ্বারা তাদেরকে সোজা পথে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা আর নেই এবং যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন পন্থায় তাদেরকে অন্যের অধিকার হরণ, অন্যের ইজ্জত ও সম্মানের ওপর অবৈধ আক্রমণ, অন্যের নিজস্ব ব্যাপারে অনধিকার হস্তক্ষেপ এবং অন্যদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনে শোষণ চালানো থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়, তখন মানবতার সত্যিকার কল্যাণকামী প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা এবং যতক্ষণ সাধারণ মানুষ তার হাতে অধিকার ফিরে না পায় ততক্ষণ ক্ষান্ত না হওয়া।

যুদ্ধের উপকারিতা

যুদ্ধের এই উপকারিতা ও আবশ্যকতাকেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছেনঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ

وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط (الحج:

আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষকে মানুষ দিয়ে জব্দ না করতেন তাহলে গীর্জা, মন্দির, মসজিদ ও যাবতীয় উপাসনালয় ধ্বংস করে ফেলা হতো। হজ্জঃ ৬

এই পবিত্র আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ন লোকদের দ্বারা জালেম ও অত্যাচারী লোকদেরকে প্রতিরোধ না করতেন তাহলে এত অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতা দেখা দিত যে, উপাসনালয় গুলো পর্যন্ত ধ্বংসের হাত থেকে রাক্ষা পেত না– যাকে স্বাভাবিক অবস্থায় সবচেয়ে নিরাপদ স্থান বলে মনে করা হয়। এখানে সঠিকভাবে একথাও বলা হয়েছে যে, একটি জাতি শত্রুতার বশে অন্য জাতির উপাসনালয় পর্যন্ত ধ্বংস করবে, অরাজকতার এটাই সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ও ঘৃণ্য অবস্থা। এরপর অত্যন্ত শানিত ভাষায় আল্লাহ নিজের নীতি ঘোষণা করে দিলেন যে, কোন মানবগোষ্ঠী যখন অরাজকতার এতটা নিম্নস্তরে নেমে যায় তখন আমি অন্য একটি মানবগোষ্ঠীর সাহয্যে তাদের অনাচার নির্মূল করে দেয়া অত্যাবশ্যক মনে করি।

যুদ্ধের এই উপকারিতাই পবিত্র কোরআনের অন্যত্র 'জালুত'– এর বিদ্রোহ ও হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের হাতে তার নিহত হওয়ার ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। ঘটনার শেষে সেখানে মন্তব্য করা হয়েছেঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (البقره : ٢٥١)

আল্লাহ যদি মানুষকে মানুষ দিয়ে শায়েস্তা না করতেন তাহলে দুনিয়া অরাজকতায় ভরে যেত। তবে বিশ্ববাসীর ওপর আল্লাহ খুবই অনুকম্পাশীল (যে, তিনি অরাজকতা নির্মূল করার এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন)। (বাকারাঃ ৩৩)

অন্য এক জায়গায় জাতি সমূহের পারস্পারিক শত্রুতা ও প্রতিহিংসা পরায়নতার উল্লেখ করে আল্লাহ বলেনঃ

كُلَّمَآ أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِى
الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (المائدہ: ٦٤)

তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ সে আগুন নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ নৈরাজ্যবাদীদের পছন্দ করেন না। (আল–মায়েদাঃ ৬৪)

আল্লাহর পথে জিহাদ

এখানেই সেই পবিত্র যুদ্ধ বা জিহাদের কথা এসে পড়ে। বিপর্যয় ও নৈরাজ্য, লোভ ও লালসা, শত্রুতা ও প্রতিহিংসা, গোড়ামি ও কূপমন্ডুকতার এই সর্বাত্মক আগ্রাসনের প্রতিরোধের জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে তরবারী উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ (الحج: ٣٩-٤٠)

যাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাদেরকে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার অনুমতি দেয়া যাচ্ছে। কেননা তাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন। এরা সেইসব লোক, যাদেরকে বিনা অপরাধে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের একমাত্র অপরাধ, তারা আল্লাহকে নিজেদের একক মনিব ও প্রভূ বলে ঘোষণা করেছে। (হজ্জঃ ৬)

পবিত্র কোরআনে সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে যতগুলো আয়াত আছে তার মধ্যে এ আয়াতটিই প্রথম নাজিল হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদের ওপর এ দোষ দেয়া হয়নি যে, তাদের

কাছে একটি উর্বর ভূ-খন্ড আছে, কিংবা বড় রকমের বাণিজ্যিক এলাকা আছে, কিংবা তারা ভিন্ন ধর্মের অনুসারী। বরং তাদের অপরাধ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তারা অত্যাচারী, তারা লোকদেরকে বিনা অপরাধে দেশ থেকে বিতাড়িত করে এবং তারা এতখানি গোঁড়া যে শুধু আল্লাহকে প্রভূ মেনে নেয়ার কারণে মানুষকে নির্যাতন করে। এরূপ লোকদের বিরুদ্ধে কেবল নিজের প্রতিরক্ষার জন্যই যুদ্ধ করতে বলা হয়নি। বরং অন্যান্য মজলুমের সাহায্য ও সমর্থনেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে জালেমদের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে।ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۝ (النساء : ٧٥)

একদল নির্যাতিত নারী, পুরুষ ও শিশু অনবরতই কেবল ফরিয়াদ জানাচ্ছে যে, হে প্রভু, আমাদেরকে এই জালেমদের বসতি থেকে দুরে নিয়ে যাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন বিশেষ সাহায্যকারী ও ত্রাণকর্তা পাঠাও। তোমরা আল্লাহর পক্ষে ও সেইসব নির্যাতিতদের মুক্তি দেয়ার জন্য যুদ্ধ করা না কেন? (সুরা নিসাঃ ১০)

যে যুদ্ধ জালেম ও নৈরাজ্যবাদীদের মোকাবিলায় নিজের আত্মরক্ষা এবং দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতিতদের সাহায্যের জন্য করা হয়, তাকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, এ যুদ্ধ মানুষের জন্য নয় বরং আল্লাহর জন্য, মানুষের স্বার্থোদ্ধারের জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। যতক্ষণ আল্লাহর নিষ্পাপ ও নিরীহ বান্দাদের ওপর স্বৈরাচারী ও অত্যাচারীদের অত্যাচার ও জুলুম এবং স্বার্থান্ধ আক্রমণের ধারা বন্ধ না হয়ে যায় ততক্ষণ এ যুদ্ধ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর ভাষায় قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (অরাজকতা নির্মূল না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও) এবং "حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا" (যুদ্ধ কর যতক্ষণ অস্ত্র সংবরণ না করে এবং গোলযোগের নাম- নিশানা

এমনভাবে মুছে না যায় যে যুদ্ধের প্রয়োজনই না পড়ে।) এইসাথে একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক যুদ্ধকে অবৈধ রক্তপাত মনে করে পিছিয়ে থাকা কিংবা এতে জান মালের ক্ষতি বা ঝুঁকি নিতে ইতস্তত বোধ করার পরিণতি মোটেই শুভ নয়।

হক ও বাতিলের সীমানা নির্ধারণ

আল্লাহ তা'আলা সত্যের উদ্দেশ্যে চালিত যুদ্ধের উপকারিতা ও আবশ্যকতা বর্ণনা করে ও সে যুদ্ধে প্রত্যেককে অংশগ্রহণের কঠোর নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যেঃ

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ
كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝ (النساء: ٧٦)

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর যারা কাফের ও অবাধ্য তারা জুলুম ও অন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের অনুচরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কারণ শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল।(আন–নিসাঃ১০)

এখানে একটা চূড়ান্ত কথা বলে দেয়া হয়েছে। হক ও বাতিলের সীমানা পূর্ণরূপে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। যারা জুলুম ও অন্যায়ের খাতিরে যুদ্ধ করে, তারা শয়তানের অনুচর। আর যারা জুলুম নির্মূল করার জন্য লড়াই করে, তারা আল্লাহর পথের মুজাহিদ। যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য সত্য ও ইনসাফের পরিপন্থি মানুষকে নিপীড়ন ও নির্যাতন করা, যার উদ্দেশ্য মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ও তাদের বৈধ স্বত্বাধিকার থেকে বেদখল করা, যার উদ্দেশ্য আল্লাহর অনুগত লোকদের বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়া, সেটা শয়তানের যুদ্ধ , সেটা বাতিলের যুদ্ধ। আল্লাহর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ ধরনের যুদ্ধে অংশ নিতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা এ ধরনের জালেম ও অত্যাচারীর মোকাবিলায় মজলুমদের সমর্থনে প্রতিরোধ যুদ্ধে এগিয়ে আসে, যারা দুনিয়া থেকে মুলুম ও অত্যাচার নির্মূল করে

ইসনাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যারা অহংকারী ও নৈরাজ্যবাদীদের নির্মুল করে আল্লাহর বান্দাদেরকে নিরুদ্বেগ শান্তির সাথে জীবন যাপন ও মানবতার উচ্চতর লক্ষ্যে পৌছার সুযোগ করে দিতে চায়, তাদের যুদ্ধ আল্লাহর পথে যুদ্ধ। তারা মজলুমদের সাহায্য করার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহরই সাহায্য করে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আল্লাহর পথে জিহাদের মর্যাদা

এটাই হলো সেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। পবিত্র কোরআনে এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে ভুরিভুরি আয়াত নাজিল হয়েছে। সূরা সাফ্‌ফ্‌–এ বলা হয়েছেঃ —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের যন্ত্রণায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে এমন একটা ব্যবসায়ের কথা শুনবে? সে ব্যবসাটি হলো, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং জান ও মাল দিয়ে তার পথে জিহাদ করা। যদি তোমাদের জ্ঞান থেকে থাকে তা হলে এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কাজ। (আস্‌সফঃ ২)

একই সুরার অপর আয়াতে মুজাহিদদের প্রশংসা এভাবে করা হয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم
بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ - (الصف : ٤)

আল্লাহ সেইসব মুজাহিদকে অত্যধিক ভালবাসেন যারা আল্লাহর পথে লৌহপ্রাচীরের মত কাতারবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। (আস্‌সফঃ ১)

আল্লাহর পথের এই লড়াই এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছেঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ
عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ (التوبہ: ۱۹-۲۰)

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং কা'বা শরীফের সেবা ও তত্ত্বাবধান করাকে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের কাজের সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করেছ? আল্লাহর কাছে এ দু'গোষ্ঠী সমান নয়। আল্লাহ জালেমদের সুপথে চালিত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, সত্যের জন্য বাস্তুভিটা ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে লড়াই করেছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠতর। তারাই প্রকৃতপক্ষে সফলকাম। (আত্‌তওবাঃ ১৯)

বস্তুত একেই বলা হয়েছে সত্যের লড়াই। এ লড়াই–এ এক রাত জাগা হাজার রাত জেগে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। এতে ময়দানে ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে শত্রুর সামনে রুখে দাঁড়ানো ঘরে বসে ৬০ বছর নামাজ পড়ার চেয়েও বড় পুণ্যের কাজ। এর জন্য যে চোখ নিদ্রাহীনভাবে প্রহরায় রত তার ওপর দোজখের আগুন হারাম। এই লড়াই–এর পথে ধুলিমলিন হয়েছে যে পদদ্বয় তাকে দোজখের আগুনের দিকে ঠেলে দেয়া হবে না। এই সাথে যারা লড়াই এড়িয়ে ঘরে বসে থাকে এবং লড়াই–এর ডাক শুনে যারা তাতে সাড়া দিতে গড়িমসি করে তাদেরকে এরূপ কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছেঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

হে নবী, আপনি ওদের বলে দিন যে, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়–স্বজন, তোমাদের সঞ্চিত সম্পদ ও বাণিজ্য–যাতে অচলাবস্থা দেখা দেয়ার আশংকা কর এবং তোমাদের প্রাণপ্রিয় ঘর–বাড়ী–এইসব যদি আল্লাহ, রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে অপেক্ষা কর, আল্লাহ স্বীয় কার্য সমাধা করবেন। জেনে রেখ, আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে কখনো সুপথে চালিত করেন না। (আত–তাওবাঃ ২৪)

জিহাদের মর্যাদার কারণ

ভাববার বিষয় যে, আল্লাহর পথে জিহাদের এত মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কেন? জিহাদকারীদেরকে কেন বারবার বলা হয় যে, তারাই সফলকাম ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আর যারা জিহাদে ফাঁকি দিয়ে ঘরে বসে থাকে, তাদের প্রতি কেনই বা এত হুশিয়ারী ? এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সেইসব আয়াতের ওপরও একটু দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া দরকার যাতে জিহাদের হুকুম, তার মাহাত্ম্য ও জিহাদ থেকে পালানোর দোষ বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতের কোথাও সাফল্য ও মাহাত্ম্যের অর্থ ধন–সম্পদ ও রাজ্য লাভ বলা হয়নি। গীতায় বলা হয়েছেঃ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন যে, তুমি যদি এই যুদ্ধে জয়ী হতে পার তাহলে পৃথিবীর রাজত্ব লাভ করতে পারবে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে কোথাও এভাবে পার্থিব ধন–দৌলত ও রাজত্বের লোভ দেখিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি। পরন্তু সব জায়গাতেই আল্লাহর পথে জিহাদের বিনিময়ে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদা লাভ এবং যন্তণায়ক শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। হাজীদের পানি পান করানো এবং কা'বা শরীফের সেবা ও তত্ত্বাবধান করা তৎকালীন আরবে একটা বিরাট অর্থ উপার্জন ও প্রভাব – প্রতিপত্তি লাভের উপায় বলে গণ্য হতো। সেই কাজের চাইতে ঘরবাড়ী ছেড়ে আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাওয়া ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। আর এ কাজের জন্য أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ। অর্থাঃ আল্লাহর নিকট উচ্চমর্যাদা লাভ ছাড়া অন্য কোন পুরস্কারেরও উল্লেখ করা হয়নি। অন্য জায়গায় একটি বাণিজ্যের পাঠ এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, সেখানে কিছু

ধন–সম্পদের উল্লেখ হবে বলে ধারণা হয়। কিন্তু একটু অগ্রসর হলেই দেখা যায়, সে বাণিজ্য আর কিছু নয়,কেবল আল্লাহর পথে জান–মালের পুঁজি নিয়োগ করা এবং তার বিনিময়ে পারলৌকিক আজাব থেকে অব্যাহতি লাভ। অন্য জায়গায় জিহাদে যারা গড়িমসি করে তাদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হয়েছে যে, তাদেরকে স্ত্রী–পুত্রের ভালোবাসা এবং সঞ্চিত ধন–সম্পদ, বাণিজ্য ও ঘর–বাড়ী হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয় পেয়ে বসেছে। অথচ দুনিয়াতে যারা যুদ্ধ করে দেশ জয় করতে সক্ষম হয় তারা অনেক টাকা–পয়সাও পায়, তাদের বাণিজ্যেও বেশ উন্নতি হয় এবং বিজিত জাতির লোকদের সুউচ্চ ভবন সমূহও তারা লাভ করে।

এখানে আরো একটা বিষয় ভাববার আছে। জিহাদের উদ্দেশ্য যখন পররাজ্য ও ধন–সম্পদ হস্তগত করা নয় তাহলে এই রক্তপাতে আল্লাহর কি ফায়দাটা হয়, যে তার জন্য তিনি এত বড় মর্যাদা ও পূণ্য বরাদ্দ করলেন? এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কি এমন মহত্ব লুকিয়ে আছে যে, এরজন্য ছুটোছুটিতে যে পা ধুলিমলিন হয়, তাকে পর্যন্ত অনুগৃহীত করা হয়? কি সেই চমৎকার সাফল্য যার জন্য এমন বিস্বাদ ও নিরস যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে বার বার أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (তারাই সফলকাম) বলা হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ (আল্লাহ মানুষকে মানুষ দিয়ে জব্দ না করলে পৃথিবী অরাজকাতায় ভরে যেত) এবং إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (তোমরা এটা (প্রতিরোধ যুদ্ধ) না করলে পৃথিবীতে ভয়াবহ বিপর্যয় ও নৈরাজ্য দেখা দেবে) এ আয়াত দুটোতেই নিহিত। বস্তুত আল্লাহ তাঁর পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অরাজকতা দেখা দিক তা চান না। তিনি চান না তার বান্দাদের বিনা অপরাধে নির্যাতন করা হোক, ধ্বংস করা হোক। সবলেরা দুর্বলদের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনকে বিপর্যয় ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিক–এটা তিনি সহ্য করতে রাজী নন। তিনি চান না, পৃথিবীতে প্রতারণা, জুলুম, বেইনসাফী,হত্যাকান্ড ও লুটতরাজ চলুক এবং দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে সৃষ্ট জীবের দাসত্ব করে। তাদের উচ্চ মানবীয় মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বকে অপমানিত ও কলংকিত করুক। সুতরাং যে মানবগোষ্ঠী কোনপ্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ধন–দৌলতের আশা–অভিলাস ছাড়াই কেবল মাত্র

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পৃথিবীকে ঐসব অরাজকতা ও মলিনতা থেকে মুক্ত ওপবিত্র করতে সংকল্পবদ্ধ হয়, যারা জুলুম ও অবিচারের মুলোৎপাটন করে তার স্থলে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়, যারা এই মহৎ কাজে নিজেদের জান–মাল, বাণিজ্য, পিতা–পুত্র, ভাই–বেরাদার, স্ত্রী ও আত্মীয়–স্বজনের মায়া এবং ঘরের আরাম–আয়েশ, বিলাস–ব্যাসন সবকিছুই বিসর্জন দিতে পারে, তাদের চেয়ে বেশী আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের অধিকারী আর কে? সাফল্য ও বিজয়ের সিংহদ্বার তাদের জন্য ছাড়া আর কার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে।?

বস্তুত এখানেই আল্লাহর পথে জিহাদের মর্যাদা ও মাহাত্ম নিহিত। এ মাহাত্মের জন্যই একে মানুষের যাবতীয় কাজের মধ্যে ঈমানের পর সর্বাপেক্ষা মহৎ ও পুণ্যময় কাজ বলে ঘোষনা করা হয়েছে। চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে এটাই সফল পূর্ণকর্ম ও চারিত্রিক গুণাবলীর ভিত্তি ও প্রাণ। অন্যায় ও অসততাকে কোন অবস্তাতেই সহ্য না করা এবং তাকে নির্মুল করার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া মানবীয় মাহাত্মের সর্বোচ্চ গুণবৈশিষ্ট। বাস্তব জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠিও এই গুণবৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত। যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতি অবিচার বরদাশত করে, নৈতিক দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত তাকে তার নিজ স্বত্তার ওপর পরিচালিত জুলুম–অবিচারও মেনে নিতে বাধ্য করে। আর নিজের প্রতি অবিচার ও অন্যায় সহ্য করার এই মনোবৃত্তি যখন সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার সেই নিকৃষ্টতম আবর্তে নিক্ষিপ্ত হতে হয়, যাকে আল্লাহ তাঁর অভিশাপ বলে অভিহিত করেছেনঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ

তাদের ওপর চরম লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের বিভীষিকা নেমে এসেছিল। তারা আল্লাহর পক্ষ হতে অভিশপ্ত হয়েছিল।

এই স্তরে নামার পর মানুষের মধ্যে ভদ্রতা ও মানবতাবোধ বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। সে ধুধু দৈহিক ও বস্তুগত দাসত্বই নয় মানসিক ও আধ্যাত্মিক গোলামীও বরণ করে নেয়। সে নীচতা ও হীনতার এমন ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত হয় যে, সেখান থেকে আর কখনোই বেরিয়ে আসতে পারে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যায়কে নিছক অন্যায় হবার কারণে খারাপ মনে করার চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী এবং মানব জাতিকে তা থেকে অব্যাহিত দেয়ার জন্য ক্লান্তিহীন সংগ্রাম করে, সে একজন সত্যিকার মানুষ এবং মহৎ মানুষ। তার অস্তিত্ব মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ। এরূপ ব্যক্তি বিশ্ববাসীর কাছ থেকে কোনো প্রতিদান নাও চাইতে পারে। কিন্তু বিশ্ববাসী যত অকৃতজ্ঞতার কলংকই বয়ে বেড়াক, এত অকৃতজ্ঞ নয় যে, মানবতার এমন নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম সেবককে নিজেদের নেতা রূপে বরণ না করে পারে। কারণ কোন প্রতিদানের আশা ছাড়াই তিনি তাদেরকে অন্যায়ের প্রভূত্ব থেকে মুক্তিদান এবং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত স্বাধীনতা এনে দেয়ার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। বস্তুত এটাই أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ। (পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার ন্যায়পরায়ন বান্দাগণ) আয়াতের মর্মার্থ। এখান থেকেই বুঝা যায় যে, أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ এরঅর্থ শুধু আখেরাতের সাফল্যই নয় বরং পার্থিব সাফল্যও প্রকৃতপক্ষে তাদেরই প্রাপ্য, যারা নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ও আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণের জন্য জিহাদ করে।

সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় জিহাদের স্থান

জিহাদের এ তাৎপর্য জানার পর, জাতীয় ও সামাজিক জীবনে–এর গুরুত্ব কি এবং সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্থ ও বিকারমুক্ত রাখার জন্য এর আবশ্যকতা কতখানি, তা বুঝা সহজ হয়ে যায়। পৃথিবীতে যদি এমন কোন সংগঠন বর্তমান থাকতো, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে সংগ্রাম করতে থাকে এবং সমস্ত বিদ্রোহী ও স্বেচ্ছাচারী শক্তিগুলোকে আপন আপন সীমা–সরহদ মেনে চলার জন্য বাধ্য করতে পারে, তাহলে আজকের সমাজব্যবস্থায় যে ভারসাম্যহীনতা দেখা যায় তা আর দেখতে হতো না। আজকের মানব সমাজ জালেম ও মজলুম, প্রভূ ও গোলামের দুটি গোষ্ঠীতে যেরূপ বিভক্ত হয়ে আছে এবং আজকের বিশ্ববাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন কোথাও দাসত্ব ও জুলুমের শিকার হয়ে, কোথাও সীমাহীন স্বৈরাচারী ও পাপাচারের পরিণামে যেরূপ ধ্বংস ও বিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে, তাও হয়তো আর চলতো না। অন্যায়–অত্যাচার থেকে অন্যকে বাচানোতো অনেক বড় কথা,

কেবল নিজের ওপর থেকে জুলুম প্রতিহত করার অনুভূতি ও উদ্যমও যদি কোন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে এবং এরজন্য তারা যদি নিজেদের আরাম ও বিলাস, ধন ও সম্পত্তি, ইন্দ্রিয় সুখ ও প্রাণের মায়া সব কিছুকে বিসর্জন দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে, তা হলে সে মানবগোষ্ঠী কখনো লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হতে পারে না; তার ইজ্জত ও সম্ভ্রমকে কেউ পদদলিত করতে পারে না। সত্যের সামনে অবলীলাক্রমে মাথা নত করে দেবে এবং অসত্যের সামনে মাথা নত করার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করবে, এটাই হওয়া চাই একটা মর্যাদশীল মানবগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

সত্যকে সমুন্নত করা এবং সত্যের জন্য সাহায্য ও সহযোগীতা করার মত মনোবল ও বাহুবল যদি তার না থাকে, তাহলেও অন্তত সত্যকে রক্ষা করার ব্যাপারে অবিচল ও কঠোর সংকল্প থাকা উচিত। কেননা এটাই হলো মানবিক মাহাত্মের সর্বনিম্ন স্তর।

কিন্তু এই সর্বনিম্নস্তর থেকেও নীচে মেনে গিয়ে যে জাতি সত্যের সংরক্ষণের দায়িত্বও পালন করতে পারে না এবং যাদের মধ্যে ত্যাগ–কোরবানীর মনোবৃত্তি এত কমে যায় যে, অন্যায় ও অসত্যের প্রভুত্ব খতম করা অথবা যে জাতি নিজে খতম হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে অন্যায়ের অধীনতা মেনে বেঁচে থাকাকেই বরণ করে নেয়, সে জাতির পৃথিবীতে কোন মর্যাদা থাকতে পারে না। এমন জাতির বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কাপুরুষ জাতি সমূহের কথা বারবার উল্লেখ করে ঐ কথাটাই বুঝাতে চেয়েছেন। কোরআনে বর্ণিত ঐ জাতিগুলো এমনি নিকৃষ্ট চরিত্রের ছিল যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে জান–মাল ও ইন্দ্রিয় সুখের অনিষ্ঠ ঘটবে এই ভয়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকতো। শেষ পযন্ত অন্যায় ও অসত্যের প্রভুত্ব তারা মেনে নেয় এবং নিজেদের ভাগ্যকে চিরদিনের জন্য ব্যর্থতার গ্লানি দিয়ে ভরে তোলে। এরূপ জাতিগুলোকে আল্লাহ জালেম জাতি বলে অভিহিত করে থাকেন। অর্থাৎ নিজেদের কাজ দ্বারা তারা নিজেদের ওপর জুলুম করছে এবং সত্যি সত্যি তারা নিজেদের জুলুমের দ্বারাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ দিয়েছেনঃ

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ

وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ
رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ۝ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (التوبہ: ۷۰-۷۱)

পূর্ববর্তী ইবরাহীমের জাতি এবং আ'দ, সামুদ ও নূহের জাতি সমূহ এবং মাদায়েনবাসী ও মুতাফিকাত ধারীদের ইতিহাস কি তারা জানে না? তাদের কাছে নবীরা সুস্পষ্ট নির্দেশমালা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাদের ওপর জুলুম করেন নি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। পক্ষান্তরে ঈমানদার নারী–পুরুষেরা পরস্পরের মিত্র ও সহযোগী। তারা ভালো কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। (তওবা)

এখানে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর নিজেদের ওপর অত্যাচারের উল্লেখ করার পরক্ষণেই ঈমানদারদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে থাকে। এ কথা দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, পূর্বতন জাতিগুলো সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজ প্রতিরোধ করা বন্ধ করেছিল। এটাই ছিল তাদের জুলুম। এ জুলুমের পরিণামেই তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

অন্য এক জায়গায় বনী ইসরাইলের কাপুরুষতা ও জিহাদে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করা হযেছে। বলা হয়েছে যে, হজরত মুসা (আঃ) স্বজাতীকে আল্লাহর নেয়ামত সমুহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যে পবিত্র ভূমিখন্ড উত্তরাধিকার হিসেবে দিয়েছেন সেখানে চলে যাও এবং কোনক্রমেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। কেননা পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীরা সব সময়ই ব্যর্থকাম হয়ে থাকে। কিন্তু বনী ইসরাইল ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তারা বললঃ

يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا
حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۝

হে মূসা, ঐ ভুখন্ডে একটি পরাক্রান্ত জাতি বাস করে। তারা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ওখানে প্রবেশ করাবো না। তারা আগে বেরিয়ে যাক তারপরেই আমরা ঢুকছি। (মায়েদা)

ঐ ভিরু জাতির মধ্য হতে দু'জন মর্দেমুমিন তখন বেরিয়ে এলেন। আল্লাহ তাদের দু'জনকে বীরোচিত সাহস দিয়ে অনুগৃহীত করেছিলেন। তারা পরামর্শ দিলেন যে, তোমরা নির্ভয়ে ঢুকে পড়। দেখবে, তোমরাই জয়যুক্ত হবে। তোমাদের যদি ঈমান থেকে থাকে তা হলে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। কিন্তু সেই কাপুরুষ জাতি তাদের লাঞ্ছনাময় জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট রইল। ভীরুতা থেকে তারা মুক্ত হতে পারলো না। হযরত মূসা (আঃ) কে তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলঃ

يٰمُوْسٰىٓ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ
اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ - (المائدہ: ٢٤)

হে মূসা, ওরা যতক্ষণ ওখানে আছে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই ঢুকতে পারবো না। তার চাইতে বরং তুমি আর তোমার আল্লাহ লড়াই কর গিয়ে। আমরা এখানে বসে রইলাম। (মায়েদা)

অবশেষে তাদের এই ক্লীবতা ও ভীরুতার দরুন আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত করলেন যে, চল্লিশ বছরের মধ্যে ওদের আর কোন আবাসভূমি জুটবে না, যাযাবরের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবেঃ

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ
فِى الْاَرْضِ (المائدہ: ٢٦)

আল্লাহ তা'আলা ফরমান জারী করলেন যে, যে ভূ–খন্ড তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তা এখন চল্লিশ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। এখন ওদের দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াতে হবে। (মায়েদাঃ ৪)

সূরা বাকারার এক জায়গায় খুবই চিত্তাকর্ষকভাবে বনী ইসরাইলের এই কাপুরুষতা, ধন–সম্পদ ও জানের মায়া এবং মৃত্যুভীতির উল্লেখ করা

হয়েছে। এসব ক্রটির দরুন তারা আল্লাহর পথে জিহাদের কর্তব্য পরিত্যাগ করেছিল। ফলে চূড়ান্ত জাতীয় ধ্বংস ও বিনাশই হয়েছিল এর শেষ পরিণাতি। আল্লাহ বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ (البقرہ: ٢٤٣)

মৃত্যুর ভয়ে যে হাজার হাজার লোক দেশত্যাগ করেছে, তাদের ব্যাপারটা ভেবে দেখনি? আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপরে মৃত্যুর আদেশ জারী করে দিলেন। তারপর পুনরায় তাদের জীবিত করলেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মানুষের ওপর বড়ই অনুগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

এর পরই আল্লাহ মুসলমানদেরকে সত্যের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিলেনঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই জানেনও শোনেন।

এরপর বনি ইসরাইলের আর একটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ (البقرہ: ٢٤٦)

> মূসার পরবর্তী সময়কার বনী ইসরাইলের সেই গোষ্ঠীটির কথা ভেবে দেখনি, যারা তাদের নবীকে বলেছিল যে, আমাদের জন্য একজন রাজা নিয়োগ করুন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি? নবী বললেন, তোমাদের যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলে আবার পিঠটান দেবে নাতো? তারা বললো, সে কি! আমরা ঘরবাড়ী ও সন্তান–সন্ততি থেকে নির্বাসিত হয়েছি। তবুও লড়াইতে পিঠটান দেব কেন? কিন্তু কার্যত যখন যুদ্ধের হুকুম এল,তখন গুটিকয় লোক ছাড়া সকলেই পিছু হটে গিয়েছিল। আল্লাহ জালেমদের বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন।
> (বাকারাহঃ ৩২)

এ ধরনের বহু উদাহরণ আছে। এসব উদাহরণ বারবার উল্লেখ করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়িত্বের জন্য সত্যিকার ত্যাগ ও কোরবানীর প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী। এই ত্যাগ ও কোরবানীই হলো সত্য ও ন্যায়ের রক্ষক। যে জাতি এই ত্যাগের প্রেরণা হারায়, সে জাতি অনতিবিলম্বেই অন্যায় ও অসত্যের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে থাকে। আর সে পরাজয়ের পরিণতি চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা তার অনুসারীদের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের রক্ষণাবেক্ষণের এমন দুর্জয় প্রেরণা সৃষ্টি করতে চায়, যার ফলে কোন অবস্থাতেই তাদের মধ্যে অসত্য ও অন্যায়ের সামনে মাথা নত করা এবং জুলুম ও স্বৈরাচারের প্রভুত্ব মেনে নেয়ার মত দুর্বলতা দেখা দিতে পারে না। কোরআনের শিক্ষা অনুসারে মানুষের সবচেয়ে বড় হীনতা ও সবচেয়ে অপমানজনক দুর্বলতা এটাই। নিজের আরাম-আয়েশ, ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়ায় যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়ের সংরক্ষণের কর্তব্যে অবহেলা করে, এই কর্তব্যের পথে যে কঠোরতা ও প্রতিকূলতা রয়েছে, তার ভয়ে সে উক্ত কর্তব্য এড়িয়ে যায় এবং বাতিল শক্তিকে পরাক্রান্ত দেখে তার দাসত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন সে যে দুর্বলতার পরিচয় দেয়, তা দেহ ও প্রাণের দুর্বলতা নয়, সেটা মন ও আত্মার দুর্বলতা, সেটা ঈমানের দুর্বলতা। এ দুর্বলতা যখন কোন জাতির মধ্যে দেখা দেয় তখন তার মধ্য হতে মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, আত্মসম্মানের যাবতীয় চেতনা ও অনুভূতি আপনাআপনি দূর হয়ে যায়। সে জাতি সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত করাতো দূরে থাক, স্বয়ং নিজেকেও সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে না। দৈহিক গোলামী সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে, এর বন্ধন কেবল ওপরে ওপরেই বর্তমান থাকে এবং মন ও আত্মার অভ্যন্তরে তার প্রভাব পৌঁছে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে,শরীর দাসত্ব বরণ করার আগেই আত্মা দাসত্ব বরণ করে। শরীর কেবল তখনই গোলামীর অবমাননাকর জিঞ্জির পরে, যখন আত্মা আত্মসম্ভ্রম ও স্বকীয়তার চেতনা একেবারেই হারিয়ে ফেলে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অনুভূতি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যায়। সুতরাং যে জাতি হীনবল, হীনমন্যতা ও কাপুরুষতার বশে নিজ অধিকার সমূহের সংরক্ষণে শৈথিল্য দেখায় এবং বাতিল ও অন্যায় শক্তির আনুগত্য গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যায়, সে জাতি নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখতে কিছুতেই সক্ষম হয় না। সে জাতি আপন কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আইন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক

মূলনীতি সমূহের ওপর অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ও আপন সমাজ ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্য অটুট রাখতে পারে না। তাছাড়া হক ও বাতিল যখন দুটো পরস্পর বিরোধী বস্তু এবং এক জায়গায় উভয়ে একত্র হতে পারে না, তখন একটি জাতি বাতিলের দাসত্ব বরণ করে নেয়ার পরও সত্যের আনুগত্যে বহাল থাকবে –এটা কি করে সম্ভব? একটির সাথে দাসত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্যটির সাথে দাসত্ব সম্পর্কের অনিবার্য ছেদ কিভাবে রোধ করা সম্ভব? চিরায়ত সত্য যে স্বভাবগত ভাবেই একক ও অখন্ড আনুগত্যের দাবী করে, সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং 'অর্ধেক আমার, অর্ধেক তোমার' এর ভিত্তিতে বাতিলকে সে নিজের সহযোগী ও হিস্‌সাদার হিসেবে মেনে নিতে রাজী হতে পারে না। এজন্য সত্যের আনুগত্য যে করতে চাইবে, তাকে বাতিলের দাসত্ব ত্যাগ করতেই হবে। তার আপন স্কন্ধকে অন্য সকল দাসত্ব ও আনুগত্যের শৃংখল থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

কোরআন মূলত সনাতন ও চিরায়ত সত্যেরই মুখপত্র। সত্যের এই ঐকান্তিক ও স্বভাবগত দাবীকে সে যথাযথভাবে রক্ষা করেছে। এজন্যই মানুষকে সে শুধু মাত্র দুটো পথ দেখিয়েছেঃ যথার্থ সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা অথবা মৃত্যুবরণ করা। সম্মানহীন জীবন --এই তৃতীয় পথটি তার অভিপ্রেত পথ নয়। অবশ্য তার হতভাগা অনুসারীরা যদি আপন ঈমানের দুর্বলতা ও সংকল্পের শৈথিল্য বশত নিজেরাই ঐ পথ গ্রহণ করে তাহলে সে আলাদা কথা। কোরআন এ পথকে 'অবমাননাকর, 'লাঞ্ছনাময়, ও 'অভিশপ্ত' পথ বলে অভিহিত করেছে। তার দৃষ্টিতে এটা কাপুরুষ ও ভীরু জাতি সমূহের বৈশিষ্ট্য--যারা আল্লাহর চেয়েও মানুষকে বেশী ভয় করে এবং এভাবে নিজেদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ ডেকে আনে, কোরআনের মতে এই অবমাননাকর জীবনকে গ্রহণ করা নিজের ওপর জুলুম করারই শামিল। কোরআন এ ধরণের গ্লানিময় জীবনকে যারা গ্রহণ করে তাদেরকে চরম ব্যর্থতা ও শোচনীয় পরিণতির হুঁশিয়ারী দিয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا
فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ

اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝ (النساء : ٩٧)

নিজেদের ওপর অত্যাচার করছিল এমন অবস্থায় যাদের জান ফেরেশতারা কবজ করেন তাদেরকে তারা জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা কিহালে জীবন–যাপন করেছিলে? তারা বলেঃ আমরা দুনিয়াতে খুবই দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলেনঃ আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা অন্যত্র চলে যেতে? এ ধরনের লোকদের বাসস্থান জাহান্নাম এবং সেটা বড়ই খারাপ জায়গা। (নিসাঃ ১৪)

(একদল মুসলমান হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাধারণ মুসলমানদের হিজরতের পর মক্কায় থেকে গিয়েছিলো। তারা নিজেদের বাড়ী–ঘর, ব্যবসা–বাণিজ্য ও জমি–জায়গার খাতিরে মক্কার অনৈসলামিক সমাজে বাস করাকে বরণ করে নেয়। অথচ সেখানে তারা নিজেদের ঈমান ও আকীদা–বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করতে সক্ষম ছিলো না। বরং কাফেরদের অধীনতা বশত অনেকগুলো বিধর্মীসুলভ রসম–রেওয়াজ ও আচার–আচরণ মেনে চলতে বাধ্য ছিলো। এমনকি সেই সামাজিক চাপের কারণে তারা কাফের বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বদরের ময়দানে আসতে বাধ্য হয়। বলাবাহুল্য, আলোচ্য আয়াত তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়।)

ভাববার বিষয় যে, জাতীয় মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধের কত সুন্দর শিক্ষা এখানে দেয়া হয়েছে। নিজেকে নিজে দুর্বল ভেবে যারা বাতিলের আনুগত্য গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যায় তাদেরকে নিজের ওপর অত্যাচারকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের কাছে যখন অবমাননাকর জীবন গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা ওজর দিল দুর্বলতার। কিন্তু এ ওজর গ্রাহ্য হলো না। বলা হলো, তোমরা যদি দুর্বলই হতে তাহলে এহেন অবমাননাকর অবস্থা মেনে নেয়ার চাইতে ঘর–বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়াই উচিত ছিল। যেখানে নিজের ঈমান ও বিবেকের বিরুদ্ধে জীবন –যাপনের বাধ্যবাধকতা ছিল না– তেমন কোন জায়গায় গিয়ে বসবাস করা দরকার ছিল। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় সুখ ও আরাম–আয়েশের খাতিরে বাতিলের গোলামীর ন্যায়

অপমানজনক কাজ কেন মেনে নিলে? অবশেষে এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে তাদেরকে ব্যর্থতা ও অবমাননার নিকৃষ্টতম ভাগাড়ে নিক্ষেপ করা হলো। সে ভাগাড়ের নাম জাহান্নাম এবং তার চেয়ে বিভৎস জায়গা আর কিছু হতে পারেনা।

প্রতিরক্ষার দায়িত্ব

উল্লেখিত কারণেই মহান কোরআন সব ব্যাপারেই ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া সত্ত্বেও এমন কোন আক্রমণ বা আগ্রাসন বরদাশত করার শিক্ষা দেয়নি যার উদ্দেশ্য ইসলামী ব্যবস্থাকে নির্মূল ও উৎখাত করা এবং মুসলমানদের ওপর ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া। কোরআন অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে, তোমাদের মানবিক অধিকার যে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে, যে তোমাদের ওপর জুলুম–অত্যাচার চালাবে, তোমাদের বৈধ স্বত্বাধিকার থেকে তোমাদের বেদখল করবে, তোমাদের বিবেক ও ঈমানের স্বাধীনতা হরণ করবে, তোমাদেরকে আপন আদর্শ অনুসারে জীবন–যাপন করতে বাধা দেবে, তোমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করবে এবং তোমরা ইসলামের অনুসারী বলে তোমাদেরকে নির্যাতন ও নিপীড়ন করবে, তাদের প্রতিরোধ করতে মোটেই দুর্বলতা দেখিও না। বরং সর্বশক্তি দিয়ে সেই জুলুম ও অত্যাচারকে খতম করার চেষ্টা কর ঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ط
إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ
قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ
اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ (البقرة : ١٩٠-١٩٤)

যারা তোমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তাদের সাথে তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে সীমালংঘন করো না। (অর্থাৎ জুলুম ও বাড়াবাড়ি করো না।) কেননা যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। এই জালিমদের যেখানে পাও হত্যা কর। যেখান থেকে তোমাদের বের করেছিল সেখান থেকে ওদের বের করে দাও। কেননা অরাজকতা হত্যার চেয়েও মারাত্মক জিনিস। তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে কা'বা শরীফের মিলনায়তনে যুদ্ধ না করবে ততক্ষণ তোমরাও তাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করো না। তারা যদি সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তা হলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর। অবিশ্বাসীদের এটাই উপযুক্ত শাস্তি। এরপর তারা যদি ক্ষান্ত হয় তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমরা তাদের সাথে ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাও–যতক্ষণ নৈরাজ্যের অবসান না হয় এবং সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট না হয়ে যায়। তারা যদি ক্ষান্ত হয় তাহলে অত্যাচারীরা ছাড়া আর কারো জন্য কোন শাস্তি নেই। নিষিদ্ধ মাসের বদলায় নিষিদ্ধ মাস এবং সকল নিষিদ্ধ আচরণের বদলা আছে (অর্থাৎ শত্রুরা যদি নিষিদ্ধ মাস ও স্থানের পবিত্রতা লংঘন করে তা হলে মুসলমানদের নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা চলবে না, বদলা নিতে হবে।) সুতরাং কেউ যদি তোমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করে তা হলে তোমরাও তার সাথে সেই পরিমাণ বাড়াবাড়ি কর। তবে আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রেখ, আল্লাহকে যারা ভয় করে আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন।

(বাকারাহঃ ২৪)

ইসলাম ও মুসলিম আবাসভূমির রক্ষণাবেক্ষণের এ আদেশ এমন কঠোর যে, কোন অজুহাতেই এ আদেশ অমান্য করা বা স্থগিত রাখা চলে না। কোন শক্তি যখন ইসলামকে উৎখাত করা ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে নির্মূল করার জন্য আক্রমণ চালায় তখন ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেক

মুসলমানের ওপর অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে উক্ত হামলা প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ ঐ আক্রমণ থেকে ইসলাম ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা হয় ততক্ষণ এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেই। ফেকাহ শাস্ত্রের সকল কিতাবে এ আদেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, দুশমন যখন দারুল ইসলামের ওপর আক্রমণ চালায় তখন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলমানের ওপর নামাজ–রোজার মতই অপরিহার্য কর্তব্যে পরিণত হয়। ফেকাহর প্রখ্যাত কিতাব 'বাদায়েউছ ছানায়ে' তে লেখা রয়েছেঃ

اما اذا عم النفير بان هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد من احاد المسلمين ممن هو قادر عليه فاذا عم النفير لا يتحقق القيام به الا بالكل فبقي فرضا على الكل عينا بمنزلة الصوم والصلوٰة فيخرج العبد بغير اذن مولاه والمرأة بغير اذن زوجها لان منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عينا مستثناه عن ملك المولى والزوج شرعا كما في الصوم والصلوٰة وكذا يباح للولد ان يخرج بغير اذن والديه لان حق الوالدين لا يظهر في فروض الاعيان كالصوم والصلوٰة – (جلد ٧، صفحه ٩٨)

কিন্তু যখন এই মর্মে ঘোষণা জারী হবে যে, শত্রুরা কোন মুসলিম দেশের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তখন জিহাদ প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের ওপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হয়ে যায়। সাধারণ ঘোষণা[২] জারী হবার পর সকলে একত্রে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া ফরজ আদায় হয় না। এ সময় ঠিক নামাজ–রোজার মতই জিহাদ সকল মুসলমানের ওপর প্রত্যক্ষ ভাবে ফরজ হয়ে যায়। সুতরাং দাস মনিবের এবং স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই জিহাদে নেমে পড়বে। কেননা নামাজ–রোজার ন্যায় যেসব ইবাদত প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ, তাতে দাসের ওপর মনিবের এবং স্বামীর ওপর স্ত্রীর কোন বৈধ কর্তৃত্ব বা

স্বত্ব নেই। তেমনিভাবে পিতা–মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তান জিহাদে বেরুবে। কেননা নামাজ–রোজায় যখন পিতা–মাতার কর্তৃত্ব নেই তখন জিহাদেও থাকতে পারে না। (৭ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

بان هجم العدو على بلد (শত্রুরা কোন মুসলিম দেশের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে) এ কথাটি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু ধর্মীয় গোঁড়ামীর বশে কোন জাতি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইবে এমন অবস্থাতেই জিহাদ ফরজ নয়, বরং ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম অধ্যুষিত ভূ–খণ্ডের ওপর যে কোন আগ্রাসী আক্রমণকে প্রতিহত করাও একই রকম ফরজ। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের জন্য স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও সার্বভৌমত্ব সবচেয়ে জরুরী জিনিস। স্বাধীনতা হারানোর পর মুসলমানদের মধ্যে মানবতার যে সর্বোচ্চ সেবার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তার ক্ষমতা আর থাকে না। এমনকি তারা নিজেদের শরীয়তভিত্তিক সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবনকেও বহাল রাখতে পারে না। এ জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী জাতীয়তার ওপর আক্রমণ করা স্বয়ং ইসলামের ওপরই আঘাত হানার শামিল। কোন দুশমনের যদি ইসলামকে নির্মূল করার ইচ্ছা নাও থেকে থাকে বরং শুধু মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তি খর্ব করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তথাপি তার সাথে যুদ্ধ করা ঠিক তেমনিভাবে ফরজ যেমন ইসলামকে নির্মূলকারীর সাথে যুদ্ধ করা ফরজ। এ জন্যই যে দেশ বা শহরের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে, শুধু সেই দেশ বা শহরের মুসলমানদের ওপরই প্রতিরোধ সংগ্রাম ফরজ করা হয়নি, বরং তারা যদি হামলা প্রতিহত করার ক্ষমতা না রাখে তাহলে গোটা পৃথিবীর সকল মুসলমানের ওপর ঐ দেশ বা শহরবাসীকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ফরজ হয়ে যায়। 'বাদায়ে'র উল্লেখিত উদ্ধৃতির মধ্যে يفترض على كل واحد من احاد المسلمين (সকল মুসলমানের ওপর ফরজ হয়ে যায়) এবং لا يتحقق القيام به الا بالكل (সকলে সক্রিয় হওয়া ছাড়া ফরজ আদায় হয় না) এ কথা দুটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জিহাদের দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে সারা বিশ্বের মুসলমানের ওপর অর্পিত।

'নেহায়া' নামক গ্রন্থে 'জখিরা' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে উপরোক্ত আদেশের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছেঃ

ان الجهاد اذا جاء النفير انما يصير فرض عين على من
يقرب من العدو فاما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض
كفاية عليهم حتى يسعهم تركه اذا لم يحتج اليهم فان
احتيج اليهم بان عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة
مع العدو او لم يعجزوا عنها لكنهم تكاسلوا و لم يجاهدوا
فانه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلوة والصوم لا
يسعهم تركه ثم و ثم الى ان يفترض على جميع اهل الاسلام
شرقا وغربا على هذا التدريج نظيره الصلوة على الميت، ان
كان الذى يبعد من الميت يعلم ان اهل محلته يضيعون
حقوقه او يعجزون عنه كان عليه ان يقوم بحقوقه كذا هنا.
(شامى، ج ٣، ص ٢٤٠)

যখন জিহাদের ডাক আসবে তখন জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে ফরজ (ফরজে আইন) হবে তাদের ওপর যারা শত্রুর নিকটতম স্থানে অবস্থান করে। আর যারা শত্রু থেকে কিছুটা দুরত্বে এবং নিকটতম স্থানে অবস্থানকারীদের পার্শ্বে অবস্থান করে তাদের ওপর জিহাদ (ফরজে কেফায়া) সমষ্টিগতভাবে ফরজ। তাদের যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে তারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করলেও চলবে। কিন্তু যদি নিকটতম স্থানে অবস্থানকারীরা শত্রুর মোকাবিলায় অক্ষম হওয়া অথবা আলস্য ও ঔদাসিন্য বশত মোকাবিলা না করায় তাদের প্রয়োজন হয় তাহলে পার্শ্ববর্তীদের ওপর জিহাদ নামাজ রোজার মতই ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হয়ে যাবে। তারা কোনমতেই এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। এভাবে প্রত্যেক পরবর্তী বসতির ওপর দায়িত্ব বর্তাতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের ওপর উক্ত দায়িত্ব বর্তাবে। এর দৃষ্টান্ত হলো, মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ। মৃত ব্যক্তির নিকট থেকে দূরে

অবস্থানকারীরা যদি জানতে পারে যে, নিকটে অবস্থানকারীরা মৃত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য পালনে অক্ষম কিংবা উদাসীন, তাহলে দূরবর্তীদের ওপর তার জানাজা ও অন্যান্য কর্তব্য পালনের দায়িত্ব বর্তাবে। জিহাদের ব্যাপারও ঠিক অনুরূপ। (শামী, ৩য় খণ্ড, ২৪০ পৃঃ)

বস্তুত ইসলামে জিহাদকে একটি অপরিহার্য ইবাদত বা ফরজে আইনের সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং তার মাহাত্ম্য নামাজ–রোজার চেয়েও বেশী বলা হয়েছে। কিন্তু শুধু এটাই প্রতিরক্ষার গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তবুক যুদ্ধ সংক্রান্ত সুরা তওবার আয়াত কয়টিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঐ আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, কোন শত্রু যখন ইসলাম ও মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব ধবংস করার জন্য আক্রমণ করে এবং তার মোকাবিলায় জিহাদের ডাক আসে, তখন জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়া ঈমানের সত্যতা নিরুপণের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। পরাক্রান্ত রোমক শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরোধ সংগ্রামে যাওয়ার গুরুদায়িত্বে যারা শৈথিল্য দেখাচ্ছিল এবং যাদের ঈমানের দুর্বলতা বিবেচনা করে হজরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ঘরে বসে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত কয়টি নাজিল হয় ঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝

হে মুহাম্মদ, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি ওদের ঘরে বসে থাকার অনুমতি দিলেন কেন? অনুমতি না দেয়াই ভালো ছিল। যাতে কে সত্যিকার ঈমানদার এবং কে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার তা আপনি বুঝে নিতে পারেন। সত্যিকারভাবে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী তারা নিজেদের জান–মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে

অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা সেসব খোদাভীরুদের সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত আছেন। এই অনুমতি আপনার নিকট থেকে কেবল তারাই চাইতে আসবে যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে না, কেয়ামতের ওপরও না। তাদের মনের মধ্যে দ্বিধা–সংশয় বাসা বেঁধেছে। তাই তারা তাদের সংশয়ের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। (তওবাঃ ৭)

প্রতিরক্ষা যুদ্ধের বিভিন্ন রূপ

প্রতিরক্ষা যুদ্ধের এই নির্দেশাবলী থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের পার্থিব জীবন সংক্রান্ত যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো ইসলাম ও মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব কঠোরভাবে হেফাজত করা এবং নিজেদের জাতীয় ও ধর্মীয় অস্তিত্বকে কোনক্রমেই কোন অরাজকতা ও আক্রমণের কাছে পর্যুদস্ত হতে না দেয়া। এই উদ্দেশ্যে ইসলাম নিজের অনুসারীদেরকে শুধু যুদ্ধের অনুমতিই দেয়নি, বরং তার জন্য প্রবলভাবে তাগিদও দিয়েছে। সে তাগিদ কত শক্তভাবে দেয়া হয়েছে, তা উপরোক্ত উদ্ধৃতি ও আয়াত সমূহেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আক্রমণ শুধু একটি উপায়েই করা হয় না। একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যথারীতি যুদ্ধ ঘোষণা করে মুসলিম দেশের ওপর আক্রমণ চালাবে, তাকে জয় করে মুসলমানদের খতম করবে কিংবা দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করবে কিংবা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে-- শুধু এগুলোই আগ্রাসন ও আক্রমণের একমাত্র পন্থা নয় যার বিরুদ্ধে জিহাদ চালানো প্রয়োজন। বরং এ ছাড়া আরো অনেক প্রকারের আক্রমণ ও আগ্রাসন হতে পারে যা একটি জাতির শান্তি, নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্য ব্যবস্থাকে বিপন্ন ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে তুলতে পারে। এক্ষণে আমরা দেখবো শত্রুর আক্রমণ কি কি ভাবে হতে পারে এবং সেই সব বিবিধ প্রকারের আক্রমণের কোনটি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন আমাদের কি নির্দেশ দেয়।

এ উদ্দেশ্যে আমরা প্রতিরক্ষা যুদ্ধের আদেশ যে আয়াতগুলোতে রয়েছে সেই সকল আয়াত এখানে উদ্ধৃত করবো। অতঃপর এগুলোর ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণও কোরআন অথবা হাদিস থেকে উদ্ধার করবো যেন ব্যক্তিগত মতামতের অনুপ্রবেশের দরুণ সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টির কোন অবকাশই না থাকে।

১–জুলুম ও আগ্রাসনের জবাব

শীর্ষস্থানীয় তফসিরকারদের মতে ইসলামে সর্বপ্রথম যে আয়াত সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে নাজিল হয়, তা সূরা হজ্জ–এর নিম্নোক্ত আয়াতঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُ - (الحج : ٣٩-٤٠)

যাদের ওপর যুদ্ধাবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে পাল্টা আক্রমণ চালানোর অনুমতি দেয়া গেল। কেননা তারা নির্যাতিত এবং আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। তারা হচ্ছে সেইসব মজলুম, যাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহকে মনিব ও প্রভু মেনে নেয়ার কারণে অবৈধভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। (আল–হজ্বঃ ৬)

আল্লামা ইবনে জারীর ও অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট তফসিরকারের মতে যুদ্ধের প্রথম আয়াত হলোঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -

(البقرة : ١٩٠-١٩١)

যারা তোমাদের ওপর যুদ্ধাবস্থা চাপিয়ে দেয় তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না। তাদের যেখানে পাও হত্যা কর

এবং যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছে সেখান থেকে তাদের বের কর। কেননা হত্যার চেয়েও অরাজকতা খারাপ জিনিস।

(বাকারাহঃ ২৪)

এই আয়াত দুটি থেকে নিম্নোক্ত আদেশ সমূহ পাওয়া যায়ঃ

(১) মুসলমানদের ওপর যখন কেউ আক্রমণ করে এবং জুলুম–অত্যাচার চালায় তখন যুদ্ধ করা অপরিহার্য।

(২) যারা মুসলমানদের ঘর–বাড়ী ছিনিয়ে নেয়, তাদের অধিকার হরণ করে এবং তাদেরকে সম্পত্তি থেকে বেদখল করে, তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ করা উচিত।

(৩) মুসলমানদের ধর্মীয় আকিদা–বিশ্বাসের জন্য তাদের ওপর যখন নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো হবে এবং তারা শুধু মুলসমান বলে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হবে তখন তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা বৈধ।

(৪) শত্রুরা জয়লাভ করে যে ভূ–খণ্ড থেকে মুসলমানদের বের করে দেয় অথবা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে, সেই হারানো ভূ–খণ্ড ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পুনরায় অর্জন করার জন্য মুসলমানদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। মুসলমানদের হাতে যখন শক্তি আসবে তখন শত্রুরা যেসব জায়গা থেকে বহিষ্কার করেছিল সেখান থেকে শত্রুদের বহিষ্কার করা উচিত।

২–সত্যের সংরক্ষণ ও হেফাজত

সূরা আনফাল–এ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাদেরকে নির্মূল করার আদেশ দান প্রসঙ্গে তাদের একটি অপরাধ নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ
اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ-

যারা কাফের তারা তাদের সম্পদ মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য ব্যয় করে। তারা এ উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে।

তবে শেষ পর্যন্ত তাদের পস্তাতে হবে এবং তারা পরাজিত হবে। (আনফালঃ ৪)

কোরাইশের যে বাহিনী বদরের মাঠে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল এবং যাদের মোকাবিলায় আল্লাহ সত্যকে সত্য ও বাতিলকে বাতিল বলে প্রমাণ করার জন্য নিজের বিশেষ ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন তাদের কথা নিম্নরূপ আলোচিত হয়েছেঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَ
رِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ - (انفال: ٤٧)

যারা দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের ঐশ্বর্য দেখানোর জন্য অহংকারের সাথে ঘর থেকে বেরিয়েছিল এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চাইছিল, তোমরা তাদের মত হয়ো না। (আনফালঃ ৬)

যে মোশরেকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের অপরাধ সূরা তওবায় নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ اِنَّهُمْ
سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - (التوبہ: ٩)

তারা আল্লাহর বাণীগুলোকে খুবই কম মুল্যে খরিদ করতো এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখতো। তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের কাজে লিপ্ত ছিল। (তওবাঃ ২)

অন্যত্র আহলে কিতাবের সাথে লড়াই করার হুকুম দিয়ে তাদের অপরাধ সমূহের বর্ণনা নিম্নরূপ দেয়া হয়েছেঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হে ঈমানদারগণ! (আহলে কিতাবদের) অনেক ধর্মযাজক ও সংসারত্যাগী অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ খেয়ে ফেলে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। (তওবাঃ ৫)

সূরা মুহাম্মদ-এ আরো স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ه

যারা আল্লাহর সত্য দ্বীন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, তাদের সমস্ত সৎ কাজকে আল্লাহ নষ্ট ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন। (৪৭ঃ ১)

একই সূরায় কয়েক আয়াত পরেই পুনরায় তাদের প্রসঙ্গ তুলে নিম্নরূপ নির্দেশ জারী করা হয়েছেঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا- (آيت ١٠ و ٤)

অতএব যখনি তোমরা সেই কাফেরদের মুখোমুখী হবে, অমনি গর্দান মারতে আরম্ভ করে দেবে। এভাবে যখন তাদের শক্তি চূর্ণ করে দেবে, তখন বন্ধন মজবুত করে দাও এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করো। তারপর তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, অনুগ্রহের আচরণ কর অথবা ফিদিয়া গ্রহণ কর। এরূপ করতে থাক যতক্ষণ না অস্ত্র সংবরণ করে (যুদ্ধের প্রয়োজনই নাথাকে)।

এই সমস্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, صد عن سبيل الله অর্থাৎ আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখাও এমন একটা অপরাধ যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রয়োজন। আল্লাহর পথ অর্থ সত্য দ্বীন। কোরআনে একেও صراط مستقيم বলা হয়েছে। ইসলামকে পথ বলে অভিহিত করা পবিত্র কোরআনের একটি চমৎকার বাচনভংগী বিশেষ। অর্থাৎ ইসলাম যেন একটা সড়ক যা সরাসরি লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যায় এবং এর ওপরে স্থানে স্থানে শয়তান ও তার অনুচররা রাহাজানি করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। কেউ কেউ سبيل অর্থ গাড়ী -ঘোড়া চলাচলের সড়ক বলে মনে করেন। কিন্তু পবিত্র কোরআনে سبيل الله ও سبيل رب প্রভৃতি শব্দ এমন রহস্যাবৃত কিছু নয় যে তা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হতে পারে।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ (মানুষকে আল্লাহর পথের দিকে ডাকো) এবং اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِه (আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত যারা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিফহাল) ইত্যাকার আয়াত সমূহে মোটরগাড়ী ও সাইকেল চলার পথ বুঝানো হয়নি বরং যে পথে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছা যায় সেই পথ বুঝানো হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ

যে ব্যক্তি ঈমানকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নেবে সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে যাবে।

এ আয়াতেও সোজা পথ দ্বারা ঈমানের পথই বুঝানো হয়েছে। এর বিপরীত পথ হলো কুফরীর পথঃ

لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَآءٌ

আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা চিরঞ্জীব।

এখানে মাটি ও নুড়িপাথরের তৈরী সড়কে নিহত লোকদেরকে চিরঞ্জীব বলা হয়নি। বরং এ মর্যাদা শুধু আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছে দেয়া পথে যারা নিহত হয়েছে তাদের জন্যই নির্ধারিত। সুতরাং এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা মূলত ইসলাম থেকেই ফিরিয়ে রাখারশামিল।

এবার একটু ভেবে দেখা যাক, ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার অর্থ কি। ইসলামকে যখন পথ বলা হয়েছে তখন তা থেকে ফিরিয়ে রাখাটাও সাধারণ পথ থেকে পথচারীকে ফিরিয়ে রাখার মতই হবে। কোন পথ অবরোধ করার তিনটি পন্থা হতে পারেঃ প্রথমতঃ যারা অন্য পথের যাত্রী তারা যাতে ইচ্ছা করলেও এ পথে না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়তঃ যারা এ পথের যাত্রী তাদের জোর–জবরদস্তী করে এ পথ থেকে হটিয়ে দেয়া। তৃতীয়তঃ যারা এ পথের যাত্রী, তাদের পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয়া, তাদের ভীত–সন্ত্রস্ত করা এবং তাদেরকে এমনভাবে উত্যক্ত করা যেন তারা চলতেই না পারে এবং আপনা আপনি সরে যায়। বস্তুত صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বা

আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখারও এই তিন অর্থ; অর্থাৎ লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে না দেয়া, মুসলমানদেরকে বল প্রয়োগে ইসলাম ত্যাগ করানোর চেষ্টা করা এবং মুসলমানদের জন্য ইসলাম অনুসারে জীবন–যাপন করাকে কঠিন ও দুরূহ বানিয়ে দেয়া। পবিত্র কোরআনে এই তিন অর্থেরই পর্যাপ্ত উদাহরন রয়েছে। যারা এভাবে ইসলামের পথ অবরোধ করার চেষ্টা করে তাদেরকে পথ থেকে হটিয়ে দেয়া এবং তাদের শক্তি চূর্ণ করা মুসলমানদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।

৩–বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি

সূরা আনফাল–এ আরো একটা অপরাধের উল্লেখ আছে যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ
فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ
فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَإِمَّا تَخَافَنَّ
مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ ۝ (انفال: ٥٥ تا ٥٨)

আল্লাহর দৃষ্টিতে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঈমান আনয়ন করে না। তাদের সাথে তুমি চুক্তি সম্পাদন করেছিলে কিন্তু তারা প্রতিবার চুক্তি ভঙ্গ করে এবং কিছুমাত্র সংযম অবলম্বন করে না। সুতরাং তুমি যদি যুদ্ধে তাদের পেয়ে যাও তাহলে কঠিন শাস্তি দিয়ে তাদের পশ্চাৎবর্তীদের ভীত–সন্ত্রস্ত ও শতধাবিচ্ছিন্ন করে দাও। আশা করা যায়, এভাবে তারা কিছুটা শিক্ষা পাবে। আর যদি তুমি কোন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা কর তাহলে সোজাসুজি তাদের চুক্তি তাদের মুখের ওপর নিক্ষেপ কর। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না। (আনফালঃ ৭)

অনুরূপভাবে যে কাফেররা মুসলমানদের সাথে বার বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল,সূরা তওবায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝ (آيت ١-٢)

আপনি যে মুশরিকদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন (এবং যারা বার বার তা লংঘন করেছে) আল্লাহ ও তাঁর রসুল এখন থেকে আর সে চুক্তির ধার ধারেন না। সুতরাং (হে মুশরিকগণ,) এখন তোমরা আরো চার মাস পৃথিবীতে ঘোরাফিরা করে নাও তারপরই বুঝতে পারবে যে তোমরা আল্লাহকে পরাজিত করার ক্ষমতা রাখ না। বরঞ্চ আল্লাহ তা'আলাই অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছিত করে ছাড়েন। (রুকুঃ১)

এরপর মুশরিকদের মধ্যে যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হলোঃ فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের চুক্তি মেনে চল।

এরপর পূনর্বার যারা চুক্তি লংঘন করে তাদের সম্পর্কে ফরমান জারী হলোঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (توبه : ٥)

সেই নিষিদ্ধ চারমাস (যা পূর্বোক্ত আয়াতে মোশরেকদের শেষ অবকাশ হিসেবে দেয়া হয়েছে) যখন অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন মোশরেকদের যেখানে পাও হত্যা কর, গ্রেফতার কর ও ঘেরাও করে অবরুদ্ধ করে রাখ (যেন মুসলমান দেশের চতুঃসীমার মধ্যে ঢুকতে না পারে) এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে পাহারা বসাও। অতঃপর যদি তারা তওবা

করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তাহলে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (রুকুঃ১)

কিছুক্ষণ পরেই আবার চুক্তি লংঘনকারী বিশ্বাসঘাতক মোশরেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছঃ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهٖٓ
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا
لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوا
عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَتَأْبٰى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُونَ ۝ (توبه : ٧-٨)

এই (বিশ্বাসঘাতক) মোশরেকদের চুক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নিকট কি করে টিকতে পারে? অবশ্য যাদের সাথে কাবা শরীফের মিলনায়তনে বসে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছিলে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা যতক্ষণ চুক্তি মেনে চলবে, ততক্ষণ তোমরাও মেনে চলো। আল্লাহ সংযমশীল লোকদের ভালোবাসেন। কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতকদের সাথে কি করে চুক্তি রক্ষা করা যাবে, যারা (এত নীচাশয় যে) তোমাদের ওপর জয়লাভ করলে আত্মীয়তারও মর্যাদা দেয় না,ওয়াদা–অঙ্গীকারেরও না। তারা তোমাদের মিষ্টি বাক্যে খুশী রাখার চেষ্টা করে কিন্তু মনে মনে তারা তা অগ্রাহ্যই করে (অর্থাৎ মনে মনে তারা চুক্তি–লংঘন করার মতলবেই থাকে)। তাদের মধ্যে অধিকাংশই দুষ্কৃতিকারী। (আত্ তওবা, রুকুঃ২)

এরপর এই বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধেই পুনরায় বলা হয়েছেঃ

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً وَأُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُعْتَدُونَ ۝ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ۝

وَإِنْ نَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي

دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُوْنَ ○ اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا
بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ
فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ قَاتِلُوْهُمْ
يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ○ (توبہ : ١٠ تا ١٤)

তারা (মোশরেকরা) কোন মুমিনের সাথে আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না। আসলে তারাই বাড়াবাড়ি করে থাকে। তবে তারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তাহলে তারা কিন্তু তোমাদের মুসলিম ভাই। জ্ঞানী লোকদের জন্য আমি এসব বিষয় স্পষ্ট করে ব্যক্ত করি। কিন্তু তারা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের ওপর আঘাত হানে,তাহলে কুফরী ব্যবস্থার নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধ কর। কেননা (এ দ্বারা বুঝা গেল যে) তাদের শপথ ও প্রতিশ্রুতির ওপর আর নির্ভর করা চলে না। (যুদ্ধ করলে) আশা করা যায় যে,তারা সংযত হবে। যারা নিজেদের শপথ পর্যন্ত ভঙ্গ করেছে, রসুলকে তাড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে এবং নিজেরাই প্রথম তোমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, তাদের সাথে তোমাদের লড়াই না করার কি কারণ থাকতে পারে? তোমরা কি তাদের ভয় পাও? অথচ তোমরা যদি পরিপক্ক ঈমানের অধিকারী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহই তোমাদের ভয়ের বেশী উপযোগী। ·····এগিয়ে যাও, ওদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে ওদের শাস্তি দেবেন এবং লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করবেন। আর মুমিনদেরকে ওদের ওপর জয়যুক্ত করবেন এবং একশ্রেণীর (রোগগ্রস্থ) মুমিনকে আরোগ্য দান করবেন। (অর্থাৎ ঈমানের কোন দুর্বলতা থাকলে জিহাদের ওষুধ দ্বারা তা সারিয়ে তুলবেন)। (রুকুঃ২)

এই আয়াত সমুহ ও এগুলোর নাজিলের পটভূমি নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায় যেঃ

(১) যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে তা ভেঙ্গে দেয় তাদের সাথে যুদ্ধ করা কর্তব্য। বলাবাহুল্য যেসব অমুসলিম নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুনরায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তারাও এ আদেশের আওতাভুক্ত।

(২) যারা চুক্তি ভঙ্গ না করলেও তাদের চালচলন ও আচরণ এমন বিদ্রোহাত্মক ও অবন্ধুসুলভ যে, তাদের দিক থেকে ইসলাম ও মুসলিম জনগণ সব সময়ই ক্ষতির আশংকা ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে। তাদেরকে প্রকাশ্যে চুক্তি বাতিলের নোটিশ দিয়ে দেয়া উচিত। এবং তারপর তাদের শত্রুতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া উচিত।

(৩) যারা বারবার চুক্তি লংঘন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে, যাদের ওয়াদা ও অঙ্গীকারকে আর বিশ্বাস করা চলে না এবং যারা মুসলমানদের ক্ষতি করার ব্যাপারে নৈতিকতা ও মানবতার কোন ধারই ধারে না, তাদের সাথে চিরস্থায়ী যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একমাত্র তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলেই তাদের সাথে সন্ধি বা আপোষ হতে পারে। নচেৎ তাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ইসলাম ও মুসলিম ভূ–খণ্ডকে রক্ষা করার জন্য হত্যা, গ্রেফতারী,অবরোধ এবং এই ধরনের অন্যান্য সামরিক প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।

৪—আভ্যন্তরীণ শত্রু নির্মূলকরণঃ

উল্লিখিত বহিশত্রু ছাড়াও কিছু গৃহ–শত্রু রয়েছে। তারা প্রকাশ্যে বন্ধু। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইসলামের শিকড় কাটে। এরা যে বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত তাকে পবিত্র কোরআন 'মোনাফেক' নামে অভিহিত করেছে। তাদের সম্পর্কে কোরআনের আদেশ নিম্নরূপ ঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○ (توبه : ٧٣)

হে নবী! কাফের ও মোনাফেকদের সাথে যুদ্ধ কর এবং কঠোরতা প্রয়োগ কর। তাদের আবাস জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ স্থান।

(তওবাঃ ১০)

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ
فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مَّلْعُوْنِيْنَ ۛ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا
تَقْتِيْلًا ۝ (احزاب : ٦٠-٦١)

যদি মোনাফেক কাপুরুষ ও গুজব রটনাকারীরা তাদের ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে বিরত না হয়, তাহলে আমি আপনাকে তাদের ওপর চড়াও করে দেব। তারপর তারা এই শহরে (মদিনায়) আপনার প্রতিবেশী হিসেবেও খুব অল্প দিন বাস করার সুযোগ পাবে, তারা অভিশপ্ত। যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে, আটক করা হবে এবং হত্যা করা হবে। (আহযাবঃ ৮)

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا
مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۠ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا
نَصِيْرًا ۝ (النساء : ٨٩)

তারা চায় যে তারা নিজেরা যেমন অবিশ্বাসী হয়ে গেছে তেমনি তোমরাও অবিশ্বাসী হয়ে যাও। অতএব তারা যতক্ষণ না হিজরত করে বাড়ী থেকে বেরোয় ততক্ষণ তাদের কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। যদি তারা বিগড়ে যায় (অর্থাৎ কুফরী ব্যবস্থার সাহায্য করা থেকে বিরত না হয়) তাহলে তাদের আটক কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। (আন নিসাঃ ১২)

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا
قَوْمَهُمْ ۭ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ
وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ۭ وَاُولٰۗىِٕكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا
مُّبِيْنًا ۝ (النساء : ٩١)

তোমরা আরো একশ্রেণীর লোক পাবে। তারা তোমাদের দিক থেকেও নিরাপদে থাকতে চায়, স্বজাতীয় অবিশ্বাসীদের দিক থেকেও নিরাপদে থাকতে চায় (এজন্য যখন তোমাদের কাছে আসে, তখন ইসলামকে স্বীকার করে) আর যখনই কুফরীর দিকে ফিরে যায়, তার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়। সুতরাং তারা যদি তোমাদের দল ত্যাগ না করে এবং তোমাদের কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণও না করে আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ ও শত্রুতা থেকেও বিরত না হয়, তাহলে তাদের পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে দিলাম। (আন্ নিসা ঃ ১২)

মোনাফেকদের এই দলটিকে হত্যা করা যে অপরাধের দরুন অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, উল্লিখিত আয়াত সমুহে তাও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টা আরো একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এখানে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করা যাচ্ছে। এ থেকে বুঝা যাবে যে, তারা কি ধরনের লোক। সুরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ
مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ (النساء: ٨١)

তারা আপনাকে বলে থাকেঃ আমরা অনুগত। কিন্তু তাদের একটি দল আপনার কাছ থেকে বেরিয়ে রাত হতে না হতেই নিজেদের বলা কথা পাল্টিয়ে ফেলে। অথচ তারা কি অবস্থায় রাত কাটায় আল্লাহ তা জানেন।

(আন্ নিসাঃ ১১)

সূরা তওবায় বলা হয়েছেঃ

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا
خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ
الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ۝

তারা যদি তোমাদের সাথে একত্রে লড়াই করতে নামতো তাহলে তোমাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করতোনা। আর তোমাদের মধ্যে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে ও চোগলখুরি করে গোলযোগ পাকাতে চেষ্টা করতো। এদিকে তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা তাদের কথা আড়ি পেতে শোনে। আল্লাহ এই জালেমদের সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল। তারা এর আগেও (ওহুদ যুদ্ধে) গোলযোগ পাকাতে চেষ্টা করেছিল এবং আপনার সম্পর্কে নানা রকমের চক্রান্ত এঁটেছিল। শেষ পর্যন্ত সত্যের বিজয় সূচিত এবং আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হলো। অবশ্য সেটা তাদের ভালো লাগে নি। (তওবাঃ৭)

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ط وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ
قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۝ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا
لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝ (التوبة: ٥٦-٥٧)

তারা আল্লাহর শপথ করে বলেঃ আমরা তোমাদের দলের লোক। অথচ তারা কখ্‌খনো তোমাদের দলের লোক নয়। আসলে তারা হলো ভীরু। (তোমাদের শক্তির ভয়ে বন্ধুত্বের ভান করে) যদি তারা কোন আশ্রয় স্থল, কোন গর্ত অথবা বসার জায়গা পেয়ে যায় তাহলে সেদিকে যাবেই এবং দৌড়ে যাবে। (তওবাঃ৭)

اَلْمُنٰفِقُونَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ م يَأْمُرُونَ
بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ط
نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝ (التوبة: ٦٧)

মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী একই গোষ্ঠীর মানুষ। তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং ভালো কাজে বাধা দেয়। আর আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই আল্লাহও আর তাদের ধার ধারেন না। মুনাফেকরা সত্যিই অত্যন্ত নাফরমান ও দুষ্কৃতিকারী (তওবাঃ ৯)

সূরা আহযাবে বলা হয়েছেঃ

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ
مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ
فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ
بِعَوْرَةٍ ۚ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ۝ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ
اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ اِلَّا
يَسِيْرًا ۝ (احزاب: ۱۲ تا ۱۴)

তখন (খন্দকের যুদ্ধের সময়) মুনাফেকগণ এবং দুর্বল ঈমানের লোকেরা বলতে লাগলো যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের মধ্য থেকে একদল বললো, হে ইয়াসরিববাসী! এখন আর তোমাদের দাঁড়াবার অবকাশ নেই। এখান থেকে ফিরে যাও। তাদের মধ্যে একদল এই বলে নবীর কাছে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইল যে, আমাদের ঘরবাড়ী অরক্ষিত অবস্থায় রেখে এসেছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা অরক্ষিত ছিলনা। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল পালানো। বস্তুত মদীনার আশপাশ দিয়ে যদি শত্রুরা ঢুকে পড়তো এবং তাদের যদি বলা হতো যে তোমরাও দাঙ্গায় (মুসলমানদের হত্যা ও লুটতরাজ) অংশ গ্রহণ কর, তাহলে তারা অবশ্যই অংশ ;গ্রহণ করতো এবং বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করতো না। (আহযাবঃ২১)

সুরা মুনাফেকুনের দু'টি আয়াত লক্ষণীয়ঃ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
لَكٰذِبُوْنَ ۝ اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ (منافقون: ۱-۲)

মুনাফেকরা যখন আপনার কাছে আসে তখন বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল। আল্লাহও জানেন যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী। তারা নিজেদের শপথগুলোকে (নিজেদের শত্রুতামূলক আচরণের জন্য) ঢাল স্বরূপ বানিয়ে রেখেছে। তারা আল্লাহর পথ আগলে রাখে, যা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। (মুনাফেকুনঃ১)

এ সব আয়াত থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। মুনাফেকদের মধ্যে একটি শ্রেণী এমন আছে যাদের সাথে নিছক বাহ্যিকভাবেও মুসলমানদের মত আচরণ করা যায় না। এদের বৈশিষ্ট্য এই যে, মুসলমান হওয়ার দাবীদার হয়েও প্রকাশ্যে এমন সব কথা বলে যা একজন কাফেরের মুখেই শোভা পায়। কিংবা মুখে যথারীতি ইসলামের কথা বলতে থাকলেও সর্বদাই মুসলামনদের কষ্ট দেয়া ও ক্ষতি করার ফন্দি আঁটিতে থাকে। মুসলমানদের শত্রুদের সাথে গোপন যোগসাজশ করে এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে পৌঁছায় মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার ও তাদের বিপথে চালিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। মুসলমানদের সংগঠনের মধ্যে দলাদলী ও বিভেধ সৃষ্টির চক্রান্ত করে। তাদের শত্রুদের নৈতিক ও বস্তুগত সাহায্য ও সহযোগিতা দেয়। আর ইসলামের ওপর যখন কোন দুর্যোগ আসে তখন এই গোষ্ঠীটি ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এ দলটি ইসলামের জন্য তার বহিঃশত্রুদের চেয়েও মারাত্মক ও বিপজ্জনক। এজন্য এই বিশ্বাসঘাতক দলের সদস্যদের মুখে যতই তাওহীদ–রেসালাতের মাহাত্ম্য ঘোষিত হোক বাহ্যত তাদের আচার আচরণ যতই নিখুঁত ইসলামী ধাঁচের হোক, তাদের প্রতি মোটেই নমনীয়তা ও কৃপা দেখানো যাবে না। তাদের অপরাধ যখনই ধরা পড়বে তখনই তাদেরকে মুসলিম জাতির দেহের ফোঁড়া মনে করে নির্মম ভাবে অস্ত্রোপচার করে কেটে ফেলতে হবে।

৫–শান্তি রক্ষা

ইসলামের আর এক প্রকার শত্রু হলো, যারা মুসলিম রাষ্ট্রের ভেতরে বসে অথবা বাইরে থেকে এসে গোলযোগের সৃষ্টি করে, ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা ও লুটতরাজ চালায় এবং মুসলিম রাষ্ট্রের আইন–শৃংখলায় বিঘ্ন ঘটায়

অথবা বলপ্রয়োগে ইসলামী সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করে। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ আদেশ দেয়া হয়েছেঃ

إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ط ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (المائدہ : ٣٣-٣٤)

যারা আল্লাহর ও তাঁর রসুলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করতে হবে কিংবা শূলে চড়াতে হবে, অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দিতে হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে। এটা কেবল তাদের ইহকালীন জীবনের শাস্তি। এ ছাড়া তাদের জন্য আখেরাতেও কঠিন শাস্তি রয়েছে। অবশ্য জেনে রেখ তোমাদের নিয়ন্ত্রণে আসার আগে যারা তওবা করে তাদের জন্য আল্লাহ দয়ালূ ও ক্ষমাশীল। (আল–মায়েদাহঃ ৩৩–৩৪)

এ আয়াতে **يحاربون الله ورسوله** কথাটার অর্থ কেউ কেউ ভুল বুঝেছেন। তারা মনে করেছেন, এর অর্থ সেই অবিশ্বাসীর দল, যাদের সাথে মুসলমানদের নিয়মিত যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আসলে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ হলো "سعی فساد فی الارض" অর্থাৎ দেশে অরাজকতা, বিশৃংখলা, গোলযোগ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করা। এ ব্যাখ্যা খোদ কোরআনেই يحاربون الله الخ এর পরবর্তী বাক্যাংশেই করা হয়েছে।

(এখানে আল্লাহ ও রসুলের সাথে যুদ্ধ ফৌজদারী আইনে waging war against the king (রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা) কথাটা যে অর্থে গৃহীত অবিকল সেই অর্থেই নেয়া হয়েছে। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে

এর দ্বারা দুই ধরনের অপরাধ বুঝানো হয়েছেঃ এক, মুসলিম দেশে হত্যা, লুটতরাজ ও ডাকাতি দ্বারা বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করা। দুই, এমন কিছু করা যার উদ্দেশ্য বল প্রয়োগে ইসলামী সরকার ও ইসলামী ব্যবস্থাকে উৎখাত করে কোন অনৈসলামী সরকার ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা)।

আয়াতটি যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছিল তা থেকেও মনে হয় যে, এ আদেশ নৈরাজ্যবাদীদের ও আইন–শৃংখলার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহকারীদের জন্য। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনু উরাইনা গোত্রের কিছু লোক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় বসবাস করতে থাকে। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া তাদের সহ্য হলোনা। তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লো। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের রং হলদে হয়ে গিয়েছিল এবং পেট বড় হয়ে গিয়েছিল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ

لو خرجتم الى ذود لنا فشربتم من البانها وابوالها ،

অর্থাৎ তোমরা আমাদের উটের আস্তাবলে গিয়ে থাক এবং তাদের দুধ ও পেসাব খাও তাহলে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠবে। (সম্ভবত তৎকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানে ঐ রোগের ওটাই ওষুধ ছিল। এজন্য ওষুধ হিসেবে বিকল্প কোন হালাল জিনিস না পাওয়া গেলে হারাম জিনিসও ব্যবহার বৈধ)। লোকগুলো সত্যিই উটের আস্তাবলে গিয়ে রইল। সুস্থ হয়ে উঠলে তারা হযরতের উট পালকদের হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং ইসলাম পরিত্যাগ করলো। হযরত যখন তাদের এই কাণ্ড কারখানার কথা শুনলেন, তৎক্ষণাত লোক পাঠিয়ে তাদের ধরে আনালেন। অতঃপর তাদের হাত পা কেটে চোখ তুলে রোদের মধ্যে ফেলে রেখে দিলেন। এই অবস্থাতেই তারা মারা গেল (ইবনে মাজা)। বোখারী শরীফেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মোসলেম শরীফে হযরত আনাস (রঃ)–এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, উরাইনীরা হযরতের উটপালকদের চোখ তুলে নিয়েছিল। তাই হযরত তার বদলা নিয়েছিলেন। একদল ফিকাহবিদের ধারণা যে, এ আয়াত' উরাইনীদের সম্পর্কে নাজিল হয়নি। কিন্তু এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, পবিত্র

কোরআনের এই কঠিন সাজাগুলো একমাত্র তাদের জন্যই নির্ধারত যারা হত্যা ও লুটতরাজ চালিয়ে মুসলিম দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি–শৃংখলায় বিঘ্ন ঘটায়। তবে অপরাধের স্তরভেদে শাস্তির পরিমাণেও রকম ফের রয়েছে। মুসলিম ফকীহগণ এ ব্যাপারে বিস্তারিত দণ্ডবিধি রচনা করেছেন।

৬–নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য

আরো এক ধরণের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ রয়েছে–যাতে মুসলমানদেরকে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের কোন দল যদি দুর্বলতা ও অক্ষমতার দরুন শত্রুদের নিয়ন্ত্রণাধীন চলে যায় এবং নিজেদেরকে মুক্ত করার মত শক্তি তাদের না থাকে, তাহলে অন্য যেসব স্বাধীন ও শক্তিশালী মুসলমান আছে উক্ত নির্যাতিত মুসলিম ভাইদের মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ‎(النساء:٧٥)

'যে সব দুর্বল ও' অক্ষম নারী, পুরুষ ও শিশু ফরিয়াদ জানাচ্ছেঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এই জালেম–অধ্যুষিত জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যান এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হতে একজন বন্ধু ও ত্রাণকর্তা পাঠান, তাদের মুক্ত করার জন্য আল্লাহর পথে তোমরা যুদ্ধ করনা কেন? (আন্ নিসাঃ১০)

অন্য এক জায়গায় আরো সুস্পষ্টভাবে এই সাহায্যের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ তাগিদ দেয়া হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ
وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ

فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۝ (انفال: ٧٢-٧٣)

যারা ঈমান এনেছে বটে, কিন্তু কাফের–শাসিত এলাকা ছেড়ে মুসলিম শাসিত এলাকায় এখনো আসেনি, তাদের অভিভাবকত্বের ব্যাপারে কোন দায়ীত্ব তোমাদের ওপর বর্তে না––যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। তবে যদি দ্বীনের ব্যাপারে তারা তোমাদের নিকট কোন সাহায্য চায় তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। তবে তোমাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ এমন কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তা করবে না। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখতে পান। যারা বিশ্বাসী, তারা পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে। তোমরা যদি তা না কর তাহলে পৃথিবী ভয়াবহ গোলযোগ ও মারাত্মক অরাজকতা দেখা দিবে। (আনফালঃ ১০)

এ আয়াতে স্বাধীন ও পরাধীন মুসলমানদের সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমাংশে বলা হয়েছে যে, যে সব মুসলমান কাফের শাসিত দেশে বসবাস করতে ইচ্ছা করে অথবা বাধ্য হয়, তাদের সাথে মুসলিম শাসিত দেশের মুসলিম অধিবাসীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থাকতে পারে না। অর্থাৎ তারা পরস্পর বিয়ে–শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনা। একে অপরের উত্তরাধিকারও লাভ করতে পারে না। যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের ও বিনাযুদ্ধে বিজিত এলাকার সম্পদের কোন ভাগও তারা পেতে পারে না। তারা যাকাত সদকারও অংশ পাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের তারা কোন পদও লাভ করতে পারে না, যে পর্যন্ত কাফের শাসিত অঞ্চল থেকে হিজরত করে মুসলিম শাসিত দেশে চলে না আসে। কিন্তু অধিকার ও দেনা–পাওনার এই সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়ার পরও সাহায্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়নি। আয়াতের শেষাংশে ধর্মের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করা সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সাহায্যের এই সম্পর্ক ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট। একজন

মুসলমান পৃথিবীর যে স্থানেই থাক, তার সাথে অন্য মুসলমানদের সাহায্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই ছিন্ন হতে পারে না। তার ধর্মীয় জীবন যাপনের স্বাধীনতা যদি বিপন্ন হয় কিংবা তার ওপর যদি নির্যাতন চালানো হয় এবং সে যদি ধর্মীয় বন্ধন ও ভ্রাতৃত্বের নামে সাহায্য প্রার্থনা করে তাহলে তাকে সাহায্য করা মুসলমানদের ওপর ফরয। কেবল এইটুকু বাধ্যবাধকতা যে, যার বিরুদ্ধে সাহায্য চাওয়া হবে তার সাথে মুসলমানদের কোন চুক্তি না থাকলেই হলো। কেননা চুক্তি থাকলে মুসলমানদের জন্য চুক্তি রক্ষা করা মুসলমানদের ভাইকে সাহায্য করার চেয়ে বেশী জরুরী। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন সাহায্য করা চলবে না। এ আদেশ বর্ণনা করার পর এই সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভেবে দেখ, কাফেররা ইসলামকে উৎখাত করার জন্য পরস্পরকে কেমন চমৎকার সাহায্য–সহযোগিতা করে। পারস্পরিক মতবিরোধ ও শত্রুতা সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তোমরাও যদি ধর্মীয় বন্ধনের দিকে লক্ষ্য রেখে একে অপরের সাহায্যকারী না হও, তাহলে পৃথিবীতে কি সাংঘাতিক বিপর্যয় ও অরাজকতা দেখা দিতে পারে? আয়াতে বর্ণিত 'ফেৎনা' শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা পরে আলোচনা করবো। আপাতত সংক্ষেপে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, কোরআনে 'ফেৎনা, শব্দার্থ দ্বারা কুফরী ব্যবস্থার বিজয় ও পরাক্রম এবং সত্য দ্বীনের অনুসারীদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হওয়া বুঝায়। এমনিভাবে 'ফাসাদ' হেদায়াতের ওপর গোমরাহীর বিজয় এবং সততা ও ন্যায়নীতির বিপর্যয়ের সমার্থক। অর্থাৎ মুসলমানদের কোন দল বা জাতির স্বাধীনতা বা অস্তিস্ব বিপন্ন হওয়া এবং তাদের সত্য পথ থেকে দুরে সরে যাওয়ার হুমকির সম্মুখীন হওয়াকেই আল্লাহ তা'আলা ফেৎনা ও ফাসাদ নামে অভিহিত করেন। এই ফেৎনার মোকাবিলা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।

প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের যে কয়টি রূপ ওপরে আলোচিত হলো, তার ওপর একটু গভীর দৃষ্টি বুলালে পাঠক বুঝতে পারবেন যে, এইসবগুলোর মধ্যে একই উদ্দেশ্য সক্রিয় রয়েছে। সে উদ্দেশ্যটা এই যে, মুসলমানরা যেন

নিজেদের ধর্মীয় জীবন ও জাতীয় সত্তাকে কোন অবস্থাতেই অন্যায় ও দুষ্কৃতির কাছে পর্যুদস্ত হতে না দেয় এবং দুস্কৃতি ভেতর বা বাইরে যে দিক থেকেই মাথা তুলুক না কেন, তাকে নির্মূল করার জন্য যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিতে চান, তার প্রাথমিক প্রয়োজন হলো তাদের সব রকমের জাতীয় ও মানবিক দুর্যোগ থেকে নিরাপদ থাকা এবং তাদের জাতীয় ও রাজনৈতিক শক্তি অটুট ও দৃঢ় থাকা। তারা স্বয়ং যদি নিজেদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ থেকে রক্ষা না করে এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রুর সৃষ্ট গোলযোগ ও চক্রান্ত সম্পর্কে ঔদাসিন্য দেখিয়ে নিজেদেরকে যাবতীয় সামাজিক জরাব্যাধিতে আক্রান্ত করে ফেলে যা অতীতের হঠকারী জাতিগুলোকে লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য ও খোদায়ী অভিশাপে পিষ্ট করে ছিলো, তাহলে এতে করে তারা যে শুধু নিজের অস্তিত্বকেই অনিবার্য ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে তা নয়, বরং মানবতার যে মহান সেবার কাজটি সম্পাদনের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাও তারা করতে পারবে না এটা শুধু নিজেদের ওপরই নয় গোটা মানব জাতির ওপর জুলুম করার শামিল হয় এ জন্যই মুসলমানদের যে সব শত্রু তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে বা হয়ে থাকে, তাদেরকে এতই স্পষ্ট করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে চিনিয়ে দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি শত্রুকে নির্মূল করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে--যেন তারা পৃথিবী থেকে হেদায়াতের জ্যোতিকে নিশ্চিহ্ন করতে বিশ্বব্যাপী সংস্কার মূলক কাজের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে। এজন্য দুষ্কৃতি শুধু মাথা তুললেই এবং গোলাযোগ সৃষ্টি করা আরম্ভ করলেই অস্ত্রধারণের নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং তার প্রতিরোধের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুষ্কৃতি যেন মাথা তোলার দৃষ্টতাই না দেখায় এবং তার ওপর সত্যের এমন প্রচন্ড পরাক্রম থাকে যে, অন্যায় ও অসত্য যেন ভিতরে যেন ধম আটকে মরে যায়।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ
بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ
اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ
وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ٥ (انفال : ٦٠)

শত্রুর মোকাবিলার জন্য যত বেশী করে সম্ভব যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সদা প্রস্তুত অশ্ব বাহিনী সংগ্রহ করে রাখ এসব নিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রুদের, তোমাদের শত্রুদের এবং তারা ছাড়া আরো কিছু লোকের-- যাদের তোমরা চিননা আল্লাহ চিনেন--ভিত ও সন্ত্রস্ত করে দিতে পারবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা (পৃথিবীতে শান্তি, নিরাপত্তা ও ইসলামের অগ্রগতির আকারে এবং আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির আকারে) পুরোপুরি ফেরত পাবে। তোমাদের ওপর কোনক্রমেই জুলুম করা হবে না। (আনফালঃ৮)

এ আয়াত থেকে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, মুসলমানদের সাময়িক প্রয়োজন মেটাতে সাময়িক ও অস্থায়ী সৈন্য–সামন্ত (militia) ও সরঞ্জাম যথেষ্ট নয় যা কেবল প্রয়োজনের সময় সংঘবদ্ধ করা হয় এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। বরং এজন্য স্বতন্ত্র ও স্থায়ী সেনাবাহিনী (Standing Army) রাখা উচিত যা সর্বদা অস্ত্র সজ্জিত থাকবে। এ আয়াতটির বাচনভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্ময়কর তাৎপর্য উদঘাটিত হয়। এতে রণ–সজ্জার গোটা প্রক্রিয়াকে শুধু মাত্র قوت বা 'শক্তি' শব্দটি দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি প্রথম শতাব্দীর তীর –ধনুক–বর্শা, চতুর্দশ শতাব্দীর তোপ–কামান, যুদ্ধ–বিমান ও সাবমেরিণ এবং আগামী দিনের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের ওপর সমানভাবে প্রযোয্য। مااستطعتم (যতটা পার) শব্দটি দ্বারা যুদ্ধাস্ত্রের পরিমাণ মুসলমানদের শক্তি–সামর্থের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সামর্থ রাখে তা হলে তাদের তাই করতে হবে। আর তাদের যদি অতটা সামর্থ না থাকে, তারা যদি বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ ও সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ করতে না পারে তা হলেই তারা এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল---তা নয়। বরং তাদের যে সাজ–সরঞ্জামই জোটে এবং যা দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করা যায় তাই হস্তগত করা উচিত ও তাই দিয়ে জিহাদের কর্তব্য পালন করা উচিত। "সদা প্রস্তুত অশ্ব বাহিনী", "শত্রুকে ভীত–সন্ত্রস্ত করে দেয়া" এবং 'অচেনা শত্রু'র কথা বলে আয়াতটিতে রাজনীতির একটি সুক্ষ্ম তত্ব বুঝানো হয়েছে। কোন জাতি নিজের সামরিক শক্তি মজবুত রাখলে শুধু প্রকাশ্য শত্রুরাই ভীত–সন্ত্রস্ত থাকে না, বরং ক্রমান্বয়ে মানুষের ওপর তার এমন প্রভাব পড়ে যে, তার

সাথে খামোখা শত্রুতা করার ধারণাও কারো মনে আসে না। যেসব হঠকারী শক্তি মুসলিম শক্তিকে একটু শিথিল দেখলেই আক্রমণ চালাতে দ্বিধা করে না, তারা তার এমন অনুগত মিত্রে পরিণত হয় যে, তার ভেতরে যে হঠকারীতা ও আগ্রাসনের গোপন ইচ্ছা লুকিয়ে আছে তার কথা সে টেরই পায় না। অতঃপর সামরিক খাতে ব্যয়ের যে উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্য দিয়েও বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান তত্ত্ব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষার খাতে যে টাকা ব্যয় করা হয় তা নষ্ট হয়ে গেল, এ রূপ ভাবা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে জাতি পুরোপুরিই সেটা ফেরত পায়। এর ফলে মানুষ শোষণ ও আগ্রাসন থেকে রক্ষা পায়। এভাবে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনের যাবতীয় বৈষয়িক ও বস্তুগত উপকারিতা লাভ করা যায়। আর এ আয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় শান্তি এবং জুলুম থেকে অব্যাহতি লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। দুটোই এ আয়াতের প্রতিপাদ্য। কেননা মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের দুনিয়ায় যাতে কল্যাণ, আখেরাতে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতেও তাতেই কল্যাণ। আর তাদের পার্থিব অকল্যাণ সেখানেই যেখানে তাদের পারলৌকিক ও ধর্মীয় অকল্যাণ নিহিত।

—

তৃতীয় অধ্যায়

সংস্কারমূলক যুদ্ধ

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের এই নির্দেশ সমূহ দ্বারা মুসলমানদের জাতীয় শক্তিকে ক্ষয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু সে শক্তিকে কোন্ কাজে লাগানো দরকার সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এই শক্তিটাকে রক্ষা করাই কি ইসলামের প্রধান লক্ষ্য, না সে একে দিয়ে অন্য কোন লক্ষ্য অর্জন করতে চায় এবং সে জন্যই একে বিপর্যয় ও দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করে, এ প্রশ্নেরও মীমাংসা আমাদের করে নিতে হবে। বিগত অধ্যায়ে আমরা বারবার বলেছি যে, মুসলমান জাতিকে যে মৌল লক্ষ্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জাতীয় শক্তি বিনষ্ট হলে তার পক্ষে সেটা অর্জন করা সম্ভব নয়। উক্ত অধ্যায়ে আমরা এই সংক্ষিপ্ত কথাটার মধ্য দিয়েই উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই কেবল ইংগিত দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছি। এবারে আমরা আলোচনার এমন স্তরে এসে পৌঁছেছি, যেখানে এই রহস্যটি উদঘাটন করলে আর ভুল বুঝাবুঝির আবকাশ থাকবে না।

পবিত্র কোর'আন একটা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ হলেও মৌলিক ইসলামী শিক্ষার কোন দিক সে অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ রাখেনি। প্রতিটি বিষয় সে সবিস্তার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছে। মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য কি এবং কি সেই 'মৌল লক্ষ্য'---যার জন্য তার জাতীয় সত্তা ও শক্তির রক্ষণা-বেক্ষণের এমন বিরাট ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা পবিত্র কোরআন বিশদভাবে তুলে ধরেছে। বলাহয়েছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ - (آل عمران : ١١٠)

তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম জাতি, যাকে মানব জাতির সেবা ও কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকবে।

(আলে ইমরানঃ ১২)

এ আয়াতে للعرب (আরবদের জন্য) কিংবা للعجم (অনারবদের জন্য) বা للمشرق (প্রাচ্যবাসীর জন্য) প্রভৃতি বলা হয়নি। বলা হয়েছে للناس (মানব জাতির জন্য)। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মুসলমানের জন্ম কোন বিশেষ গোত্র, গোষ্ঠী বা বিশেষ দেশের জন্য নয় বরং গোটা মানব জাতির সেবার জন্য। আর মানব জাতির সেই সেবা হলো সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।

একটি জাতির জীবনের উদ্দেশ্য সমগ্র মানব জাতির সেবা---এটা এমন একটা ব্যাপার যে, ভৌগলিক ও প্রজাতিক জাতীয়তাবাদের ভক্ত সংকীর্ণ মস্তিষ্কের লোকেরা তা বুঝতে পারবে না। তারা ' জাতিপূজা' বা ' দেশপুজা'টা বেশ বোঝেন। 'জাতীয়তাবাদ' তাদের আদর্শের সর্বোচ্চ ধাপ। কিন্তু ভৌগলিক ও ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে সমগ্র বিশ্বমানবতার কার্যকর কল্যাণ সাধন এবং একেই সমগ্র জাতির জীবনের লক্ষ্য রূপে নির্ধারণ করা তাদের বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার। এ জন্য সর্বপ্রথম আমাদের এই اخرجت للناس। (সমগ্র মানব জাতির সেবা) বস্তুটা কি তার বিশ্লেষন প্রয়োজন।

সামাজিক দায়িত্বের নৈতিক মূল্যায়ন

মানুষের সহজাত বৃত্তি ও কামনা–বাসনার মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যাবে যে, মূলগতভাবে নগন্যতম ইতর প্রাণীর মধ্যে যে কামনা–বাসনা ও নৈতিক বৃত্তি সমুহ রয়েছে, তার সবই মানুষের মধ্যেও বর্তমান। একজন মানুষ যেমন মজার মজার খাবার খেতে উৎসুক হয়ে থাকে তেমনিভাবে একটা ঘোড়াও তাজা ও সজীব ঘাস খাওয়া পছন্দ করে। একজন মানুষ যেমন তার স্বজাতীয় লোকদের ওপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব করার সুযোগ পেলে খুশী হয়, তেমনিভাবে একটা ব্যাঙও অন্য ব্যাঙদের ওপর পরাক্রমশীল ও প্রতাপশালী হতে পারলে তার জন্য এর চেয়ে খুশীর বিষয় আর কিছু হতে পারে না। একজন মানুষ যেমন নিজের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে থাকে,

তেমনিভাবে একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতংগের মধ্যেও এ চেষ্টা বর্তমান। সুতরাং নিছক ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দিক থেকে, কামনা ও বাসনার দিক থেকে মানুষ ও ইতর প্রাণীতে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। কেবল একটা জিনিস মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে পার্থক্য ঘটায়। ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তি সমূহ চরিতার্থ করাই জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়। উল্লিখিত কামনা-বাসনা সমূহ চরিতার্থ করা মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়। বরং সে একটা উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্যের জন্য একটি অপরিহার্য উপকরণ ও মাধ্যম হিসেবে এগুলোকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। মানুষের যদি প্রকৃতপক্ষে জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার চেয়ে উচ্চতর কোন মানবিক লক্ষ্য না থাকে এবং সে যদি আল্লাহর দেয়া মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কেবল জৈবিক ক্ষুধাকে আরো উত্তম পন্থায় প্রশমনের উপায় উদ্ভাবনেই ব্যয় করে, তাহলে সে একটা প্রথম শ্রেণীর প্রাণী বটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর মানুষ সে হতে পারে না।

মানুষ তাই প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজনে জীবিকা উপার্জন করতে বাধ্য। কেননা তা না করলে তাকে না খেয়ে মরতে হয়। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘর-বাড়ী বানানো, কাপড় পরা ও অন্যান্য আত্মরক্ষার সরঞ্জামাদি গ্রহণ করতে সে বাধ্য। কেননা তা না করলে তাকে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। অনুরূপভাবে সে শত্রুর হাত থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে বাধ্য। কেননা এজন্য চেষ্টা না করলে সে বিপদ ও লাঞ্ছনার মধ্যে পতিত হবে। কিন্তু শুধুমাত্র এই প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করাই তার চুড়ান্ত লক্ষ্য নয়। যে উচ্চতর লক্ষ্যে উপনীত হওয়া মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য, এই প্রয়োজনগুলো পূর্ণ হওয়া সেই লক্ষ্য অর্জনের উপায় ও মাধ্যম মাত্র। সুতরাং প্রকৃত মানুষ হলো সেই ব্যক্তি, যে কেবলমাত্র নিজের পরিবার-পরিজন, দেশ,জাতি ও সমাজ, সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতি ও স্বয়ং স্রষ্টার অধিকার সমূহ প্রদান করার জন্যই এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার পক্ষ থেকে তার ওপর যে সব কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পিত তা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের যোগ্য হওয়ার উদ্দেশ্যেই নিজের ব্যক্তিগত অধিকার সমুহ অর্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। মানবতার প্রকৃত মূল্য-মান এই অধিকার ও দায়িত্ব সমূহ অনুধাবন করা ও তা পূরোপুরিভাবে সম্পাদনের মধ্যেই নিহিত। বস্তুত মানুষের ওপরে তার নিজের অধিকার সমূহ অর্জন করা যে ফরজ করা হয়েছে তা শুধু এজন্যই যে, তার দায়িত্বের

আওতায় শুধু তার নিজের অধিকারই পড়ে না, অন্যদের অধিকারও পড়ে। সে যদি নিজের অধিকার সমূহ অর্জন না করে তাহলে অন্যদের অধিকার প্রদানে সক্ষম হবে না।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে যখন মানবতার এই মূল্য–মানই সঠিক তখন সমষ্টিগত পর্যায়েও মানবতার এই মূল্য–মানই সঠিক হবে না, তার কোন কারণ নেই। ব্যক্তি গোষ্ঠীতে পরিণত হলেই মনুষ্যত্বের কোন তারতম্য ঘটে যায় না। এ জন্য আদম সন্তানদের সমষ্টিগত মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠিও ব্যক্তিগত মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠির অনুরূপই হওয়া অপরিহার্য। একটি মানুষের যখন নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন ও আত্মসেবা ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য থাকে না তখন তাকে আমরা একটি বুদ্ধিমান জানোয়ারের চেয়ে বেশী মর্যাদা দিতে পারি না। অনুরূপভাবে যে মানব গোষ্ঠীর সামগ্রিক চেষ্টা–সাধনা কেবল নিজের বস্তুগত উন্নয়ন, পার্থিব কল্যাণ এবং নিজেদের শক্তি ও নিরাপত্তা চারদিকেই কেন্দ্রীভুত এবং সকল মানুষের প্রতি যাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, সে মানব গোষ্ঠীকেও বড়জোর একটি সভ্যতা–দীপ্ত জানোয়ার গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এরচেয়ে বেশী কোন গুরুত্ব বা মর্যাদা পাওয়ার অধিকার তাদের নেই। যে মানুষ কেবল নিজের ঘরের আগুন নেভানো, নিজের অধিকার রক্ষা এবং নিজের জান–মাল ও ইজ্জত রক্ষায় সদা জাগ্রত থাকে কিন্তু অন্যের ঘর পুড়তে দেখে, অন্যের অধিকার সমুহ পদদলিত হতে দেখে এবং অন্যের জান–মাল ও ইজ্জত বিনষ্ট হতে দেখে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না তাকে ভালো মানুষ বলা দুরে থাক, মানুষ বলতেও আমরা দ্বিধা বোধ করবো। অনুরূপভাবে যে জাতি বা গোষ্ঠী নিজের জান–মাল ও ইজ্জত রক্ষা––সবকিছুই করতে প্রস্তুত হলেও অন্যদের ওপর অন্যায়ের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, শয়তানী শক্তি সমুহের হঠকারিতা ও স্বেচ্ছাচারে তারা ধ্বংসোন্মুখ হলে এবং তাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক জীবন রসাতলে যেতে বসলেও তাদের মুক্তি, স্বাধীনতা, সংশোধন ও কল্যাণের জন্য চেষ্টা করতে উদ্যোগী হয় না, তাকেও আমরা সর্বোত্তম বা মহান জাতি বলতে পারি না। বস্তুত একজন ব্যক্তির কাজ যেমন তার নিজের অধিকার ছাড়াও স্বজাতির ও স্রষ্টার কিছু অধিকার প্রাপ্য থাকে ঠিক তেমনিভাবে একটি সমাজ বা জাতির কাছেও আপন স্রষ্টা ও বৃহত্তর মানবসমাজের পক্ষ

থেকে কিছু অধিকার পাওনা থাকে। এইসব অধিকার প্রত্যর্পণের জন্য সেই সমাজ বা জাতি যতক্ষণ নিজের জান-মাল, মুখ ও মন দিয়ে সংগ্রাম না করবে ততক্ষণ তাকে একটি মহৎ জাতি বলা যাবে না। এটা সত্য যে, একটি জাতির প্রাথমিক দায়িত্ব তার নিজের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করা এবং নিজেকে অন্যায় ও অসত্যের আধিপত্য থেকে মুক্ত রাখা। কিন্তু এটাই তার একমাত্র দায়িত্ব নয় এবং শুধুমাত্র এটা করেই তার ক্ষান্ত হওয়ার অবকাশ নেই। তার প্রকৃত কর্তব্য হলো, নিজের যে শক্তি আছে তা দিয়ে সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্য চেষ্টা করা, মানব জাতির নৈতিক, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমস্ত বাধা-বিপত্তি দুর করার জন্য সংগ্রাম করা এবং যাবতীয় শোষণ-ত্রাসন, অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অবিচার ও অরাজকতা-উচ্ছৃংখলার বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে যুদ্ধ করা এবং যতদিন ঐ সব পৈশাচিক শক্তি সম্পুর্ণরূপে উৎখাত না হয় ততদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের সুমহান নৈতিক শিক্ষা

দুঃখের বিষয় যে, বিশ্বের সংকীর্ণমনা পন্ডিতগণ সামাজিক মর্যাদার এই সুউচ্চ মাপকাঠি এবং সামাজিক জীবনের এই সুমহান লক্ষ্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেননি। আর কেউ যদি চেষ্টা করেও থাকেন তথাপি তার দৃষ্টি বেশী দুর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে নি। এসব লোক যখন ব্যক্তিগত পরিমন্ডলে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব সমুহ নিয়ে আলোচনা করেন তখন মানবতার ব্যাপকতর ও প্রসস্ততর মূল্যায়নে তাদের মস্তিষ্ক সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। ফলে তারা সামাজিক দায়িত্ব সমুহকে জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার এক ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে সীমিত করে দিয়ে জাতীয়তাবাদ বা স্বাদেশিকতাবাদের সূচনা করেন। আর এই স্বাদেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ সামান্য রদবদলের পর সহজেই উৎকৃষ্ট জাতীয় ও স্বাদেশিক সংকীর্ণতা এবং অন্ধ-গোড়ামীর রূপ পরিগ্রহ করে। এই সংকীর্ণতা ও গোড়ামীই মানবতার কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক শ্রেণী বিভক্তির জন্য দায়ী। আর এই কৃত্রিম বিভক্তির দরুন একটি বিশেষ বংশোদ্ভুত অথবা বিশেষ ভাষা বা জাতীয়তার অধিকারী মানুষ ভিন্ন বংশ, ভাষা ও জাতীয়তা-ধারী মানুষকে মনুষ্যত্বের গন্ডী-বহির্ভূত বলে মনে করে।

অধিকন্তু তাদের অধিকার সমুহ পদদলিত করাকেও নৈতিকতা ও সৌজন্যের পরিপন্থী বলে মনে করে না।

পবিত্র কোরআন স্বীয় উক্তি اخرجت للناس (সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে) দ্বারা প্রকৃত পক্ষে মানবতার এই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বিভক্তিকেই খন্ডন করেছে। সামাজিক মর্যাদার এই সুমহান মাপকাঠিকে উপস্থাপিত করে কোরআন মুসলিম জাতিকে মানবতার সেবার সেই সুমহান লক্ষ্যের দিকে পথ নির্দেশ করেছে যা সকল ভেদাভেদের উর্ধে। কোরআনের বক্তব্য হলো, একটি সত্যসন্ধ ও ন্যায়নিষ্ঠ জাতির কর্ত্যব্য পালনের পক্ষে জাতীয়তাবাদের ময়দান অত্যন্ত সংকীর্ণ। এ ধরনের কোন মানবগোষ্ঠী কখনো বর্ণ, ভাষা কিংবা স্বাদেশিকতার সীমিত গন্ডিকে বরদাশত করতে পারে না। তার জন্য স্থল কিংবা সমুদ্র,প্রাচ্য কিংবা প্রতীচ্য, আর ইউরোপ কিংবা এশিয়ার পার্থক্য নিরর্থক। এ সব পার্থক্য তার জন্য শুধু নিরর্থকই নয়, তার দায়িত্ব পালনের পথে অন্তরায়ও বটে। তার কাছে বরং সকল মানুষ তথা সকল আদম সন্তানই সমান।এ জন্য তাদের সকলের সেবা করা তার অবশ্য কর্তব্য। আর কোরআনের দৃষ্টিতে সেবা বলতে বুঝায় সকলকে ভালো কাজের জন্য আদেশ করা, সকলকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা। এই মহিমান্বিত আদর্শকে সে বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় পেশ করেছে। সে সব উক্তির মধ্য দিয়ে সে সংকীর্ণতার কল্পিত মুর্তি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। আর তার স্থলে উন্মুক্ত করেছে কর্তব্য সচেতনতার এক বিশাল ও বিস্তীর্ণ জগতের সুপ্রশস্ত রাজপথ। কোরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط (البقره : ١٤٣)

এভাবে আমি তোমাদেরকে একটা সুমহান ও শ্রেষ্ঠ জাতি রূপে তৈরী করেছি যেন তোমরা মানব জাতির সামনে সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও এবং রাসুলও তোমাদের সামনে সাক্ষী হয়ে দাঁড়ান। (বাকারাঃ ১৭)

সুরা হজ্জে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে নিম্নরূপঃ

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ
هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ (الحج : ٧٨)

আল্লাহর পথে যেমনভাবে জিহাদ করা উচিত সেইভাবে জিহাদ কর। তিনি তোমাদেরকে এ কাজের জন্যই মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের ওপর ইসলামের সীমার মধ্যে কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। এ হলো তোমাদের মহান পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ) এর আদর্শ। আল্লাহ এ গ্রন্থে এবং এর আগে তোমাদের নাম মুসলিম (অনুগত, আত্মনিবেদিত) রেখেছেন--যেন, রাসুল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরাও দুনিয়ার মানুষের ওপর সাক্ষী হও। অতএব তোমরা নামাজ কয়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক।

(আল–হজ্জঃ ১০) ।

পরস্পরকে বিশ্লেষণকারী উপরোক্ত আয়াত দু'টি মিলিয়ে পড়লে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এখানেও মুসলমানদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে সেই বিশ্বজনীন মানব সেবাকেই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, যে গোষ্ঠীটিকে চরম উগ্রতা ও চরম শৈথিল্যের মধ্যবর্তী ন্যায়নীতি ও সুবিচারের পথে চালিত করা হয়েছে– তোমরাই সেই গোষ্ঠী। আল্লাহ তোমাদেরকে এই বিশেষ কাজটির জন্য মনোনীত করেছেন যে, তোমরা আপন কাজ ও কথা দ্বারা সত্যের সাক্ষ্য দেবে এবং দুনিয়াতে সত্যের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে থাকবে যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমাদের কথাবার্তা ও আচরণ–পদ্ধতি–দ্বারা দুনিয়াবাসী বুঝতে পারে, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা ন্যায়, কিসের নাম ন্যায়বিচার, আর কাকে বলে সততা। এটাই সত্যের সাক্ষ্য এবং এটাই তোমাদের জীবনের লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই তোমাদের নাম দেয়া হয়েছে মুসলিম বা ফরমাবরদার। আরো বলা হয়েছে যে,তোমাদের এ আদর্শের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রশস্ত। এর মধ্যে আদৌ কোন সংকীর্ণতা

নেই যে, বর্ণ, বংশ, ভাষা, জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার প্রাচীর এর সর্বব্যাপী কল্যাণের প্রবাহ রোধ করে রাখতে পারে। এতে না আছে কোন অচ্ছুত অস্পৃশ্যের অস্তিত্ব, না আছে বর্ণাশ্রমের কোন অলীক কল্পনার অবকাশ। ইসরাঈলের তথাকথিত ' হারিয়ে যাওয়া মেষপাল' কিংবা 'ইসমাইলের পথহারা উষ্ট্রপাল' এর কোন বিশেষণ এতে স্বীকৃত নয়। ইসলামের মূলনীতিকে যে–ই গ্রহণ করবে, সে তোমাদের সাথে সম্পূর্ণ সমান মর্যাদা নিয়ে তোমাদের এই মহিমান্বিত জীবনাদর্শের মিলনায়তনে প্রবেশাধিকার লাভ করবে– তা সে যে কোন বর্ণ বা জাতির লোক হোক কিংবা যে কোন দেশের অধিবাসী হোক। অনুরূপভাবে যে সেবার কাজ তোমাদের দায়িত্বে অর্পিত হয়েছে, তাও কোন বিশেষ জাতি বা দেশ পর্যন্ত সীমিত নয় বরং তোমাদেরকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সত্যের সাক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এই বিষয়টিই অন্য এক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (الحج : ۴۱)

এরা সেই সব লোক, যাদের পৃথিবীতে আমি সার্বভৌমত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। (আল–হজ্জঃ৬)

এখানে للناس এর পরিবর্তে الارض। শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলমানদের শক্তি–সামর্থ ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থকতা এই বলা হয়েছে যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের বিজয়–পতাকা ওড়াবে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। এ বক্তব্যেরও লক্ষ্য এই যে, মুসলমানদের কাজ শুধু আরব, অনারব, এশিয়া কিংবা প্রাচ্যের জন্য নয় বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্য। তাদেরকে ভূ–মন্ডলের প্রত্যেক কোণে ও প্রত্যেক অঞ্চলে যেতে হবে, প্রতিটি জনপদে, পথে–প্রান্তরে, পর্বতে–অরণ্যে, সমুদ্রে ও স্থলভাগে সত্য ন্যায়ের ঝান্ডা বয়ে নিয়ে অন্যায় ও অসত্যের অনুগামীদের পিছু ধাওয়া করে যেতে হবে। পৃথিবীর এক ইঞ্চি জায়গাও এমন থাকতে দেয়া যাবে না যেখানে অন্যায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এমন প্রতিটি স্থান থেকে অন্যায় উৎখাত করে তার স্থলে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আল্লাহ

কোন বিশেষ দেশ বা বিশেষ গোষ্ঠীর আত্মীয়-কুটুম নন। তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির সমান স্রষ্টা এবং স্রষ্টা হিসেবে সকলের সাথেই তাঁর একই রকমের সম্পর্ক। এ জন্য তিনি কেবল কোন বিশেষ দেশেই বিভেদ-বিশৃংখলা ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়াকে অপছন্দ করেন না বরং পৃথিবীর যেখানেই বিভেদ-বিশৃংখলা ও অরাজকতা দেখা দিক, তিনি তা সমানভাবে অপছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে কোথাও فساد فى العرب (আরবে অরাজকতা) বা فتنه فى العجم (অনারব জগতে বিশৃংখলা) বলা হয়নি বরং সব জায়গাতেই لارض। (পৃথিবী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ لفسدت الارض। (পৃথিবী অরাজকতায় ভরে যেত) يسعون فى الارض فسادا: (তারা পৃথিবীতে বিভেদ ও বিশৃংখলা ছড়াবার চেষ্টা করে) এবং

تكن فتنة فى الارض (পৃথিবীতে অরাজকতা দেখা দিবে)। এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তার সত্যের সৈনিকদের অর্থাৎ মুসলিম জাতির করণীয় সেবামুলক কাজের ন্যায় পরম কল্যাণবহ বস্তুটিকে কোন বিশেষ বর্ণ বা জাতীয়তার সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিতে চান না বরং তাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে বন্ধন করে দিতে চান।

আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের তাৎপর্য

ওপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, মুসলমানরা যে خير امة নামে অভিহিত হয়েছে তার কারণ এই যে, তারা শুধু নিজেদের সেবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেনি বরং সমগ্র মানব জাতির সেবাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের রহস্য اخرجت للناس (মানব জাতির কল্যাণের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে) কথাটার মধ্যেই নিহিত। স্বজাতি পূজা ও স্বদেশ পূজার জন্য তাদের অভ্যুদয় ঘটেনি। খোদ ইসলামের স্বভাবগত দাবীই এই যে, তাদেরকে সমগ্র বিশ্ব মানবতার সেবক হয়েই থাকতে হবে।

এবার আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, মুসলমানদের করণীয় সেই আসল সেবামূলক কাজ, যাকে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে তা কি ধরনের সেবা এবং তার তাৎপর্যই বা কি। মা'রুফ আভিধানিক অর্থে যে কোন চেনা বা জানা জিনিসকে বলা হয়। আর

পারিভাষিক অর্থে এমন যে কোন কাজ যা সুস্থ বিবেক–বুদ্ধির নিকট সুপরিচিত। মানুষের সুস্থ ও বিকারমুক্ত মন যাকে ভালো বলে জানে এবং যা দেখে প্রত্যেক মানুষের মন বে–এখতিয়ার বলে ওঠে যে, বস্তুতই এটা ভালো কাজ। ঠিক এর বিপরীত হলো 'মুনকার' শব্দটি। আরবী অভিধানে এর অর্থ অজানা ও অচেনা। পারিভাষিক অর্থে যা সুস্থ বুদ্ধির কাছে অবাঞ্ছিত, সুস্থ ও বিকার মুক্ত বিবেক যাকে খারাপ মনে করে এবং সাধারণ মানুষ যা অপছন্দ করে, সেটাই মুনকার। বিশ্বস্ততা, সততা, সত্যবাদিতা, সংযম, দায়িত্ব সচেতনতা, অনাথ ও দুর্বলের সাহায্য, বিপন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি, মজলুমদের সহায়তা, ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর, তাঁর বান্দাদের এবং নিজের অধিকার সমূহ বুঝা ও তা প্রদান করা, এ সব এবং এমনি ধরনের আরো বহু নৈতিক গুণ–বৈশিষ্ট্য 'মারূফে'র অন্তর্ভূক্ত। এগুলোকে–নিজে বাস্তবায়িত করা এবং অন্যদেরকে বাস্তবায়িত করতে উদ্বুদ্ধ করার নাম আমর বিল মা'রূফ। পক্ষান্তরে বিশ্বাসঘাতকতা, পরস্ব অপহরণ ও আত্মসাৎ, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, বিভেদ–বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য বিস্তার, বেইনসাফী, সীমালংঘন করা, অন্যদের অধিকার হরণ করা, অন্যায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা করা, সত্য ও ন্যায়কে দাবিয়ে রাখা, দুর্বল ও অসহায়দের কষ্ট দেয়া ইত্যাকার যাবতীয় মানবতা বিরোধী, বিবেক বিরোধী এবং স্বভাব বিরোধী কাজ মুনকার। এগুলো থেকে নিজে বিরত থাকা এবং অন্যদের বিরত রাখার নামই 'নাহি আনিল মুনকার'।

সূরা হজ্জের আয়াতে امر بالمعروف نهى عن المنكر এর পূর্বে اقاموا الصلوة واتوا الزكوة। এর উল্লেখ থেকে বুঝা যায় যে, নিজের ভালো হওয়া ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের দাবী রাখে। অন্যদের ভালো বানানোর ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার স্থান তার পরেই। বস্তুত অন্যকে ভালো বানাতে হলে আগে নিজের ভালো হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু মহত্তের বিচারে যেমন নিজের উদর পূর্তির চাইতে অন্যের উদর পূর্তি উত্তম, তেমনি ভালো কাজের বিস্তার ঘটানো ও মন্দ কাজ রোধ করাটাও নিজের ভালো হওয়া ও অন্যায় থেকে নিজের বিরত থাকার চাইতে মহৎ কাজ। কেননা একটি হলো আত্ম সেবা, অপরটি পরোপকার। একটি মানবতার প্রাথমিক স্তর, অপরটি পূর্ণাঙ্গ মানবতা। অবশ্য নিজে সৎ কাজ করা

ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা যে একটা ভালো কাজ এবং মহৎ স্বভাব, তাতে সন্দেহই নেই। কিন্তু মহত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ এবং শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে অন্যদেরকে সৎ কর্মশীল হতে উদ্বুদ্ধ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এটা মানুষের সহজাত বৃত্তি যে, সে কোন জিনিস অপছন্দ হলে তা বর্জন করে। অপছন্দের চেয়ে আর এক ডিগ্রী ওপরে উঠে যদি সে তা ঘৃণা করে তা হলে তা দেখা বা শোনাও সহ্য করবে না। আর ঘৃণার চেয়ে আর এক ডিগ্রী উপরে উঠে যদি শত্রুতার সৃষ্টি হয় তা হলে সে তাকে নিশ্চিহ্ন ও নির্মুল করার জন্য উঠে–পড়ে লেগে যাবে। আর যদি শত্রুতাও নিছক নামমাত্র শত্রুতার পর্যায়ে না থাকে বরং প্রচন্ড ধরনের আক্রোশ ও প্রতিহিংসার রূপ ধারণ করে তাহলে সে তাকে নির্মুল ও নিশ্চিহ্ন করাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করবে এবং এমনভাবে তার পেছনে লাগবে যে, তাকে নিশ্চিহ্ন করে না দেয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে না। অনুরূপভাবে যখন সে কোন জিনিসকে পছন্দ করে, তখন তা সে নিজে গ্রহণ করে। যখন তাকে ভালোবাসে তখন তাকে দেখে ও তার কথা শুনতে আনন্দ পায়। যখন ভালবাসা প্রেম ও আসক্তির পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন সে চায়, পৃথিবীর সর্বত্র তার প্রেমাষ্পদের প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব শোভা পাক এবং জীবনের একটি মুহূর্তেও সে ছাড়া অন্য কারো চেহারা দর্শনে ও স্মৃতিচারণে ব্যয়িত না হোক। তারপর সেই প্রেম যদি আরো উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়ে আত্মোৎসর্গের ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তাহলে সে আপন জীবনকে তারই সেবায় নিয়োজিত করে এবং তার জন্য নিজের জান, মাল, ইজ্জত, সম্মান সবই উৎসর্গ করে দেয়। সুতরাং 'আমর বিল মা'রূফ' কথাটা আসলে ন্যায় ও সত্যের প্রতি চরম ও পরম আসক্তিরই নামান্তর। আর 'নাহি আনিল মুনকার' হলো অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রচন্ডতম ঘৃণা, বিদ্বেষ ও আক্রোশ। যিনি মা'রূফ বা সৎ কাজের আদেশ করেন তিনি আসলে সততা ও ন্যায়নীতির প্রতি আশক্ত ও উৎসর্গকৃত হয়ে থাকেন। আর 'মুনকার' তথা অন্যায় ও অসত্য থেকে যিনি নিষেধ করেন তিনি শুধু অন্যায় থেকে সংযমকারী ও তার প্রতিরোধকারীই হন না, বরং তার কথা ও তার রক্তপিপাসু হয়ে থাকেন।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের ভিত্তি হিসেবে আরো একটা মনোবৃত্তির উল্লেখ করা যায়। সেটা হলো, মানব প্রেম ও মানব

হিতৈষণার মনোবৃত্তি। স্বার্থপর মানুষ আল্লাহর যে নেয়ামত লাভ করে তা একাই ভোগ করতে চায়। অন্য কাউকে তার ভাগ দিতে চায় না। অনুরূপভাবে সে নিজে কোন বিপদে পড়লে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিন্তু অন্য কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানব হিতৈষী ও মানব প্রেমিক, সে নিজের সুখ ও সম্পদে সকলকে অংশীদার করে, সকলের মধ্যে তা বন্টন করে এবং নিজের বিপদে যেমন অস্থির হয় তেমনি অন্যের বিপদ–আপদেও ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে পড়ে। এই পরস্পর বিরোধী স্বার্থপরতা ও সহানুভুতিশীলতাকে আমরা সাধারণত ইন্দিয়গ্রাহ্য ও বস্তুগত লাভালাভের জগতেই সীমাবদ্ধ মনে করে থাকি। কিন্তু আসলে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার জগতে এই গুণ সমূহের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষ আরো প্রচন্ড, আরো সাংঘাতিক। যেহেতু মানুষের বস্তুগত শুভাশুভ ও কল্যাণ–অকল্যাণ তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসারী, তাই এই গুণাবলীর সংঘাত সত্যিকারভাবে দুই জগতেই দেখা দিয়ে থাকে। একজন সত্যিকার মানব প্রেমিক ও মানব হিতৈষী কেবল নিজে সৎ হয়েই সন্তুষ্ট হতে পারে না, সে যতক্ষণ ভ্রাতৃপ্রতিম গোটা মানব জাতিকে অন্যায় ও অসত্যের শৃংখল থেকে মুক্তি দিয়ে সততার পথে চালিত করতে না পারবে ততক্ষণ শান্তি পায় না। তার অন্য এক ভাইকে পাপে ও অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখে তার আত্মা অস্থির ও অশান্ত হয়ে উঠে। জননী যেমন নিজের সন্তানকে শীতে কোঁকড়াতে দেখে অধীর হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে সে অন্য মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেখে বেদনায় মুষড়ে পড়ে, মর্মাহত হয়। সে যখন কোন জিনিসের মধ্যে নিশ্চিত মহত্বের কল্যাণের সন্ধান পায় তখন তার মনে চায় যে, সকল মানুষ তা দ্বারা উপকৃত হোক। আর যখন কোন জিনিসে নিশ্চিত অশুভ ও অকল্যাণ দেখতে পায় তখন সে চায় যে, একটি মানুষও যেন তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে। সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, কোন জিনিস যদি ভালো ও কল্যাণকর হয়ে থাকে তবে তা শুধু আমার জন্য কল্যাণকর নয়––সকলের জন্যই ভালো, সকলের জন্যই কল্যাণকর এবং সকল মানুষের কাছে এ জ্ঞান, ও উপলব্ধিটুকু পৌছে দেয়া আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। অপর কোন জিনিস যদি খারাপ ও ক্ষতিকর হয়ে থাকে হবে তা শুধু আমার জন্য ক্ষতিকর বা খারাপ নয়–– সকলের জন্যই মন্দ, সকলের জন্যই অনিষ্টকর। নিজের ন্যায় অন্যদেরকেও তা থেকে রক্ষা

করা আমার কর্তব্য। নিজের শুভ ও নিজের কল্যাণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা এবং অন্যদের হিত ও কল্যাণ কামনা না করা আর পাপ ও অন্যায়কে কেবল নিজের থেকে প্রতিহত করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া এবং অন্যদেরকে তা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা না করা সবচেয়ে বড় স্বার্থপরতা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট আত্মম্ভরিতা।

কিন্তু একে শুধু স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা বললেই ঠিক বলা হয় না। এটা আত্মহত্যারও নামান্তর। মানুষ একটা সভ্য ও সামাজিক জীব। সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী জীবন যাপন করতে পারে না। তার ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি সবই সামাজিক ও সমষ্টিগত ব্যাপার। সমাজ পাপিষ্ট ও চরিত্রহীন হলে তার খারাপ প্রভাব থেকে সেও রক্ষা পেতে পারে না। একটি শহরে যদি যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা পড়ে থাকে এবং তা থেকে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে তাহলে সেই বিষাক্ত ও সংক্রমন-দুষ্ট আবহাওয়ার খারাপ প্রভাবে শুধু যাদের গৃহে ময়লা রয়েছে তারাই ধ্বংশের কবলে পড়বে না বরং সেই শহরে বসবাসকারী একান্ত ধোপ-দোরস্ত, পরিষ্কার-পারিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য-বিধি পালনকারী ব্যক্তিও তার কবলে পড়বে। অনুরূপভাবে যদি কোন সমাজের সাধারণ চরিত্র দুষিত ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেখানকার মানুষ সাধারণ ভাবে অসচ্চরিত্র ও পাপিষ্ঠ হয় তা হলে সেখানে যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হবে তা শুধু চরিত্রহীন ও পাপিষ্ঠদের পর্যন্তই সীমিত থাকবে না বরং যে মুষ্টিমেয় কয়জন সাধূ-সজ্জন ব্যক্তি ঐ জনপদে বসবাস করেন তাদের সুনাম-সম্ভ্রমও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কোরআনের উক্তিঃ

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (انفال)

এর মর্মার্থও এই যে, কোন জনবসতিতে যে সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলা ঘটে তাতে শুধু গুনাহগার লোকরাই ধ্বংস হয় না বরং নেককার ও পরহেজগার লোকেরাও তার আওতায় এসে যায়। (আনফালঃ৩)

হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টি একটি হাদিসে নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করেছেনঃ

ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا

المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا

ينكروه فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة (مسند احمد)

সাধারণ মানুষ যখন এতটা শৈথিল্য দেখায় যে, তাদের চোখের সামনে অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে অথচ তারা তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করছে না--- কেবল তখনই মুষ্টিমেয় লোকের অপরাধের দরূন সমাজের সকলে আল্লাহর আজাবের শিকার হয়। এরূপ শৈথিল্য না দেখানো পর্যন্ত আল্লাহ গুটি কয়েক লোকের পাপের ফল সকলকে ভোগ করান না। (মুসনাদে আহমদ)

সুতরাং একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত যে, আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার (সৎ কাজে আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা) শুধু অন্যদেরই সেবা নয়, নিজেরও সেবা। আসলে এটা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের মধ্যে নিজের কল্যাণ অনুসন্ধানের এক বিজ্ঞজনোচিত ও বাস্তব কর্মপন্থা।

সামাজিক জীবনে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের মর্যাদা

সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি–অগ্রগতিও এই আমর বিল–মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এটি একটি সমাজকে ধ্বংস ও অবক্ষয়ের হাত থেকেও রক্ষা করে। মানবিক মুল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের রক্ষণাবেক্ষণও একমাত্র এর দ্বারাই সম্ভব। একটি জাতির প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে পরস্পরকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার প্রেরণা ও জাগৃতি যতক্ষণ বর্তমান থাকবে কিংবা এ দায়িত্ব পূর্ণনিষ্ঠার সাথে পালন করে এমন একটি দল বর্তমান থাকবে ততক্ষণ সে জাতি ধ্বংস ও অবক্ষয়ের কবলে পড়তে পারে না। কিন্তু যদি ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের এই চেতনা ও স্পৃহার বিলুপ্তি ঘটে এবং এ দায়িত্ব পালনকারী কোন একটি দলও তাদের মধ্যে বর্তমান না থাকে তাহলে ক্রমে ক্রমে পাপাচার ও অপরাধ প্রবণতার দানবীয় শক্তি তাদের ওপর পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সে সমাজ নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত অবক্ষয় ও

অধঃপতনের গভীরতর আবর্তে এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হয় যে, সেখান থেকে আর মাথা তুলতে পারে না। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়টিই নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ج وَاتَّبَعَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ○ وَمَا كَانَ
رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ○ (هود: ١١٦-١١٧)

(আল্লাহর আজাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া) অতীতের জাতিগুলোর মধ্যে অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এমন একদল সৎ লোক যদি থাকতো! অবশ্য স্বল্প সংখ্যক লোক তেমন ছিল এবং তাদেরকে আমি আজাব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম। অতীতের সেই দুরাচারীরা কেবল ভোগ–বিলাস ও আমোদ–প্রমোদের উপকরণ নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। আসলে তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। অতএব জেনে রেখ, তোমার প্রতিপালক এমন জালেম নন যে, জনবসতিগুলো সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও ধ্বংস করবেন।' (হুদঃ ১০)

অন্য এক জায়গায় বনী ইসরাইল বংশের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছেঃ

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ
دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা আল্লাহর বিধানকে অমান্য করেছিল তাদেরকে দাউদ ও ঈসার মুখ দিয়ে 'অভিসম্পাৎ করা হয়েছিল। কারণ তারা নাফরমানী করতো ও সীমালংঘন করতো। আর পরস্পরকে অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতো না। তারা অত্যন্ত জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকতো।

(আল–মায়েদাহঃ১১)

এ আয়াতের তফসির প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা (রঃ) বিভিন্ন হাদিস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদিসে ভাষায় সামান্য হেরফের থাকলেও মোটের ওপর পূর্ণ ঐকমত্য সহকারেই বনি ইসরাইলের লোকদের প্রাথমিক বিভ্রান্তি ও ত্রুটির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা তাদের মন থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল। অন্যায়কে সহ্য করতে করতে স্বয়ং তাদের মধ্যেই অন্যায়ের প্রতি আসক্তির সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। অথচ একে তারা তথাকথিত উদার নীতি নামে অভিহিত করতো।

كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هٰذا اتق الله ودع ما تصنع
فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذالك
ان يكون اكيله وشريبه وقعيده۔

অর্থাৎ তাদের একজন অপরজনের সাথে সাক্ষাতের সময় বলতো, হে অমুক! তুমি যা করছ, অন্যায় করছ।। ওটা ছেড়ে দাও। কিন্তু পরের দিন যখন সেই ব্যক্তির সাথে তার দেখা হতো তখন সে বিনা দ্বিধায় তাদের সাথে মিশে যেতো ও পানাহার করতো। অবশেষে তাদের ওপর তাদের পরস্পরের খারাপ প্রভাব পড়ার দরুন তাদের বিবেক নির্জীব হয়ে গেল। ضرب الله قلوب بعضهم ببعض হযরত রাসুলূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলার সময় হঠাৎ শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন এবং উত্তেজিতভাবে বললেনঃ

والذى نفسى بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن
المنكر ولتاخذن على يد المسئ ولتطرنه على الحق اطراء او
ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض او ليلعنكم كما لعنهم۔

আমার প্রাণ যার হাতে সেই মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, তোমাদের সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং দুষ্কৃতিকারীর তৎপরতা বন্ধ ও তাকে সৎ কাজের দিকে চালিত করে দিতেই হবে। নচেৎ তোমাদের পরস্পরের বিবেককে আল্লাহ পরস্পর

দ্বারা প্রভাবিত করে দেবেন অথবা বনি ইসরাইলের মত তোমাদের ওপরও অভিসম্পাৎ করবেন।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তের আলোকে সমগ্র বিশ্ববাসীর ব্যাপারটাই বুঝে নিতে হবে। একটি জাতির মুক্তি ও কল্যাণ যেমন সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার মর্যাদাগত চেতনা ও প্রেরণার ওপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি সাফল্যও ঐ একই জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীতে অন্তত একটা মানবগোষ্ঠী এমন থাকাই চাই যারা দুষ্কৃতিকারীদের দুষ্কর্ম প্রতিহত করবে, অন্যায় ও অবিচারকে রুখে দাঁড়াবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে এবং মানবজাতির তত্ত্বাবধান করবে। এমন মানব গোষ্ঠী যারা ইনসাফ কায়েম করবে এবং অন্যায় ও অসত্যকে কখনো মাথা তোলার সুযোগ দেবে না। আল্লাহর সৃষ্টিকে সর্বব্যাপী ধ্বংস থেকে বাঁচানো এবং ভু–পৃষ্ঠকে যাবতীয় দুষ্কৃতি, বিভেদ–বিশৃংখলা, অরাজকতা, জুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করার জন্য এ ধরণের একটা গোষ্ঠী বা দলের অস্তিত্ব অপরিহার্যঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط (آل عمران : ١٠٤)

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা অপরিহার্য যারা কল্যাণ ও সত্যের দিকে সকলকে ডাকবে, ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। (আলে–এমরানঃ ১১)

অতএব 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার' কেবল একটি মহৎ কাজ তা নয়, শুধু মানব হিতৈষণার একটি পুণ্যময় স্বর্গীয় প্রেরণাও নয়। এটা আসলে সমাজ ব্যবস্থাকে বিকৃতি, বিভেদ ও বিশৃংখলা থেকে নিরাপদ রাখার সর্বোত্তম ও অপরিহার্য পন্থা। এ একটা মহৎ সেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ। পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখা, পৃথিবীকে ভদ্র ও সুসভ্য মানুষদের বসবাসযোগ্য করা এবং বিশ্ববাসীকে ইতরপ্রাণীর মর্যাদা থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ এ কাজ একটি আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠীর ওপর অর্পণ করেছেন। বস্তুতঃ মানবতার এর চেয়ে বড় সেবা আর কিছু হতে পারেনা।

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের পার্থক্য

আন্তর্জাতিক মুসলিম সমাজের দায়িত্বে যে বিশ্বজনীন মানবসেবার কাজ অর্পণ করা হয়েছে, তার দুটো অংশ। একটি আমর বিল মারূফ (সৎ কাজে আদেশ দান) অপরটি নাহি আনিল মুনকার।(অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা) এ উভয়টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদিও এক অর্থাৎ মানুষকে সত্যিকার মানুষ করে গড়ে তোলা। কিন্তু উভয়ের মর্যাদা বিভিন্ন। এ জন্য উভয়ের কর্মপন্থাও আলাদা রকমের। পরবর্তী অধ্যায় সমুহ বুঝতে হলে এ পার্থক্যটা বুঝে নেয়া দরকার।

নীতিবিজ্ঞানে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক, যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য মানুষকে আদেশ করা যেতে পারে। দুই, যেগুলি করা না করা তার নিজের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। সমাজের একজন উত্তম সদস্য হওয়ার জন্য মানুষের সর্বনিম্ন করণীয় এই যে, তাকে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে, অন্যের অধিকার হরণ করতে পারবেনা, অন্যের উপর জুলুম করতে পারবেনা, অন্যের শান্তি ও নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারবেনা, এবং যে সব কাজ করলে তার অস্তিত্ব সমাজের জন্য ক্ষতিকর কিংবা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায় তা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রত্যেক সমাজই তার সকল সদস্যের জন্য এ সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন আবশ্যিক ও অপরিহার্য বলে মনে করে। এগুলো পালণ করতে যদি কেউ ব্রতী না হয় তা হলে সমাজ তাকে পালনে বাধ্য করার অধিকার রাখে। দায়িত্ব ও কর্তব্যের দ্বিতীয় প্রকরণটিতে নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সংক্রান্ত গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। এগুলো পালন করলে মানুষ সমাজের একজন মান্যগণ্য ও উচ্চ শ্রেণীর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। যেমন, আল্লাহর ও জনগণের অধিকার জানা ও তা প্রদান করা, নিজে সৎকর্মশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া এবং অন্যকে সৎকর্মশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ বানানো, জনসেবা করা, সত্যের সংরক্ষণ ও সমর্থন প্রভৃতি। এই দ্বিতীয় প্রকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ পালন করার জন্য মানবীয় বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিপক্কতা প্রয়োজন। এ গুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি না করা পর্যন্ত এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগুলো করার জন্য যেটুকু আত্মিক পরিশূদ্ধি ও পবিত্রতা প্রয়োজন তা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ উল্লিখিত কর্তব্য সমূহ সমাধা করতে পারেনা। এ জন্য এ কর্তব্যগুলো সমাধা করা বাধ্যতামুলক নয় বরং ঐচ্ছিক। কোন মানুষ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন

মানুষে পরিণত হবে কি হবে না তার ইচ্ছা ও মর্জির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে একটা সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা এমন হওয়াই উচিত যেন তার সদস্যদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদায় পৌছার আকাংখা আপনা থেকেই জন্মে।

মানবীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের যে দুটো বিভাগ উপরে আলোচিত হলো, তার আলোকেই আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের পার্থক্য বুঝে নিতে হবে। মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে উন্নীত করে মনুষ্যত্বের স্তরে নিয়ে আসা এবং তাকে মানব সমাজের একজন অনিষ্টকর ও অনুপকারী সদস্যে পরিণত হতে না দেয়াই হলো নাহি আনিল মুনকারের মর্ম কথা। অতঃপর তাহাকে মনুষত্বের স্তর থেকে উন্নীত করে পূর্ণাঙ্গ মনুষত্বের স্তরে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে শুধু অনিষ্টকর ও অনুপকারী হওয়া থেকে বিরত রাখা নয়। বরং উপকারী ও মর্যাদাবান সদস্যে পরিণত করা আমর বিল মারূফের কাজ। আমর বিল মারূফ নাহি আনিল মুনকারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। কিন্তু ধারাক্রমের দিক দিয়ে নাহি আনিল মুনকারের স্থান আগে এবং আমর বিল মারূফ পরে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একজন কৃষকের আসল উদ্দেশ্য ফসল জন্মানো বটে। কিন্তু সে জন্য প্রথমেই বীজ বপন করা চলেনা। আগে চাষ দিয়ে ভূমি নরম করতে হয়। অনুরূপভাবে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিনত করা কিন্তু সে জন্য তার মধ্যে মারূফ তথা শ্রেষ্ঠ মানব সুলভ গুণাবলীর বীজ বপন করার আগে মূনকার তথা পশু ও নিকৃষ্ট মানুষ সুলভ দোষ ত্রুটি সমুহ থেকে তাকে পবিত্র ও মুক্ত করা অপরিহার্য। ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে মারূফের দিকে পথ নির্দেশ করে। তাকে তার উত্তম গুণাবলী দেখিয়ে দেয় ও তা গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মুনকার সেই পথে একটি পর্দাস্বরূপ এবং তা মানুষকে মারূফের মহান জ্যোতি গ্রহণের যোগ্য রাখেনা। এ জন্য সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে আগে মুনকারের পর্দা ছিড়ে ফেলা চাই। এর মরিচা যে কোন পন্থায় আগে তুলে ফেলা চাই। এটাই সর্ব প্রথম ও সব চেয়ে জরুরী কর্তব্য। এর পর যদি কেউ মারূফ তথা মহত্তর গুণাবলী অর্জনের দাওয়াত গ্রহণ করে তা হলে তার জন্য নৈতিক গুনাবলীর এক বিরাট অংশ আর ঐচ্ছিক থাকে না আবশ্যিক হয়ে যায়। কেননা পূর্ণাঙ্গ মানুষের স্তরে পৌছে যাওয়ার পর তার জন্য নিছক মনুষ্যত্বের স্তরে

থাকাকালে যে টুকু শৈথিল্যের সুযোগ ছিল তা আর থাকেনা। কিন্তু মুনকারের মরিচা উঠে যাওয়ার পর এবং মূনকারের পর্দা ছিড়ে যাওয়ার পর যদি কোন মানুষের চোখে মারূফের জ্যোতি বিচ্ছুরিত না হয় এবং তার মন সেই নুর গ্রহণে ইচ্ছুক না হয়, তা হলে ইসলাম তাকে শুধু মুনকার থেকে বিরত রেখেই ক্ষান্ত হয়। বাকী সব কিছু তার বিবেকের ওপর ছেড়ে দেয়।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের পার্থক্য বিবেচনা করা যেতে পারে। খোদ ইসলামেরই দুটি দিক রয়েছে। সে দুটি দিকের পার্থক্যের ওপরই আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের পার্থক্যের ভিত্তি। ইসলাম এক দিকে সততা, ন্যায় পরায়নতা ও আত্মসংযমের এক শাশ্বত মহান দাওয়াত। অপরদিকে তা গোটা বিশ্বের জন্য আল্লাহর আইন। কোন ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার জন্য এ দুটো দিকই একত্র হয়ে যায়। দাওয়াতের দিকটিও তার জন্য আইন–বিধানের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম যে গ্রহণ না করে তার জন্য দাওয়াত ও আইন আলাদা আলাদা থাকে। দাওয়াতের মোদ্দা কথা হলো, আল্লাহ যখন মানুষকে দুনিয়ায় পাঠান তখন তাকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং সেই প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা তার অর্জন করা চাই। আর আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তার ওপর যে সব দায়িত্ব বর্তে সে সব তার সমাধা করা চাই। আর আইনের দাবী এই যে, আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের চাহিদা পূরণ করতে ও দায়িত্ব পালন করতে যদি সে না পারে তা হলে অন্ততঃ বিভেদ, বিশৃংখলা ও রক্তপাত থেকে যেন সে বিরত থাকে। কেননা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় ফেরেশতারা তাকে এ বিষয়ে অগ্রিম দোষারোপ করেছিল। সে যদি আশরাফুল মাখলূকাত তথা শ্রেষ্ঠতম জীব না হতে পারে তা হলে অন্ততঃ নিকৃষ্টতম জীব যেন না হয়। সততা, সুবিচার ও ন্যায় নিষ্ঠার আলো দিয়ে যদি পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করতে না পারে তা হলে অন্ততঃ দুষ্কৃতি ও অপরাধ প্রবণতা দিয়ে তার শান্তি ও নিরাপত্তাকে যেন বিড়ম্বিত ও বিনষ্ট না করে। প্রথমোক্ত জিনিসটি অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধি ও আশরাফূল মাখলুকাত–সুলভ ভূমিকা পালন একান্তভাবে নির্ভর করে তার আত্মার ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতির্ময়তা, বিবেক–মনের পবিত্রতা এবং স্বভাবগত সত্যানুরাগ ও সত্যনিষ্ঠার ওপর। এ জিনিসটা শক্তিপ্রয়োগে অর্জন করা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে

সীমানা নির্ধারণ ও সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের সমপর্যায়ের। অবাধ্য ও উচ্ছৃংখল প্রকৃতির মানুষকে কেবল ওয়াজ নছিহত করে ও উপদেশ খয়রাত করে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। কোন কোন সময় তাকে এ কাজে বাধ্য করার জন্য শক্তিপ্রয়োগেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

নাহি আনিল মুনকার–এর পদ্ধতি

কি কি উপায় ও পদ্ধতিতে অন্যায়, অসত্য ও দুস্কৃতি রোধ––তথা নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব সমাধা করতে হবে, সেটা একটু বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ। সেই বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে অন্য এক জায়গায় করবো। এখানে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, ইসলাম অমুসলিমদের মারূফ বা ন্যায়ের দীক্ষা দেওয়ার জন্য শুধু মাত্র দাওয়াত ও তবলীগের পন্থাই নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু মুনকার তথা অন্যায় রোধ করার জন্য এরূপ শর্ত–সীমা করেনি। বরং মুনকারের অবস্থা ও প্রকার ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

মন ও মস্তিস্কের কলুষতা, পংকীলতা ও বিভ্রান্তিকে ওয়াজ নছিহত ও উপদেশ দ্বারা দূর করতে বলেছে। যথাঃ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط (النحل : ١٢٥)

বিজ্ঞতা ও মিষ্ট উপদেশ দ্বারা আল্লাহর পথের দিকে ডাক এবং সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক অনুষ্ঠিত কর। (কর্কশ ও রূঢ় ভাষা পরিত্যাজ্য।)

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ -(عنكبوت : ٤٦)-

"আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)–দের সঙ্গে বিতর্ক করতে হলে তা খুব ভালোভাবে কর। তবে যারা সীমা ছাড়িয়ে গেছে তাদের কথা স্বতন্ত্র"
(আনকাবুত ৫)

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٥ (طه : ٤٤)

"(দুর্মদ অহংকারী ফেরআউনকে) তোমরা দুজনে (মুসা ও হারুন) নরম উপদেশ দাও। আশা করা যায়, সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে।"(সুরা তোয়াহা–২)

অন্যায় ও অসৎ কাজকে শক্তি প্রয়োগে রোধ করতে বলা হয়েছে। এই মর্মে কিছু আগেই আমরা হজরত রাসুলে করীম (দঃ) এর একটি হাদিস উল্লেখ করেছি। সে হাদিসে হজরত বলেনঃ

ولتاخذن على يد المسئ ولتطرنه على الحق اطراء

"দুস্কৃতিকারীর হাত ধর এবং তাকে সত্যের দিকে চালিত কর।"

এ ছাড়া আরো বহু হাদিসে 'মুনকার' বা 'দৃস্কৃতি'কে শক্তিপ্রয়োগে বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক জায়গায় হজরত বলেনঃ

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع

فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان.

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন দুস্কর্ম হতে দেখবে, তার উচিৎ তা হাত দিয়ে পাল্টে দেয়া। যদি তা না পারে তবে মুখ দিয়ে। যদি তাও না পারে তবে মন দিয়ে। আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।"

উল্লিখিত হাদীস দুটিতে হাত শব্দের অর্থ শুধু দেহের অঙ্গ বিশেষ নয়–বরং রূপকভাবে তা শক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দৃস্কৃতিকারীর হাত ধরার অর্থ এই যে, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে, যেন সে আর দৃস্কৃতি না করতে পারে। অনুরূপভাবে দুস্কর্মকে হাত দিয়ে পাল্টে দেয়ার মানে হলো তোমাদের শক্তি যেটুকু আছে তা দিয়ে অন্যায়, অসত্য ও দৃস্কৃতিকে উৎখাত ও নির্মূল করার চেষ্টা চালাও। অন্য এক হাদিসে আছেঃ

ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر

بين ظهرانيهم وهم قادرون على ينكروه فلا ينكروه (مسند احمد)

সমাজের বিশিষ্ট লোকেরা নিজের সামনে অন্যায় কাজ হতে দেখেও হতে দিচ্ছে এবং তা রোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রোধ করছেনা––এমনি

ধরনের মারাত্মক শৈথিল্য না দেখানো পর্যন্ত আল্লাহ সাধারণ লোকদের পাপের দরুন বিশিষ্ট দুর্ভোগে পতিত করেন না। (মসনদে আহমদ)

হযরত রাসুলে করীমের উক্তি আল্লাহর উক্তির ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। সুতরাং এই হাদিস সমুহ দ্বারা নাহি আনিল মুনকার তথা দূস্কৃতি রোধ সংক্রান্ত কোরআনের নির্দেশের ব্যাখ্যা সুষ্ঠ হয়ে যায়। এর অর্থ শুধু মুখ ও লেখনি দ্বারাই দুস্কৃতি বিরোধী প্রচারাভিযান চালানোই নয় –বরং প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগে তা বন্ধ করে দেয়া এবং পৃথিবীকে তার কলংঙ্কময় অস্তিত্ব থেকে মুক্ত ও পবিত্র করাও বটে। একাজ মুসলমানদের শক্তি–সামর্থের ওপর নির্ভরশীল। মুসলমানদের হাতে যদি এত শক্তি থাকে যে, সারা বিশ্বকে মুনকার তথা পাপ ও দুস্কৃতি থেকে বিরত রেখে তাকে সত্য, ন্যায়নীতি ও সুবিচারের অনুসারী বানিয়ে দিতে পারে তা হলে সেই শক্তি প্রয়োগ করা তাদের ওপর ফরজ। যতক্ষণ উক্ত লক্ষ্য অর্জিত না হবে এবং সারা বিশ্ব পাপ–তাপ মুক্ত না হবে ততক্ষণ উক্ত সংগ্রামে ক্ষান্ত হওয়া চলবেনা। কিন্তু যদি এত শক্তি তাদের না থাকে তাহলে তাদের দ্বারা যতটা সম্ভব হয় ততটাই করতে হবে। বিশ্ববাসীকে অন্যায় থেকে মুক্ত রাখার মত মহান সেবাব্রত পালন করতে হবে। আর পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অধিকতর শক্তি অর্জনের চেষ্টা করতেহবে।

বিভেদ–বিশৃংখলা ও অরাজকতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম

মুনকারের দ্বিতীয় যে প্রকারটির বিরুদ্ধে ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করতে বলেছে তাকে প্রথম প্রকার থেকে অধিকতর স্পষ্ট ও আলাদা করে দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা 'ফেৎনা' ও 'ফাসাদ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেসব আয়াতে মুনকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দেওয়া হয়েছে অথবা তার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা অস্ত্রবলে তাকে নির্মূল করতে বলা হয়েছে, সেখানে 'মুনকার' শব্দের পরিবর্তে 'ফেৎনা' ও 'ফাসাদ' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে, যথাঃ

قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"ফেৎনা বিশৃংখলা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই কর।"

لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ۔

"আল্লাহ যদি মানুষকে মানুষ দিয়ে জব্দ না করতেন। তাহলে দুনিয়া ফাসাদ (অরাজকতায়) ভরে যেত।"

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ۔

"তোমরা যদি এরূপ (যেভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের নির্দেশ দেয়া হয়েছে) না কর তাহলে খুব বড় রকমের বিশৃংখলা ও অরাজকতা দেখা দিবে।" (এখানে ফেৎনা ও ফাসাদ উভয় শব্দই একত্রে ব্যবহৃত)

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"বস্তুতঃ 'ফেৎনা' হত্যার চেয়েও মারাত্মক।"

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ، فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا۔

"কাউকে হত্যাও করেনি, ফাসাদও ছড়ায়নি–এমন ব্যক্তিকে যে হত্যা করলো সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করলো।"

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ

"তারা ফেৎনা ছড়াবার চেষ্টা করেছিল।"

كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا۔

"তারা যখনই ফেৎনার দিকে ফিরে যায় তাতে নিজেরাও শামিল হয়ে যায়।"

উপরের এই আয়াতগুলোতে মুনকারকেই ফেৎনা ও ফাসাদ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। বস্তুতঃ সমস্ত মুনকারের মধ্যে এই ফেৎনা ও ফাসাদই একমাত্র বস্তু যাকে তরবারী ছাড়া নির্মূল করা যায় না।

ফেৎনার তাৎপর্য

সাধারণভাবে লোকে মনে করে দুটো দলের মধ্যে প্রথমে কোন ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হবে। তারপর পরস্পরকে গালিগালাজ করবে, তারপর

দু'দলের তাগড়া জওয়ানেরা লাঠি–সোটা, ইট–পাথর, তীর–বল্লম, ছোরা–বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে মাঠে লাফিয়ে পড়বে, একে অপরের মাথা ফাটাবে, হত্যা ও লুটপাট চালাবে, সর্ব–রকম উপায়ে গায়ের ঝাল মেটাবে–তবেই তাকে বলা হবে ফেৎনা ও ফাসাদ। নিঃসন্দেহে এ ধরনের অবস্থাও ফেৎনা ফাসাদেরই পর্যায়ভুক্ত বটে। তবে কোরআনিক পরিভাষায় এ শব্দ দুটোর অর্থ আরো ব্যাপক ও প্রশস্ত। আরো অনেক অপরাধ রয়েছে এই তালিকাভুক্ত। সেই সব রকমের ফিরিস্তি আমাদের অন্য বই কিতাবে খুজতে হবেনা। কোরআনেই তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কোরআন নিজেই ফেৎনা ও ফাসাদের মর্ম বিশ্লেষণকরেছে।

আরবী অভিধানে فتن শব্দের অর্থ স্বর্ণ পুড়িয়ে তা খাঁটি না ভেজাল তা দেখা। এই আভিধানিক অর্থের হিসাবে এই শব্দটি মানুষকে আগুনে ফেলা বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ. (যে দিন তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। এরপর রূপক অর্থে এ শব্দটি মানুষকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করে এমন যে কোন জিনিস বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়। ধন–সম্পদ ও সন্তান – সন্ততীকে ফেৎনা বলা হয়েছে। যথাঃ

اِعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

"জেনে রাখ, তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান –সন্ততী ফেৎনা স্বরূপ।"

এটা বলার কারণ এই যে, এগুলো মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়। মানুষ সত্যকে বেশী ভালোবাসে, না এ গুলিকে, তা এ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়। সুখ–শান্তি এবং বিপদ মুসিবতকেও ফেৎনা বলা হয়েছে। যথাঃ

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً.

"আমি তোমাদেরকে বিপদ দিয়েও পরীক্ষা করি শান্তি দিয়েও পরীক্ষা করি।"

এ কথা বলার কারণ এই যে, বস্তুতঃ উভয় অবস্থাতে মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে। যুগের আবর্তন এবং ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকেও ফেৎনা বলা হয়েছে। কেননা এগুলোর মধ্য দিয়েও জাতি ও গোষ্ঠী সমূহের পরীক্ষা হয়ে থাকে যথা।ঃ

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔

"তারা কি দেখেনা যে, প্রতি বছর তাদেরকে একবার বা দুবার করে পরীক্ষা করা হয়। এতদসত্ত্বেও তারা সুপথে ফিরে আসে না এবং সাবধান হয় না" (তওবা)। কাউকে তার ক্ষমতার চেয়ে বেশী দায়িত্ব দেয়াকেও ফেৎনা বলা হয়েছে। কেননা এটা তার ধৈর্যের অগ্নি পরীক্ষা। যথাঃ

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي۔

কেউ কেউ বলে, আমাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিন। আমাকে বিপদে ফেলবেননা।"

এইসব উদাহরণ থেকে বুঝা গেল, ফেৎনার আসল অর্থ হলো পরীক্ষা--চাই তা ভোগের লালসা লাভের হাতছানি, স্বাদ সম্ভোগের মোহ ও প্রিয় বস্তুর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমেই হোক অথবা ক্ষয় ক্ষতির ভয়, বিপদ আপদের আশংকা, দুঃখ লাঞ্ছনার আঘাত দিয়েই হোক। এই পরীক্ষা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তা হলে তা ন্যায় সঙ্গত। কেননা আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা মানুষের পরীক্ষা নেয়ার অধিকার তার রয়েছে। বিশেষতঃ তার পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য মানুষকে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর মর্দাদায় উন্নীত করা। কিন্তু একই পরীক্ষা যদি মানুষের পক্ষ থেকে হয় তাহলে সেটা জুলুম। সেটা তার অনধিকার চর্চা। মানুষ যখন কাউকে অনুরূপ পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে তখন তার উদ্দেশ্য হয় তার বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করা, তার আনুগত্য গ্রহণে অন্যকে বাধ্য করা এবং নৈতিক ও আত্মীক দিক দিয়ে তাকে হীনতর ও নিম্নতর পর্যায়ে নিক্ষেপ করা। এই শেষোক্ত মর্মের দিক দিয়ে ফেৎনা শব্দটি ইংরাজী Persecution শব্দের প্রায় সমার্থক। তবে ফেৎনা শব্দের তাৎপর্য ইংরাজী শব্দের চেয়েও অনেক বেশী ব্যাপক। পবিত্র কোরআনে এর যে কয়টি অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

(১) দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করা, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা, তাদের ঘর বাড়ি জবর দখল করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় কষ্ট দেয়া। যথাঃ

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا

"যারা নিদারুণ দুঃখলাঞ্ছনা ভোগের পর ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এবং যারা সত্য ও ন্যায়ের জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছে ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে, তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

সুরা– নাহাল–১৪

وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط (البقرة : ٢١٧) -

"(পবিত্র মাসগুলোতে যুদ্ধকরা অবশ্যই হেরেম শরীফের অবমাননার শামিল) কিন্তু হেরেমের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে তাড়ানো ও বের করা আল্লাহর কাছে আরো সাংঘাতিক জিনিস। বস্তুতঃ হত্যার চেয়েও অরাজকতা মারাত্মক।" আলবাকরা–২৭

(২) জোর জবরদস্তির সাথে সত্যকে দাবানো ও সত্য গ্রহণ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়াঃ

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ط (يونس : ٨٣)

"মুছা (আঃ এর উপর তাঁর জাতির একাট ক্ষুদ্র শ্রেণী ছাড়া আর কেউ ঈমান আনেনি। কেননা তাদের আশংকা ছিল, ফেরআউন ও তার পান্ডারা হয়তো তাদের ওপর জোর জুলুম চালাবে।" সুরা–ইউনুস–৯

(৩) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা––পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি এর ব্যাখ্যা করে এসেছি, সুরা আনফালের এক স্থানে অবিশ্বাসীদের একটি অপরাধ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। অতঃপর তারা পরাজিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সব শেষে তাদের এই অপরাধকে 'ফেৎনা' রূপে অভিহিত করে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়াত কয়টি লক্ষণীয়ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

"কাফেররা আল্লাহর পথ অবরুদ্ধ করার জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে।"

فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ

"তারা ব্যয় করতে করতে এক সময়ে ভীষণ অনুশোচনায় পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হবে।"

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"ফেৎনা ও অরাজকতা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।"

(৪) লোকদের বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা এবং সত্যের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ধোকা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বলপ্রয়োগের চেষ্টা করাঃ

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ

عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۝ (بنی اسرائیل : ٧٣)

"তারা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল যে, তোমাকে প্রলোভন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আমার নাজিলকৃত ওহি থেকে ফিরিয়ে নেবে––যাতে তুমি সেটা ছেড়ে দিয়ে আমার সম্বন্ধে অপপ্রচারণায় লিপ্ত হও। তুমি এতে সম্মত হলে তারা তোমাকে বন্ধু করে নিত।" (সুরা বণি ঈসরাইল–৮)

وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ (المائده : ٤٩-٥٠)

"সাবধান, যেন তারা আমার নাজিল করা ওহির কিছু অংশ থেকেও তোমাকে ফেরাতে না পারে! ···তবে কি তারা জাহেলিয়াতের শাসন ব্যবস্থা চায়?" (মায়েদা–৭)

(৫) অসত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা এবং অসৎ ও অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হত্যা, রক্তপাত করা ও জোটবদ্ধ হওয়া।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا
وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (الاحزاب: ١٤)

"(খন্দক যুদ্ধের সময়) মদিনার চতুর্দিক থেকে যদি শত্রুরা ঢুকে পড়তো এবং এই মোনাফেকদেরকে যদি তখন ফেৎনায় অংশ নিতে বলা হতো তা হলে তারা অবশ্যই তাতে অংশ নিত এবং তাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হতানা।" (সূরা আহজাব–২)

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا
قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا (النساء: ٩١)

"তুমি এই মোনাফেকদের দলে এমন কিছু লোকও পাবে যারা তোমাদের সাথেও শান্তিতে থাকতে চায়। নিজের সম্প্রদায়ের সাথেও থাকতে চায়। কিন্তু যখন ফেৎনার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তখন তাতে নির্দ্বিধায় শামিল হয়ে যায়।" (সূরা নিসা–১২)

(৬) ইসলামের অনুসারীদের ওপর বাতিল পন্থীদের প্রতাপ ও জোর জুলুমঃ

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

"তোমরা যদি (ইসলামের অনুসারীদের সাহায্য) না কর, তাহলে পৃথিবীতে ভয়াবহ অরাজকতা ও বিপর্যয় দেখা দেবে। (অর্থাৎ বতিল পরাক্রান্ত হয়ে যাবে এবং ইসলামপন্থীদের ওপর জোর জুলুম চালাবে।)

(সুরা আনফাল–১০)

ফাসাদের তাৎপর্য

পবিত্র কোরআনে 'ফাসাদ' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবার তাই দেখাযাক।

অভিধানে 'ফাসাদ' বলা হয় কোন কিছুর মধ্যম পন্থার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াকে। তাই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ন্যায় নীতি ও মধ্যমপন্থার

পরিপন্থী এবং গঠনমূলক নয়–এমন যে কোন কাজই 'ফাসাদ' এর শামিল। তবে পবিত্র কোরআনে সাধারণভাবে ফাসাদ বলে বুঝানো হয়েছে সামাজিক চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকৃতিকে। উদাহরণ স্বরূপ কোরআন ফেরআউন, আ'দ ও সামুদকে ফাসাদের জন্য নিম্নরূপ দোষারোপ করেছেঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝ (الفجر: ٦ تا ١٢)

"এরকমের সেই নজিরহীন আদজাতি, উপত্যকায় পাথর দিয়ে গৃহ নির্মাণকারী সামুদ জাতি এবং সমর সজ্জিত ফেরআউনের সাথে তোমার প্রভু কিরূপ ব্যবহার করেছেন তা দেখনি, তারা দেশে দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে এবং ব্যাপক ফাসাদ বিস্তার করেছে। ফলে তোমার প্রভু তাদের ওপর আজাবের কোড়া বর্ষণ করেন।" (সুরা ফজর–১)

কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের সেই ফাসাদ নামক অপরাধের নিম্নরূপ বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছেঃ

(১) ফেরআউন ছিল ক্ষমতাদর্পী। প্রজাদের মধ্যে সে শ্রেণী ও বর্ণগত বিভেদ সৃষ্টি করতো এবং স্বৈরাচারী শাসন চালাতো। দুর্বলদের অন্যায় ভাবে হত্যা করতো ও তাদের সম্পদ লুট করতোঃ

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ (القصص: ٤)

"ফেরআউন ক্ষমতায় মত্ত হয়ে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। এক শ্রেণীকে দুর্বল করে দিয়ে তাদের সন্তান সন্ততীকে জবাই করতো এবং তাদের স্ত্রীদেরকে জীবিত রেখে দিত। সে সত্যই বিপর্যয় সৃষ্টি কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (সুরা–কাসাস–১)

সে সত্য ইসলাম গ্রহণ করা থেকে লোকদেরে জোর–জবরদস্তি ফিরিয়ে রাখতো। হযরত মূসার (আঃ) অলৌকিক কীর্তি দেখে যখন যাদুকররা মুসলমান হলো তখন সে বললোঃ

آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا
وَأَبْقَىٰ-

"আশ্চার্য্য, আমি অনুমতি না দিতেই তোমরা ওর ওপর ঈমান আন্‌লে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের গুরু। সে–ই তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। এখন আমি বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত পা কাটাবো এবং তোমাদেরকে খেজরের গাছের ওপর শুলে চড়াবো। দেখে নিও, কার আজাব কঠিনতর ও বেশী দীর্ঘস্থায়ী।" (সুরা–তোয়াহা)

সে একটি সম্প্রদায়কে দুর্বল পেয়ে তাদেরকে দাস শ্রেণীভুক্ত করে। সে যখন হযতর মুসাকে নিজের উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তখন তিনি জবাবদেনঃ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ-

"তুমি যে অনুগ্রহের খোটা দিচ্ছ, তাহলো এই যে, বনী ইসরাইলকে দাস বানিয়ে নিয়েছ।" (সুরা– সোয়ারা)

সে ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে তারই মত মানুষের খোদা হয়ে বসেছিল এবং শুধুমাত্র বস্তুগত শক্তির জোরে রাজত্ব করতো। অথচ শক্তি হলো, ন্যায় বিচার ইনসাফ ও খোদাভীতির শক্তি।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي
.... وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا
أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ○ (القصص: ٣٨-٣٩)-

"ফেরআউন বললো, হে দেশবাসী, আমি নিজে ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদা আছে বলে তো জানিনা। ... সে ও তার সেনাদল পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়াতো। তারা ভাবতো যেন আমার কাছে তাদের আর ফিরে আসতে হবে না।"

সে তার প্রজাদের মানসিকতা ও নৈতিকতার বিকৃতি ঘটিয়ে এত হীন ও নীচ করে দিয়েছিল যে, তারা তার দাসসুলভ আনুগত্য পোষনে সম্মত হয়েও গিয়েছিল।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ

"সে তার জাতিকে নীচাশয় বানিয়ে দিয়েছিল। ফলে তারা তার আনুগত্য করেছিল। সত্যই তারা ছিল একটা পাপিষ্ঠ জাতি।

তার সরকারের ভিত্তিই ছিল অবৈধ ও ভ্রান্ত কালাকানুন সমূহঃ

فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ج وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝

"তারা ফেরআউনের আদেশ মেনে চলতো। অথচ ফেরআউনের আদেশ ন্যায় সঙ্গত ছিল না।"

(২) অনুরূপভাবে ফা'সাদ ব্যাপৃতকারী নামে অভিহিত আদ জাতির একটা অপরাধ এই যে, তারা সেচ্ছাচারী ও অহংকারি শাসকদের আদেশ মেনে চলতোঃ

وَاتَّبَعُوْا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝ (هود : ٥٩)

"তারা স্বৈরাচারী ও হটকারী মাত্রেরই অনুকরণ করতো।"

তারা জালেম ও হটকারী ছিল। ন্যায়বিচার ও ইনসাফের সাথে তাদের কোন সংস্রব ছিল না। হজরত হুদ আলাইহিস সালাম তাদের এই দোষটির নিম্মরূপ সমালোচনা করেন।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

"তোমরা যার উপরেই হস্তক্ষেপ কর, হটকারিতার সঙ্গেই কর।"

তারা ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে দুর্বল জাতি সমূহের ওপর অত্যাচার চালাতোঃ

فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا

قُوَّةً ط (حٰم سجده: ١٥)

"তারা পৃথিবীতে অবৈধ পন্থায় পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং বলতে থাকে যে, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আবার কে?"

(৩) সামুদ জাতির 'ফাসাদ' মূলক কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা কোরআনে এই দেয়া হয়েছে যে, তাদের গোত্রপতি ও শাসকরা জালেম ও পাপিষ্ঠ ছিল এবং তারা সেই জালিমদেরই অনুসরণ করতো। হজরত সালেহ (আঃ) তাদের উপদেশদিতেনঃ

وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ

وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝ (الشعراء: ١٥١-١٥٢)

"তোমরা এই সব সীমা লংঘনকারীদের কথামত চলোনা যারা পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়ায় এবং গঠনমূলক কাজ করেনা।"

তারা এমন হটকারী চরিত্রের লোক ছিল যে, একজন মানুষ শুধুমাত্র তাদেরকে অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে এবং সৎকাজ করার উপদেশ দেয় এই কারণে তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারপর সেই জঘন্য অনাচারের জন্য মিথ্যা ও দুরভিসন্ধির নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বনেও কুণ্ঠা বোধ করেনা।ঃ

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ

وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ

لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

"সেই শহরে নয়জন দলপতি ছিল। তারা পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যপৃত করতো এবং গঠনমূলক কাজ করতো না। তারা পরস্পরে বলাবলি করতোঃ এসো, আমরা শপথ করি যে, রাতে আকস্মিকভাবে ছালেহ (আঃ) এর বাড়ীর ওপর আক্রমণ চালাবো এবং (তাকে হত্যা করে ফেলবো।) পরে তার খুনের দাবীদারদের বলবো যে, আমরা ছালেহ ও তার পরিবার পরিজনের হত্যা সম্পর্কে কিছুই জানিনা। আমরা সত্যই বলছি।"

(৪) পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আঃ)–এর জাতিকে ‘ফাসাদ’ ব্যাপৃতকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের ‘ফাসাদ’ মূলক কাজের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করা হয়েছেঃ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ
وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ط (عنكبوت : ٢٨-٢٩)

“তোমরা এমন অশ্লীলতা করছ যা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। কি আশ্চর্য; তোমরা পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর, রাহাজানি কর এবং প্রকাশ্য সভা–সমিতির মধ্যে অশ্লীল কাজ কর।” (সুরা আন কাবুত –রুকু–৩)

বস্তুতঃ লুত (আঃ) এর জাতির কৃত্রিম যৌনতা, বাণিজ্যিক সড়কের ওপর ডাকাতি এবং সামাজিক চরিত্রের এমন বিকৃতি ঘটা যে প্রকাশ্যে অনাচারে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কেউ তাতে বাধা দেয় না।–এ কয়টি জিনিসকেই একত্রে ‘ফাসাদ’বলাহয়েছে।

(৫) মাদায়েনের লোকদেরকেও ফাসাদ ব্যাপৃত করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। হজরত শোয়াইব (আঃ) তাদেরকে নিম্নরূপ উপদেশ দেন ঃ

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ
وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُونَهَا

عِوَجًا ج (اعراف : ٨٥-٨٦)

“মাপ ও ওজন ঠিকমত দাও। লোকদের কেনা জিনিস কম দিওনা। পৃথিবীতে শান্তি–শৃংখলা স্থাপিত হওয়ার পর আর তাতে ফাসাদ ব্যাপৃত করোনা। তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে এটাই উত্তম কর্মপন্থা। আর চলাচলের পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করো না এবং যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে

আল্লাহর পথ থেকে ঠেকানো ও তাদেরকে বক্রতার দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করো না।” (সুরা আরাফ–১১)

হজরত শোয়াইব (আঃ) যখন তাদেরকে সৎপথে চলার উপদেশ দিলেন তখন তারা বললো। ঃ

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۝ (هود: ٩١)

“যদি তোমার দলবল না থাকতো তা হলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে, মেরে ফেলতাম। তুমি আমাদের ওপর ক্ষমতাশালী নও।”

(সুরাহ হুদ –৮)

এ থেকে জানা যাচেছ যে, মাদায়েনবাসীর ক্ষেত্রে ফাসাদ ছিল তাদের সর্বব্যাপী অবিশ্বস্ততা, বাণিজ্যিক কায়কারবারে বেইমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা। তারা বণিজ্যিক চলাচলের পথে ডাকাতি রাহাজানি ও ছিনতাই করে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্ঠি করতো। ঈমানদারকে ন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতো। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিহিংসা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, একজন পুণ্যবান মানুষ যখন তাদের অন্যায় ক্রিয়া–কলাপের সমালোচনা করলো এবং পুণ্যের দিকে দাওয়াত দিল, তখন তারা তার অস্তিত্ব পর্যন্ত বরদাশ্‌ত করতে রাজী হলো না এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

(৬) চুরিকেও ‘ফাসাদ’ এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হজরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের ওপর যখন পানপাত্র চুরির অভিযোগ আরোপ করা হয় তখন তারা বলে ঃ

تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝ (يوسف: ٧٣)

“আল্লাহর কছম, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমরা ফাসাদ ব্যাপৃত করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই” (সুরাহ ইউসুফ–৯)

(৭) রাজ রাজড়াদের পররাজ্য গ্রাসের দরুন যে বিপর্যয় আসে এবং তার প্রভাবে বিজিত জাতিগুলোর চরিত্রে যে হীনতা ও নীচাশয়তার জন্ম হয় তাকেও ফাসাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। হজরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের চিঠি পেয়ে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকিস তার উপদেষ্টাদের বলেন!

الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ
وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ (النمل: ٣٤)

"রাজারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে ফাসাদে ভরে তোলে। এটা তাদের চিরাচরিত স্বভাব।" (সুরা নহল–৩)

(৮) পবিত্র কোরআনে ফাসাদের একটা ব্যাপক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যে সব সামাজিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তা মানব সভ্যতার ভিত্তি, সেগুলো নষ্ট করা ফাসাদের শামিল। সুরা রা'দ –এ বলা হয়েছে।

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ (الرعد: ٢٥)

"আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর যারা তা ভেঙে দেয় এবং আল্লাহ যে সব সম্পর্ক –সম্বন্ধ দৃঢ় কারার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করে, তাদের ওপরই আল্লাহর অভিশাপ এবং তাদের জন্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা রয়েছে।" (সুরা রা'দ–৩)

সাধারণ তফসিরকারগণ এখানে 'সম্পর্ক ছিন্ন করা'কে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা একে শুধু আত্মীয়তা ছিন্ন করার অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে মানব সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পক্ষে যে সমস্ত সম্পর্ক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে সেই সমস্তগুলিকেই বুঝানো হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক, স্বামী–স্ত্রী সম্পর্ক, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সম্পর্ক, বাণিজ্যিক লেন দেন ও কায়কারবারের সম্পর্ক, চুক্তি অঙ্গীকার ও পারস্পরিক বিশ্বস্ততার সম্পর্ক, বিভিন্ন দেশ ও সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সবই এর অন্তর্ভূক্ত। কেননা এ সব সম্পর্কই মানব –সভ্যতার ভিত্তি।

পৃথিবীর সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা এ সব সম্পর্ক–সম্পদের সুষম ও সুচারুরূপে চালু থাকা ও টিকে থাকার ওপরই নির্ভরশীল। এগুলোকে বিনষ্ট করে দেওয়ার ফলেই পৃথিবীতে যুদ্ধ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। এ জন্য আল্লাহ

এগুলোর নষ্ট করাকেই ফাসাদ নামে অভিহিত করেছেন এবং এর জন্য অভিশাপেরহুসিয়ারী দিয়েছেন।

(৯) যে শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরিবর্তে জুলুম, অবিচার ও লুটতরাজ চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকেও ফাসাদ, নামে অভিহিত করা হয়েছে।

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○ (البقره : ٢٠٥)

"সে যখন শাসকের আসনে বসে তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করতে সচেষ্ঠ হয় এবং ফসল ও প্রাণী কুলকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয় অথচ আল্লাহ ফাসাদ ভালো বাসেননা।" (সুরাহ বাকারাহ-২৫)

(১০) صد عن سبيل الله তথা, আল্লাহর পথ অবরোধ করাকেও ফাসাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে৷ এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে 'ফেৎনা' প্রসঙ্গে করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা নাহ্‌লে বলেন ঃ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ

عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ○ (النحل : ٨٨)

"যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহর পথ অবরোধ করে চলেছে, তাদের উপর আমি আজাবের ওপর আজাব নাজিল করবো। কেননা তারা ফাসাদ ব্যাপৃত করতো।" (সুরা নহল-১২)

(১১) সূরা মায়েদায় যে সব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করে وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا এবং যাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ এ সব ফাসাদ ব্যাপৃতকারীকে ভালোবাসে না। وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ বর্ণিতহয়েছে।

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ

أَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ الآية (المائده : ٦٢)

"তুমি তাদের বেশীর ভাগ লোককেই দেখতে পাবে। পাপাচার, সীমালংঘন ও অবৈধ সম্পদ খাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে।"

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۔ (المائدہ: ٦٤)

"আমি কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তাদের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার বীজ বপন করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে, আমি তা নিভিয়েছি।" (সূরাহ মায়েদা–৯)

এ থেকে বুঝা গেল যে, اثم। (পাপাচার) যা মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রকে ধ্বংস করে, عدوان (সীমালংঘন) যার খারাপ প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ে এবং اكل سحت। (অবৈধ সম্পদ গ্রহন) অর্থাৎ ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি অবৈধ কারবার দ্বারা মানুষের সম্পদ নেয়া এবং হীন স্বার্থের খাতিরে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার বীজ লালন করা ও যুদ্ধের আগুণ জ্বালানো –এ সবই ফাসাদেরশামিল।

ফেৎনা ও ফাসাদ নির্মূলকরণে ইসলামী রাষ্ট্রের আবশ্যকতা

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে কোরআন কথিত ফেৎনা ও ফাসাদের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে গেল। এবার যদি ফেৎনা ও ফাসাদ নামে অভিহিত অপরাধমূলক কাজ গুলোর ওপর একটা নজর বুলানো হয় তা হলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, একটা খোদাদ্রোহী ও অসদাচারী সরকারই ঐ সবগুলোর উৎস। কোন বিশেষ অপরাধের সৃষ্টির ব্যাপারে হয়তো সেই সরকার সরাসবি দায়ী নাও হতে পারে। কিন্তু সেই অপরাধ যে টিকে আছে এবং সংশোধন হচ্ছে না সেটা এ জন্যই যে, ঐ সরকার বাতিল ও অন্যায়ের পোষকতা দিয়ে যাচ্ছে এ ধরনের সরকার নিজেই একটা ফেৎনা। একটা অবাঞ্ছিত অনাসৃষ্টি ও বিড়ম্বনা। কেননা সরকার যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়ে থাকে, এর অস্তিত্ব তার পরিপন্থী। তার খারাপ প্রভাব কোন একটি দিকে সীমিত থাকেনা। বরং সে হয়ে ওঠে সকল খারাপ কাজের ও অমঙ্গলের উৎস। ফেৎনা ও ফাসাদের সকল শাখা

প্রশাখার বিস্তার ঘটে এই বিষবৃক্ষ থেকেই। আল্লাহর পথ অবরোধের মত জঘন্য কাজের আসকারা এই সরকার থেকেই আসে। সত্য ও ন্যায়ের উৎখাত ও উচ্ছেদের কাজও চলে এরই তত্ত্বাবধানে। পাপী ও জালেমরা যাবতীয় অপকর্মের উৎসাহ পায় এর কাছ থেকেই। এরই উদ্যোগে চালু হয় চরিত্র ধ্বংসকারী এবং সামাজিক ন্যায়বিচার খতমকারী কালাকানুন। এরূপ সরকারই মানবজাতির মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের বীজ বোনে। পৃথিবীতে যুদ্ধ ও নারকীয় হিংস্রতার আগুন জ্বালে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নেমে আসে প্রতিহিংসার অভিশপ্ত ও ধ্বংসের বিভীষিকা। মোট কথা, এই সরকারই একমাত্র বস্তু যার শক্তি কোন না কোন প্রকারে প্রত্যেক অন্যায় ও পাপাচারের উপলক্ষ বা তার প্রতিষ্ঠা ও স্থীতির কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং ইসলাম যাবতীয় অন্যায় ও অসততার নির্মূল ও প্রতিহত করার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থার সুপারিশ করেছে। সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম (জেহাদ) দ্বারা এবং প্রয়োজন হলে ও সম্ভব হলে সশস্ত্র সংগ্রাম (কেতাল) দ্বারা এবং এ ধরনের অসত্যাশ্রয়ী সমস্ত সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎখাত করতে হবে। অতঃপর তার স্থলে আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে সেই ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে হবে –যা কোন ব্যক্তি,গোষ্ঠী, শ্রেণী ও জাতিগত স্বার্থের তল্পীবাহক হবে না। বরং তা হবে সত্যিকার মানবতার স্বার্থরক্ষক, সেবক ও কল্যাণকামী। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হবে সত্য ও ন্যায়ের বিকাশ সাধন এবং অন্যায় ও অসত্যের উৎপাটন। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্মী হবে কেবল সেই সব পূণ্যবান মানুষ যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ প্রতিরোধ (আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার) কে নিজ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং অহংকার ও বড়াই জাহির করার জন্য নয় বরং মানবতার কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনের জন্য সরকারী গদী দখল করে।

পাঠক কোরআনের পাতা ওল্টালে দেখতে পাবেন, তার স্থানে স্থানে জালেম, স্বৈরাচারীর ও হটকারীদের কর্তৃত্ব মানতে নিষেধ করা হয়েছে। মানুষকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যেন বাতিলের অনুকরণ এবং স্বৈরাচারী ও হটকারীদের আনুগত্য করে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ না করে। কোথাও নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

لَا تُطِيْعُوْآ اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ

وَلَا يُصْلِحُوْنَ ٥ (الشعرا: ١٥١-١٥٢)

"সেই সব উচ্ছৃংখল লোকের আনুগত্য করোনা যারা পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করে, সংশোধনমূলক কাজ করে না।" (সুরাহ শোয়ারা–৮)

কোথাও এরশাদ হয়েছেঃ

لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ

كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ٥ (كهف: ٢٨)

"যার মনকে আমি আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি, যে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার আদেশ বাড়াবাড়িরই নামান্তর, তার আনুগত্য করো না।" (সূরাহ কাহাফ–৪)

কোথাও বা স্বৈরাচারীর আনুগত্যকেই একটি জাতির ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاتَّبَعُوْآ اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ٥ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ ط (هود: ٥٩-٦٠)

"তারা প্রত্যেক হঠকারী খোদাদ্রোহীর কথা মেনে চলতো। এ জন্য এ দুনিয়াতেও তাদের ওপর অভিশাপ পড়েছে। কেয়ামতের দিনও পড়বে" (সূরাহ–হুদ ৫)

কোথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, একটি দেশ তখনই ধ্বংস হয় যখন তার শাসন ক্ষমতা ও সম্পদের কর্তৃত্ব খারাপ লোকদের হাতে চলে যায়।

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا

فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ٥ (بنى اسرائيل: ١٦)-

"আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার ধনাঢ্য লোকদেরকে (ভালো কাজের) নির্দেশ দেই। কিন্তু তারা নাফরমানী করে। তখন সেই জনপদ শাস্তির যোগ্য হয় এবং আমি তা বিধবস্ত করে দেই।"

(বনি ইসরাইল ২)

এর কারণ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। সমাজ জীবনের যতগুলো উপাদনে মানুষের নৈতিকতা ও কৃষ্টির ওপর সর্বাপেক্ষা গভীর প্রভাব বিস্তার করে, তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর উপাদান হলো সরকার। সরকারের শাসন পদ্ধতি যদি খারাপ ও ভ্রান্ত হয় এবং তার বাগডোর যদি জনসেবা ও গঠন মূলক কাজে উদ্বুদ্ধ লোকদের পরিবর্তে আত্মসেবা ও ধ্বংসাত্মক কাজে শাসনক্ষমতা প্রয়োগকারী লোকদের হাতে চলে যায় তা হলে সে অবস্থায় পুণ্যকর্মের বিকাশ, সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মসূচীর সাফল্য এবং নৈতিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন সহজসাধ্য থাকে না। কেননা সেই সরকার স্বভাবতই অন্যায় ও অসৎকাজের পৃষ্ঠপোষক হয়ে থাকে। সে সরকার শুধু নিজেই অসৎকর্মশীল হয় না, বরং তার সমস্ত ক্ষমতা সর্বক্ষণ যাবতীয় গর্হিত ও নৈতিকতা বিবর্জিত কাজের সহায়তায় নিয়জিত থাকে। পক্ষান্তরে সরকার যদি একটি সুষ্ঠু, সুষম ও ন্যায় সঙ্গত শাসনতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তার লক্ষ্য যদি ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সে সরকারের পরিচালকেরা যদি হয় ন্যায় নিষ্ঠ ও পরহেজগার লোক, এমন ন্যায়নিষ্ঠ যে নিজের ক্ষমতাকে তারা সংকীর্ণ ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত বা জাতিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নয় বরং বৃহত্তর মানবতার কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত প্রয়োগ করে, তা হলে তার গঠনমুলক ও সংশোধনমূলক শক্তির প্রভাব শুধু সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের এলাকায়ই সীমিত থাকবে না, বরং সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল বিভাগ তার সুফল সমুহ গ্রহণ করবে। ধর্ম, অর্থনীতি,সমাজ ব্যবস্থা, চরিত্র ও মানসিকতা সভ্যতা ও কৃষ্টি জ্ঞান–বিজ্ঞান ও শিল্পকলা মোটকথা, সকল বিভাগেই সংস্কার প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হবে। এতে করে পাপাচার শুধু বন্ধই হবে না, বরং তার উৎসও শুকিয়ে যাবে। সুতরাং বাস্তবিকপক্ষে ফেৎনা ও ফাসাদ নির্মূল করা ও মানব জীবনকে 'মুনকার' তথা অন্যায় অসত্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র করার সব চেয়ে ফলপ্রসূ ও সবচেয়ে অপরিহার্য কর্মপন্থা হলো, বাতিলের পোষকতাদানকারী অসাধু সরকার গুলোরই মূলেৎপাটন করা,

অতঃপর সেগুলোর স্থলে এমন সরকার প্রতিষ্ঠা করা যা চিন্তা ও কর্ম, আদর্শ ও নীতির উভয় দিক দিয়েই সততা ও ন্যায়পরায়নতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

সশস্ত্র সংগ্রাম قتال এর নির্দেশ

এটাই হলো সেই সুমহান ও পবিত্র লক্ষ্য যার জন্য আল্লাহ তার সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ বান্দাদেরকে অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথম লক্ষ্য ছিল,আপন অস্তিত্বকে বাচানো, আপন শক্তিকে নির্মূল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। আর দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো, সেই রক্ষিত শক্তি দিয়ে সারা পৃথিবী থেকে ফেৎনা ও ফাসাদ নির্মূল করতে হবে এবং ফাসাদ ও অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের ধ্বংসাত্মক শক্তি খর্ব করতঃ তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের অনুগত (অনুসারী যদি নাও হয়) বানাতে হবে। এই নির্দেশটি সংক্ষেপে নীচের আয়াতটিতে লক্ষণীয়।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝ (التوبہ : ٢٩)

"আসমানী কিতাবধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করেনা এবং আল্লাহ ও তার রসুল যে সব জিনিসকে হারাম করে দিয়েছেন তাকে হারাম মনে করেনা এবং এই সত্য দ্বীনকেও গ্রহণ করেনা–তাদের সাথে লড়াই কর যদি না তারা আপন হাত দিয়ে জিজিয়া দেয় এবং আনুগত্য স্বীকার করে।" (সূরাহ তওবা–৪)

এই আয়াতে যাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কিতাবধারী হলেও আখেরাত ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনেনি এবং আল্লাহ ও তার রসুল যে সব জিনিস নিষিদ্ধ করে নিয়েছেন তা থেকে বিরত ও সংযত থাকেনা আর তারা ইসলামকে গ্রহণ করে না। অপরাধ কয়টির এই ধারা বিন্যাস তাৎপর্যহীন নয়। এ নিয়ে একটু গবেষণা করলে সশস্ত্র সংগ্রামের আদেশের কারণ উপলব্ধি করা যায়। বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে আগেই কিতাব দিয়ে চিন্তা ও কর্মের

সুষ্ঠু পথ বাৎলিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য একটা নির্ভুল জীবন বিধান প্রনয়ণ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সেই সব আসমানী কিতাবকে আগ্রাহ্য ও বর্জন করে অতঃপর নিজেদের খেয়াল খুশী ও ধ্যান ধারনা অনুযায়ী নিজেরাই নিজেদের জন্য পৃথক পৃথক ধর্ম ও আইন তৈরী করে নেয়–যা সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী। এই বিকৃতি ও গোমরাহীর কারণে তাদের চিন্তা ধারা এমন ভাবে পাল্টে গেল যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি তাদের বিশ্বাস রইলনা। অপরদিকে তাদের কার্য ধারায়ও হলো আমূল পরিবর্তন। তাদের মধ্যে হালাল হারামের বাছ বিচার রইলনা। তারা ফেৎনা ও ফাসাদ (অরাজকতা ও বিশৃংখলা) ছড়াতে লাগলো। অথচ আল্লাহ ও তার রসূলগণ তাদেরকে এ সব করতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর যখন আল্লাহ তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন করে সেই সত্য দ্বীনকে হজরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর মাধ্যমে পাঠালেন–যা তারা হারিয়ে ফেলেছিল তখন তারা তা মানতে অস্বীকার করলো এবং পুরানো বিভ্রান্তিকে আকড়ে ধরে রইল। অথচ তারা এটা মেনে নিলে আবার একটি সুসংহত কিতাব, একটা সুষ্ঠু ও নির্ভুল ধর্ম এবং একটি সুষম বিধানের অনুগত হয়ে নিজেদের চিন্তা ও কর্মের পরিশুদ্ধির সুযোগ লাভ করতো এবং ফেৎনা ফাসাদের আর নাম নিশানাও থাকতো না। এখন যদি তারা ইসলামকে গ্রহণ না করে, তা হলে তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস ও আচার আচরণের ওপর অবিচল থাকুক সে অধিকার তাদের দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তারা যে তাদের মনগড়া বাতিল আইন চালু করে আল্লাহর পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করবে সে অধিকার তাদের দেওয়া যেতে পারেনা।

কেতাল বা শসস্ত্র সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

উল্লেখিত আয়াতে حتى يعطوا الجزية (যাবৎ না জিজিয়া দেয়)কথাটা বলে সশস্ত্র সংগ্রামের লক্ষ্য সুনিদিষ্ট ভাবে বলে দেয়া হয়েছে। যদি حتى يسلموا (যাবৎ না ইসলাম গ্রহণ করে) বলা হতো তা হলে এর অর্থ হতোঃ তাদেরকে তরবারীর ভয় দেখিয়ে মুসলমান বানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু حتى يعطوا الجزية দ্বারা বুঝা গেল। তাদের জিজিয়া দিতে রাজী হয়ে যাওয়া সশস্ত্র সংগ্রাম তথা কেতালের শেষ সীমা। এর পর তারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক,

তাদের প্রাণ ও সম্পত্তির ওপর কোন আক্রমণ চালানো যাবে না। বাদায়েউছ ছানায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

نهى سبحانه وتعالى اباحة القتال الى غاية قبول
الجزية واذا انتهت الاباحة تثبت العصمة ضرورة ـ (ج ص)"

"আল্লাহ তায়ালা জিজিয়া দিতে রাজী হওয়াকে কেতাল বা সশস্ত্র সংগ্রামের বৈধতার শেষ সীমা নির্ধারণ করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনের ফলে যখন বৈধতা শেষ হয়ে গেল তখন অত্যাবশ্যক ভাবেই জিজিয়া দানকারীদের প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত বলে সাব্যস্ত হলো।"

এ কারণেই জিম্মী (জিজিয়া ভিত্তিতে নাগরিকত্ব লাভকারী অমুসলিম) দের প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার বিধানের জন্য কঠোর আদেশ দেয়া হয়েছে। তাদের বাচানোর জন্য যুদ্ধ করা ও মুসলমানদের রক্তপাত ও প্রাণপাত পর্যন্ত করা অপরিহার্য। হজরত আলী (রাঃ) বলেন!

انما قبلوا عقد الذمة لتكون اموالهم كاموالنا
ودماؤهم كدمائنا ـ

"তারা জিজিয়া ভিত্তিক নাগরিকত্ব এ জন্যই গ্রহণ করেছে যেন তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মত এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মত সম্মান ও নিরাপত্তা লাভ করে।"

হজরত ওমর (রাঃ) বলেনঃ

اوصيه بذمة الله وذمة رسوله ان يوفى لهم
بعهدهم وان يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا الا طاقتهم

"আমি অছিয়ত করছি যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (জিজিয়ার বিনিময়ে) অমুসলিমদের যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা যেন লক্ষ্য রাখা হয়, তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি যেন পূর্ণ করা হয়, তাদের রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যেন যুদ্ধ করা হয় এবং তাদের ক্ষমতাবহির্ভূত কোন বোঝা যেন তাদের ওপর চাপানো না হয়।"

হুজরত রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অমুসলিমদের প্রাণের নিরাপত্তা সম্পর্কে কি রূপ কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তা নিম্নে লক্ষণীয় ঃ

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنّة وان ريحها لتوجد من مسيرة اربعين عامًا-

"যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিককে হত্যা করবে সে বেহেস্তের ঘ্রাণও পাবেনা। অথচ বেহেস্তের ঘ্রাণ ৪০ বছরের দুরত্ব পর্যন্ত পৌছে।"

এ রূপ ধারণা ঠিকনয় যে, জান মালের এই নিরাপত্তা বিধান শুধু মাত্র চুক্তি ও অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শণের জন্য। এ আদেশ সমস্ত জিম্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা ছাড়া জিম্মি হতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হতেই হবে এমন নয়। অনুসলিমরা যদি কোন চুক্তি বা শর্ত ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সরকার নিজেই তাদের জিম্মী ঘোষণা করেন তা হলেও তারা জিম্মী হবে এবং তাদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। মুসলিম ফকীহগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধ করে কোন দেশ জয় করার পর তার অধিবাসীদের সাথে কোন চুক্তি না হলেও তাদের জিম্মী বলেই ধরা হবে। মুসলমানদের নেতা তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করে তাদেরকে আল্লাহ ও রসুলের দায়িত্বের মধ্যে শামিল করে নেবেন। (বাদায়ে উছছানয়ে)

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, কেতাল বা সশস্ত্র সংগ্রামের এই আদেশ কোন ধর্মীয় প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে দেয়া হয়নি। তা না হলে আনুগত্য প্রকাশের আগে যাদের সাথে যুদ্ধ করা অপরীহার্য ছিল আনুগত্য প্রকাশ করতেই তাদের জান–মাল এত সম্মানের পাত্র হয়ে উঠতো না। অথচ আনুগত্য প্রকাশকারীদের উপরই ধর্মীয় প্রতিহিংসার ঝাল–ঝাড়া অধিকতর সহজ। অনুরূপ ভাবে এই সমস্ত্র সংগ্রামের আদেশের উদ্দেশ্য যে শুধু জিজিয়া আদায় করা হবে –এটাও দুর্বোধ্য ব্যাপার। বার্ষিক ক'টা টাকার বিনিময়ে এত বড় দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া যে তাদের রক্ষণা–বেক্ষণের জন্যে প্রয়োজন হলে প্রাণপন যুদ্ধ করতে হবে– এটা অর্থলিপসা চরিতার্থ করার ব্যাপারে হতে পারেনা। এটা বুদ্ধির অগম্য যে, একজন কাফের জিজিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তে

ও স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য–কাজ কারবার চালাবে, আরাম–আয়েশের সাথে পরিবার পরিজনের সাহচর্য–সুখ ভোগ করবে আর মুসলমান দেশের হেফাজতের জন্য রনাঙ্গনে গিয়ে কষ্ট করবে এবং প্রাণের ঝক্কি পোহাবে। অথচ তার এমন ক্ষমতা রয়েছে যে, ইচ্ছা করলেই সেই কাফেরের কাছ থেকে জিজিয়াও আদায় করতে পারে আবার তাকে দিয়ে যুদ্ধও করাতে পারে। জিজিয়া আদায় হলেই যুদ্ধ বা কেতালের বৈধতা শেষ হয়ে যায় এবং জিজিয়া গ্রহণ করার পর শান্তি ও ন্যায়–বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব জিজিয়া গ্রহণ কারীর ওপর বর্তে। এ বিধান থেকে সুস্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য তাদেরকে ফেৎনা ফাসাদ ও অরাজকতা বিশৃংখলা থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং শান্তি শৃংখলার অনুগত করা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের উপর জিজিয়ার নামে যে কর আরোপ করা হয় তার উদ্দেশ্য হলো তাদেরই প্রতি রক্ষার ব্যয়ে তাদের অংশ গ্রহণ করানো। এটা তাদের অব্যাহত আনুগত্যেরও প্রতীক।

জিজিয়ার তাৎপর্য

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া حتى يعطوا الجزية এর ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ والمراد باعطائها التزامها بالعقد অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হলো তাদের চুক্তির আনুগত্য অব্যাহত রাখা। সকল সরকারের আইনে যেমন কর দেয়া অব্যাহত রাখা সরকারের আনুগত্য ও আইন মান্য করার প্রতীক সরূপ এবং কর না দেয়া বিশ্বাস ঘাতকতা ও রাষ্টদ্রোহের নামান্তর। ঠিক তেমনিভাবে জিজিয়া দেয়া অব্যাহত রাখাও চুক্তি মান্য করার প্রমাণ এবং না দেয়া চুক্তি ভঙ্গ করার শামিল। এ জন্যই জিজিয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করার উপযুক্ত পুরুষদের ওপর আরোপ করা হয়েছে। নারী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, পাগল, অক্ষম বৃদ্ধ, অন্ধ, পংগু প্রভৃতির জিজিয়া দিতে হয় না। বাদায়েউছ ছানায়ে গ্রন্থে আছেঃ

لان الله سبحانه وتعالى اوجب الجزية على من هو
من اهل القتال لقوله تعالى قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الآية والمقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعى
اهلية القتال من الجانبين فلا تجب على من ليس من اهل القتال

"আল্লাহ তায়ালা জিজিয়া আরোপ করেছেন শুধু মাত্র যুদ্ধ করার উপযুক্ত লোকটির উপর। قاتلوا الذين কথাটার মধ্যে قاتلوا শব্দটি দ্বারা এটাই বোঝা যায়। কেননা مقاتله বা যুদ্ধ করার জন্য উভয় পক্ষের যুদ্ধ করার উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যাদের মধ্যে এ যোগ্যতা নেই তারা কেতাল এবং জিজিয়া উভয়টি থেকেই অব্যহতি পাবে।"

عن يد শব্দটি এই বিষয়েরই ব্যাখ্যা। يد বলতে এখানে শুধু হাতই বুঝায়নি, বরং আসলে এটি আনুগত্য ও বশ্যতার ইংগীতবহ। আরবীতে اعطى فلان بيده اذا (সে হাত দিয়ে দিয়েছে) বললে তার অর্থ হয় সে আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করেছে। সুতরাং حتى يعطوا الجزية عن يد অর্থ হলো তারা আনুগত্য স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে জিজিয়া দেবে। তাদের মধ্যে যদি এতটুকু আইনানুগতা ও শান্তি প্রিয়তা না জন্মে যে,অত্যাবশ্যক কর স্বেচ্ছায় দিয়ে দেবে, বরং সেজন্য তাকে বাধ্য করতে সব সময় তরবারী প্রয়োগ করতে হয় তা হলে জিজিয়া দেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য আইন শৃংখলার প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হয় না এবং নাগরিকত্বের চুক্তিও বহাল থাকতে পারেনা। কেননা এ জন্য আনুগত্য ও বশ্যতা অপরিহার্য্য পূর্বশর্ত।

জিজিয়ার টাকার পরিমাণ এত কম নির্ধারণ করা হয়েছে যে তা দেয়া যেন কষ্টকর না হয়। জিজিয়া আদায় করার সময় নম্র ও উদার আচরণ করতে বলা হয়েছে। জেল জুলুম ও অসহনীয় কোন বোঝা চাপানো বৈধ রাখা হয়নি। এ ব্যাপারে কঠোর তাগিদ সহকারে বহু রেওয়ায়েত ও আদেশ বর্নিত হয়েছে। একবার হজরত ওমরের নিকট বিপুল পরিমাণ জিজিয়ার টাকা আনা হলো। হজরত ওমরের কাছে টাকার পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেশী মনে হওয়ায় বললেন! "মনে হচ্ছে তোমরা লোক জনকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে এসেছ।"

কর আদায়কারীরা জবাব দিলেন, "আল্লাহর কছম, আমরা খুব নম্রতার সাথে আদায় করেছি। হযরত ওমর আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ بلا سوط ولا نوط "বেঁধে বা পিটিয়ে নয় তো"? তারা বললো "জ্বি না, বেধে বা পিটিয়ে নয়।" তখন তিনি সেই টাকা বায়তুলমালে দাখিল করার অনুমতি দিলেন। একবার হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে উকবুরার কর -খাজনা আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করার সময় উপদেশ দিলেন যে, "কর, খাজনা

আদায় করার সময় তাদের ওপর এমন কঠোরতা প্রয়োগ করো না যে তারা তাদের গাধা, গরু, কাপড় বা অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাদের সাথে নরম ব্যবহার করো।" হজরত হাকিম ইবনে হাজ্জাম ফিলিস্তিনের কিছু লোককে দেখলেন, কড়াকড়ি করে কর খাজনা আদায় করছে। তিনি তাদের কড়াকড়ি করতে নিষেধ করলেন এবং বললেনঃ আমি হজরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, "যারা দুনিয়াতে মানুষকে আজাব দিবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের আজাব দেবেন।"

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অমুসলিমদের উপর যে জিজিয়া আরোপ করা হয় তা মূলতঃ কোন শাস্তি নয় বরং তার উদ্দেশ্য অমুসলিম নাগরিকদেরকে আইন শৃংখলার অনুগত বানানো। এতে করে তারা স্বেচ্ছায় ন্যায়নীতি ভিত্তিক আইনের আনুগত্য করার সুযোগ পাবে। আর যে সরকার তাদেরকে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ দিচ্ছে জুলুম ও আগ্রাসন থেকে নিরাপদ রাখছে, ইনসাফের সাথে অধিকার বন্টন করছে, শক্তিমানকে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখছে, দুর্বলদেরকে শক্তিমানদের দাসত্ব করা থেকে রক্ষা করছে এবং সমস্ত অহংকারী ও উচ্ছৃখল লোকদেরকে নৈতিকতা ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলছে তার ব্যায়ভার নির্বাহে তারা সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করতে পারবে।

وهم صاغرون কথাটি এ বিষয়ের ওপর আরো তীর্যকভাবে আলোকপাত করছে। ইবনে কাইয়েম বলেছেনঃ

الصغار هو التزامهم بجريان احكام الله تعالىٰ عليهم

واعطاء الجزية هو الصغار-

"এই আয়াতে صغار বা বশ্যতা স্বীকার করার অর্থ আল্লাহর আইন অনুসারে নিজেদের প্রতি নির্দেশ জারী করার সম্মত হওয়া এবং আল্লাহর ন্যায়ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এই আনুগত্যের চিহ্ন স্বরূপ তাদের জিজিয়া প্রদানই صغار বা বশ্যতা।"

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও তার স্বার্থকতা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, صاغرون বা বাধ্য ও অনুগত হওয়ার অর্থ হলো কাফেরদের আসল বাতিল আইন–কানুন

চালু করত অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হওয়া। তাদের অন্যায় ও অপকর্ম করতে না পারা এবং খোদায়ী আইনের অধীন ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার অনুগত থাকা। قاتلوهم حتى لا تكون فتنة এই আয়াতে কিতালের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে বিশৃংখলা ও অরাজকতা নির্মূল করা। حتى تضع الحرب اوزارها এ আয়াতেও বলা হয়েছে যে, বাতিলপন্থী শক্তির যেন যুদ্ধ করার ক্ষমতা আর না থাকে। عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ আয়াতেও আল্লাহ তায়ালা একই বক্তব্য এভাবে রেখেছেন যে. শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা খর্ব করে দেবেন। অপর এক আয়াত–এ

جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا

যুদ্ধের স্বার্থকতা এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, "কাফেরদের আদর্শ যেন নীচু হয় আর আল্লাহর আদর্শ উচু হয়।" অতএব কেতাল বা শস্ত্র সংগ্রাম সংক্রান্ত আয়াতে صاغرون বা বশ্যতা স্বীকারের যে উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ হলো অরাজকতা ও বিশৃংখলা তথা ফেৎনা ফাসাদ নির্মূল হওয়া, বাতিল শক্তির সমর্থক ও সহযোগীদের যুদ্ধ করার শক্তি খর্ব হওয়া, কুচক্রী কুফরী শক্তির এতটা দুর্বল হয়ে যাওয়া যে তারা দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করতে না পারে এবং মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উন্নতিতে বাধা দিতে না পারে এবং কাফেরদের মনগড়া আইন কানুন বাতিল হয়ে যাওয়ায় ও তার জায়গায় আল্লাহর সেই ন্যায়সঙ্গত আইন চালু হওয়া বা মানব জাতির মধ্যে সব রকমের অমানুষিক বিভেদ নির্মূল করে দিয়ে শুধুমাত্র হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য করে এবং জালেম ব্যতীত সকলের জন্য শান্তি ও স্বাধীনতার সুসংবাদ দেয়।

বস্তুতঃ উল্লিখিত আয়াতে যে শস্ত্র সংগ্রামের আদেশ জারী হয়েছে– তার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া থেকে ফেৎনা ও ফাসাদ তথা অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির স্বাধীনতা হরণ করা এবং জীবনের সকল বিভাগে মানুষকে সত্যিকার মানবতার কল্যাণ সাধন করে–এমন স্বাধীনতা প্রদান করা। এমন স্বাধীনতা যা নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অযৌক্তিক বাধ্যবাধকতা ও অযৌক্তিক বল্গাহীনতা– উভয়টি থেকেই মুক্ত। ইসলামের তরবারী শুধু জুলুম ও হঠকারীতা এবং বিশৃংখা ও অরাজকতার বিরুদ্ধে উত্তোলিত হয়ে থাকে– তাই সে জুলুমের শিকার মুসলমান হোক কিংবা অমুসলমান হোক। কোন দল

বা গোষ্ঠী যতক্ষন এই ক্ষমতার এই অপপ্রয়োগ ত্যাগ না করবে ততক্ষণ ইসলাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকবে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে এই মহাপাপ ত্যাগ করবে এবং সত্য ও ন্যায় বিচারভিত্তিক আইনের আনুগত্য স্বীকার করবে সেই মুহূর্তেই তার রক্ত স্পর্শ করা হারাম হয়ে যাবে, তার জানমালের হেফাজত করা মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে এবং ইসলামের শান্তিপ্রিয় সরকারের অধীন তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। সে সমস্ত বৈধ পন্থায় নিজের ধনসম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্য, জ্ঞান বিজ্ঞান
ও সাহিত্য চর্চা, শিল্পকলা–মোটকথা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক ও বিভাগে সাধ্যমত উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে। মানবিক উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে যে সব উপায় উপকরণ প্রয়োজন, তা সে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে ইসলামের আইন জিম্মীদেরকে যে প্রশস্ত ও উদার স্বাধীনতা প্রদান করে দুনিয়ার কোন আইন কানুনে তার তুলনা নেই। বস্তুতঃ তার কোন তুলনা স্বভাবতঃই থাকতে পারেও না। কেননা ইসলামের আইন ও এসব মানবরচিত আইনের দৃষ্টিভংগিতে একটি মৌলিক পার্থক্য বিরাজমান। মানবরচিত আইন সাম্রজ্যবাদী নীতির ভিত্তিতে রচিত। এ আইনের দৃষ্টিতে শাসিত জাতি শাসক জাতির কেনা গোলাম সদৃশ। আর শাসকের জন্য শাসিতদের সম্পদ পৈতৃক সম্পত্তির মত বিবেচিত হয়ে থাকে। এ সম্পদ শাসকের ইচ্ছামত নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা এবং শাসিতকে তা থেকে বঞ্চিত রাখা তার স্বাভাবিক অধিকারের পর্যায়ভূক্ত। এ জন্য এ আইন সমূহ যতই উদারতার সাথে তৈরী ও চালু হোকনা কেন, কোন অবস্থাতেই শাসক দলের স্বার্থ শাসিতদের প্রকৃত স্বার্থের সাথে এক ও একাত্ম হতে পারেনা। দুর্বলের স্বার্থ অনিবার্যভাবেই সবলের স্বার্থের বেদীতে উৎসর্গীকৃত হয়ে থাকে। আধুনিক গণতন্ত্রে যদিও জাতীয় সংখ্যালঘুদেরকে (National minorities) নীতিগতভাবে শাসন ক্ষমতার অংশীদার বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু কার্যত দেশ শাসিত হয়ে থাকে একান্তভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দ্বারাই। সংখ্যালঘুকে হয় হত্যা ও লুটতরাজের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয় অথবা সর্বপ্রকারের চাপ ও বলপ্রয়োগ দ্বারা তাদের স্বাতন্ত্র বিলীন করে দিয়ে সংখ্যাগুরুর মধ্যে মিশে একাকার হয়ে যেতে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু ইসলামী আইনের অবস্থা এর সম্পুর্ণ বিপরীত। মানবতার কল্যাণের উচ্চ ও মহান লক্ষ্যই এ আইনের ভিত্তি। এতে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক সত্যিকার অর্থে সেবক ও সেবিতের সম্পর্কের মতই। শাসিতের প্রকৃত স্বার্থের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চেষ্টা করার মধ্যেই শাসকের স্বার্থ নিহিত। তাকে শাসনক্ষমতা দেয়ার উদ্দেশ্যই এই হয়ে থাকে যে, সে যেন সমাজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনের বিনাশক খারাপ উপাদানগুলো নির্মূল করতে সচেষ্ট হয় এবং মানবতার উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে সাহায্য করে এমন উত্তম গুণাবলীর বিকাশ, প্রচলন ও প্রসার ঘটাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সুতরাং ইসলামের শাসক শাসিতকে নৈতিক সীমা মেনে চলতে বাধ্য করার পর তাকে সর্বপ্রকারের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। নিজের অথবা নিজের অনুগত দল বা শ্রেণীর স্বার্থের জন্য কোন রকমের বাধ্যবাধকতা তার ওপর চাপিয়ে দেয় না। বরং তাকে একজন উন্নততর মানুষ হতে পূর্ণ সাহায্য করে।

ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদ

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, এ যুগে পাশ্চাত্যের কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী জাতি দাবী করেছে, তারা দুনিয়াতে সভ্যতা ও মানবতার উন্নতি সাধন, অধোপতিত জাতিগুলোর সংস্কার এবং শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু এটা নিছক তাদের মৌখিক দাবী। কার্যতঃ তারা দুর্বল জাতিগুলোর স্বাধীনতার ওপর দস্যুর মত হামলা চালায়। তারা সভ্যতা ও মানবতার উন্নতি সাধনের পরিবর্তে দুনিয়া থেকে মানবতা ও মানবিক মহত্বের সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্যকে একে একে উচ্ছেদ করে চলেছে। এসব দেখে জনমনে সন্দেহ জাগতে পারে যে, ইসলামের অবস্থাও এমনিতরো নয়তো যে, মুখে সংস্কারের লম্বা লম্বা বুলি আর হাতে ফেৎনা ও ফাসাদ ছড়ানোর তরবারী? পাশ্চত্য সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলামী সংস্কার যুদ্ধের বাহ্যিক আকৃতিগত সাদৃশ্য এই সন্দেহকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছে। ইসলামে বিশ্বজনীন সংস্কার ও শুদ্ধির সংগ্রাম যেমন কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট, তেমনি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরাও সভ্যতা ও কৃষ্টির বিশ্বজোড়া প্রসারের মিশনকে আপন আপন জাতির একক উত্তরাধিকার বলে মনে করে। অবশ্য পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো অভিনিবেশ সহকারে পড়লে এরূপ ভিত্তিহীন ধারণা পোষণের তেমন অবকাশ

থাকে না। কিন্তু যেটুকু থাকে, সেটুকুকে আরো খারাপ ধারণার সাথে মিশ্রিত হয়ে ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ দেয়ার চেয়ে জ্ঞান দ্বারা শূন্যতা পুরণের চেষ্টা করাই উত্তম।

সকলেই জানেন যে, সাম্রাজ্যবাদের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, তা একটি বিশেষ দেশ ও জাতির লোকদের দ্বারা গঠিত সরকারের নাম। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বৃটেনের অধিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট। জার্মান সাম্রাজ্যবাদে জার্মান জাতি ছাড়া আর কারো অংশ নেই। ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদে যা কিছু আছে সব ইটালীয় অধিবাসীদের। দুনিয়ার অন্যান্য জাতি যেমন বৃটিশ জার্মান বা ইটালীয় হয়ে যেতে পারেনা তেমনিভাবে এই জাতিগুলোর সাম্রাজ্যবাদেও অন্যদের অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। বৃটিশ জাতি 'সভ্যতা ও কৃষ্টি' প্রচারের নামে যেখানেই চলে যাক, বৃটিশ জাতীয়তা তার সাথে সাথে যাবেই। সিংহাসনে আরোহন করলে বৃটিশ নাগরিকই তা করবে। রাজনৈতিক দলপতি হলে বৃটিশই তা হবে, শাসনক্ষমতার অধিকারী হলে তাও হবে একজন বৃটিশ। অন্যান্য জাতি ও বর্ণের লোকেরা বৃটিশ সভ্যতায় যতই উন্নতি লাভ করুক বৃটিশ সাম্রাজ্য তার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা লাভ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্যান্য জাতির সাম্রাজ্যবাদেও একই কথা খাটে। এ ধরণের ব্যবস্থায় সরকার চালানোর অধিকার অনিবার্যভাবেই একটি বিশেষ দেশের ও বিশেষ বংশোদ্ভুত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। জানা কথা যে, বর্ণ, বংশ ও জাতীয়তা এমন জিনিস নয় যা কোন ব্যক্তি নিজেই গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ যাদেরকে কোন বিশেষ দেশে ও বিশেষ বংশে সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যেই ওটা সীমিত থাকতে বাধ্য। এ জন্য বিশ্বজনীন সাম্প্রসারণ বাদের এই ব্যবস্থার দুয়ার ভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন দেশের লোকদের জন্য সব সময়ই বন্ধ থাকে। এক জাতির সাম্রাজ্যে অন্য জাতির লোক ঠাঁই পায় না শুধুমাত্র এই কারণেই যে, সে শাসক জাতির বংশোদ্ভুত নহে। এরপর এখান থেকেই অন্যান্য খারাপ বৈশিষ্ট্যের জন্মের সূচনা হয়। শাসিত জাতি সামগ্রিকভাবে ও জাতিগতভাবে হীনমন্যতার শিকার হয়। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্ম–সম্মানবোধ অবশিষ্ট থাকে না। যদি শাসক জাতি জুলুম ও স্বৈরাচারের সাথে শাসন না চালায় তা হলেও শাসিতদের মধ্যে হীনতা ও নীচাশয়তার ত্রুটিসমূহ স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়ে যায়। দীর্ঘদিন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য অত্যন্ত

অনিবার্যভাবেই এরূপ মানসিকতার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তা উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ধ্বংসাত্মক।

পক্ষান্তরে ইসলাম কোন বিশেষ বর্ণ, বংশ, জাতি বা দেশের নাম নয়। ইসলাম হলো জীবন যাপনের একটা আইন ও বিধান। এর দুয়ার সকলের জন্য খোলা। আরব, অনারব, চীনা, ভারতীয়, ফিরিংগী, সকলেই এটা গ্রহণ করতে পারে এবং গ্রহণ করে নেয়ার পর সকলের অধিকার, এখতিয়ার ও পদ মর্যাদা তার সামষ্টিক ব্যবস্থায় সমান হয়ে দাঁড়ায়। কোন মানুষের বর্ণ কি, দেশ কোথায়, জাত কি–তা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। সে মানুষকে শুধুমাত্র মানুষ হিসেবেই সম্বোধন করে এবং তার সামনে জীবন যাপনের একটা পদ্ধতি ও মানব জীবন সংগঠনের একটা বিধান পেশ করে। এই বিধানকে সে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম বিধান বলে মনে করে। এই পদ্ধতি ও বিধানকে যে গ্রহণ করবে, সে ইসলামী সংগঠনের সদস্য। ইসলামী রাষ্ট্রের কাজকর্মে সে সমান অংশীদার। নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতার বলে সে সেই রাষ্ট্রের খলিফা বা রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত হতে পারে। দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র–ব্যবস্থায় সিভিল সার্ভিস বা অনরূপ অন্য কোন পরীক্ষায় পাশ করা শাসকসুলভ যোগ্যতার মাপকাঠি। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে একাধারে শাসক, সংস্কারক ও পথপ্রদর্শক সুলভ যোগ্যতার অধিকারী হতে হয় এবং তার মাপকাঠি হলো ইসলামী জীবন পদ্ধতিকে গ্রহণ করা ও তাঁর আইন মেনে চলা। এই মাপকাঠিতে যে উত্তম হয়ে সে বর্ণ, বংশ ও জাতীয়তা নির্বিশেষে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে। এই গ্রন্থের পরবর্তী পর্যায়ে আমি বলবো যে, ইসলামে এক জাতির ওপর আর এক জাতির শাসন চলার প্রশ্ন যেমন অবান্তর, তেমনি 'স্বজাতির উপর শাসনের' প্রশ্নও নিরর্থক। আসলে ইসলামের মূল কথা হলো সৎলোকের শাসন ও ন্যায়পরায়ণ লোকের সরকার। একজন হাবশী গোলামও যদি সততার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয় তাহলে আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদের উপর সে অবাধে শাসন চালাতে পারে। হজরত রসুলে করীম (সঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেনঃ

اسمعوا واطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة۔

"একজন টাকপড়া হাবশীকেও যদি তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় তা হলে তার আনুগত্য কর ও আদেশ পালন কর।"

ইসলামের সর্বশেষ দাওয়াত উদগত হয় আরবের মাটি থেকেই। আরবরাই প্রথম তার পতাকা উত্তোলন করে। কিন্তু ইসলাম কখনোই সরকারী ক্ষমতা ও শাসনদন্ডকে আরবদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়নি। আরবরা যতদিন 'সত্য' ছিল অর্ধেক দুনিয়া শাসন করেছে। যখন তাদের মধ্যে সততা ও যোগ্যতা রইল না, তখন তাদেরই বিজিত জাতি ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হলো এবং তারা আরবদেরকেও শাসন করলো। তুর্কীরা প্রথমে ইসলামের ঘোর দুশমন ছিল। কিন্তু তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করলো তখন মুসলিম দুনিয়ার অর্ধেকেরও বেশী অংশ তাদেরকে শাসক রূপে বরণ করে নেয়। চট্টগ্রাম থেকে কার্টাজেনা পর্যন্ত তাদের বিজয় পতাকা উড়তে থাকে। আমি অস্বীকার করিনা যে, আজকাল মুসলিম জাতি সমূহের মধ্যে জাতীয়তা ভিত্তিক ও বর্ণগত বৈষম্য বেশ কিছুটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম তার কোন আদেশে বা উপদেশে এই বৈষম্যকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেয়নি।

এ হলো ইসলাম ও সাম্রাজ্যবাদের বাহ্যিক পার্থক্য। এ দু'য়ের আভ্যন্তরীণ পার্থক্য আরো স্পষ্ট। বলতে গেলে দু'য়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই নেই। একটি জাতি যখন আপন দেশের সীমানা সম্প্রসারণ ও ধন–সম্পদ লাভের লালসার বশে পররাজ্য গ্রাস করতে উদ্যত হয় তখন তাকেই বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ। কোন জাতির নিজ দেশে যে সম্পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে তাতে যখন সে সন্তুষ্ট না হয় তখন সে ভিন্ন দেশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তার সম্পদ জোর দখল করে, তার অধিবাসীদেরকে গোলাম বানায় এবং তাদের অর্থবলে নিজেদের ব্যবসায়–বাণিজ্য ও কলকারখানার–উন্নতি সাধন করে। এ রকম ঘটনা আগেও ঘটতো। আগ্রাসী ও পররাজ্য লোভী জাতিগুলোর এটা চিরন্তন স্বভাব। কিন্তু এখন পাশ্চাত্যের জাতিগুলো এই লুটপাট ও আগ্রাসনের নাম দিয়েছে "সভ্যতা কৃষ্টির প্রচার ও প্রসার" এবং "মানবতার সেবা।" তাদের "সভ্যতা ও কৃষ্টি" নামক শাসনতন্ত্রের প্রথম ধারাই হলো, "শক্তিই অধিকার" এবং "শক্তিই ন্যায়" আর দুর্বলের দুনিয়ায় টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। দুর্বল জাতিগুলোর কাছে কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রচার করার যে পদ্ধতি তারা উদ্ভাবন করেছে তা হলো তাদেরকে নিরক্ষতা, দারিদ্রতা, দাস সুলভ নীচাশয়তা, ধর্মহীনতা ও বিবেকের ব্যবসায় ইত্যাকার 'সম্পদে'সমৃদ্ধ করে তোলা। আর "মানবাতার সেবার" জন্য তাদের সর্বোত্তম চেষ্টার পরাকাষ্ঠা

দেখা যায় তখনই যখন তাদের পাশবিক শক্তি পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস করে দেয়।

ইসলামের সুমহান ও পবিত্র শিক্ষা সাম্রাজ্য লিপসার দোষ থেকে মুক্ত। সে মূলতঃ মানব জাতিকে এ ধরণের সাম্রাজ্য লিপসু শক্তি সমূহকে উৎখাত করা এবং তার স্থানে একটি ন্যায় ও সুবিচার ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানায়। তার বিঘোষিত নীতি হলো এই যে, শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট। إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (সার্বভৌমত্ব ও শাসন ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়।) আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের অনুগত দাসে পরিণত করার অধিকার কোন মানুষের নাই। তাদের কর্তব্য শুধু এই যে, তার প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে তার বান্দাদের সেবা ও সংশোধন করবে। যে শক্তি তাদের অর্জিত হবে তা দিয়ে সেবার পরিবর্তে আল্লাহর সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণের কাজ করবে। এ 'খেলাফত' তথা পৃথিবীর 'উত্তরাধিকার' লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হলো সৎকর্মশীলতা ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে আল্লাহ পৃথিবীতে খলিফা নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– যেমন খলিফা নিয়োগ করতেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।" (সুরা নুর–৭)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا
عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ۝ اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۝

"আমি জবুর গ্রন্থে উপদেশাবলীর পর লিখে দিয়েছিলাম যে আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে। আনুগত্যশীল জাতি সমূহের জন্য এতে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রয়েছে।" (সূরা আম্বিয়া–৭)

এই 'খেলাফত' ও উত্তরাধিকার যারা লাভ করে তাদেরকে তাকিদ সহকারে বলে দেয়া হয় যে, আল্লাহর বান্দাদের ওপর তোমাদেরকে যে

প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেটা আল্লাহর পবিত্র আমানত। একে নিজস্ব সম্পত্তি মনে করে ইন্দ্রীয় সুখ চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করোনা। হজরত দাউদ (আঃ) যখন সাম্রাজ্য লাভ করলেন তখন নির্দেশ এল ঃ

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ○ (ص : ٢٦)

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছি। কাজেই মানুষের ওপর সততা ও ন্যায়পরায়নতার সাথে শাসন চালাও এবং নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছামত চলোনা। অন্যথায় প্রবৃত্তি তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে ছাড়বে। আল্লাহর পথ থেকে যারা গোমরাহ হয়ে যায় তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কারণ তারা তাদের কার্যকলাপের হিসাব গ্রহণের দিনকে ভুলে গেছে।" (ছোয়াদ–২৯)

সরকারী ক্ষমতা লাভের পর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে দোষটি জন্মে তা হলো, সে নিজেকে সাধারণ মানুষের উর্ধের একজন মনে করতে থাকে। সে নিজের আসল পরিচয় ভুলে গিয়ে এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হয় যে, তার শাসনাধীন লোক গুলো যেন তার দাসত্ব করার জন্য জন্মেছে। ইসলাম এই ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছে এবং এই ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকাকে পারলৌকিক মুক্তি ও সাফল্যের শর্তরূপে নির্ধারণ করেছে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○ (القصص : ٨٣)

"পরকালীন জগতের সম্পদ সমূহকে আমি শুধু যারা পৃথিবীতে ফাসাদ ও অহংকার করেনা তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি। বস্তুতঃ কেবল মাত্র সংযমশীল ও খোদাভীরু লোকদের জন্যই পারলৌকিক সাফল্য।"

(সূরা কাসাস–৯)

সরকার প্রতিষ্ঠার প্রধানতম উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সাথে ইনসাফ করতে হবে। আর ইনসাফ অর্থ শুধু দুটি বিবাদমান দলের মধ্যে সঠিক মীমাংসা করে দেয়া নয় বরং সত্যিকার ইনসাফ এই যে, শাসক শাসিতের সাথে আচরণ করার সময় ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে। এমনকি যেখানে স্বয়ং তার ব্যক্তিগত লাভালাভ ও শাসক সুলভ সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রশ্ন জড়িত, সেখানেও অবাধ ক্ষমতা ও এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও হক ও ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করবে। চাই তাতে তার নিজের কিংবা তার আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের ক্ষতিই হোক না কেন। ইসলাম ইনসাফের সবচেয়ে সুন্দর শিক্ষা দেয় ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ج إِنْ يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ج
وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ه

“হে মুমিনগণ! ইনসাফের ওপর অবিচল থাক এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। চাই তা তোমাদের নিজেদের, কিংবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধেই যাকনা কেন। ধনীর সন্তোষ লাভের আকাংক্ষা কিংবা দরিদ্রের প্রতি সহানুভুতির আবেগ যেন তোমাদেরকে ইনসাফ ও সত্য সাক্ষ্য থেকে ফিরিয়ে না রাখে। কেননা আল্লাহ তাদের প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশী হীতাকাংক্ষী। অতএব, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ইনসাফ ও সুবিচার থেকে দূরে সরে যেওনা। তোমরা যদি চাতুর্য দেখাও কিংবা সত্য থেকে মুখ ফিরাও তা হলে জেনে রেখ, আল্লাহ সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।” (সূরা নেসা–২০)

শুধু তাই নয়। ইসলাম আরো নির্দেশ দেয় যে, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা আছে, তাদের সাথেও ইনসাফ করতে হবে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ط اِعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى - (المائدة : ٨)

"কোন সম্প্রদায়ের সাথে তোমাদের শত্রুতা আছে–এই অজুহাতে ন্যায় বিচার করা থেকে বিরত থেকনা। ন্যায়বিচার অব্যাহত রাখা এটাই পরহেজগারীর নিকটতম।" (সুরা মায়েদা–২)

পর্যাপ্ত শক্তি অর্জনের পর একটি জাতির মধ্যে অনিবার্যভাবেই দেশের সীমানা সম্প্রসারণ ও দুর্বল জাতিসমূহের দেশ কেড়ে নেয়ার মনোবৃত্তি জাগে। পররাজ্য ও পরার্থের এই লোভই জুলুম ও অরাজকতা– উচ্ছৃংখলতার মূল ভিত্তি। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ–সংঘর্ষ হয় এর কারণেই। কিন্তু ইসলাম এর কঠোর নিন্দা করে। সে শুধু এই অপরাধমূলক কাজ থেকে বেঁচে থাকারই নির্দেশ দেয় না বরং এই মহা পাতকের সাথে জড়িত লোকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করারও নির্দেশ দেয়। ফেৎনা ও ফাসাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। এক হাদিসে আছে. হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

من اقتطع شبرا من ارض ظلما طوقه الله اياه يوم

القيامة من سبع ارضين (مسلم)

"যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি জোর–জুলুমের মাধ্যমে দখল করে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার গলায় অনুরূপ সাতটি ভু–খন্ড ঝুলিয়ে দেবেন।"– (মুস্‌লিম)

অন্য হাদিসে আছে ঃ

ان هذا المال حلوة من اخذه بحقه ووضعه في

حقه فنعم المؤنة هو- ومن اخذه بغير حقه كان

كالذي يأكل ولا يشبع-

"এই ধন–সম্পদ একটি সুস্বাদু জিনিস। যে ব্যক্তি ন্যায় পন্থায় তা অর্জন করে ও ন্যায্য পথে ব্যয় করে তার জন্য এটা উত্তম পাথেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্জন করে সে যেন খায় কিন্তু তৃপ্তি লাভ করে না।"

পবিত্র কোরআন ও মহানবীর হাদিসে ইসলামের রাজনৈতিক সততা সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তৃত আইনকানুনের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখানে সেইসব

খুটিনাটি বিধানের উল্লেখের অবকাশ নেই। এক কথায় বলা যেতে পারে : যেসব আনন্দ ও সুখ সম্ভোগের মোহে মানুষ শাসন ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে থাকে, ইসলাম তার সবই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা ও তাদের উর্দ্ধেকার কোন সত্তা নয়। সে উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসতে পারে না। নিজের সামনে মানুষের মস্তক নত করাতে পারে না। ন্যায়ের দণ্ডের সামনে সে এক বিন্দুও অন্যায় সুযোগ–সুবিধা ভোগ করতে পারে না। নিজের কোন প্রিয়জনকে কিংবা নিজেকে কোন নগন্যতম নাগরিকের দাবী থেকেও সে বে–আইনীভাবে অব্যাহতি দিতে সক্ষম নয়। অন্যায়ভাবে সে একটি কনাও গ্রহণ করতে কিংবা এক ইঞ্চি মাটিও দখল করতে পারে না। সে সব সময় এই ভয়ে কম্পমান থাকে যে, তার কার্যকলাপের কঠোর হিসাব গ্রহণ করা হবে। সে যদি একটি পয়সাও অবৈধভাবে গ্রহণ করে, এক ইঞ্চি জমিও যদি জোরদখল করে, এক মুহূর্তের জন্যও যদি মনে অহংকারকে প্রশ্রয় দেয়, এক বিন্দুও যদি কারো ওপর জুলুম ও অবিচার করে এবং অনুপরিমানও যদি প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, তা হলে তার হিসাব আল্লাহ রাখবেন এবং তার জন্য তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

হজরত আবুবকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর যে ভাষণ দেন তাতে একজন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের প্রকৃত মর্যাদা ও তার দায়িত্ব–সমূহের সত্যিকার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন!

يا ايها الناس! قد وليت امركم ولست بخيرمنكم
وان اقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له بحقه وان
اضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه ايها الناس ما انا
الا كاحدكم فاذا رأيتمونى قد استقمت فاتبعونى وان
زغت فقوّمونى-

"হে মানুষ সকল! আমার উপর তোমাদের শাসনের ভার অর্পণ করা হয়েছে। অথচ আমি তোমাদের চেয়ে ভালো নই। আমার নিকট দুর্বল ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যাবৎ না থাকে তার প্রাপ্য আমি দিয়ে দেই। আর আমার নিকট শক্তিশালী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে -

সর্বাপেক্ষা দুর্বল–যাবৎ না তার কাছ থেকে রাষ্ট্রের ও অন্যদের প্রাপ্য আমি আদায় করি। হে জনতা! আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী নয়। আমাকে যদি সোজা পথে চলতে দেখ তা হলে তোমরা আমার অনুকরণ কর। আর যদি দেখ, বাঁকা পথে চলছি, তাহলে আমাকে সোজা করে দিও।”

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) তার এক ভাষণে স্বীয় পদের দায়িত্ব নিম্নরূপ বিশ্লেষন করেন ঃ

انما انا ومالكم كولى اليتيم، ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف لكم على ايها الناس خصال فخذوني بها لكم على ان لا اجتبى شيئًا من خراجكم ولا مما افاء الله عليكم الا من وجهه ولكم على اذا وقع فى يدى ان لا يخرج منى الا فى حقه۔

“ইয়াতিমের মালের সাথে তার তত্ত্বাবধায়কের যে রকম সম্পর্ক, তোমাদের সম্পদের সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক তেমনি। আমি যদি স্বচ্ছল হই, তা হলে কোনই পারিশ্রমিক নেবনা। আর যদি অভাবী হই, তা হলে ন্যায্য পারিশ্রমিক নেব। আমার নিকট তোমাদের কিছু ন্যায্য অধিকার পাওনা রয়েছে। তোমরা সেগুলো আমার কাছে চাইতে পার। খাজনা বাবদ ও তোমাদের যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে আমি অন্যায়ভাবে কর আদায় করবো না। এটা আমার দায়িত্ব। আর আমার কাছে তোমাদের এ অধিকারও পাওনা রয়েছে যে, আমার হাতে যা কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ জমা হবে তা বৈধ খাতে ছাড়া ব্যয় হবে না।”

এভাবে সব রকমের রাজসিক বিলাস ব্যসন ও শানশওকত, শাসকসুলভ একনায়কত্ব, ধনসম্পদের প্রাচুর্য এবং ইন্দ্রীয়সুখ সম্ভোগের যাবতীয় সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা হয়। এরপর সরকারী দায়িত্বের যে স্বাদবিহীন ও জৌলুসবিহীন নীরস অংশটি বাকী থাকে তা স্বয়ং ইসলামের ভাষায় এই ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط (الحج : ٤١)

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।" (সুরা হজ্জ–৬)

এটা ইসলামের শুধু দাবীই নয় বরং হজরত রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন তার বাস্তব উদাহরণ বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ইতিহাস আলোচনা করা নয়– আইনের ব্যাখ্য দেয়া। তথাপি প্রসঙ্গ যখন উঠেছে তখন কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমি ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের মানদন্ড কি তা দেখাতে চেষ্টা করবো।

বনী মাখজুমের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ফাতেমা বিনতে আছাদ চুরীর অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট নীত হয়। কোরেশরা ভড়কে গেল যে, হযরত সাধারণ লোকদের মত তারও হাত কাটার নির্দেশ দিয়ে না বসেন। তারা হজরতের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি উছামা ইবনে জায়েদকে তার কাছে সুপারিশের জন্য পাঠান। কিন্তু তিনি তার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করতো এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের ছেড়ে দিত বলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। অতপর আবেগোদ্দীপ্ত হয়ে বললেন ঃ

والذى نفسى بيده لوان فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدها.

"আমার জানের মালিক আল্লাহর শপথ করে বলছি, (ফাতেমা বিনতে আছাদের পরিবর্তে) মুহাম্মাদের দুলালী ফাতেমা যদি চুরি করতো তা হলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।" (বুখারী এবং ইবনে মাজা)

বদর যুদ্ধে কোরাইশের অন্যান্য সরদারের সাথে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের জামাতাও গ্রেফতার হয়ে আসেন। ইনি রসুলুল্লাহর কন্যা জয়নবের স্বামী আবুল আছ। ৭ম হিজরী পর্যন্ত তিনি কাফের ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। সাধারণ কয়েদীদের মত তাকেও বন্দী করা হয়। তার কাছে ফিদিয়া দেয়ার টাকা না থাকায় তাকে বলা হয়, "বাড়ী থেকে আনিয়ে দাও। তা না হলে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।" তিনি নিজের স্ত্রী হজরত রসুলুল্লাহর কন্যা জয়নবকে খবর পাঠান। জয়নবের নিকট থেকে স্বামীর

ফিদিয়া স্বরূপ এক গাছি মূল্যবান হার আসে। সেই হার হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) এর স্ত্রী হজরত খাদিজা (রাঃ) তাকে বিয়ের [illegible] হিসেবে দেন। হার দেখে হজরত তার প্রিয়তমা মহিষীকে স্মরণ করে বেইখতিয়ার অশ্রুবর্ষন করেন। তথাপি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফিদিয়া মাফ করলেন না। সাধারণ মুসলমানদের নিকট অনুমতি চান যে, তোমরা যদি অনুমতি দাও তা হলে মেয়েকে তার মায়ের স্মৃতি ফেরত দেয়া যেতে পারে। সাধারণ মুসলমানরা অনুমতি দিলে হজরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের জামাতা ফিদিয়া ছাড়া মুক্তিপান। (তাবারী, আবু দাউদ–১০২)

হোদাইবিয়াতে হজরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও কোরেশদের মধ্যে সন্ধি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্তাবলী স্থির হয়েছে এবং চুক্তি লেখা হচ্ছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে একজন মুসলমান আবু জুনদল ইবনে ছোহাইল কাফেরদের বন্দী দশা থেকে পালিয়ে এলেন। তার পায়ে তখনো বন্দী দশার শৃংখল। শরীরে প্রহারের জখম। তিনি এসে মুসলমানদের সামনে গড়িয়ে পড়েন এবং বলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ওদের কয়েদ থেকে মুক্ত করে আনুন। রসুলুল্লাহ (সঃ) এর বাহিনীতে তখন ১৪ শো তলোয়ারধারী মুসলমান। তার একটি ইশারাতেই আবু জুন্দল মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু কাফেরদের সাথে চুক্তি হ'য়েছে যে, "কোরেশদের যে ব্যক্তি মুসলমানদের নিকট যাবে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর মুসলমানদের মধ্যে কেউ মক্কায় আটকা পড়লে তাকে ফেরত দেয়া হবেনা।" এজন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহু আলাইহি ওয়ছাল্লাম তাকে মুক্ত করতে রাজী হলেন না। আবু জুন্দল তার জখম দেখিয়ে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, "আপনি কি আমাকে পুনরায় এহেন জুলুমের শিকার হবার জন্য ফেরত পাঠাচ্ছেন।" হযরত জবাবে বললেন,"

يا اباجندل! اصبرو احتسب فانا لا نغدران الله جاعل

لك فرجا ومخرجا

"আবু জুন্দল, ধৈর্য ধারন কর ও সংযম অবলম্বন কর। আমরা ওয়াদা খেলাপী করতে পারিনা। আল্লাহ তোমাদের জন্য মুক্তির একটা উপায় করে দেবেন।" (ফতহুলবারী জিলদ–৫)

ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় রুম সম্রাট মুসলমানদের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেন এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে মুসলমানদের বহিস্কার ও তাদের শক্তি চুর্ন করার সংকল্প করেন। এ রূপ নাজুক মুহূর্তে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুসলমানদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা হেম্‌সের অধিবাসীদের একত্র করেন এবং তাদের কাছ থেকে যে কর নিয়েছিলেন তা ফেরত দিয়ে বলেন,"আমরা তোমাদের রক্ষনা–বেক্ষন করতে সক্ষম নই। এখন তোমাদের ব্যবস্থা তোমরাই কর।" হেমস বাসী বললো, আমরা ইতিপুর্বে জুলুম ও অত্যাচারে পিষ্ঠ হচ্ছিলাম। সে অত্যাচারের চেয়ে আপনাদের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার আমাদের কাছে প্রিয়। আপনাদের কর্মকর্তার নেতৃত্বে হিরকিলের বাহিনীর মোকাবেলা করবো।" (ফতুহুল বুলদান,বালাজুরী) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হিরকিল একজন খৃষ্টান রাজা ছিল। আর হেমসের এই অধিবাসীরাও ছিল খৃষ্টান। তারা বহু শতাব্দী যাবত রোম সম্রাটের অধীন ছিল। তা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের পক্ষে হয়ে হিরকিলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছিল।

সিফফিনের যুদ্ধে যাওয়ার সময় চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর বর্ম হারিয়ে যায়। যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে সেই বর্মই রাজধানীর জনৈক ইহুদীর নিকট পাওয়া যায়। তিনি তার কাছে বর্ম চাইলেন। ইহুদী বললো ' এ বর্ম আমার। খলিফা নিশ্চিত যে, ইহুদী মিথ্যা বলছে এবং ওটা তারই হারানো বর্ম কিন্তু তথাপি নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ না করে একজন অসহায় ফরিয়াদীর ন্যায় বিচারপতি শোরাইহের আদালতে মামলা রুজু করেন। বিচারপতি খলিফার গুরুত্ব পুর্ণ ব্যক্তিত্বের দিকে লক্ষ্য করে শুধু মাত্র দাবী পেশ করার ভিত্তিতেই রায় দিয়ে দেননি। তিনি বলেন, এই বর্ম যে আপনার তার প্রমাণ পেশ করুন। তিনি আপন ভৃত্য কিম্বার এবং ছেলে হাছান (রাঃ) কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেন। বিচারপতি শোরাইহ বলেন, ইমাম হাসানের সাক্ষ্য গ্রহন যোগ্য নয়। কেননা তিনি আপনার ছেলে। বাপের দাবী প্রমানের জন্য ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। এ অবস্থা দেখে ইহুদী উচ্চস্বরে কলেমা তাইয়েবা পাঠ করে এবং বলে, "যে ধর্মে এমন সুবিচারের ব্যবস্থা রয়েছে, তা অবশ্যই সত্য ধর্ম।" (সুয়ুতী)

দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের নিকট একজন কর্মচারী প্রচুর পরিমাণে জিজিরার টাকা নিয়ে আসে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? সে বলে

"অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে আদায় করা জিজিয়া।" এত বেশী টাকা দেখে খলিফার সন্দেহ হলো যে, হয়তো জোর জুলুম করে আদায় করা হয়েছে। বললেন, তুমি লোকদেরকে একেবারে উজাড় করে দিয়ে আসনি তো? কর্মচারী বললো, আল্লাহর কসম, আমরা অত্যন্ত নম্রভাবে আদায় করেছি।" খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, "কাউকে বেধে বা মেরে আদায় করনি তো?" আল্লাহর কছম, কাউকে বেঁধে বা মেরে নয়।" তখনই সেই টাকা বাইতুলমালে দাখিল করা হলো। (ফাত্হুল বয়ান) ইমাম আবু ইউসুফ কিতাবুল খারাজে লিখেছেন যে, হজরত ওমরের নিকট যখন ইরাক থেকে কর আসতো তখন দশজন দায়িত্বশীল অফিসার কুফা থেকে এবং দশজন বসরা থেকে আসতো। তারা বার বার শরীয়ত মোতাবেক শপথ করে বলতো যে, এ টাকা সম্পূর্ণ হালাল এবং কোন মুসলমান বা অমুসলমানের নিকট থেকে জুলুম করে আদায় করা হয়নি।

হজরত ওমরের ছেলে আবু শাহমা মদ পান করলে তাকে একজন সাধারণ আসামীর মত গ্রেফতার করা হয়। হজরত ওমর তাকে নিজ হাতে ৮০ টি চাবুক মারেন। সেই চাবুকের আঘাতে তার ইন্তেকাল হয়ে যায়।[৩] মিশরের গভর্ণর আমর ইবনুল আসের ছেলে আবদুল্লাহ এক ব্যক্তিকে প্রহার করে। সেই ব্যক্তি খলিফার দরবারে নালিশ করে। হজরত ওমর (রাঃ) স্বয়ং সেই ব্যক্তিকে দিয়ে আব্দুল্লাহকে চাবুক মারেন। স্বয়ং হজরত আমর ইবনুল আস সম্পর্কেও একবার খবর এল যে, তার কাছে প্রচুর সম্পদ পুঞ্জীভুত রয়েছে। হজরত ওমর (রাঃ) তাকে লিখলেনঃ "গভর্ণর হবার আগে তো তোমার এত সম্পত্তি ছিলনা। এখন এসব কোত্থেকে এল?" তিনি জবাব দিলেন ঃ "আমার প্রদেশ একটা স্বর্ণপ্রসাধনী এলাকা। এ জন্য আমার কাছে আমার খরচ থেকে অনেক টাকা বেচে যায়।" এ জবাবে হযরত ওমর (রাঃ) সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুসলেমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে পাঠালেন। মিশরে গিয়ে তিনি আমর ইবনুল আসের সম্পত্তি পরীক্ষা করলেন। তার পূর্বতন সম্পত্তির হিসাব নিলেন। গভর্ণর থাকা কালে ঐ সম্পত্তির অতিরিক্ত যা ন্যায় সঙ্গত পারিশ্রমিক তার প্রাপ্য হতে পারে তার হিসাব করলেন, অতঃপর যেটা অতিরিক্ত হলো তা বাজেয়াপ্ত করে বায়তুলমালে দাখিল করে দিলেন। ত্রিপোলি পর্যন্ত যে প্রদেশের সীমানা , সেই মিশরের গভর্ণর অসহায়ের মত সব কিছু দেখলেন এবং টু শব্দটি করতে পারলেন না। (বালা জুরি)

বসরার শাসনকর্তা মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল যে, কোন একটি মেয়ের সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। শোনামাত্র হজরত ওমর (রাঃ) আবু মুসা আশয়ারীকে নির্দেশ দিলেন যে, "বসরায় শয়তানের আড্ডা জমে উঠেছে। তুমি শীগগীর চলে যাও। সেখানকার শাসনকার্য কেমন চলছে দেখে এস। আর মুগিরাকে সাক্ষী সমেত মদিনায় পাঠিয়ে দাও।" নির্দেশ অনুসারে মুগিরা চলে গেলেন বসরায়। স্বয়ং হজরত ওমরের আদালতে বিচার বসলো। জেরার সময় সাক্ষীর পতন ঘটলো। সাক্ষীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। অপরাধ সাব্যস্ত হতে পারলো না। তাই মুগিরা (রাঃ) কে অব্যাহতি দিয়ে হজরত ওমর (রাঃ) বললেন, "সাক্ষ্য যদি ঠিকমত পাওয়া যেত তা হলে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করার শাস্তি দিতাম।" মুগিরা হলেন হজরত রসুলুল্লাহর (দঃ) একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছাহাবী। আরবের চারজন সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান দক্ষ রাজনীতিবিদ এর তিনি অন্যতম। যথা আমীর মোয়াবিয়া আমর ইবনুল আস, মুগীরা ইবনে শুবা এবং জিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান। মুগিরা ইসলামের কল্যাণের জন্য অতি বড় বড় রাজনৈতিক ও সামরিক কীর্তি রেখেছেন। তার এত বড় কৃতিত্ব, এত খ্যাতি, এত বড় পদ-মর্যাদা কোনটাই তার কাজে এলনা। একজন সাধারণ আসামীর মত তাকে কাট গড়ায় দাঁড়াতে হলো। প্রচলিত সরকার পদ্ধতিতে কোন কর্মচারীর ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এমনকি এ যুগের সুসভ্য সরকার সমূহের আইনেও ব্যভিচার উভয় পক্ষের সম্মতিতে হয়ে থাকলে তা আদৌ অপরাধই নয়। কিন্তু যে সরকারের আসল লক্ষ্যই ছিল মানবতার পরিশুদ্ধি এবং সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সে সরকারের চৌহদ্দিতে ব্যক্তিগত চরিত্র ভালো নয় এমন কোন ব্যক্তির স্থান ছিলনা।

পারস্য অঞ্চলে মুসলমানগণ শুহরিয়াজ নামক একটি শহর অবরোধ করে। অবরুদ্ধ নগর বাসীর প্রতিরোধ এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ে যে, শহর যে বিজিত হবে তা এক রকম নিশ্চিত হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় মুসলিম বাহিনীর একটি গোলাম শহর বাসীর নামে নিরাপত্তা সনদ লিখে তীরের সাথে বেধে শহরের ভেতরে ছুড়ে দেয়। পরদিন যখন মুসলিম বাহিনী শহরের ওপর আক্রমণ চালায় তখন শহরবাসী দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে এবং বলে, একজন মুসলমান আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে। এখন তোমরা কি জন্য যুদ্ধ করছ?

নিরাপত্তা সনদটি পড়ে দেখা গেল একটি গোলামের লেখা। এ সম্পর্কে হজরত ওমরের মতামত জানতে চাওয়া হলো যে, নিরাপত্তা সনদ গ্রহণযোগ্য কিনা। জবাবে খলিফা লিখলেন। "মুসলমান গোলাম ও সাধারণ মুসলমানদের মতই। তার নিরাপত্তা দানও সাধারণ মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রদানের মতই বৈধ। সুতরাং শহরবাসীকে নিরাপত্তা দিতে হবে।" (বালাজুরী)

হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হজরত রসুলে করীম (সঃ)–এর ইন্তেকালের পর সমগ্র মুসলিম জাহানের ক্ষমতাসীন শাসক নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হবার পরের দিন হজরত ওমর দেখেন যে, তিনি কাপড়ের বোঝা মাথায় করে বাজারে চলেছেন। হজরত ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, "এখন আপনি মুসলমানদের আমীর। আপনার এ কাজ শোভা পায়না।" তিনি জবাব দিলেন, "তাহলে আমি নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ কি দিয়ে চালাবো?" হজরত ওমর প্রস্তাব করলেন যে," এ কাজটি আপনার আবু ওবায়দা করে দেবে।" সে মতে আবু ওবায়দার সাথে খলিফার এই চুক্তি হলো যে, তিনি তার ব্যবসায় চালাবেন এবং খলিফার পরিবার পরিজনের জন্য একজন মধ্যম শ্রেণীর মোহাজেরের খাদ্য ও শীত গ্রীষ্মের কাপড় দেবেন। তারপর বায়তুল মাল থেকে খলিফার জন্য মাসিক ৫০০ দিরহাম (বর্তমানের হিসাবে মাসিক একশো টাকার সামান্য কিছু বেশী) বেতন নির্ধারিত হলো। ইন্তিকালের সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন হজরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের ডেকে বলেনঃ "খলিফা হবার পর আমার যে টুকু অতিরিক্ত সম্পত্তি হয়েছে তার সবটুকু নতুন খলিফার হাতে যেন সমর্পন করা হয়।" ইন্তিকালের পর হিসাব করলে দেখা গেল একটি উট, একটি ভৃত্য ও একটি পুরানো চাঁদর ছাড়া আর কিছু নেই। (ফাতহুল বারী)

হজরত ওমরের সময়ে মুসলিম জাহানের সীমা ইরান থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যুদ্ধলব্ধ ও করলব্ধ অর্থের এত প্রাচুর্য ঘটেছিল যে, প্রতিবছর বায়তুল মালে কোটি কোটি টাকা দাখিল হতো। রোম ও ইরান সাম্রাজ্যের সমস্ত ধন–সম্পদ মুসলমানদের করায়ত্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের শাসকের এমন দিনহীন অবস্থা ছিল যে, শরীরে দশ বিশটি তালি লাগা কাপড় পরা থাকতো। পায়ে ছেড়া চটি, মাথায় ছিন্ন পূরানো পাগড়ী পরে ঘুরে ঘুরে ইয়াতিম, বিধবা ও অনাথদের খোঁজ নিয়ে বেড়াতেন। রোম ও

অন্যান্য এলাকার লোকেরা রাজধানীতে এসে সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকে তাদের শাসককে চিনে বের করতে পারতো না, সিরিয়া সফরে গেলেন এমনভাবে যে, লোকেরা কে খলিফা এবং কে তার ভৃত্য, তা ধরতে পারলো না। বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করার সময় যখন শহরে ঢুকলেন, তখন পদব্রজে ঢুকলেন। আর এমন মোটা কাপড় পরে গিয়েছিলেন যে মুসলমানরা খৃষ্টানদের সামনে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল। উটের দুধ, জয়তুনের তেল, সের্কা ও গমের রুটি-এই ছিল খলিফার সবচেয়ে উপাদেয় খাদ্য; যখন ইন্তেকাল করলেন, ঘরে ঋণ শোধ করার মত সম্পত্তি ছিলনা, তাই বসবাসের বাড়ী বেচে দিয়ে ঋণ শোধ করতে হলো।

এ সব রূপকথার কল্প-কাহিনী নয়,-ইতিহাসের প্রামান্য সত্য ঘটনা। এ সব ঘটনা সামনে রেখে পাঠক বলুন, পৃথিবীতে এর চেয়ে ভাল শাসন-পদ্ধতির কোন নজির কি বর্তমান আছে? এমন নিখুঁত তাকওয়া, পরহেজগারী, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা,সাম্য স্বাধীনতা, সুবিচার, ন্যায় -নিষ্ঠতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং সততা ও বিশ্বস্ততার ওপর ভিত্তি করে যারা দেশ শাসন করে, পৃথিবীতে শাসন চালানো তথা পৃথিবীর সেবা করার অধিকার যে একমাত্র তাদেরই, এ দাবী কি ভ্রান্ত ও অসঙ্গত? তারা যদি বহিরারবের জালেম ও বিলাসী শাসকদের কবল থেকে সেখানকার গদি খালী করিয়ে থাকেন, তারা যদি রোমের অত্যাচারী নরপতিদেরকে শাসনক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে থাকেন, তারা যদি আশপাশের সমস্ত কুচক্রী শাসকদেরকে গদিচ্যুত করে দিয়ে থাকেন এবং তাদের স্থলে এমন ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়বিচারক সরকার প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, তাহলে বলুন, তারা মানবতার ওপর অবিচার করেছেন, না তার কল্যাণ সাধন করেছেন? এদের সামনে পাশ্চাত্যের সেই সব মিথ্যা দাবীদারের কি গুরুত্ব থাকতে পারে- যাদের না আছে সততা ও পরহেজগারীর সাথে কোন সম্পর্ক, যাদের নেই ওয়াদা পালনের বিন্দুমাত্রও কোন নিষ্ঠা, যাদের কাছে নেই ন্যায়বিচার, ইনসাফ, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়নতার কোন গুরুত্ব, সর্বোপরি যাদের রাজনীতিতে সম্প্রসারনবাদ, অর্থনৈতিক শোষণ, পররাজ্য লিপ্সা ও ক্ষমতার মোহ ছাড়া অন্য কোন মহৎ আকাংখার স্থান নেই।

আমি অস্বীকার করবো না যে, পরবর্তী যুগের অধিকাংশ মুসলিম সরকারের কার্যধারা রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত ইসলামের এই যথার্থ ও খাটি

আদর্শের অনুসারী ছিলনা। কিন্তু এ ত্রুটি ইসলামের নয়, তার অনুসারীদের। ইসলাম হলো একটা আইন বিধান যার উৎস কোরআন ও রসুলের আদর্শ। যে সরকার এই বিধান অনুযায়ী কাজ করে সে ইসলামী সরকার। আর যার কাজ এর পরিপন্থী, সে ইসলামী সরকার নয়। মুসলমান সম্রাট ও রাজাদের কাজ আমাদের আদর্শ নয়। ইসলামের আইন ও বিধানই আমাদের আদর্শ। এই আইনে কোন ত্রুটি চোখে পড়ে কিনা. সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য ।

ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারের মুল কারণ

পরবর্তী আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আর একটি সমস্যার সমাধান করে নেয়া একান্ত প্রয়োজন। এই গ্রন্থে একাধিকবার বলা হয়েছে যে, নিছক দেশজয়ের উদ্দেশ্যে তরবারী উত্তোলন করা ইসলামী শরীয়াতে হারাম। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে, এ কাজটি যখন হারাম তখন সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন ইরাক, সিরিয়া, ইরান, আরমেনিয়া, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় যে সব অভিযান চালিয়েছেন, তার যুক্তি কি? ইসলামের শত্রুরা এ প্রশ্ন খুবই শক্তভাবে তুলেছে। মুসলিম ঐতিহাসিক এবং লেখকগণ এ প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলাম ও অমুসলিমদের দৃষ্টিভংগীতেই যে বিরাট পার্থক্য, সেটা কেউ ভেবে দেখেনি। এ জন্য যারা অমুসলিমদের দৃষ্টিভংগী মেনে নিয়ে জবাব দিয়েছেন তারা ইসলামের অপব্যাখ্যা করেছেন। আর যারা ঐ দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে একেবারেই বেপরোয়া হয়ে জবাব দিয়েছেন, তারা আরো বেশী সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি করে ফেলেছেন।

আসল কথা এই যে, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলাম 'জাতীয়' ও 'বিজাতীয়'–এর পার্থক্য মানেনা। তার কাছে একমাত্র 'জুলুম' ও 'ন্যায়–বিচার'ই হলো পার্থক্যের মাপকাঠি। একটি দেশের সরকার যদি সেই দেশের অধিবাসীদের হাতেই থাকে কিন্তু তার কর্মকর্তারা জালেম, পাপিষ্ঠ, স্বার্থপর, চরিত্রহীন ও দুর্নীতিবাজ হয় তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে তারা একটি বিজাতীয় সরকারের অসৎ ও দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের মতই ধিকৃত ও ঘৃনার্হ। পক্ষান্তরে একজন অনারব যদি একটি আরব এলাকার ওপর শাসন চালায় এবং সকল ব্যাপারে ইনসাফ, বিশ্বস্ততা, সততা, ও খোদাভীরুতার সাথে কাজ করে, মজলুমদের জুলুমের প্রতিকার করে, হকদারদের হক আদায় করে দেয়,

অহংকার না করে, স্বার্থপূজা ও আত্ম–সেবায় লিপ্ত না থাকে এবং প্রজাদের চরিত্র সংশোধন ব্যতীত কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আপন শক্তি ব্যবহার না করে, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে সেই অনারব সরকার এই গুনাবলী থেকে বঞ্চিত আরব শাসকের চেয়ে উত্তম। অত্যাচারী আরব শাসক আরবদের জন্য ন্যায় বিচারক অনারবের চেয়ে ভালো–এরূপ ধারণা ইসলামের কাছে আদৌ গ্রহণ যোগ্য নয়। অনুরূপভাবে একজন তুর্কী যতই সৎ ও ন্যায়পরায়ন হোক, শুধু তুর্কী বলে ইরাকীরা তাকে গ্রহণ করতে পারে না–এরূপ ধারণাকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে মনে করে। এ বিষয়টাকে সে "জাতীয়তা" ও 'স্বাদেশিকতার' দৃষ্টিকোন থেকে দেখেনা বরং নিরেট "মানবতার' দৃষ্টিকোন থেকে দেখে থাকে। তার বিশ্বাস এই যে, "সৎ" মানুষ সর্বাবস্থাতেই "অসৎ" মানুষের চেয়ে উত্তম ও অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য ইসলাম মনে করে যে, মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে আপন ও পর, দেশী ও বিদেশী, ভারতীয় ও ইরাকী, হাবশী ও বৃটিশ, সাদা ও কালো, প্রভৃতির ভেদাভেদ করা অন্ধ গোড়ামী ছাড়া আর কিছু নয়।

ইসলামের এই বিশ্বাস ও আকিদা অনুসারে একটি ভালো সরকার হওয়ার জন্য তার স্বজাতীয় ও স্বদেশী হওয়া শর্ত নয়। আবার বিদেশী ও বিজাতীয় হওয়াই তার খারাপ হওয়ার লক্ষণ নয়। আসল প্রশ্ন শুধু এই যে, শাসন ব্যবস্থাটা ন্যায় বিচারমুলক কিনা, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ কিনা। যদি সৎ, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়বিচারমুলক সরকার হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম তাকে উৎখাত করা তো দুরের কথা, এধরণের ইচ্ছা পোষণ করাকেও ভয়ংকর পাপ ও গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচনা করে। কিন্তু যদি তার বিপরীত হয় তাহলে সে একটি জালেম ও পাপাচারমূলক শাসন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে তার স্থলে একটি সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায় পরায়ন সরকার প্রতিষ্ঠা করাকে সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে মনে করে। জাতীয় ও বিজাতীয়ের প্রশ্নকে সে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে কোনই আমল দেয়নি। এর অর্থ এই যে, তার কাছে সরকারের ভালো বা মন্দ হওয়ার ওপর তার দেশী বা বিদেশী হওয়ার কোনই প্রভাব নেই। এটা আলাদা কথা যে, বিজাতীয় ও বিদেশী সরকার সাধারণতঃ জালেম ও স্বৈরাচারী হয়ে থাকে। কেননা এক জাতি অন্য জাতির ওপর নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এই উদ্দেশ্যে যে, তাকে মানসিক গোলাম বানিয়ে আপন স্বার্থে ব্যবহার করবে। পক্ষান্তরে স্বদেশী ও স্বজাতীয় সরকারের মধ্যে পরিশুদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা বেশী

থাকে। তাই তাকে সংশোধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয় সরকার সব সময় ভাল হবে এবং বিজাতীয় সরকার কখনোই ন্যায় বিচারকারী হবেনা এটা জরূরী নয়, এমনও হতে পারে যে, একটি জাতির মাথার উপর তার নিজেরই হঠকারী ও উচ্ছৃংখল লোকেরা শয়তানের মত চেপে বসবে এবং গোটা জাতিকে আপন স্বার্থের আজ্ঞাবহ দাস বানিয়ে ধ্বংস করে ছাড়বে। এমনিভাবে এও সম্ভব যে, একটি জাতিকে ভিন্ন জাতির নিঃসার্থ ও ন্যায়পরায়ণ সংস্কারকামী লোকেরা এসে জুলুম ও স্বৈরাচারের যাতাকল থেকে রেহাই দেবে এবং তার জন্য নৈতিক ও বস্তুগত উন্নতির পথ খুলে দেবে। সুতরাং সরকারের ভালো হওয়ার প্রকৃত মাপকাঠি হলো তার সৎ হওয়া ও ন্যায়বিচারক হওয়া আর তার অসৎ হওয়া ও অত্যাচারী হওয়াই তার খারাপ হওয়ার প্রকৃত মানদন্ড।

তাই বলে ইসলাম জাতীয় সরকারের বিরোধী এমন ধারণা করা ঠিক নয়। নিজেকে শুধরে নেওয়ার অধিকার প্রত্যেক জাতিরই আছে–একথা ইসলাম স্বীকার করে। কিন্তু যখন কোন জাতির নৈতিক অধঃপতন ঘটে এবং সে দুষ্ট ও উচ্ছৃংখল প্রকৃতির নেতাদের পদাংক অনুসরণ করে অবমাননা ও লাঞ্ছনার গভীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইসলামের দৃষ্টিতে সেই জাতির আত্ম–নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম–শাসনের অধিকার আর থাকে না। তাদের চেয়ে যারা ভালো ও চরিত্রবান, ঐ জাতির উপর তাদের শাসন চালানোর অধিকার জন্মে। কোরআনে অবাধ্য ও অপরাধ প্রবণ জাতিদেরকে বারবার এরূপ হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছে।

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

"তোমরা যদি সত্য পথ থেকে মুখ ফিরাও তাহলে আল্লাহতায়ালা তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন–যারা তোমাদের মত অবাধ্য হবে না।" (সূরা–মুহাম্মাদ–৪)

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا (التوبہ : ٣٩)

"তোমরা যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অথচ তোমরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" (সুরা তওবা–৬)

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۝

"হে মানবজাতি, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যেতে ও তোমাদের যায়গায় অন্যদেরকে নিয়ে আসতে পারেন।"

(নিসা– ১৯)

এই মর্মে কোরআনে বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে। সেই সব আয়াতেরই বক্তব্য এই যে, শাসন পরিচালনার অধিকারের একমাত্র শর্ত হলো যোগ্যতা। যোগ্যতা যারা হারায়, অধিকারও তাদের থাকেনা। আর যারা যোগ্যতা অর্জন করে, তারা অধিকারও লাভ করে। এই যোগ্যতা শুধু শক্তির সামর্থক নয়। এই মহামূল্যবান উপাদানটি শুধু যারা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করে, সৎকাজের আদেশ দেয় অসৎকাজের প্রতিরোধ করে, প্রত্যেক সৎকাজ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে এবং একদিন নিজের কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে–এই কথা বিশ্বাস করে–শুধুমাত্র তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছেঃ

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

"তারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করে, ভালো কাজে দ্রুতগামী ও তৎপর থাকে। তারাই প্রকৃত সৎকর্মশীল।" (সুরা–আলে ইমরান–১২)

এই সৎলোকেরা কোন একটি বিশেষ জাতির বা বিশেষ দেশের একক সম্পত্তি নয়। তারা গোটা মানব জাতির যৌথ সম্পদ। তাদের যোগ্যতা ও সততা দ্বারা উপকৃত হবার অধিকার সকল আদম সন্তানেরই রয়েছে। তারা যদি নিজেদের কর্ম তৎপরতাকে বিনা প্রয়োজনে কোন সীমিত মানব গোষ্ঠী কিংবা ভূ–খন্ডের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে সেটা অবশ্যই মানব জাতির উপর

তাদের অবিচারের শামিল হবে। ইসলাম তাদের জন্য বর্ণ, বংশ বা ভৌগলিক ভাগাভাগির দিক দিয়ে কোন সীমা রেখা নির্দেশ করে নি। বরং তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভার সুফল জাতি–বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্য বিস্তৃত করে দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝

"আমি যবুর গ্রন্থে উপদেশ দেওয়ার পর লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎ বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।" (সূরা নিসা–৭)

শাসন ও সরকার পরিচালনা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার এই হলো মর্মকথা। এটা বুঝে নেয়ার পর সাহাবা কেরামের বিজয়াভিযান সমূহের কারণ সহজেই অনুধাবন করা যায়। কি কারণে তারা রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের তখত তাউস উল্টিয়ে দিয়েছিলেন এবং বাতিলের শাসনের তেলেসমাতী ফানুস চুপসে দিয়েছিলেন, তাও উপলব্ধি করা যায়। তারা নিজ দেশের সংস্কার কর্মসূচী সম্পন্ন করার পর যখন বহির্বিশ্বের দিকে নজর দিলেন তখন দেখলেন, সকল প্রতিবেশী দেশে জালেম রাজা ও স্বৈরাচারী শাসক জনগণের মাথার উপর সওয়ার হয়ে আছে। শক্তিমানেরা দুর্বলদের স্বাধীনতার টুটি চেপে ধরেছে। ধনবানেরা গরীবদের বিবেক ও মান সম্ভ্রম খরিদ করে রেখেছে। মানুষ মানুষের খোদা হয়ে বসেছে। ন্যায় বিচার, ইনসাফ ও আইনের শাসন বলতে সেখানে কিছুই নেই। রাজা ও শাসকদের চোখের ইশারায় মানুষের অধিকার সমূহ দলিত মথিত হয়, মান–সম্ভ্রম লুন্ঠিত হয়, ঘরবাড়ী বিরাণ হয় জাতি সমূহের ভাগ্যের ফায়সালা হয়ে যায়। দেখলেন সেখানে দরিদ্র শ্রমজিবী মানুষ নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে অর্থ উপার্জন করে, তা নানা রকমের জুলুমের মাধ্যমে লুন্ঠিত হয় ও রাজকর্মচারীদের বিলাস ব্যসনে ব্যয় হয়ে যায়। শাসকরা চরম পাপাসক্ত, লম্পট ও দুষ্কর্ম প্রবন। এ জন্য প্রজারাও নানা রকমের অপরাধে জর্জরিত। সেখানে মদ, জুয়া ও ব্যাভিচারের অবাধ লাইসেন্স রয়েছে। ঘুষ ও সরকারী সম্পদ আত্মস্বাতের জোয়ার বয়ে চলেছে। প্রবৃত্তির উচ্ছৃংখলতা নৈতিকতা ও মানবতার সকল সীমা লংঘন ও সকল বাধা বন্ধন ছিন্ন করেছে। পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য মানুষ

আর কোন বাধাবন্ধন মানছেনা। মানুষের নৈতিক অধঃপতন এমন চরমে পৌঁছেছে যে, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বাহ্যিক জৌলুসের পর্দা তুলে দেখলে পশুরাও তার পশুত্ব দেখে লজ্জা পাবে। ১

মানব জাতিকে এহেন লাঞ্ছনাকর অবস্থায় পতিত দেখে পুণ্যবানদের সেই নিবেদিত প্রাণ দলটি সংস্কার ও সংশোধনের জন্য কৃতসংকল্প হলেন। প্রথমে তারা সদুপদেশ দিতে লাগলেন। পারস্য ও রোমের সম্রাট এবং মিসরের রাজাকে দাওয়াত দিলেন যে, ইসলামের সততা ও ন্যায়বিচারের পথ গ্রহণ করুন। তারা যখন সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো, তখন তারা আহবান জানালেন যে, সত্যিকার যোগ্য লোকদের জন্য ক্ষমতার আসন খালী করে দিন। কিন্তু যখন এই ডাকও অগ্রাহ্য করা হলো এবং এর জবাবে তরবারী দেখানো হলো, তখন মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষের এই নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল দলটি সেই বিশাল সাম্রাজ্য দুটিকে আক্রমণ করে ভুমিস্মাৎ করে দিলেন। ভারতের সীমান্ত থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত যারা তাদের জুলুমে পিষ্ট হচ্ছিল তাদের সকলকে মুক্ত করে দিলেন।

ইচ্ছা করলে তাদের এই পদক্ষেপকে সাম্রাজ্যবাদ বা আগ্রাসন যা খুশী বলতে পারেন। কিন্তু ইতিহাসের এ বর্ণনা খন্ডন করতে পারেন না যে, তাদের সরকার অধঃপতিত সেই জাতিসমূহকে চরম মানবেতর অবস্থা থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম চূড়ায়

---

১. ইরান, রোম ও মিসর প্রভৃতি দেশে তৎকালে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে যে মানবেতর পর্যায় ছিল, তার বর্ণনায় ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। ব্যাবিচার বাপ, মেয়ে ও ভাই বোনের পর্যন্ত ভেদাভেদ ছিলনা। ধর্মযাজকরা পর্যন্ত জঘন্যতম নৈতিক অপরাদে লিপ্ত হতো। ইরানে মজদকী ধর্ম সমাজের সমস্ত শৃংখলা ধ্বংস করে দিয়েছিল। রোমে রাজা ও রাজকর্মচারীদের ইন্দ্রিয় পূজার দরুণ চারদিকে অধঃপতনের চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। রোমকদের গোলামীর দরুণ মিসর ও আফ্রিকার জনগণের মধ্যে ঘোর চরিত্রহীনতার প্রসার ঘটেছিল। আরবের সীমান্ত সংলগ্ন সিরিয়া ও ইরাকে এই দুই সাম্রাজ্যের প্রভাবে নৈতিক পংকীলতার প্রচন্ড সয়লাব বয়ে চলছিল। এই অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য ইসলামের ইতিহাসের পরিবর্তে স্যার জন ম্যালকম ও এডওয়ার্ড গীবন প্রমুখ ইউরোপীয় পন্ডিতদের লেখা গ্রন্থাবলী পড়তে আমি পাঠককে অনুরোধ করি। লাইকির "হিষ্ট্রী অব ইউরোপিয়ান ওয়ারস"– এ বিশেষভাবে তৎকালীন রোমকদের নৈতিক দেউলিয়াপনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।–গ্রন্থকার

আরোহণ করিয়েছিলেন। যে দেশ ও জাতি সভ্যতা ও কৃষ্টির নাম পর্যন্ত জানতো না তার মধ্যে তারা নতুন করে উন্নতি ও অগ্রগতির এমন দুর্জয় শক্তি জাগিয়ে তোলেন যে মানবজাতির মধ্যে তাদের সেই প্রচেষ্টার সুফল আজও পর্যন্ত বর্তমান। জাতীয়াতাবাদের পুজারীরা হয়তো এই ফতোয়া দেবে যে, রোম ও ইরান না হয় ধ্বংসই হয়ে যেত, তাতে কি! আরবদের কোন অধিকার ছিলনা তাদের ওপর আক্রমণ করার। কিন্তু সনাতন সত্যের সুস্পষ্ট রায় এই যে, তারা এই আক্রমণ চালিয়ে মানবতার সবচেয়ে বড় কল্যাণ সাধন করেছেন। বস্তুতঃ এটা মানবজাতির সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, তার একটি বিরাট অংশ সেই মহৎ মানব–গোষ্ঠীর মূল্যবান সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে–যাদের চেয়ে 'সৎ' মানুষ পৃথিবীতে আর কখনো জন্মেনি।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা

ইসলামের সশস্ত্র সংগ্রামের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র কোরআন, রাসুলের হাদিস এবং প্রামাণ্য ইসলামী গ্রন্থাবলী থেকে গৃহীত। এর কোথাও অমুসলিমদেরকে বল প্রয়োগে মুসলমান করার নির্দেশ নেই। এমনকি কোন আদেশে এরূপ অর্থ গ্রহণেও অবকাশ নেই যে, ইসলাম তরবারীর শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে নিজের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য করে। ইসলামের যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশাবলীতে এরূপ কোন নির্দেশ না থাকাই ইসলামবিরোধীদের অপবাদ খন্ডনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু গোড়া লেখকগণ ও তাদের অন্ধ সমর্থকগণ এ ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে এত বেশী ধোকা দিয়েছেন এবং এত বেশী ভুল ধারণার প্রসার ঘটিয়েছেন যে, এ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশাবলী ও নীতিমালা স্পস্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

পবিত্র কোরআনের যে সমস্ত আয়াতে যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে যুদ্ধ ও রক্তপাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে তার একটা সীমা, নির্দেশ করা হয়েছে। সেই সীমা অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু এক জায়গায় নয়– কোরআনের একাধিক জায়গায় সম্পুর্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই সীমারেখা টানা হয়েছে। সূরা বাকারায় মুসলমানদেরকে কেতাল তথা সশস্ত্র সংগ্রামের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط

"যতক্ষণ না অরাজকতা ও বিশৃংখলা দূরীভূত হয় এবং আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয় ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।" (সুরা বাকারা–২৪)

এখানে حَتّٰى (যতক্ষণ) শব্দটি একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছে। অর্থাৎ যতক্ষণ বিশৃংখলার অস্তিত্ব থাকে এবং ইসলামের অগ্রগতি ও প্রসারের পথে অন্তরায় থাকে ততক্ষণ যুদ্ধ চালাতে হবে। এই দুটো জিনিস যখন দুরীভুত

হবে তখন যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করে দিতে হবে। আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছেঃ

فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ (بقره: ۱۹۳)

"তারা যদি বিশৃংখলা ছড়ানো থেকে বিরত হয় তাহলে জেনে রাখা দরকার যে জালেমদের ছাড়া আর কারো জন্য শাস্তি নেই।" (সূরা বাকারাহ–২৪)

সূরা মায়েদায় আরো সুষ্ঠভাবে মানুষের প্রাণ বধ করা কখন হারাম এবং কখন হালাল তা বলা হয়েছেঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ط (المائده: ۳۲)

"কাউকে হত্যাও করেনি এবং অরাজকতা ও গোলযোগও সৃষ্টি করেনি এমন ব্যক্তির প্রাণ যে বধ করবে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই খুন করলো।" (সূরা মায়েদা–৫) এ থেকে বুঝা গেল যে, মানুষকে শুধু দুই অবস্থায় হত্যা করা যায়ঃ প্রথমতঃ সে যদি অন্য কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, দ্বিতীয়তঃ সে যদি পৃথিবীতে অরাজকতা ও দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি করে। এই দুই অবস্থা ব্যতীত তৃতীয় কোন অবস্থায় কাউকে খুন করা শুধু অবৈধই নয়– এত বড় পাপ যে আল্লাহ তকে সমগ্র মানব–জাতিকে হত্যা করার সমান মনে করেন।

সূরা তওবায় জিজিয়া আদায় করাকে যুদ্ধের প্রান্তিক সীমা বলে ঘোষনা করা হয়েছে। যথাঃ

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝

"তারা যতক্ষণ না স্বহস্তে জিজিয়া দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ কর।" (সূরা তওবা–৪)

এ থেকে বুঝা গেল যে, কাফেররা যখন জিজিয়া আদায় করে ইসলামী আইনের আনুগত্য গ্রহণে রাজী হয়ে যায় তখন আর তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায় না এবং যুদ্ধের অনুমতির সীমা শেষ হয়ে যায়।

সুরা শুরায় একটা মৌলিক বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। সে বিধি অনুসারে যারা মানুষের ওপর জুলুম করেনা এবং পৃথিবীতে কোন গোলযোগ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করেনা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ করা বৈধ নয়ঃ

مَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝
اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ (الشورى: ٤١-٤٢)

"যে ব্যক্তি জুলুমে পিষ্ট হওয়ার পর তার বদলা গ্রহণ করে তাকে দোষ দেয়া যায় না। দোষ দেয়া যায় কেবল তাদেরকে যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং নাহকভাবে হঠকারিতা ও অহংকার করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" (সুরা শুরা–১৪)

সুরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা সত্য দ্বীন ও তার অনুসারীদের দুশমন, কেবল তাদের সাথেই মুসলমানদের শত্রুতা থাকবে। যারা সে ধরণের নয়, তাদের সাথে সদাচার ও ন্যায় বিচার মুলক ব্যবহার করতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়নিঃ

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ
وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ
قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا
عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ ۝ (الممتحنة: ٨-٩)

"যারা দ্বীনের প্রশ্নে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে বহিস্কার করেনি তাদের সাথে ইনসাফ ও সদাচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। কেননা আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবসেন। আল্লাহ তায়ালা কেবল সেই কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে তোমাদের নিষেধ করেন যারা তোমাদের সাথে দ্বীনের

প্রশ্নে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ীঘর থেকে বহিস্কার করেছে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করার ব্যাপারে শত্রুদের সাহায্য করেছে। যারা এ ধরনের কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা জালেম।"
(সূরা মুমতাহিনা–২)

এই সব নির্দেশের মর্ম এত স্পষ্ট যে এর জন্য আদৌ কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। এ থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, ইসলামী যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে বল প্রয়োগে মুসলমান করা নয়,–বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো জুলুম, হঠকারীতা এবং বিশৃংখলা–অরাজকতা নির্মূল করে তাদেরকে সুবিচারমুলক আইন ও বিধানের অনুগত করে দেয়া।

যারা ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূল করার চেষ্টা করে কিংবা পৃথিবীতে ফেৎনা ও ফাসাদ তথা অরাজকতা ও বিশৃংখলা ছড়ায় তাদের শিরচ্ছেদ করার ব্যাপারে ইসলামের তরবারী নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ধারালো ও শক্তিশালী। এ ব্যাপারে তার ধারালো ও শক্তিশালী হওয়া যে ন্যায় সঙ্গত তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু যারা জালেম নয়, পাতকীও নয়, যারা আল্লাহর পথ অবরোধ করেনা, যারা সত্য দ্বীনকে নির্মুল করতে ও তার অগ্রগতি রোধ করতে চেষ্টা করেনা, যারা মানুষের শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করেনা, তারা যে জাতির লোকই হোক না কেন এবং তাদের আকীদা বিশ্বাস যত বাতিল ও ভ্রান্ত হোক না কেন ইসলাম তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করে না। তাদের ব্যাপারে ইসলামের তরবারী ভোতা। তাদের রক্তপাত ইসলামের চোখে অবৈধ ও হারাম।

দ্বীনের ব্যাপারে বল প্রয়োগ চলবেনা

যুদ্ধের এই সীমা নির্দ্ধারণের পর আর কোন আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আল্লাহর কিতাব এ ব্যাপারে চুড়ান্ত স্পষ্টবাদিতার আশ্রয় নিয়েছে। সে শুধু পরোক্ষভাবেই আমাদের সুপথ প্রদর্শন করে ক্ষান্ত থাকেনি বরঞ্চ প্রত্যক্ষভাবেও জানিয়ে দিয়েছে যে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি ও বল প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। সুরা বাকারায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছেঃ

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ (البقرة: ٢٥٦)

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি চলবে না। সোজা পথ ভ্রান্ত পথ থেকে আলাদা করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন যে ব্যক্তি বাতিল মনিবদের পরিত্যাগ করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে সে অটুট রশী ধারণ করবে।"

এ আদেশ এমনিতেই অত্যন্ত স্পষ্ট। তদুপরি যে পটভুমিতে তা নাজিল হয়েছে তা দৃষ্টি পথে থাকলে এর বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। মদিনাবাসীদের রীতি ছিল কোন মহিলার সন্তান না বাঁচলে সে মান্নত মানতোঃ আমার সন্তান বেঁচে থাকলে তাকে ইহুদী করবো। মদিনায় এভাবে আনসারদের বহু শিশু সন্তানকে ইহুদী করা হয়েছিল। চতুর্থ হিজরীতে যখন হযরত রাসুলে করীম (সঃ) বনু নজীরকে তাদের ষড়যন্ত্রমুলক কার্যকলাপের দরুন বহিস্কার করলেন তখন তাদের মধ্যে আনসারদের সেই সমস্ত ইহুদী শিশুরাও ছিল। আনসাররা বললেন আমরা আমাদের সন্তানদের যেতে দেব না। আমরা তাদেরকে ইহুদী বানিয়েছিলাম তখন যখন তাদের ধর্মকে আমরা আমাদের ধর্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করতাম। কিন্তু এখন ইসলামের সুর্য উদিত হয়েছে। সকল ধর্মের সেরা ধর্ম আজ আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা আমাদের সন্তানদের ইহুদী থাকতে দেবনা। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবো" এই সময় নাজিল হলো لا اكراه فى الدين "ধর্মে জবরদস্তি চলবে না। " তাদেরকে মুসলমান হতে বাধ্য করো না।

অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে আনসারদের এক ব্যক্তির দুই ছেলে খৃষ্টান ছিল। তিনি হযরত রাসুলে করীম (সঃ) এর নিকট হাজির হয়ে বললেন আমার ছেলে খৃষ্টান ধর্ম ছাড়তে রাজী হচ্ছে না, তাকে কি আমি বাধ্য করতে পারিনা? এর জবাবে لا اكراه فى الدين নাজিল হয়। উল্লিখিত দুটি রেওয়ায়েত দু'রকমের হলেও দু'টোরই মর্মার্থ এক। আল্লামা ইবনে কাছির তার প্রখ্যাত তাফসির গ্রন্থে লিখেছেন যে, আয়াত নাজিলের এই পটভুমির পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের আদর্শ স্পষ্টতই এ রূপ মনে হচ্ছে ঃ

لا تكرهوا احدا على الدخول فى دين الاسلام فانه
بين واضح جلى دلائله وبراهينه لا يحتاج الى ان يكره احد
على الدخول فيه بل من هداه الله للاسلام وشرح صدره
ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن اعمى الله قلبه
وختم على سمعه وبصره فانه لا يفيده الدخول فى الدين
مكرها ومكسورا۔

"কাউকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য করোনা। কেননা ইসলাম এত স্পষ্ট এবং তার দলীল প্রমাণ এত উজ্জ্বল যে, এতে কাউকে প্রবেশ করতে বাধ্য করার প্রয়োজনই নেই। আল্লাহ যাকে সুপথ দেখাবেন, সত্যকে গ্রহণ করার জন্য যার বুক প্রশস্ত করে দেবেন এবং যাকে সত্য দর্শনের জ্যোতি দান করবেন, সে সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই তা গ্রহণ করবে। আর যার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির ওপর মোহর মেরে দেবেন, তাকে বল প্রয়োগে ইসলামে প্রবেশ করানোর কোন অর্থ হয় না।"

জামাখ্শরী স্বীয় তাফসীরে কাশশাফে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত মতের সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

لم يجر الله امر الايمان على الاجبار والقسر ولكن
على التمكن والاختيار ونحوه قوله وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ
فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ اى لو شاء لقسرهم على الايمان ولكن لم يفعل
وبنى الامر على الاختيار۔

"আল্লাহ ঈমানের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের অবকাশ রাখেন নি বরং স্বাধীন ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের এ আয়াতটি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ولو شاء ربك لامن الخ তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে সমস্ত বিশ্ববাসী একযোগে ঈমান আনতো। তুমি কি তাদের ঈমান আনতে বাধ্য করার

পক্ষপাতী?" অর্থাৎ মানুষকে জোর পূর্বক মুসলমান বানানোই যদি আল্লাহ ভালো মনে করতেন তাহলে তিনি নিজেই সকলকে ঈমান আনতে বাধ্য করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। মানুষের ইচ্ছার ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়েছেন।"

ইমাম রাজী স্বীয় তাফসরিে এই আয়াত সম্পর্কেই আবু মুসলিম ইসপাহানী ও কাফফালের অভিমত উদ্ধৃত করেছেনঃ

"এর অর্থ এইযে, আল্লাহ তায়ালা ইসলামের ব্যাপারে কঠোরতা ও জবরদস্তির অবকাশ রাখেননি, স্বাধীন ইচ্ছার ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাওহীদের দলীল–প্রমাণ এমন অকাট্যভাবে দিয়ে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে আর কোন ওজর আপত্তির অবকাশ নেই। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, এ সব অকাট্য প্রমাণ দেয়ার পর কোন কাফেরের পক্ষে আর কুফরীর ওপর জিদ করার যুক্তি নেই। এ সত্ত্বেও যদি সে ঈমান না আনে তাহলে তাকে শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করা ছাড়া ইসলামে দীক্ষিত করার আর কোন উপায় থাকেনা। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার জায়গা, তাই এখানে এই শক্তি প্রয়োগ বৈধ নয়। কেননা তাহলে পরীক্ষার উদ্দশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।" সুরা কাহাফে আল্লাহ তায়ালা এ জন্যই বলেছেনঃ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

(আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেল। অতএব এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা কুফরী করুক।) অন্যত্র বলেছেনঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

(তোমার প্রভু ইচ্ছা করলে সারা বিশ্ববাসী মুসলমান হয়ে যেত। কিন্তু তাই বলে তুমি কি মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে চাও?) সুরা শুয়ারায় বলা হয়েছেঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝

(তারা ঈমান আনেনা এই দুঃখে আপনি যেন মরতে বসেছেন। আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে এমন একটা নিদর্শন নাজিল করতে পারি যার সামনে তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। কিন্তু আমি তা করি না।)

স্বয়ং ইমাম রাজী এই বক্তব্য সমর্থন করে বলেনঃ

وما يوكد هذا القول انه تعالى قال بعد هذه الآية
قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ظهر الدلائل ووضحت البيّنات
ولم يبق بعدها الا طريق القسر والالجآء والاكراه وذلك
غير جائز لانه ينافى التكليف۔

“আয়াতটির অব্যবহিত পরই আল্লাহ বলেছেনঃ হেদায়াতের পথ গোমরাহীর পথ থেকে আলাদা করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দলীল প্রমাণ প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। এখন কেবল বলপ্রয়োগ ও জোর জবরদস্তির পথ বাকী। কিন্তু সে পথ বৈধ নয়। কেননা সেটা স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতার পরিপন্থী।”

এটা সত্য যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক মতভেদ হয়েছে। কারো কারো মতে এ আয়াত মানছুখ বা রহিত। কেউ কেউ বলেন এ নির্দেশ শুধু কিতাব ধারীদের জন্য। কেউ কেউ বলেন, এটা কেবল আনসারদের জন্য। কেউ কেউ আবার একেবারেই সীমা অতিক্রম করে আল্লাহর কালামের সাথে এ ভাবে বিদ্রুপ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন যে, ইসলামে কোন বল প্রয়োগ করা হলেও তা প্রকৃতপক্ষে বলপ্রয়োগ নয়। অর্থাৎ কেউ যদি তরবারীর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলেও একথা বলা চলবেনা যে, সে বলপ্রয়োগে মুসলমান হয়েছে। কিন্তু এসব উক্তি শুধুমাত্র বই কিতাবেই সীমিত। বাস্তব জগতে এসব মতামতের প্রতিফলন দীর্ঘ ১৪ শো বছরের মধ্যেও ঘটেনি। দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকতে পারে। কিন্তু তা দিয়ে কোন নীতি নির্ধারণ করা চলে না। বাস্তবিক পক্ষে যদি ইসলামের শিক্ষা এই হতো যে ইসলাম গ্রহণের জন্য লোকদেরকে শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করা যেতে পারে, তাহলে গত ১৪ শো বছরে মুসলিম জাতি অন্ততঃ একটি বার এই শিক্ষা অনুসারে মানুষকে জোর জবরদস্তি পূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করতো। কিন্তু এমন কাজ

আজ পর্যন্ত করা হয়নি। খেলাফতে রাশেদা এবং হজরত রসুলে করীম (সঃ) এর যুগ ছিল কোরআনের আদর্শের সঠিক প্রতিচ্ছবি এবং তখন ইসলাম ছিল তার নিজস্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত। সেই খেলাফত ও নবুয়তের পবিত্র যুগেও এরূপ কাজ করা হয়নি। হযরত রসুলে করীম (সঃ) একাধিকবার কাফেরদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করেছেন এবং তাদের বড় বড় দল তাঁর করতলগত হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো তাদেরকে ইসলামের ফাঁদে আটকান নি। কেবল ইসলামের মহান ও পবিত্র শিক্ষা দিয়ে তাদের মনের মলিনতা ও পংকীলতা দুর করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। দিকে দিকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য তিনি যে ছোট ছোট বাহিনী পাঠাতেন, তাদেরকে তিনি বলে দিতেন যেন কোন রকম কঠোরতা প্রয়োগ করা না হয়। হজরত আবু মুসা আশায়ারী ও মায়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে যখন ইয়ামানে পাঠালেন তখন বলে দিলেনঃ

يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا

"নম্র ব্যবহার করো, কঠোর ব্যবহার করোনা। লোকদের খুশী করো, বিদ্বেষ ছড়িও না" মক্কা বিজয়ের সময় তিনি যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন যেসব কাফের একদিন তার রক্ত পিপাসু শত্রু ছিল তাদেরকে

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

(আজ তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই, যাও, তোমরা মুক্ত) বলে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন। কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করলেন না। এইসব লোকের মধ্য থেকেই দু'হাজার লোক হোনাইন যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবকরূপে হযরত রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে অংশ নেয়। মক্কার আশে পাশে তিনি যেসব দল ইসলামের দাওয়াতের জন্য পাঠান তাদেরকে শসস্ত্র সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে নির্দেশ দেন। আল্লামা ইবনে জারীর লিখেছেনঃ

بعث النبى صلى الله عليه وسلم فيما حول مكة السرايا تدعوهم

الى الله عز وجل ولم يامرهم بالقتال

"হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার আশে পাশে ছোট ছোট বাহিনী পাঠান। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে বলেছিলেন, যুদ্ধ করতে বলেন নি।" বনু জুজাইমা গোত্রে যখন হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ

হজরত রসুলে করীম (সঃ) এর অনুমতি ছাড়া রক্তপাত করেন তখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, ঐ ঘটনার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। পরে তিনি সেই গোত্রের নিহত কুকুরের পর্যন্ত দিয়াত (হত্যার বদলে অর্থ দন্ড) প্রদান করেন। এ শুধু কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। নচেৎ হজরতের সমগ্র জীবনে এমন একটি ঘটনাও মিলবেনা যে, তিনি কোন ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, لا إكراه فى الدين কথাটার শাব্দিক অর্থই সঠিক অর্থ অন্যথায় কোরআনের একটি নির্দেশও এমন নেই যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) তা কার্যকরী করে নিজ জীবনে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন নি।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়ে থাকে। হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে বললোঃ انى اجدنى كارها অর্থাৎ আমি অপছন্দ করি। হজরত বললেন وان كنت كارها فان الله سيرزقك حسن النية والاخلاص অর্থাৎ "অপছন্দ করা সত্ত্বেও গ্রহণ কর। আল্লাহ তোমাকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দান করবেন।" আশ্চর্য লাগে যে, এ হাদীসকে কিভাবে বল প্রয়োগের বৈধতার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যেতে পারে। অথচ এখানে مكرها নয়, বরং كارها শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। كارها শব্দটি দ্বারা মনের অপ্রস্তুতি ও অপছন্দের ভাবটাই শুধু বুঝানো হয়েছে। এ থেকে কি করে বুঝা যায় যে, হজরত ঐ ব্যক্তিকে জবরদস্তিমূলকভাবে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন।

যারা আয়াতটি রহিত বলে মত প্রকাশ করেছেন, তাদের যুক্তি এছাড়া আর কিছু নয় যে, তারা কেতাল বা সশস্ত্র সংগ্রামের নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াত সমূহের সাথে এর সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি। নচেত কোন বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত দ্বারা এ আয়াতের রহিত হওয়া প্রমাণিত হয় না। কোরআনের কোন আয়াত রহিত হওয়া কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং তার জন্য কি ধরনের দলীল প্রমাণ প্রয়োজন, সে কথা না হয় নাই তুললাম। আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে, এই আয়াত রহিত হওয়ার কথা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরবর্তী যুগের আবিষ্কার। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর যুগের বড় বড় সাহাবীগণ এ কথা জানতেন না। এ কথা যদি সে সময়কার মানুষের জানা থাকতো। তাহলে হজরত ওমরের মত শরিয়ত বিশারদ ব্যক্তি তার ভৃত্য আছবাককে ইসলাম

গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের স্বাধীনতা দিতেন না। ইবনে আবি হাতেমের এ রেওয়ায়েত রহিত হওয়া সংক্রান্ত মত খন্ডন করার জন্য যথেষ্টঃ

عن اسبق قال كنت فى دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب فكان يعرض علىّ الاسلام فآبى فيقول لا اكراه فى الدين و يقول يا اسبق لو اسلمت لاستعنابك على بعض امور المسلمين -

"আছবাক বলেন, আমি হজরত ওমরের খৃষ্টান গোলাম ছিলাম। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু আমি অস্বীকার করতাম। এতে তিনি বলতেন, لا اكراه فى الدين (ইসলামে বল প্রয়োগের অবকাশ নেই) তারপর বলতেন, আছবাক, তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে আমরা তোমাকে দিয়ে মুসলমানদের কোন কোন কাজে সাহায্য নিতাম।"

ইমাম ইবনে জারীর তাবারীর অভিমত এ ব্যাপারে ইমাম রাজী ও ইবনে কাছীরের অভিমত থেকে কিছুটা ভিন্ন। কিন্তু তিনি ছাহাবায়ে কেরাম ও অতীত ইমামগণের অভিমত উল্লেখ করার পর রহিত হওয়া সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেনঃ

"এ থেকে বুঝা যায় যে, لا اكراه فى الدين এর অর্থ হলোঃ যে নাগরিকের নিকট জিজিয়া আদায় করা বৈধ, সে যদি জিজিয়া দিয়ে দেয় এবং ইসলামী সরকারের আনুগত্য করতে স্বীকৃত হয় তাহলে তাকে ঈমান আনতে বাধ্য করা চলবেনা। সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা এ আয়াত لا اكراه فى الدين রহিত হয়েছে বলে যিনি মনে করেন তিনি ভুল করেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে এ আয়াতে তো আনছার ছেলেমেয়েদের জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সুতরাং এটি অন্যদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে কেন? এর জবাবে আমি বলবো যে, আনছারদের ব্যাপারেই যে এ আয়াত নাজিল হয়েছে, সেটা সত্য কথা। কিন্তু এর প্রয়োগ যে ঐ ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সকল ব্যাপারেই চলবে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয় তারা ইসলামের আদেশ জারী হওয়ার পূর্বে

তওরাতের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে নিষেধ করে দেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞাটি এমন ভাষায় অবতীর্ণ করা হয় যে, যে সব ধর্মের অনুসারীদের নিকট থেকে জিজিয়া গ্রহণ করা বৈধ তাদের সকলেই উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হয়েছে।”

‘যারা বলপ্রয়োগের এই নিষেধাজ্ঞা কেবল আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে মনে করেন, তাদের কাছেও তাদের মতের স্বপক্ষে কোরআন ও হাদীছের কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। لا اكراه (বলপ্রয়োগ চলবে না) এ আদেশ অপর সার্বজনীন ও সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিশেষ পটভূমিতে নাজিল হয়েছে বলেই তা বিশেষ ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে না। অন্যথায় কোরআনের কোন আদেশই বিশেষ প্রেক্ষিত ছাড়া নাজিল হয়েছে–এমন পাওয়া যাবে না। কাজেই বিশেষ প্রেক্ষিতের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট করা আরম্ভ করলে সব আদেশকেই নির্দিষ্ট ও সীমিত করতে হবে। একথা সত্য যে, জিজিয়া সংক্রান্ত সুরা তওবার আয়াতটিতে শুধুমাত্র আহলে কিতাবেরই উল্লেখ রয়েছে। তাই আপাত দৃষ্টিতে উক্ত আয়াত ছাড়া শুধুমাত্র আহলে কিতাবদের জন্যই বল প্রয়োগের নিষেধাজ্ঞা এসেছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞ ইমামগণ এতদসত্ত্বেও সকল কাফের মুশরিকদেরকেই উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত বলে রায় দিয়েছেন। হানাফী ইমামদের অধিকাংশের অভিমত যদিও এই যে, আরবের অংশীবাদীরা এ আয়াতের আওতাভুক্ত নয়। (অবশ্য জিজিয়ার আয়াত নাজিল হওয়ার আগে এই সম্প্রদায়টির অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তাদের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।) কিন্তু ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ ও ইমাম আওজায়ী প্রমুখ আরবের পৌত্তলিকদেরকেও এই অনুকম্পার গন্ডীভূক্ত করেছেন। আর এটাই প্রথম শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত মুসলিম সমাজ ও মুসলিম শাসকগণ বাস্তবে রূপ দিয়ে এসেছেন। তারা কাফের ও অবিশ্বাসী তা যে ধরনের এবং যত প্রকারেরই হোক না কেন, সকলের নিকট থেকে জিজিয়া গ্রহণ তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও নাগরিকত্ব প্রদান করেছেন।

এভাবে এক দিকে জিজিয়ার আয়াতের মধ্যে যখন সকল অবিশ্বাসীকেই অন্তর্ভুক্ত করা হলো এবং অন্যদিকে বলপ্রয়োগ চলবে না বলে নাজিল হওয়া

আয়াত যখন স্পষ্টতই কোন বিশেষ শ্রেণীর অবিশ্বাসীর জন্য নির্দিষ্ট নয়, তখন কোন শরিয়ত সম্মত দলীল প্রমাণ ছাড়াই বলপ্রয়োগের নিষেধাজ্ঞাকে কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট ও সীমিত করা কিভাবে সঙ্গত ও বৈধ হতে পারে? ইসলামে সকল শ্রেণীর কাফেরের নিকট থেকেই জিজিয়া গ্রহণ করা হয় তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি আহলে কিতাবভুক্ত হোক বা না হোক, তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যায় না। কেননা জিজিয়া দেয়ার পর যে বল প্রয়োগের অবকাশ থাকে না সেটা ইসলামী আইনের স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বিধি।

দাওয়াত ও তবলীগের সর্বপ্রধান মূলনীতি

বস্তুতঃ সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা জিজিয়া সংক্রান্ত আয়াতের বক্তব্য لا اكراه في الدين এর ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরোধী নয়। যারা এই দুই বক্তব্যে বৈপরিত্য বা সংঘাত দেখতে পান, তারা আসলে দৃষ্টি–প্রমাদে ভোগেন। আসলে আল্লাহ তায়ালা ইতিপূর্বে যে শর্তহীন ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রাম ও জিজিয়ার আয়াত দ্বারা সেই স্বাধীনতাকে নিয়ম শৃংখলার আওতায় নিয়ে এলেন। প্রথম প্রথম যখন মুসলমানরা দুর্বল ছিল এবং خير امة (শ্রেষ্ঠ দল) امة وسطا। (মধ্যম পন্থী জাতি) হিসাবে আল্লাহ তাদের দিয়ে যে কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন, তা সম্পন্ন করার ক্ষমতা যখন তাদের মধ্যে জন্মেনি, তখন মুসলমানরা শুধু لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম) বলেই শুধু ক্ষান্ত থাকে নি, বরং এ কথাও বলতো যে, لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ (আমাদের কাজের ফল আমরা ভোগ করবো, তোমাদের কাজের ফল তোমরা ভোগ করবে।) তাদের মধ্যে এতটুকু শক্তি ছিল না যে, চারিত্রিক দোষ ত্রুটি থেকে দুনিয়াকে পবিত্র করে এবং অরাজকতা ও বিশৃংখলা দুর করে। এজন্য আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার–এর কাজ একই পদ্ধতিতে চলতে থাকে। হজরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারীরা যেরূপ মানুষকে তওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন এবং সমাজ কায়েম করার উপদেশ ও আহবান জানাতেন, তেমনি চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা, মিথ্যা বলা, রাহাজানি করা, আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরানো প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যও কেবল মৌখিক

নিষেধ করে ও তাদের মনে ঘৃণা জন্মিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন। কিন্ত যখন মুসলমানরা দুর্বল ও অসহায়াবস্থায় থেকে মুক্ত হলো এবং তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষমতা যখন তাদের অর্জিত হলো, তখন কাউকে বলপ্রয়োগে মুসলমান বানানো হবে না-এ নীতিটা বহাল রইল বটে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ সিদ্ধান্তও জানিয়ে দেয়া হলো যে, যেখানে আমাদের ক্ষমতায় কুলাবে, আমরা অরাজকতা, বিশৃংখলা ও অন্যান্য দুস্কর্ম হতে দেব না। এ সময়ে আমর বিল মারুফের (ভালো কাজে আদেশ দান) এর গন্ডী নাহি আনিল মুনকার (মন্দ কাজ প্রতিরোধ) এর গন্ডী থেকে আলাদা হয়ে গেল। নাহি আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে দাওয়াত ও প্রচারের পাশাপাশি তরবারীও যোগ দিল। দুনিয়ার মানুষের সম্পত্তির তোয়াক্কা না করেই সমগ্র পৃথিবীকে ফেৎনা ও ফাসাদ থেকে মুক্ত করার সংকল্প নেয়া হলো। কিন্তু আমর বিল মারুফের ক্ষেত্রে সেই لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ চলবে না।) এবং مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (আপনি বলপ্রয়োগকারী হিসাবে প্রেরিত হন নি) এর নীতি বহাল রইল।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, ইসলামের দুটো দিক রয়েছে। এক হিসাবে তা দুনিয়ার জন্য আল্লাহর আইন স্বরূপ। অপর হিসাবে তা সততা ও ন্যায়পরায়নতার প্রতি একটি আবেদন ও আহবান বিশেষ। প্রথম পর্যায়ে তার লক্ষ্য পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, জালেম ও হটকারী লোকদের কবলে পড়ে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে তাকে রক্ষা করা এবং বিশ্ববাসীকে নৈতিকতা ও মানবতার চতুঃসীমার মধ্যে থাকতে বাধ্য করা। এ উদ্দেশ্য সাধনে শক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা সর্ব স্বীকৃত। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে তার লক্ষ্য হলো আত্মার পবিত্রতা সাধন, মন মানসের মলিনতা, শোষণ এবং জৈবিক ও পাশবিক পংকিলতাসমূহ প্রক্ষালন করে আদম সন্তানকে শ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত করা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তরবারীর ধার নয় হেদায়েতের আলো প্রয়োজন। হাত পা ও মাথার নতি স্বীকার করা নয়-মনের নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতা প্রয়োজন। দেহের বশ্যতা নয়-আত্মার অনুগত্যশীলতা আবশ্যক। যদি কেহ মাথার উপর তরবারী চক্ চক্ করতে দেখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে অথচ তার মন যথারীতি পৌত্তলিকতা ও নানা রকমের বাতিল প্রভুর প্রতি আসক্ত থাকে, তা হলে আন্তরিক নিষ্ঠা বিবর্জিত সেই মৌখিক স্বীকৃতি কোন

কাজেই আসবে না। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইসলামের কথা বাদ দিন। দুনিয়ার যেসব সাধারণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পার্থিব স্বার্থোদ্ধার ছাড়া আর কিছু নয়, সেগুলিও এমন অনুসারীদের ওপর ভরসা করে সাফল্যের আশা করতে পারে না, যারা কেবল মৌখিক সহানুভুতি দেখায়, কিন্তু অন্তর দিয়ে সমর্থন করে না। আন্তরিকতাহীন, বিমনা ও কপট অনুচরদের নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন আন্দোলন সাফল্যমন্ডিত হতে পারে নি। বস্তুত সত্য নিষ্ঠাহীন কতগুলো মাংসপিন্ড নিয়ে কেউ দুনিয়ার প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস করতে ও সাফল্য লাভের আশা পোষণ করতে পারে না। আর পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের কাজেই যখন তা সম্ভব নহে, তখন যে আদর্শের লক্ষ্য পার্থিব জীবনের সাফল্য নয় বরং আখেরাতের কামিয়াবী ও কল্যাণ লাভ, যে ধর্ম নিয়ত, উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসকে কর্মের ভিত্তি বলে নির্ধারণ করেছে, যে আদর্শের চোখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ব্যতীত কোন কাজের কোনই মুল্য নেই, ধর্ম সমগ্র মানব জাতির সংস্কার ও সংশোধনের মহান আন্দোলনের সুচনা করেছে। এবং যার পরিচালিত আন্দোলন পৃথিবীতে অতুলনীয় ও নজিরহীন সাফল্য লাভ করছে, সেই মহান ধর্ম সেই দিগ্বিজয়ী আদর্শ নিজের প্রচার ও দাওয়াতের কাজ শুধুমাত্র ভাষাহীন তরবারীর দায়িত্বে সোপর্দ করে দেবে–এটা কি করে সম্ভব? নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিবর্তে বাধ্যতামূলক আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করাতেই সন্তুষ্ট হবে–তা কি করে বিশ্বাস করা যায়। আল্লাহর ভয় যাদের মনকে বিচলিত করে না–বরং কেবল তরবারীর ভয়েই যারা ভীত সন্ত্রস্ত, সেই সব অপদার্থ অনুসারীদের নিয়েই কি সে সন্তুষ্ট হতে পারতো? এমন কাপুরুষ ও ভীরু মানুষ যারা কোন আদর্শের সত্যতায় বিশ্বাসী না হয়েও কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য তা গ্রহণ করে, তাদেরকে কি সে কিছুমাত্র মূল্য দিতে পারতো? তা যদি সে করতো তা হলে যে সাফল্য সে অর্জন করেছে তা তার পক্ষে সম্ভভ হতো না।

মানুষের স্বভাব–প্রকৃতিকে তার স্রষ্টার চেয়ে নিখূঁতভাবে কেউ বুঝতে পারে না। তিনি তার বুদ্ধিদীপ্ত কালামের বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের হৃদয় জয় করার সবচেয়ে নির্ভুল ও কার্যকর পন্থা কি? এক জায়গায় বলেছেনঃ

لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ (حم سجدہ: ٣٤)

"হে নবী, ভালো ও মন্দ কখনও সমান নয়। মন্দকে ভালো পন্থায় প্রতিরোধ কর। তখন দেখবে, তোমার সাথে যার শত্রুতা, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে।" সুরা হা–মীম সেজদা–১৮

অন্যত্র বলেছেনঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

"আপনি যে, কোমল হৃদয় হতে পেরেছেন, সে আল্লাহর অনুগ্রহেরই ফল। কিন্তু আপনি যদি কঠিন হৃদয় ও কর্কশভাষী হতেন তাহলে তারা সকলে আপনাকে ছেড়ে চলে যেত।" সূরা আলে ইমরান–১৬

অন্য এক জায়গায় ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে যেঃ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَ
جَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ (النحل: ١٢٥)

"মানুষকে বুদ্ধিমত্তার সাথে উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আপন প্রতিপালকের দিকে ডাক। আর বিতর্ক এমন পন্থায় কর যা সবচেয়ে ভালো।"

এই নম্র আচরণ, মিষ্ট কথা বলা ও সহৃদয় আচরণ করার জন্য এত বেশী তাকীদ করা হয়েছে যে, কাফেরদের উপাস্য দেবতাদেরকে পর্যন্ত গাল–মন্দ করতে নিষেধ করা হয়েছেঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ
عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ (الانعام: ١٠٨)

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সব কৃত্রিম মা'বুদের তারা উপাসনা করে, তাদেরকে তোমরা গাল–মন্দ করো না, পাছে তারাও অজ্ঞতা ও প্রতিহিংসা বশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দিয়ে বসে।" সূরা আনয়াম–১২

গোমরাহী ও সুপথ প্রাপ্তির মূল রহস্য

অতঃপর তিনি বিভিন্ন স্থানে একটি সুক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে তার উপর ঈমান আনতে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু এরূপ বাধ্যতামুলক ঈমান তার প্রয়োজন নেই। তিনি ইচ্ছা করলে ঈমান আনাকে মানুষের সহজাত ও স্বভাবগত জৈবিক কামনা–বাসনার অন্তর্ভূক্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু এ ধরনের ঈমান আনয়নকারী ও এবাদত আনুগত্যকারী সৃষ্টি আল্লাহর নিকট আগে থেকেই বর্তমান। তাদের স্বভাবই হলো আল্লাহর নির্দেশ মত কাজ করা। কিন্তু মাবুদ হওয়ার প্রকৃত স্বাদ গ্রহণের জন্য তিনি এমন সৃষ্টির প্রত্যাশী ছিলেন যার ওপর আল্লাহকে চেনা, তার আনুগত্য ও উপাসনা করা এবং তার আদেশ মেনে চলার জন্য বলপ্রয়োগ করতে হবেনা বরং সে নিজ বিবেক–বুদ্ধি দ্বারা তাকে চিনবে, আপন চেষ্টা সাধনা বলে তার সন্ধান লাভ করবে, আপন ইচ্ছা স্বাধীন দ্বারা তার এবাদত–উপাসনা করবে এবং তার আদেশের (ইচ্ছার নয়) বিরোধিতা করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী করবে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিবেকের আলোকে পথ চলার জন্য স্বাধীন করে ছেড়ে দিয়েছেন। তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা কুফরী করুক।) তার কাছে একের পর এক হেদায়েতকারী ও পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছেন যাতে তার স্বজাতীয় লোক তাকে গোমরাহীর পথ থেকে সত্য পথ আলাদা করে দেখিয়ে দেয় এবং তারা ওজর দিতে না পারে যে, আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। অতঃপর এর জন্য একটি বিচার দিবস নির্ধারণ করেছেন যারা আপন বিবেক–বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহকে চিনেছে, আপন মর্জিতে তার দেখানো পথ গ্রহণ করেছে, এবং কারো বলপ্রয়োগ নয়–নিজ ইচ্ছায় নিজের কর্তব্য মনে করে তার আনুগত্য ও ফরমাবদারী করেছে, তাদেরকে তিনি সেদিন অপরিমেয় পুরস্কার ও প্রতিদান দেবেন। আর যারা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ থাকা সত্ত্বেও ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহর প্রেরিত হেদায়েত ও প্রত্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজের দাসসুলভ দায়িত্ব অবহেলা করে তার হুকুম অমান্য করেছে, তাদেরকে যন্তণাদায়ক শাস্তি দেবেন। এই রহস্য তিনি কিরূপ বিজ্ঞতার সাথে উদঘাটন করেছেন লক্ষ্য করুণঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

(هود: ١١٨-١١٩)

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে একদলভুক্ত করে দিতে পারতেন কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ এ জন্যই তাদের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে আল্লাহর এ উক্তি সফল হয়েছে যে, দোজখকে জিন ও মানুষ দিয়ে পূর্ণ করে দেব।" সূরা হুদ–১০

পবিত্র কোরআনের অন্যান্য স্থানেও বিভিন্ন ভংগীতে এই রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে। সূরা ইউনুছে বলা হয়েছেঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ (يونس ٩٩)

''আল্লাহ যদি চাইতেন তবে পৃথিবীর সকলেই ঈমান আনতো।"

সূরা আনআমে বলা হয়েছেঃ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ (الانعام: ١٠٧)

"আল্লাহর ইচ্ছা হলে তারা শের্কে লিপ্ত হতে পারতো না।"

সূরা শূয়া'রায় বলা হয়েছেঃ

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝ (الشعراء: ٤)

"আমি যদি ইচ্ছা করতাম তা হলে আকাশ থেকে এমন সব নিদর্শন অবতীর্ণ করতাম যা দেখে তাদের মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসতো।"

সূরা ইউনুছে বলা হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ (يونس: ١٠٠)

"আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ ঈমান আনতে পারে না। আর যারা বুদ্ধি বৃত্তিকে কাজে লাগায় না তাদের ওপরই তিনি (কুফরীর) পংকিলতা নিক্ষেপ করেন।"

সুরা কাছাছে বলা হয়েছেঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○ (القصص: ٥٦)

"তুমি যাকে ইচ্ছা সুপথে আনতে পার না। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সুপথে আনেন। আর কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে, সে খবর আল্লাহই জানেন।"

সুতরাং সর্বশক্তিমান বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ স্বয়ং যখন মানুষকে নিজের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতে চান না, বরং স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী তারা বন্দেগী দাসত্ব করুক তা–ই বেশী ভালোবাসেন তখন অন্য বান্দাদের কি অধিকার আছে, অন্য বান্দাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের জন্য বলপ্রয়োগ করার? বস্তুতঃ এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বিশ্বনবী (সঃ) কে বারবার এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়েছেন যে, ইসলামে দীক্ষিত করতে কারো ওপর বলপ্রয়োগের অবকাশ নেই। আপনার কাজ শুধু আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। সুরা ক্বাফে বলা হয়েছেঃ

وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ
وَعِيدِ

"তুমি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অধিকারী নও। আল্লাহর হুঁশিয়ারীকে যে ব্যক্তি ভয় করে তাকে উপদেশ দিতে থাক।"

সুরা গাশিয়ায় বলা হয়েছেঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ○ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ○

"তুমি উপদেশ প্রদান অব্যাহত রাখ। কেননা উপদেশ প্রদানই তোমার একমাত্র কাজ। তুমি তাদের ওপর দারোগা নও।"

সূরা ইউনুছে বলা হয়েছেঃ

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

''তুমি কি মানুষকে ঈমান আনার জন্য বাধ্য করতে চাও?"

সূরা বাকারায় এরশাদ করা হয়েছেঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ

"তাদেরকে সুপথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়। এটা আল্লাহর কাজ। তিনিই যাকে খুশী সুপথে আনেন।"

সুরা রা'দে বলা হয়েছেঃ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

"তোমার উপর কেবল বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব। হিসাব গ্রহণ করা আমার কাজ।

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম কাউকে বলপ্রয়োগে নিজের বশ্যতা স্বীকার করায় না। সে কেবল যুক্তি ও দলীল প্রমাণের আলোকে সত্যপথ ও অসত্যপথকে আলাদা করে দেখিয়ে দেয়। তারপর প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেয় যে, ইচ্ছা হয় ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে ব্যর্থতার গভীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত হোক। অন্যথায় সত্য ও সরল পথ অবলম্বন করে প্রকৃত ও চিরন্তন কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করুক। তবে এ আলোচনার ইতি টানার আগে আমি এ কথা বলে দেয়া প্রয়োজন মনে করি যে, তরবারীর সাথে ইসলাম প্রচারের একটা সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে। এ কথা সত্য যে, ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌছানোর কাজে তরবারীর কোন স্থান বা ভূমিকা নেই। কিন্তু এই প্রচার কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কিছু জিনিসও আছে–যার সহযোগিতায় দুনিয়ায় ইসলাম প্রচারিত হয়ে থাকে অথচ সে সব জিনিস তরবারীর সাহায্যের মুখাপেক্ষী।

আমরা সচরাচর দেখতে পাই যে, মানুষ যখন বল্গাহীনভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করে এবং জৈবিক প্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করার ব্যাপারে কোন

নৈতিক বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য থাকে না তখন সেই দুঃখজনক কিন্তু আপাততঃ মধুর ও সুখকর জীবনে সে খুবই স্বাদ ও আনন্দ পায়। সেই স্বাদ ও আনন্দ ত্যাগ করতে সে স্বেচ্ছায় রাজী হয় না। ওয়াজ নছিহত ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাকে নৈতিক বিধিনিষেধ মানতে, হালাল–হারামে বাছবিচার করতে এবং ভালো মন্দের পার্থক্য করতে যতই বলা হোক, সে সোজাপথে আসতে চায় না। প্রথমতঃ ক্রমাগত ও অব্যাহতভাবে অন্যায় ও অসৎকাজ করতে করতে তার বিবেক–বুদ্ধি চেতনা ও প্রজ্ঞার উপর এমন একটা আচ্ছাদন পড়ে যায় যে এ ধরনের নৈতিক শিক্ষার কোন প্রভাব তার ওপর পড়তে পারে না। এমনকি তার বিবেকে যদি কিছুমাত্র প্রাণ থেকেও থাকে তথাপি তা তার প্রবৃত্তিকে এতটা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় না যাতে সে সত্যকে শুধু সত্য হওয়ার ভিত্তিতেই সেচ্ছায় ও সাগ্রহে গ্রহণ করবে এবং বল্গাহীন জীবনে যে আনন্দ ও স্বাদ সে ভোগ করতো তা ত্যাগ করতে সম্মত হবে। পক্ষান্তরে কোন নৈতিক আদর্শের পেছনে যদি সদুপদেশ দানের সাথে সাথে শাসন ও দমনের ব্যবস্থাও থাকে এবং অন্যায় ও অসত্যকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দেয়ার সাথে সাথে অন্যায়কে প্রতিরোধকারী শক্তিও ব্যবহার করা হয়, তাহলে মানুষের প্রকৃতিতে ক্রমান্বয়ে সৎ হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হতে থাকে। ন্যায়পথ অনুসরণ ও ভালো–মন্দে পার্থক্য করার মনোভাব গড়ে উঠে ও উন্নতি লাভ করে। এভাবে একদিন যে মানুষ সদুপদেশ শুনতেও রাজী ছিল না সে অবশেষে তা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

কয়েক মুহূর্তের জন্য এমন একটি সমাজের কথা কল্পনা করুন যেখানে কোন আইন চালু নেই, যার প্রতিটি ব্যক্তি এমনি স্বভাবের যে নৈতিকতার কোন ধার ধারে না, যার উপর ক্ষমতা চলে তাকে শোষণ ও লুণ্ঠনের শিকার বানায়, যার সাথে শত্রুতা তাকে খুন করে, যে জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করে তা চুরি বা ছিনতাই এর মাধ্যমে হস্তগত করে। মনে যা চায় তা যেমন করেই হোক পূর্ণ করে। হালাল হারাম, জায়েজ নাজায়েজ ন্যায় অন্যায়ের কোন বিচার করে না। কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে তার মন–মগজে কোন সুষ্ঠু জ্ঞান ও চেতনা নেই, বরং তার সামনে আছে কেবল নিজের পৃবৃত্তির কামনা ও বাসনা এবং তা চরিতার্থ করার সম্ভাব্য উপায়–উপকরণ। এহেন সমাজে ও এহেন পরিবেশে যদি কোন নৈতিক সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে এবং মানুষকে হালাল–হারামের পার্থক্য শিখায় ও বৈধ–অবৈধের সীমা রেখা

নির্দেশ করে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে শুভা শুভ এবং কর্মপদ্ধতিতে ভালো মন্দের বাছবিচার প্রদর্শন করে, চুরি, হারাম–খুরি, নাহক খুন, জেনা–ব্যাভিচার ও অশ্লীলতার প্রতিরোধ করে। সমাজের লোকদের কর্তব্য ও অধিকার নির্ধারণ করে। এবং একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক বিধান প্রস্তুত করে, কিন্তু সেই বিধান চালু করার জন্য তার কাছে ওয়াজ নছিহত এবং যুক্তিতর্ক ছাড়া কোন শক্তি না থাকে, তাহলে সেই সমাজ নিজের স্বাধীনতার ওপর এমন সব বাধ্যবাধকতা ও কড়াকড়ি মেনে নিতে প্রস্তুত হবে কি? সে সমাজ কি শুধু তার যুক্তিতর্কের জোরে সেচ্ছায় ও সানন্দে আইনের আনুগত্য স্বীকার করে নেবে? তার আবেগপূর্ণ উপদেশে সে কি এত প্রভাবিত হবে যে, বল্গাহীন জীবনের সুখ ও আনন্দকে বিনা দ্বিধায় পরিহার করতে সম্মত হয়ে যাবে! মানুষের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান রাখেন এমন যে কোন ব্যক্তিই এ প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দেবেন। কেননা সততাকে শুধু সততা বলেই আকড়ে ধরে এবং অন্যায়কে কেবল অন্যায় বলেই বর্জন করে এমন পুন্যাত্মার সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই কম। কিন্তু যদি সেই সংস্কারক শুধু নৈতিক উপদেষ্টা বা ওয়ায়েজ না হয়ে সেই সাথে শাসক এবং কর্তৃত্বশীলও হয়, আর দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকারও প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই সরকারের ক্ষমতা বলে দেশ থেকে বল্গাহীন স্বাধীনতা ও বন্য স্বেচ্ছাচার থেকে সৃষ্ট দোষগুলো দুরীভূত হয় তা হলে ঐ প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক না হয়ে ইতিবাচক হতে বাধ্য। সকলেই একবাক্যে বলবে, এ ধরনের সংস্কারমূলক চেষ্টা সফল না হয়ে পারে না।

ইসলামের প্রচার–প্রসারও অনেকটা এই প্রক্রিয়ায়ই হয়েছে। ইসলাম যদি শুধু কতিপয় আকিদা–বিশ্বাসের সমষ্টিই হতো, সে যদি কেবল আল্লাহকে এক মানা, রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং আখেরাত ও ফেরেশতার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া মানুষের নিকট আর কিছুর দাবী না করতো তা হলে হয়তো শয়তানী শক্তিগুলো তার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো না। কিন্তু ইসলাম আসলে একটা আকিদা মাত্র নয়। ইসলাম একটা আইনও। সেই আইন মানুষের জীবনকে আল্লাহর আদেশ নিষেধের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। তাই শুধু উপদেশ ও ওয়াজনছিহত দ্বারা তার কার্য সিদ্ধ হতে পারেনা। বরং শাসিত ভাষার সাথে সাথে তাকে শানিত অস্ত্রও প্রয়োগ করতে হয় ভাষার অস্ত্র চালনার পাশাপাশি তাকে অস্ত্রের ভাষায়ও কথা বলতে হয়। কেননা

বেপরোয়া ও উচ্ছৃংখল স্বভাবের মানুষ এই আইনের আনুগত্যকে যত ভয় করে, এর আকিদা বিশ্বাসকে এত ভয় করে না। সে চুরি করতে চাইলেই ইসলাম তাকে হাত কাটার হুমকি দেয়। সে ব্যভিচার করতে ইচ্ছুক হলে ইসলাম তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তির কথা জানিয়ে দেয়। সে সূদ খেতে চাইলে ইসলাম তাকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ প্রদান করে সে হালাল হারামের বাধ্যবাধকতা অগ্রাহ্য করে প্রবৃত্তির বাসনা পূর্ণ করতে চাইলে ইসলাম তাকে এত সব বাধ্যবাধকতার বাইরে প্রবৃত্তির হুকুম মেনে চলতে দিতে চায় না। এই জন্য প্রবৃত্তি পুজারী স্বার্থান্ধ মানুষের মন মেজাজ ইসলামের প্রতি বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। পাপাচারের দরুন তার হৃদয়ের আরশিতে এমন মরিচা ধরে যায় যে, তার আর ইসলামের জ্যোতি গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) তার তেরো বছরের মক্কী জীবনে কাফেরদেরকে যত মিষ্ট ভাষায়ই দাওয়াত দিতেন তা তারা গ্রাহ্য করতো না। তিনি ওয়াজ নছিহত ও উপদেশ দানের যত হৃদয় গ্রাহী পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব, তা অবলম্বন করতেন। অকাট্য দলীল প্রমাণ দিতেন। অলংকার সমৃদ্ধ ও লালিত্যময় ভাষায় জোরদার ভাষণ দিয়ে স্রোতাদের মনে আবেগের ঢেউ তুলতেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে বিস্ময়কর ও বিমোহিতকারী অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত করতেন। নিজের সুমহান চরিত্র ও পূত পবিত্র জীবন থেকে সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। এবং সত্যের প্রকাশ ও প্রচারে সহায়ক হতে পারে এমন কোন পন্থাই বাদ রাখতেন না। আরবদের সামনে তার দাওয়াতের সত্যতা সূর্যের মত সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সত্য তাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। যে পথের দিকে তিনি তাদের ডাকেন, তা যে সঠিক ও সোজা পথ, তা তারা স্বচক্ষেই দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র এজন্য তারা কুফরীর পথ, আঁকড়ে ধরে রেখেছিল যে, কাফের থাকাকালীন বল্গাহীন বেলেল্লাপনার আনন্দ ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ওয়াজ–উপদেশ ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামী দাওয়াতের মহানায়ক তরবারী হাতে নিলেন এবং الا كل ماثرة اودم اومال يدعى فهو تحت قدمى هاتين (অর্থাৎ জাহেলিয়াতের সমস্ত পুরুষানুক্রমিক বৈষম্য, সমস্ত খুনের প্রতিশোধ দাবী এবং সমস্ত আর্থিক দাবী এই যে আমার পদতলে পিষ্ট করলাম) ঘোষণা করে দিয়ে যাবতীয় পুরুষানুক্রমিক বৈষম্যের অবসান

ঘটালেন। ক্ষমতা ও আভিজাত্যের সমস্ত কাল্পনিক মূর্তিগুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিলেন। দেশে একটি সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত সরকার গঠন করলেন। নৈতিক আইন সমূহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে চালু করে পাপ ও অনাচারের সেই অবাধ ও লজ্জাহীন স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিলেন–যা তাদেরকে পৈশাচিক আনন্দে বিভোর রাখতো। দেশে এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করলেন যে নৈতিক ও মানবিক গুনাবলীর লালন ও বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক। এর ফলে মানুষের মন থেকে পাপ–অনাচারের আকর্ষণ উৎখাত হতে লাগলো। স্বভাবগত অসৎ প্রবৃত্তি সমূহ আপনা থেকেই দূর হয়ে যেতে আরম্ভ করলো। আত্মার মলিনতা প্রক্ষালিত হলো। চোখ থেকে পর্দা সরে গিয়ে সত্যের জ্যোতি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো। এমন কি সত্য সমাগত হওয়ার পর তার সামনে মাথা নত করার পথে যে অহমবোধ ও হঠকারিতা অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে তাও চূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

আরবদের ন্যায় অন্যান্য দেশও যে দেখতে দেখতেই মুসলমান হয়ে গেল, এক শতাব্দীর মধ্যেই যে দুনিয়ার এক চতুর্থাংশ ইসলামে দীক্ষিত হলো, সে শুধু এ কারণেই যে, ইসলামের তরবারী মানুষের মন মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখা কৃত্রিম আবরণগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। কোন নৈতিক মুল্যবোধের আদৌ স্থান ছিল না এমন পারিপার্শ্বিকতাকে সে সাফ করে দিয়েছিল। সত্য ও ন্যায়ের দুশমন এবং মিথ্যা ও বাতিলের পৃষ্ঠপোষক সরকারগুলোকে সে উৎখাত করেছিল। যে সব সামাজিক অপরাধ সাধারণ মানুষের মনকে প্রভাবিত করে এবং সততা ও পরহেজগারী থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তার মূলোৎপাটন করেছিল। মানুষকে পশুত্ব থেকে উন্নিত করে মনুষত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব ন্যায় বিচারমূলক ও ভারসাম্যমূলক আইনের প্রয়োজন, সেগুলো চালু করে দিয়েছিল। এভাবে ইসলামের সামরিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তি ইসলামকে বাস্তবরূপে পেশ করে বিশ্ববাসীর নিকট সপ্রমাণ করেছিলেন যে, মানুষের নৈতিক, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এর চেয়ে ভালো ও উৎকৃষ্ট জীবন বিধান আর কিছু হতে পারে না।

সুতরাং ইসলাম শুধু তরবারীর জোরে তথা সামরিক শক্তি প্রয়োগে মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করে এ কথা যেমন ভুল, তেমনি ইসলামের প্রচার

ও প্রসারে তরবারী তথা সামরিক শক্তির কোনই ভূমিকা নেই-এ কথাও বলা চলে না। বাস্তব সত্য এ উভয়ের মধ্যখানে অবস্থিত। সে সত্য এই যে, ইসলামের প্রসারে তবলীগ ও তরবারী উভয়েরই অবদান রয়েছে। সকল সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতেই এ রকম হয়ে থাকে। তরবারী দ্বারা জমি প্রস্তুত করা হয় আর দাওয়াত তথা প্রচারকার্য দ্বারা বীজবপন করা হয়। তরবারী প্রথমে জমিকে নরম করে ও তাতে বীজ বপনের যোগ্যতা ও ক্ষমতার সৃষ্টি করে। অতঃপর তবলীগ ও প্রচারকার্য সেখানে বীজ বোনে ও পানি দেয়-যাতে করে চাষকার্যের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি সভ্যতারও নামোল্লেখ করা যাবেনা- যার প্রতিষ্ঠায় এই উভয় উপাদান সক্রিয় ছিল না। আমি কোন বিশেষ ধরনের সভ্যতার কথা বলছিনা। জমি প্রস্তুত করা ও বীজ বোনার এই দুটো প্রক্রিয়াই যতক্ষণ নিজ নিজ অবদান না রাখবে, ততক্ষণ কোন ধরনের সভ্যতার প্রতিষ্ঠাই সম্ভব নয়। মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে যিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, সমাজের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংস্কারে ও সংশোধনের প্রক্রিয়ায় এমন একটা সময় আসা অনিবার্য, যখন মানুষের আত্মা ও মনকে কিছু বলার আগে তার দেহ ও প্রাণকে শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের সমর পদ্ধতি

পূর্বতম অধ্যায়গুলোতে কেবল যুদ্ধের নৈতিক দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এবারে যুদ্ধের বাস্তব দিক আলোচনা করে আমি দেখাতে চাই যে, ইসলাম এ ক্ষেত্রে কি বিরাট সংস্কার সাধন করেছে।

যে কোন কাজের ভালো মন্দ বিচার করতে গেলে তার দুটো দিক পর্যালোচনা করা অত্যাবশ্যক। প্রথমতঃ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, দ্বিতীয়তঃ সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন পন্থা। মূল উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয় তাহলে তা যত ভদ্র ও সৎভাবে সম্পন্ন করা হোকনা কেন, কাজটা মোটের ওপর খারাপ এবং গর্হিতই থেকে যাবে। কিন্তু যদি উদ্দেশ্যটা মূলতঃ খুবই উচ্চ ও মহৎ হয়, কিন্তু তা সফল করার পদ্ধতি ভদ্রতা বিবর্জিত হয়। তবে খোদ্ উদ্দেশ্যের সততা এবং সাধুতাও কলংকিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তির উদ্দেশ্য ইয়াতিম শিশুদের শিক্ষা–দীক্ষা ও বিধবাদের লালনপালন। কিন্তু উক্ত মহৎ কাজের জন্য সে চুরি ও ডাকাতি করে টাকা উপার্জন করে। এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য মহৎ ও পবিত্র হলেও আইন ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে সে একজন সাধারণ চোর ও ডাকাতের মতই অপরাধী। পক্ষান্তরে অপর এক ব্যক্তি জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে টাকা উপার্জন করতে চায়। কিন্তু উক্ত জনগণের কাছে বিশ্বস্ত ও প্রিয় হওয়ার জন্য সে মসজিদে বসে ইসলামের আদর্শ প্রচার করে, ওয়াজ–নছিহত করে এবং কেবল আল্লাহর জেকের করে সময় কাটায়। তার এসব কাজ খুবই মহৎ ও পবিত্র। কিন্তু যে ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সে এই বক ধার্মিক সেজেছে, তার দরুন তার সমস্ত সৎকাজ শুধু বাতিলই হবে না–বরং অমন প্রতারণামূলক কপট ধার্মিকতার কারণে তার অপরাধ আরো গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে।

যুদ্ধের ব্যাপারেও সেই কথা খাটে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য যদি হয় দুর্বল জাতিগুলোর স্বাধীনতা হরণ করা, দেশসমুহের সম্পদ লুণ্ঠন করা এবং জনগণকে তাদের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, তা হলে এমন যুদ্ধ যত শৃংখলা ও একাত্মবোধের সাথেই করা হোক, বেসামরিক লোকদের শ্লীলতা ও সম্ভ্রম, আহতদের রক্ষণাবেক্ষণ, মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদর্শন এবং উপাসনালয়সমূহের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি যতই লক্ষ্য রাখা হোক এবং সে যুদ্ধে লুটতারাজ, জ্বালানো পোড়ানো, ধ্বংস সাধন হত্যা ও ধর্ষণ থেকে যতই সংযম অবলম্বন করা হোক, মূলগতভাবে সেটা একটা অন্যায় ও অবৈধ যুদ্ধ রূপেই গণ্য হবে। শৃংখলা ও একাত্মবোধের সাথে লড়াই করলেই যুদ্ধের প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য হবে না। বড়জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, সেটা অপেক্ষাকৃত মৃদু ধরনের অপরাধ হবে, অতি জঘন্য পর্যায়ের অপরাধ তাকে বলা হবে না। অনুরূপভাবে যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য মহৎ হয় যেমন তা যদি কোন বৈধ অধিকার অর্জন, সংরক্ষণ অথবা অন্যায় ও অরাজকতা দূর করার জন্য করা হয় কিন্তু তার জুলুম ও নৃশংসতার মাধ্যমে করা হয়, যদি তাতে কোন রকমের নৈতিকতা পালন করা না হয় এবং যোদ্ধাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় শুধুমাত্র শত্রুকে ধ্বংস করা ও তাকে নির্যাতন করে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করা, তা হলে এ ধরনের যুদ্ধও অন্যায় যুদ্ধ হবে এবং যোদ্ধারা মূলতঃ সত্যের সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও জালেম বলেই গণ্য হবে।

অতএব বলা যেতে পারে যে, একটা বৈধ ও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের সংজ্ঞা হলো; এমন যুদ্ধ যার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কর্মপদ্ধতি পবিত্র, মহৎ ও ন্যায়সঙ্গত। ইসলামের রণনীতি সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, তা শুধু এর উদ্দেশ্যের সততা, মহত্ত্ব ও পবিত্রতাই প্রমাণিত করে। এখন আলোচনার দ্বিতীয় দিকটা বাকী। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই তত্ত্বানুসন্ধান করবো যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির কর্মপন্থার বিচারে ইসলামের যুদ্ধ সভ্যতা ও ভদ্রতার এই মাপকাঠিতে কতটা উত্তির্ণ।

এখানে ইসলামের সমর পদ্ধতি সবিস্তারে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের এক নজরে একটু দেখে নেয়া উচিত যে, প্রাচীন যুগে অমুসলিম জাতিগুলোর যুদ্ধ সংক্রান্ত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল। এতে করে এ ব্যাপারে ইসলাম কতখানি সংস্কার ও সংশোধন করেছে তা আমরা সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতে পারবো।

১– প্রাগৈসলামিক যুগের আরবদের সমর পদ্ধতি

জাহেলিয়ত যুগে আরবদের নিকট যুদ্ধ ছিল একটা জাতীয় পেশা স্বরূপ। অর্থনৈতিক উপায়–উপকরণের অভাব, জীবনের অত্যাবশ্যক উপকরণসমূহের

দৈন্য ও স্বল্পতা এবং সামাজিক শৃংখলা ও ঐক্যের অনুপস্থিতির দরুন আরবদের মধ্যে যুদ্ধোম্মাদনা এত গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, তারা হত্যা, রক্তপাত ও লুটতরাজ জাতীয় হীন কার্যকলাপকে নিজেদের বৈশিষ্ট্যই শুধু নয়– বরং গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করতো। সম্ভবতঃ প্রথম দিকে নিজেদের ক্ষুৎ–পিপাসা নিবৃত্তি বা চারণভূমিতে পশু চরানোর অধিকার অর্জন অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায় শত শত বছর ব্যাপী নরহত্যার খেলায় নিয়োজিত থাকার দরুণ তাদের মধ্যে রক্তপাতের এমন নেশা ধরে গিয়েছিল যে, সেটা তখন আর কোন উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম ছিল না, নিজেই একটা উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে ছিল। সেই সাথে নির্মমতা, হিংসতা, হিংস্রতা, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়নতা ইত্যাকার পাশবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের চরিত্রে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ এ ধরনের জীবন যাপনের জন্য অনুরূপ বৈশিষ্টসমূহের জন্ম ও বিকাশ লাভ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গোত্রে গোত্রে, পরিবারে পরিবারে, কয়েক পুরুষ ধরে যুদ্ধ ও শত্রুতা চলতো। শত্রু গোত্রকে সর্বপ্রকার ধ্বংস করা হতো। প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য প্রতিপক্ষকে অত্যন্ত অমানুষিক ও অসভ্য পন্থায় নির্যাতন ও অপমান করা হতো। শুধুমাত্র গর্ব ও বীরত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যেও অনেক সময় রক্তের স্রোত বইয়ে দেয়া হতো।

আরবদের জঙ্গী মানসিকতা

আদিম আরবদের ইতিহাস জানার জন্য আমাদের কাছে মাত্র দুটো উৎস রয়েছে। প্রথমতঃ 'আইয়ামুল আরব' নামে আরবদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী ও উপখ্যানসমূহ। দ্বিতীয়তঃ আরব কবিদের রচিত কাব্যমালা। এতে তারা তাদের সমাজ, সভ্যতা, কৃষ্টি, পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধ, প্রেম, প্রণয় ও অনুকম্পার নিখুঁত বিবরণ তুলে ধরেছেন। অনারবদের ন্যায় তাদের কবিত্ব নিছক কল্পনা ও ভাবের ব্যঞ্জনা এবং অতিরঞ্জিত বর্ণনার সমষ্টি ছিল না। তারা নিজেদের চারপাশে যা কিছু দেখতেন, তাই বিনা দ্বিধায় বলতেন। এ জন্য তাদের কবিত্ব নিরেট কবিত্বই ছিল না–সেই সাথে ইতিহাস বর্ণনা ও জাতীয় চরিত্র চিত্রনের এক শৈল্পিক প্রতিভাও ছিল। যুদ্ধ সম্পর্কে আরবদের চিন্তা ও মানসিকতা কি ছিল? একে তারা কি ভাবতো? তাদের লড়াই–এর পদ্ধতি

কি ছিল? শত্রুর সাথে তাদের আচরণ কেমন ছিল? কি কি কারণে তারা যুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ হতো? কি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা যুদ্ধ করতো? এ জাতীয় বহু প্রশ্নের জবাব আমরা তাদের কবিতা ও কাব্যে পাই। যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের ধ্যান–ধারনা ও চিন্তা–ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তারা অত্যন্ত স্বার্থকভাবে পরিভাষা, উপমা এবং রূপক প্রতিকী শব্দ চয়ন করতো। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে কতিপয় পরিভাষা, উপম, রূপক ও প্রতিকী শব্দের উল্লেখ করছি ঃ

حرب، –(হারব) যুদ্ধ। সাধারণ প্রচলিত শব্দ। এর মুল আভিধানিক অর্থ হলো ক্রোধ বা ক্রুদ্ধ হওয়া।

تحريب، –(তাহরীব) রাগান্বিত করা, উস্কানী দেয়া, বর্শা ধারালো করা।

حَرَب، –(হারাব্‌) কারো সম্পদ লুণ্ঠন করা।

حَرِيبة، –(হারিবা) যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত সম্পদ– যা লুণ্ঠনকারীর ভোগদখলে এসেছে।

محروب (মাহরুব) ও حريب (হারিব) যে ব্যক্তির সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে।

إحراب، –(এহরাব) শত্রুর সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য কাউকে পথ দেখানো।

رَوع، (রওউন) লড়াই এর সাধারণ প্রতিশব্দ। এর মূল অর্থ ভয় ও আতংক। অর্থাৎ যুদ্ধকে একটি আতংকজনক বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওয়াদাক ইবনে তামছিল আল–মাজেনী বলেন ঃ

مقاديم وصالون في الروع خطوهم

"তারা অপ্রতিহতভাবে অগ্রসরমান এবং যুদ্ধের সময় পায়ে পায়ে মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে চলে।"

وغى –(ওয়াগা) এটা যুদ্ধের একটা প্রতিশব্দ। আভিধানিক অর্থ শোরগোল ও গোলযোগ।

কবি বলেন ঃ

مازال معروفا لمُرّة في الوغى   علّ القنا وعليهم انها لُها

“বনু মোররার–এর বৈশিষ্ট্য চিরদিনই খ্যাতিমান যে, তারা যুদ্ধের সময়ে বার বার শত্রুর রক্তে তাদের বর্শার পিপাসা নিবৃত্ত করে থাকে। কমপক্ষে একবার বর্শার পিপাসা নিবৃত্ত করা তো তাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।”

شر، (শাররুন) আসল অর্থ মন্দ, অন্যায় ও অকল্যাণ। রূপক অর্থে যুদ্ধের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত। একজন কবি নিজের মিত্র গোত্রের প্রশংসা করেন ঃ

قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم   طاروا اليه زرافات ووحدانا

“তারা এমন এক সম্প্রদায় যে যুদ্ধ যখন দাঁত বের করে তাদের আতংকগ্রস্থ করার চেষ্টা করে তখন তারা দলে দলে এবং একাকী দুই ভাবেই তার মোকাবিলায় এগিয়ে যায়।”

كريهة، (কারিহাতুন) এও যুদ্ধের নাম বিশেষ। মূল অর্থ কঠোরতা, বিপদমুসিবত।

জনৈক কবি এক ব্যক্তির প্রশংসা করে বলেন ঃ

صعب الكريهة لا يُرام جنابه   ماضى العزيمة كالحسام المِقصل

“যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে তিনি দুর্বার ও অবিচল। তার কাছে যাওয়া সহজ নয়। তিক্ষ্ণ ধার তরবারীর মত তিনি দৃঢ় সংকল্প।”

هياج، (হিয়াজ) ক্রোধ ও আক্রোশ। রূপক অর্থে যুদ্ধ।

কবি বলেন ঃ

كل امرئ يجرى الى !   يوم الهياج بما استعدا

“উপায়–উপকরণ যতটুকু সংগৃহিত হয় তা নিয়েই প্রত্যেককে যুদ্ধে যেতেহয়।”

مغضبة، (মাগদাবাতুন) এরও মূল অর্থ ক্রোধ, রাগ ও অসন্তুষ্টি। রূপক অর্থে যুদ্ধ। ইবনে উনতুমা বলেন ঃ

إن تدع زيدٌ بني ذهل لمغضبة   نغضب لزرعة إن الفضل محسوب

"জায়েদ যদি বনু জোহল (গোত্র)কে যুদ্ধের জন্য ডাকে তাহলে আমরা বনু জোরা গোত্রের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করবো। কেননা ভালো কাজ সব সময়ই সমাদৃত হয়ে থাকে।"

আরব কবিরা যুদ্ধকে মেষদের লড়াই এর সাথে তুলনা করেছেন। এ জন্যই نطاح বা মেষ–লড়াই যুদ্ধের একটা প্রতিশব্দ। সাদ ইবনে মালেক বলেন ঃ

والكرّ بعد الفرّ إذ   كره التقدّمُ والنطاح

"একবারেই সরাসরি অগ্রসর হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করা যখন ভালো মনে না হয় তখন পিছু হটে এসে পুনরায় ফিরে যাওয়া উত্তম।"

যুদ্ধকে উটের বুকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা উট যখন কোন জিনিসকে বুক দিয়ে চাপা দেয়, তখন তা পিষ্ট হয়ে যায়। আর এ জন্যও যে, উট একটা প্রতিহিংসা–পরায়ন ও প্রতিশোধপরায়ন জীব। কবি বলেন ঃ

أَنَخْتُمْ علينا كلكل الحرب مرّةً   فنحن مُنيخوها عليكم بكلكل

"তোমরা একবার আমাদের ওপর যুদ্ধের বুক দিয়ে চাপা দিয়েছ। এ জন্য শীঘ্রই আমরা তোমাদের ওপর যুদ্ধের বুক দিয়ে চাপা দেব।"

যুদ্ধকে যাঁতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা যুদ্ধ শত্রুকে আটার মত পিষে দেয়। আবুল গাওল তাহাতী বলেন ঃ

فوارسُ لا يَمَلّون المنايا   إذا دارت رحى الحرب الزّبونِ

"তারা এমন ঘোড় সওয়ার যে যুদ্ধের যাঁতা যখন চলে তখন মৃত্যুর ভয়ে ঘাবড়ায় না।" আমর ইবনে কুলসুম বলেন ঃ

متى ننقل إلى قوم رحانا   يكونوا في اللقاء لها طحينا

"আমরা যখন কোন গোত্রের ওপর আমাদের যাঁতা নিয়ে যাই (যুদ্ধ চাপিয়ে দেই) তখন তারা তার মোকাবিলা করতে গিয়ে আটা হয়ে যায়।"

যুদ্ধের জন্য শুধু 'বেষ্টনী' শব্দও প্রচলিত ছিল। আনতারা ইবনে শাদ্দাদ আবাছী বলেন ঃ

ولقد خشيتُ بان اموتُ ولم تكن   للحرب دائرةٌ على ابني ضمضم

"আমার আশংকা হয় যে, আমি মরে যাওয়ার পর যামযামের ছেলেরা আর যুদ্ধের বেষ্টনীতে (ময়দানে) ফিরে আসবে না।"

যুদ্ধকে অনেক ক্ষেত্রে আগুনের সাথেও তুলনা করা হয়েছে। কেননা যুদ্ধও শত্রুকে আগুনের মত ঝলসিয়ে দেয়। হারেস ইবনে হিলজা বলেন ঃ

ما جزعنا تحت العجاجة اذ   وَلّوا شلالاً واذا تلظّى الصلا

"যুদ্ধের আগুন যখন জ্বলে উঠলো এবং ঘোড় সওয়াররা চারদিকে ছুটে পালালো তখন আমরা প্রচন্ড ধুলাবালির মধ্যে বিচলিত হই নি।"

সা'দ ইবনে মালেক বলেন ঃ

من صد عن نيرانها   فانا ابن القيس لا براح

"যুদ্ধের আগুন থেকে যদি কেউ মুখ ফিরাতে চায় তো ফিরাক। আমি কয়েসের পুত্র। আমি বিচলিত হবো না।"

বাশামা ইবনে উজায়ের বলেন ঃ

قومی بنو الحرب العوان بجمعهم   والمشرفية والقنا اشعالها

"আমার সমগ্র জাতি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রতিপক্ষ এবং তার কাছে মুশরেফী তরবারী ও বর্শা যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর ইন্ধন স্বরূপ।"

আবুল গওল তাহাভী বলেন ঃ

ولا تبلى بسالتهم وان هم   صلوا بالحرب حيناً بعد حين

"তাদের বীরত্ব ও পৌরুষ মোটেও হ্রাস পায় না। যদিও তারা ক্রমাগতভাবে যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দেয়।"

উপরোক্ত উপমা পরিভাষাসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, আরবদের চিন্তায় যুদ্ধ এমন একটা জিনিস ছিল যাতে হত্যা, লুন্ঠন, দাঙ্গা–হাঙ্গামা, উস্কানী ও ক্রোধের সমাবেশ ঘটে এবং যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা হয়। সহায়–সম্পদ তছনছ করে

দেয়া হয় এবং যতসব লোমহর্ষক কান্ডকারখানা ঘটানো হয়। সংঘর্ষমুখর প্রতিপক্ষদ্বয়ের পাশবিক ক্রিয়াকান্ড তাদের দৃষ্টিতে পরস্পরকে আক্রমণকারী দুই মেষের হিংস্র আক্রোশ ও ক্রুদ্ধ আন্দোলনের মত। এসব যুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের উপাদান আছে সত্য। কিন্তু চারিত্রিক গুণপনা ও মানবীয় সৌজন্যের নাম নিশানা পর্যন্ত নেই।

আরব চরিত্রে জঙ্গী মানসিকতার প্রতিফলন

যুদ্ধ ছিল আরববাসীর মন ও আত্মার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। তাদের প্রচলিত বিশ্বাস এই ছিল যে, কোন ব্যক্তি ঘরের খাট পালঙে শুয়ে মারা গেলে তার প্রাণ নির্গত হয় নাক দিয়ে। আর যদি রণাঙ্গণে যুদ্ধ করে মারা যায়, তাহলে তার প্রাণ বেরোয় জখমের স্থান দিয়ে। প্রত্যেক আরবই একান্তভাবে কামনা করতো তার প্রাণ যেন জখমের স্থান দিয়ে বেরোয়। কেননা নাক দিয়ে প্রাণ বেরুনো তাদের কাছে কলংকজনক ব্যাপার ছিল।

আরব কবিরা গর্ব ক'রে বলতেন, তাদের দেশে কেউ নাক দিয়ে মরে না। কবিরা এক একটি জাতীয় গৌরবের ব্যাপার বলে অভিহিত করেন। যথা ঃ

وما مات منا سيدٌ حتف انفه !

" আমাদের কোন নেতা কখনো নাক দিয়ে মরেনি"।

যুদ্ধের ডাক কানে আসা মাত্রই হাতিয়ার নিয়ে ছুটে যাওয়া আরবদের সমাজে অবশ্য কর্তব্য বলে চিবেচিত হতো। যুদ্ধ কেন হবে, কিভাবে হবে, ইত্যাদি প্রশ্ন তোলাও অবৈধ বলে মনে করা হতো। কোন গোত্র যদি এ ধরনের কাপুরুষতা প্রকাশ করতো তাহলে সেই গোত্রের সচেতন ব্যক্তি মাত্রই তাতে লজ্জা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতো। জনৈক কবি এরূপ পরিস্থিতিতে বলেছিলেনঃ

لا يسألون اخاهم حين يندبهم — فى النائبات على ما قال برهانا

لكن قومى وان كانوا ذوى عدد — ليسوا من الشر فى شيئ وان هانا

فليت لى بهم قوما اذا ركبوا — شدوا الاغارة فرسانا وركبانا

"বনু মাজেন গোত্রের লোকেরা এমন বীর যোদ্ধা যে, তাদের কোন ভাই বিপদ–আপদে পড়ে সাহায্য চাইলে তারা তার বিপদের কারণ বা সাক্ষ্য–

প্রমান জিজ্ঞাসা না করেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আমার গোত্রে এত বেশী সংখ্যক লোক থাকা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধের সাথে কোন সংশ্রব রাখে না, তা যত নগণ্য যুদ্ধই হোক না কেন। হায় আক্ষেপ! এহেন কাপুরুষ গোত্রের পরিবর্তে আমি যদি এমন গোত্র পেতাম যারা উট ও ঘোড়ায় চড়ে ব্যাপক লুটতরাজ চালাতে পারে।”

অন্য এক কবি নিজ গোত্রের শৌর্য বীর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

إني لمن معشر أفنى أوائلهم   قيل الكماة ألا أين المحامونا

“আমি সেই গোত্রের লোক, যাদেরকে বীর যোদ্ধারা “কে আছ, বংশের ইজ্জত–সম্ভ্রম রক্ষাকারী–” এই বলে ডাক দিতেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ উৎসর্গ করতো।”

প্রাক ইসলামিক আরবের গোটা সাহিত্য ভান্ডার এরূপ আবেগময় বীরত্ব গাঁথায় পরিপূর্ণ। এই সাহিত্য অধ্যায় পড়লে বুঝা যায় যে, জঙ্গীস্বভাব ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রচার আরবদের নিকট পরম গৌরবের ব্যাপার ছিল। তাদের দৃষ্টিতে রক্তপাত ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ।

যুদ্ধের প্ররোচক কার্যকারণ সমূহ

গনিমাত প্রাপ্তির আশা

যে কার্যকারণগুলো তাদেরকে এমন ভয়ংকরভাবে যুদ্ধোম্মাদ ও জঙ্গী করে তুলতো, তার একটি হলো অর্থ প্রাপ্তির আশা বা লোভ। কোন আরব যখন অস্ত্র ধারণ করতো তখন সর্ব প্রথম যে অভিলাষ তার মনে জাগতো, তা ছিল এই যে, রণাঙ্গন থেকে সে অনেক ধন–সম্পদ ও গোলাম–বাঁদী হস্তগত করবে। ব্যবসায় বাণিজ্য, কিংবা শ্রম দ্বারা অর্জিত সম্পদ তার কাছে ছিল বিকৃত ও নিকৃষ্ট বস্তু। একমাত্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদই ছিল তার কাছে ‘পবিত্র’ সম্পদ এবং তা অর্জন করাই ছিল একমাত্র সম্মানজনক জীবিকা। দিনে কিংবা রাতে বিভিন্ন গোত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে যে হঠাৎ আক্রমণ চালাতো, সে শুধু এ উদ্দেশ্যেই যে, ধন–সম্পদ, গোলাম বাঁদী ও উট ছাগল প্রভৃতি লুন্ঠন

করে আনতে পারবে। বস্তুতঃ এই লোভের বশীভূত হয়েই আরবরা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো। জনৈক কবি তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জনের উদগ্র বাসনাকে নিম্নরূপে ব্যক্ত করেছেন ঃ

فلئن بقيتُ لارحلن بغـزوة   تحوى الغنائمَ او يموت كـريم

"আমি যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকি তাহলে এমন একটি যুদ্ধে যাব যাতে প্রচুর গনীমত লাভ করা যায় কিংবা ভদ্রভাবে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাযায়।"

অপর এক কবি নিজ গোত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন যে, তারা লুটতরাজের বেলায় নিজের ভাইদেরও রেহাই দিত না।

وكن اذا اغرن على جنابٍ   واعوزهن نهبٌ حيث كانا

اغرن من الضباب على حلولٍ   وضبّة انه من حان حانا

واحيانا على بكرٍ اخينا   اذا ما لم نجد الا اخانا

"আমাদের ঘোড়াগুলো যখন জনাব গোত্রের ওপর লুটতরাজ চালায় এবং সেখানে কোনই লুটের মাল হস্তগত হয় না, তখন দাবার ও দাব্বা গোত্রের ওপর তাদের ঘরে থাকা অবস্থাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে কেউ মরলে মরুক, কেহ কোন পরোয়া করেনা। আর কখনো কখনো নিজের ভাই বকরের ওপরও হামলা চালানো হয়–যখনই ভাই ছাড়া আর কাউকে লুঠতরাজের যোগ্য পাওয়া যায় না।"

কোন গোত্র যখন যুদ্ধ করতে রওয়ানা দিত তখন সেই গোত্রের মহিলারা পুরুষদের অঙ্গীকার করিয়ে নিত যে, লুটের মাল না নিয়ে তারা বাড়ী ফিরবে না। আমর ইবনে কুলসুম বলেন ঃ

اخذن على بعولتهن عهدًا   اذا لاقوا كتائب معلمينا

لكى يسلبن افراسًا وبيضا   واسرى فى الحبال مقرنينا

"তারা তাদের স্বামীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিল যে, তারা যখন বীরত্বের চিহ্ন লাগিয়ে শত্রুসেনাদের মোকাবিলা করবে, তখন যেন

ঘোড়া ও ধারালো তরবারী নিয়ে ফিরে আসে এবং গোলাম বাঁদীদের রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসে।”

একই কবি অন্যত্র গর্বভরে বলেন ঃ

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدينا

“তারা লুন্ঠিত সম্পদ ও দাসদাসী নিয়ে ফিরলো আর আমরা ফিরলাম বাঁধা রাজাদের নিয়ে।”

‘তাহলাকুল লামাম’–এর যুদ্ধে কবি তুরাফার গোত্র বিজয় লাভ করে। সেই বিজয় গাঁথা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

يوم تُبدى البيض عن أُسوقها وتلف الخيل افواج النعم

“সেদিন চকচকে তরবারীগুলো কোষমুক্ত হয়েছিল এবং সৈনিকেরা উটের পালগুলোকে একত্র করার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল।”

আলে রাবিয়া গোত্রের ওপর বিজয় লাভের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি যুহাইর বলেন ঃ

وسبينا من تغلب كل بيضا ءرقود الضحى برود الرضاب

“আমরা তাগলাব গোত্র থেকে সমস্ত পরমাসুন্দরী বালিকাদের লুন্ঠন করেছিলাম যারা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতো, যাদের ঠোঁটের লালা চুষে খেলে তৃপ্তি পাওয়া যেত।”

‘ইয়াওমে মাসহালান’–এর যুদ্ধে বনুশাইবান গোত্র বনুকালব গোত্রের ওপর যে বিজয় লাভ করে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে জনৈক শাইবান গোত্রীয় কবি বলেন ঃ

عشية ولّى اجمعُهم فتتابعوا فصار الينا نهبه وعوانسهٗ

“সে দিন রাতে তাদের গোটা সম্প্রদায় পালালো। আর তাদের ধন–সম্পদ ও দীর্ঘাঙ্গিনী কুমারী বালিকাগুলো আমাদের হস্তগত হলো।”

গণিমত লাভের এই অদম্য লালসা চরিতার্থ করার বেলায় প্রায়ই এরূপ ঘটতো যে, কোন গোত্র যখন অন্য কোন গোত্রের ওপর হামলা চালিয়েছে, তখন নিছক লুটতরাজের উদ্দেশ্যে গণিমতলোভী কিছুসংখ্যক লোক তাদের

সঙ্গে গেছে। হারেস ইবনে হাল্লাজা একটি গোত্রের ওপর নো'মান ইবনে মুনজে'রের আক্রমনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

فنادت له قراضبة من   كل حى كانهم القاء

ثم ملنا على تميم فاحرمنا   وفيها بنات حراماء

"নোমান ইবনে মুনজিরের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক গোত্র থেকে অর্থলোলুপ লুটেরারা সমবেত হয়েছিল ঠিক যেন তারা শিকারী ঈগল।......অতঃপর আমরা বনুতমীম গোত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং নিষিদ্ধ মাসে তাদের কন্যাদের হস্তগত করলাম।"

এই লুঠতরাজই ছিল আরবদের যুদ্ধ বিগ্রহের প্রধানতম লক্ষ্য। যে যুদ্ধে গণিমত লাভ না হতো, তৎকালীন আরব বুদ্ধিজীবিরাও তাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অর্থহীন যুদ্ধ মনে করতো। আকছাম ইবনে সাইফী ছিলেন নিজ গোত্রের একজন বহুদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি বলতেনঃ هناء الظفر كثرة الاسرى وخير الغنيمة المال، "সর্বাধিক পরিমান যুদ্ধবন্দী হস্তগত হওয়া সর্বোত্তম বিজয়। আর শ্রেষ্ঠ গণীমত হলো উট আর ছাগল লাভ।"

গৌরব বৃদ্ধির অভিলাষ

গণীমত লাভের পাশাপাশি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্ররোচক ছিল নিজেদের বড়াই এবং বীরত্ব ও সাহসিকতা জাহির করার বাসনা। পরস্পরের আভিজাত্যের গর্ব করা ও তা নিয়ে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হওয়া আরবদের সহজাত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম ছিল। নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের তুলনায় নিজেকে অধিকতর শক্তিমান, খ্যাতিমান ও মর্যাদাবান প্রমাণ করার জন্য তারা যে কোন রকমের ঝুঁকি গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যেতো। একজন বীর আরবের সবচেয়ে বড় অভিলাষ থাকতো এই যে, তার চারণভূমিতে যেন অন্যের উট চরতে না পারে। যে জলাশয় থেকে সে পানি নেয় সেখানে যেন অন্য কেউ আসতে না পারে, যে স্থানে সে বসবাস করে, সেখানে যেন অন্যেরা বাস করতে না পারে, যে পোশাক সে পরে তার মত পোষাক যেন অন্য কেউ পড়তে না পারে, তার মোকাবিলায় কাউকে যেন বড় না মনে করা হয়, তার সামনে যেন কারো প্রশংসা না করা হয়. সে যাকে ইচ্ছা খুন করবে কেউ যেন

তার প্রতিশোধ নেবার সাহস দেখাতে না পারে, তার কর্তৃত্ব যেন সকলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাকে সেবা করতে কেউ যেন কুন্ঠা বোধ না করে। মোট কথা সে চাইত, সর্বদিক দিয়ে যেন সকলের ওপরে তার শ্রেষ্ঠত্ব বহাল থাকে এবং কেউ তার সামনে মাথা উচু করতে না পারে। জাহেলী কবিদের সমগ্র কাব্যভান্ডার এই ধরনেরই আবেগ–উচ্ছাস ও ইচ্ছা–অভিলাষে মুখরিত। জনৈক কবি নিজের আভিজাত্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وقد علم القبائل من معدٍ   اذا قببٌ بابطحها بنينا

بانا المانعون لما اردنا   وانا النازلون بحيث شئنا

وانا التاركون اذا سخطنا   وانا الآخذون اذا رضينا

وانا العاصمون اذا اطعنا   وانا العازمون اذا عُصينا

ونشرب ان وردنا الماء صفواً   ويشرب غيرنا كدرًا وطينا

"মা'দ এর সকল গোত্র যখন প্রথম পৃথিবীতে বসতি স্থাপন করেছে তখন থেকেই জানে যে, আমরা যে জিনিসকে রুখতে চাই রুখে দাঁড়াই। যে স্থানে থামতে চাই থামি। যখন রুষ্ট হই ছেড়ে দেই। যখন তুষ্ট হই অকুন্ঠ মনে গ্রহণ করি। যখন আমাদের আনুগত্য করা হয় তখন আমরা সংরক্ষণ করি। যখন আমাদের অবাধ্যতা করা হয় তখন আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। যখন কোন নির্ঝরিনীর কিনারে উপনীত হই, স্বচ্ছ পানি পান করি এবং অন্যদের কাদামাখা পানি পান করতে হয়।"

কয়েস ইবনে সা'লাব বলেন ঃ

بيض مفارقنا تغلى مراجلنا   نأسو باموالنا آثار ايدينا

"(অধিক পরিমাণে আতর মাখতে মাখতে) আমাদের মাথা সাদা হয়ে গেছে, (অত্যধিক আতিথেয়তার কারণে) আমাদের ডেগসমূহ সর্বদাই উনুনের ওপর চড়ানো থাকে। আমরা যাদের আহত করি, নিজেদের অর্থ দিয়ে তার প্রতিকার করি (অর্থাৎ অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করি, ফলে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে না।)

অপর একজন কবি বনু ওয়াবার গোত্রের প্রশংসা করে বলেন ঃ

قوم اذا ما جنى جانيهم امنوا من لؤم احسابهم ان يقتلوا قودا

"তারা এমন গোত্র যে, তাদের কোন উচ্ছৃংখল ব্যক্তি যদি কাউকে হত্যা করে বসে, তাহলে সে নির্ভয়ে থাকে। কেননা তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে কেউ তার বংশ মর্যাদার হানি ঘটায় এমন স্পর্ধা কারো নেই।"

হাজার ইবনে খালেদ সা'লাবী অহংকারের সাথে বলেন ঃ

منعنا حمانا واستباحت رماحُنا حمى كل قوم مستجير مراتعه

"আমরা নিজেদের সুরক্ষিত চারণ ভূমিকে অন্যদের জন্য বন্ধ রেখেছি। কিন্তু অন্যদের সুরক্ষিত চারণ ভূমিতে প্রবল প্রতাপান্বিত রক্ষক থাকা সত্ত্বেও আমাদের বর্শার ঝলক সেইসব চারণ ভূমিকে আমাদের জন্য মুক্ত করে দিয়েছে।"

আখনাস আপন গোত্রের বড়াই জাহির করেন নিম্নরূপ ঃ

ارى كل قوم قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو ساربٌ

"আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ উটের রশী ছোট করে রেখেছে। অথচ আমরা উটকে মুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছি, এবং তা চারণ ভূমিতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে।"

আরব লোকগাথা (আইয়ামুল আরব) পড়লে জানা যায় যে, প্রাক ইসলামিক যুগে যতগুলো বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে, তার অধিকাংশই এই আভিজাত্য বোধের প্রতিযোগিতারই ফল। বনু তাগলাব ও বনু বকরের মধ্যে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেই কুখ্যাত বাসুস যুদ্ধ (হারবে বাসুস) একটি অতি তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে শুরু হয়। বনু তাগলাবের গোত্রপতি কুলাইব ইবনে রবিয়ার চারণ ভূমিতে বনু বকরের জনৈক অতিথির উট হঠাৎ ঢুকে যায় এবং কুলাইবের উটের সাথে বিচরণ করতে আরম্ভ করে। কুলাইবের নিয়ম ছিল যে, তিনি নিজের চারণ ভূমিতে কারো জানোয়ার চরতে দিতেন না। নিজের শিকারের জায়গাতেও কাউকে শিকার খেলতে দিতেন না। নিজের জীব জানোয়ারগুলোর সাথে অন্য কারো জীব জানোয়ারকে পানি খেতে দিতেন না। এমন কি নিজের আগুনের সামনে অন্য কারো আগুন জ্বলতে দেখতে পারতেন না। তিনি যখন অন্যের উটকে নিজের

গৃহপালিত জীব–জন্তুর সাথে চরতে দেখলেন তখন রাগে বেসামাল হয়ে গিয়ে তাকে একটা তীর মারলেন। সে তীর গিয়ে লাগলো উটের স্তনে। উটের মালিক উটকে আহত দেখে শুধু আর্তনাদ করে উঠলো ঃ يا لذل (হায় আক্ষেপ, কি অপমান!) এতেই বনু বকরের মধ্যে যেন আগুন লেগে গেল। অতঃপর তাদের এক তরুন জাসসাস ইবনে মুররা গিয়ে তার আপন ভগ্নিপতি কুলাইবকে হত্যা করলো। কুলাইবের ভাই মুহালহিল যখন হত্যার কথা জানতে পারলো তখন সে নিজের ভাই–এর প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করলো। আর যায় কোথায়, দুই গোত্রে এমন যুদ্ধ বেধে গেল যে, উভয় গোত্র খতম না হওয়া পর্যন্ত তরবারী কোষবদ্ধ হলো না।৫

এরপর দাহেস যুদ্ধ। ঘোড়দৌড়ে একটা ঘোড়া আগে চলে যাওয়া থেকেই তার সূচনা। বনু আবসের সরদার কয়েস ইবনে জুহায়েরের নিকট দাহেস ও আবরা নামে দুটো ঘোড়া ছিল। সারা আরবে তাদের দ্রুত গতির খ্যাতি ছিল। বনু বদরের সরদার হুজাইফা ইবনে বদরের এটা অসহ্য হলো। তারই সমকক্ষ একজন সরদারের ঘোড়ার এই খ্যাতি তার ভালো লাগলো না। সে নিজের দুই ঘোড়ার সাথে দাহেস ও আবরার প্রতিযোগিতার চুক্তি করলো। চুক্তিতে ঠিক হলো যে, যার ঘোড়া আগে যাবে সে একশো উট পুরস্কার পাবে।

প্রতিযোগিতা শুরু হলে দাহেস এগিয়ে যেতে লাগলো। এই অবস্থা দেখে হুজাইফার দলের এক ব্যক্তি তার মুখে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে ভিন্ন পথে চালিত করলো। এ নিয়েই দুইপক্ষে হলো ঝগড়া। কয়েস হুজাইফার ছেলেকে হত্যা করলো। হুজাইফার হত্যা করলো কয়েসের ভাইকে। ফলে বনু আবস ও বনু যাবিয়ানের মধ্যে এমন ভয়াবহ যুদ্ধ হলো যা প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চললো। দুই পক্ষের উট ও ঘোড়ার বংশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ থামেনি।

আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের যে যুদ্ধ পূর্ণ এক শতাব্দী ধরে চলেছে,তা শুরু হয়েছিল পারস্পরিক ঈর্ষা ও ক্ষমতার দর্প থেকে। খাজরাজ দলপতি মালেক বিন আজলা এর প্রতিবেশী ছিল বনু–সাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি। একবার সে বনু কাইনুকার বাজারে ঘোষণা করে বসলো যে, আমার মিত্র মালেক বিন আজলাস সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আওস গোত্রের এক ব্যক্তির কাছে কথাটা খুবই খারাপ লাগলো। সে ঘোষণাকারীকে হত্যা করে ফেললো। এরপর আওস ও খাজরাজের মধ্যে খুনাখুনির এমন ভয়াবহ প্রক্রিয়া

আরম্ভ হলো যে, ইসলামের আগমন না হলে উভয় গোত্র যুদ্ধ করতে করতে শেষ হয়ে যেত।৬

উকাজের মেলায় কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তির বদর বিন মাশার পা মেলে বসলো। সে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো। আমি আরবের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। আমার চেয়েও যদি কেউ নিজেকে সম্মানিত মনে করে তা হলে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, সে আমার পায়ে তরবারীর আঘাত করুক। সঙ্গে সঙ্গে বনু দাহমান গোত্রের এক ক্ষমতাগর্বী যুবক এগিয়ে এলো এবং বদরের পায়ে তরবারীর আঘাত করলো। দু'গোত্রে যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর জন্য এ ঘটনাটা যথেষ্ট প্রমাণিত হলো। এ থেকেই সংঘটিত হলো কুখ্যাত প্রথম ফুজ্জার যুদ্ধ। এরপর কিনানা ও হাওয়াজের গোত্রের মধ্যে আর কখনো আপোষ হয়নি। ক্রমে যুদ্ধের এত বিস্তৃতি ঘটে যে, উভয় পক্ষের মিত্ররাও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[৭]

শেষ ফুজ্জার যুদ্ধও একইভাবে অহংকার ও প্রতিহিংসার ফল ছিলো। ঐতিহাসিক ইবনে আছিরের মতে প্রাকইলামিক যুগে আরবের শেস ফুজ্জার যুদ্ধের চেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ আর হয়নি। হযরতের (সঃ) জন্মের ২৬ বছর আগে হিরার বাদশাহ নো'মান ইবনে মুনজের ঐ রাজ্য থেকে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা উকাজের মেলায় পাঠাবেন বলে মনস্থ করলেন। তিনি আরব সরদারদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার কাফেলার নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে? বারাদ বিন কয়েস কানানী কানানা গোত্র থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন ও দায়িত্ব নিলেন। হাওয়াজের গোত্রের জনৈক সরদার উরয়াতুর রাহহাল বললো, আমি সমগ্র আরবের পক্ষ থেকেই নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি। বারাদ এ ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারলো না। উরয়াহ কাফেলা নিয়ে রওয়না দিলে পথিমধ্যেই তাকে খতম করে দিলো। এই ঘটনার দরুন কানানা ও হাওয়াজের গোত্রের পুরানো শত্রুতা আবার পূনরুজ্জীবিত হলো। উভয় গোত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কোরাইশ কানানার এবং বনু সাকিফ হাওয়াজেনের পক্ষ নিল। চার বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকলো এ যুদ্ধ এবং ইয়াওমে শামতাত, ইয়াওমে শারব, এবং ইয়াওমুল হারিবার ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো, যা আরবের অতীত সমস্ত যুদ্ধের স্মৃতিকে ম্লান করে দেয়।[৮]

প্রতিশোধ স্পৃহা

প্রতিশোধ স্পৃহাও ছিল আরবের রক্তাক্ত ইতিহাসের একটি শক্তিশালী জাতীয় উপাদান। আরবের বিশ্বাস ছিল যখন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় তখন তার আত্মা পাখী হয়ে উড়ে যায় এবং যতক্ষণ তার বদলা না নেয়া হয়, তা পর্বত ও উপত্যকায় اسقونى،اسقونى। আমাকে পান করাও, পান করাও বলে চিৎকার করতে থাকে। তাদের পরিভাষায় এই পাখীর নাম হামা বাসাদা ছিলো।

অনেকের ধারণা ছিলো যে নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেয়া হয় সে জীবিত থাকে। আর যার প্রতিশোধ না নেয়া হয় সে প্রাণহীন হয়ে যায়। কেউ মনে করতো যে, যতক্ষণ বদলা নেয়া না হয় নিহত ব্যক্তির কবর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। এসব ধারণা-বিশ্বাসের দরুণ নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, গোত্রের লোকেরা এমনকি মিত্র গোত্রের লোকেরা পর্যন্ত খুনের বদলা নিয়ে তার আত্মাকে শান্ত করা নিজের দায়িত্ব মনে করতো। হত্যাকারী যদি নিহতের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোক হয় তা হলে তার গোত্রের এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার চেষ্টা করা হতো যে তাদের দৃষ্টিতে নিহত ব্যক্তির সমমর্যাদা সম্পন্ন। এভাবে অনেক সময় এক ব্যক্তির নিহত হওয়ার কারণে বড় বড় গোত্রে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠতো এবং বছরের পর বছর ধরে খুন ও পাল্টা খুনের পালা চলতো। যদি কোন ব্যক্তি বা গোত্র খুনের বদলা নিতে শৈথিল্য দেখাতো কিংবা তার বদলে অর্থদন্ড গ্রহণ করতো তবে তাকে মনে করা হতো নিদারুণ অপমান ও কাপুরুষতার কাজ। এতে তাদের বংশীয় আভিজাত্য ক্ষুন্ন হতো।

জাহেলী কবিদের কবিতায় যে সব বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় তন্মধ্যে এই বদলা গ্রহণ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা অন্যতম। এই ধারনা বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা আরবের গোত্রসমূহকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিত। তাদের রিজ্য বা সামরিক কবিতায় তারা গর্ব করতো যে, তাদের গোত্র কখনো খুনের বদলা না নিয়ে ছাড়েনি। সামাওয়াল বিন আদিয়া বলেন ঃ

وما مات منا سيد حتف انفه ولا طل منا حيث كان قتيل

"আমাদের কোন সরদার নাক দিয়ে মরেনি (অর্থাৎ বিছানায় পড়ে মরেনি) আর আমাদের কোন লোক নিহত হলে তার রক্ত বৃথা যেতে দেয়া হয়নি।"

হারেস বিন হান্নাজা বলেন ঃ

ان نبشتم مابين ملحقة فالصفا ‏ ‏ ‏ قب فيها الاموات والاحياء

"মুলহাকা থেকে ছাকের পর্যন্ত কবরগুলো যদি খুঁড়ে দেখো তা হলে তুমি দেখবে কিছু লাশ মৃত (কারণ তাদের বদলা নেয়া হয়নি) এবং কিছু লাশ জীবন্ত (কারণ তাদের বদলা নেয়া হয়েছিলো)।

কায়েস ইবনে আছেম নিজ গোত্রকে প্রতিশোধ প্রেরণায় উজ্জীবিত করার জন্য বলেন ঃ

فما بال اصداء ببطح غريبة ‏ ‏ ‏ تنادى مع الاطلال يالابن حنظل

صوادى لا صوت عزيز يجيبها ‏ ‏ ‏ ولا اسرة تسقى صداها بمنهل

"সেই অসহায় কণ্ঠস্বরগুলোর কি অবস্থা, তারা ফালুজে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে যে, 'হায়, ইবনে হানজালার প্রতিশোধ কেউ নিল না!' সেই পাখীগুলোর চিৎকারে ও ফরিয়াদের জবাব দেয়ার মত কোন শক্তিশালী মিত্রও নেই, তাদের পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারে এমন কোন আপনজনও নেই।"

তাববাতা শাররান নিজের গোত্রের কীর্তি গাঁথা বলতে গিয়ে বলেনঃ

هم الى الموت اذا خيروا ‏ ‏ ‏ بين تباعات وتقتال

"তাদেরকে খুনের আর্থিক বদলা অথবা প্রাণ বদলা গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হলে তারা সংগ্রাম করে মৃত্যু বরণ করাকেই অগ্রাধিকার দেয়।"

বনু আসাদ গোত্রের জনৈক কবি নিজ গোত্রকে অন্তিম উপদেশ দেন ঃ

فلا تأخذوا عقلا من القوم انني ‏ ‏ ‏ ارى العار يبقى والمعاقل تذهب

"আমার হত্যার বদলে শত্রু-গোত্রের নিকট থেকে অর্থদন্ড নিয়ো না। কেননা অপমান থেকেই যায় আর দন্ডের টাকাও খরচ হয়ে যায়।"

বনু খোজারা'র জনৈক কবি আপন গোত্রকে কিভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের উস্কানী দেন, তা লক্ষ্য করুন!

ولا تطعمن ما يعلفونك انهم ‏ ‏ ‏ اتوك على قربانهم بالمثمل

ابعد الازار مجسدًا لك شاهدًا ... اتيت به في الدار لم يتزيل

اراك اذًا قد صرت للقوم ناضحًا ... يقال له بالغرب ادبر واقبل

فخذها فليست للعزيز بخطة ... وفيها مقال لامرئٍ متذلل

" তারা তোমাকে খুনের অর্থদন্ড দিতে চাইলে তা নিয়ো না। কেননা আত্মীয়তা থাকলেও তা তোমার কাছে বিষ তুল্য। তোমার কাছে যে রক্তরঞ্জিত পোশাক আনা হয়েছে এবং যে পোশাক থেকে রক্ত এখনো দূর হয়নি, তা দেখেও কি অর্থদন্ড গ্রহণ করবে? এরূপ করলে আমি বুঝবো, তুমি পানি বহনকারী উট হয়ে গেছ, যার ওপর পানি ভর্তি পাত্র রেখে বলা হয়, 'এগিয়ে যাও এবং পিছিয়ে যাও।' একান্ত ইচ্ছা হলে নিতে পার, তবে সেটা ভদ্রলোকদের কাজ নয়। এতে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরও আপত্তি থাকার কথা।"

কাবশা বিনতে মাদীকারাব নাম্নী মহিলা কবি তার ভাই–এর খুনের বদলা নেয়ার জন্য বনু জুবায়েদ গোত্রকে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেন ঃ

ارسلَ عبدُ الله اذ حان وقته ... الى قومه لا تعقلوا لهم دمى

ولا تاخذوا منهم افالا وابكرًا ! ... واُترك فى بيت بصعدة مُظلم

فان انتم لم تثأروا واتديتم ... فمشُوا باذان النعام المصلّم

ولا تردوا الا فضول نسائكم ... اذا ارتملت اعقابهن من الدم

"আবদুল্লাহর শেষ মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে এলো তখন সে আপন গোত্রকে বলে পাঠালো ওদের কাছে থেকে আমার খুনের জরিমানা গ্রহণ করো না। তোমরা আমাকে সা'দার অন্ধকর কবরে ফেলে রেখে তাদের কাছ থেকে দু'চারটে শিশু ও বয়স্ক উট নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। তোমরা যদি আমার খুনের বদলা না নিয়ে জরিমানা গ্রহণ কর, তাহলে তোমরা কানকাটা উটপাখীর মত লাঞ্ছিত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। যুদ্ধ করে রক্তাক্ত দেহ ছাড়া তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ধারে কাছেও আসতে পারবে না।"

এই হলো আরবদের গোত্রীয় শত্রুতা ও যুদ্ধ বিগ্রহের মূল প্ররোচক শক্তি। এতে কোন উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্যের নাম গন্ধ পর্যন্ত নেই। প্রতিপক্ষকে

ধ্বংস করার জন্য যে হিংস্র প্রকৃতি বন্যপশুদেরকে প্ররোচিত করে, অবিকল সেই প্রবৃত্তিই অধিকতর উন্নত অথচ ভয়াবহ রূপে জাহিলী আরবদেরকে হত্যা ও লুটতরাজে উদ্বুদ্ধ করতো। যুদ্ধ তাদের চরিত্রের কেবল পাশবিক দিককেই প্রতিফলিত ও বিকশিত করতো। মানবীয় ও অতি–মানবীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে তার কোন সংশ্রব ছিলো না। এমনকি তারা কখনো কল্পনাও করতে পারতো না যে, যুদ্ধের সাথে মানুষের উচ্চতর নৈতিক মুল্যবোধের কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

যুদ্ধের পাশবিক প্রক্রিয়াসমূহ

যুদ্ধ সম্পর্কে যেমন জাহেলী আরব সমাজের ধারনা অত্যন্ত হীন ছিলো এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্যেও যেমন অত্যন্ত গর্হিত ও মানবেতর পর্যায়ের ছিলো, তেমনি তাদের যুদ্ধ করার নিয়ম–পদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত অমানুষিক ও হিংস্র। তাদের ধারণা বিশ্বাস অনুযায়ী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যই ছিলো এই যে, তা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক, ভয়াবহ, ক্রোধোসিক্ত, বিপদ–মসিবতে পরিপূর্ণ, যাঁতাকলের মত পিষ্টকারী, উষ্ট্রবক্ষের মত চূর্ণকারী এবং আগুনের মত দগ্ধকারী। এ জন্য রণাঙ্গণে তাদের ক্রিয়াকলাপও সেই ধারণা–বিশ্বাসেরই অনুরূপ ছিলো। কোন গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অর্থই তাদের নিকট এ ছিলো যে, যেভাবে সম্ভব তাকে ধ্বংসও বরবাদ করে দেয়া চাই। তাদের জঙ্গী স্বভাব আদৌ কোন নৈতিক সীমা ও পরিমিত বোধের ধার ধারতো না। তারা শুধু একটা কথাই বুঝতো যে, শত্রু কেবল নিশ্চিহ্ন করারই যোগ্য এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করাতেই কৃতিত্ব। এ জন্য তারা যুদ্ধে যেসব নৃশংসতা প্রদর্শন করতো ও যেসব সভ্যতা বিবর্জিত কর্মপন্থা অবলম্বন করতো তার বিস্তারিত বিবরণ জাহেলী যুগের কাব্যে, সাহিত্যে ও লোক গাঁথায় পাওয়া যায়। এখানে আমি তার মুষ্টিমেয় কয়েকটি উল্লেখ করছি।

বেসামরিক লোকদের প্রতি বাড়াবাড়ি

যুদ্ধে সামরিক লোকদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ হতো না। দুশমন গোত্রের প্রতিটি ব্যক্তিকেই শত্রু মনে করা হতো এবং জঙ্গী কার্যকলাপের গ্রন্থীতে সকল শ্রেণীর মানুষ সমভাবে অন্তর্ভূক্ত ছিল। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত, পীড়িত, কেউই এই সর্বগ্রাসী বিপর্যয় থেকে অব্যাহতি পেতো না। দুশমন গোত্রকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য নারীদেরকে বিশেষভাবে সামরিক

৩৭পরতার লক্ষ্য বানানো হতো। বিজিত গোত্রের নারীদের শ্লীলতা হানি করা এবং তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা বিজেতার পক্ষে গৌরবজনক বলে বিবেচিত হতো। কবিরা বিশেষ গর্বের সাথে তার উল্লেখ করতো। জনৈক কবি বলেন ঃ

وعقيلة يسعى عليها قيم   متغطرس ابديت عن خلخالها

"অনেক মহিয়সী নারী আছে, যাদের রক্ষণাবেক্ষণে তাদের আত্মসম্ভ্রমী স্বামীরা সচেষ্ট থাকতো। তাদের পাজামা আমি খুলে দিয়েছি।"

فالهو بيضات الخدود   رهناك لا النعم المراح

"যুদ্ধের ময়দানে আসল উদ্দেশ্য থাকে সুন্দরী নারী, চারণভূমি থেকে ফিরে আসা উট নয়।"

আমর ইবনে কুলসুম প্রাণপণ যুদ্ধ করার কারণ দর্শাণ এভাবে যে, তার গোত্র আপন নারীদের অবমাননার ভয়ে শংকিত। তিনি বলেন ঃ

على آثارنا بيض حسان   نخاذران تقسم او تهونا

"আমাদের পশ্চাতে অনেক সুন্দরী মহিলা রয়েছে। আমাদের আশংকা হয়, তাদের অবমাননা কিংবা ভাগবাটোয়ারা না করা হয়।"

অনেক সময় ক্রোধের আতিশয্যে শত্রুর গর্ভবতী নারীদের পেট পর্যন্ত চিরে ফেলা হতো। ইবনে তোফাইল 'ফাইফুর রীহ' যুদ্ধে নিজ গোত্রের বিজয় গাঁথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

بقرنا ما بالى من شنوءة بعدما   خبطن بفيف الريح نهدا وخثعما

"আমরা ফাইফুররীহে নাহদ ও খাচয়াম গোত্রের ওপর সফল আক্রমণ চালানোর পর উত্তেজনার বশে গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে ফেলেছিলাম।"

আগুনে পোড়ানো

শত্রুকে যন্ত্রনা দেয়া ও দৈহিক নির্যাতন করার অধিকার ছিল সীমাহীন। এমনকি আগুনে পোড়ানোর শাস্তি দিতেও দ্বিধাবোধ করা হতো না। আরব ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা এই যে, ইয়ামনের বাদশা জুনওয়াছ তার রাজ্যের

ধর্মত্যাগী সকল মানুষকে পাকড়াও করে প্রজ্জলিত আগুনের চিতায় ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিলো। পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কেই সূরা বুরুজ নাজিল হয়। قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ۔

ইমরুল কায়েসের ছেলে মুনজের উয়ারা যুদ্ধে যখন বনু শাইবান গোত্রের উপর বিজয় লাভ করে, তখন সেই গোত্রের নারীদেরকে জ্যান্ত পোড়ানো শুরু করে। অবশেষে বনু কায়েস গোত্রের এক ব্যক্তি অতি কষ্টে তাদের জান বাঁচায়। কবি আ'শা এই ঘটনা নিয়ে গর্ব করে বলেছে ঃ

سبايا بني شيبان يوم اوارة   على النار اذ تجلى به فتياتها

"তিনি উয়ারা যুদ্ধে বনুশায়বানের বন্দীদের মুক্ত করলেন এবং পরক্ষণেই তাদের যুবতী মেয়েদেরকে জ্যান্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হতে লাগলো।"

আমর ইবনে মুনজের একটি ত্রুটির জন্য মান্নত করে যে, 'বনু দারেম গোত্রের অন্ততঃ একশ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবো। পরে সত্যি সত্যি সে তাদের ওপর চড়াও হয় এবং ৯৯ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আগুনে পুড়িয়ে মারে। তার মান্নতপূর্ণ হতে একজন বাকী ছিলো। ঘটনাক্রমে ঐ সময় বিরাজুম গোত্রের এক ব্যক্তি ঐ জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলো। সে গোশতের ঘ্রাণ পেয়ে ভাবলো, খাবারের আয়োজন হচ্ছে। এ জন্য সে আমরের বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলো। আমর তার মান্নত পূর্ণ করার জন্য তৎক্ষণাত তাকে আগুনে ফেলে দিলো। এই ঘটনা সম্পর্কে কবি জরীর বলেন ঃ

اين الذين بنار عمرو احرقوا   ام اين اسعد فيكم المسترضع

"আমরের চিতায় যারা পুড়ে মরেছে তারা আজ কোথায়? তোমাদের লালিত সেই আসয়াদই বা কোথায়?

যুদ্ধবন্দীদের সাথে অসদাচরণ

যুদ্ধ বন্দীদের সাথে করা হতো ইতর প্রাণীর চেয়েও খারাপ ব্যবহার। অনেক সময় চরম প্রতিশোধ স্পৃহাও প্রতিহিংসার উম্মত্ততা বশে তাদেরকে অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হতো। উকল উরাইনার ঘটনা হাদিসে বর্ণিত আছে। তারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পশু পালকদের ধরে নিয়ে তাদের হাত পা কাটে। তাদের চোখ উপড়ে ফেলে

এবং উত্তপ্ত বালুকার উপর ফেলে রেখে পিপাসা ও যন্ত্রণায় ছটফট করিয়ে মারে।

উয়ারা যুদ্ধের এ ঘটনাও প্রসিদ্ধ যে, বনু শায়বান গোত্রের যেসব যুদ্ধবন্দী ইমরুল কায়েসের ছেলে মুনজেরের হস্তগত হয়, তাদের সকলকে উয়ারা পর্বতের চূড়ায় নিয়ে গেয়ে এক এক করে হত্যা করে। সে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে যে, বন্দীদের রক্ত যাবত পর্বতের পাদদেশকে রঞ্জিত না করবে, ততক্ষণ আমি হত্যা করা বন্ধ করবো না। শেষ পর্যন্ত নিহতদের সংখ্যা যখন কয়েক দশকে গিয়ে দাঁড়ালো এবং তথাপি পর্বতের আদদেশ ভিজলোনা তখন সে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য রক্তের ওপর পানি ঢালিয়ে দিল। ফলে রক্ত বেয়ে পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো। [৯]

ইমরুল কায়েসের বাপ হাজার ইবনে হাসে যখন বনু আসাদ গোত্রের ওপর আক্রমণ চালায়, তখন তাদের যতগুলো লোক বন্দী হয়ে আসে তাদের সকলকে সে হত্যা করায়। সে আরো নির্দেশ দেয় যে, তাদেরকে তরবারী দিয়ে নয়, বরং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হোক। [১০]

অতর্কিত আক্রমণ

যুদ্ধ ঘোষণা না করেই অতর্কিতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া অত্যন্ত পছন্দনীয় সমর কুশলতারূপে গণ্য হতো। এ উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ রাতের শেষভাগে হঠাৎ আক্রমণ করা হতো। কুররা ইবনে জায়েদ বলেন ঃ

فصبحهم بالجيش قيس ابن عاصم　　　فلم يجدوا الا الاسنة مصدرا

"কায়েস ইবনে আছেম প্রত্যুষেই তাদের সেই বাহিনী নিয়ে তাদের উপর চড়াও হলো এবং বর্শাগুলো মানুষের বক্ষদীর্ণ করতে আরম্ভ করলো।'

আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলমী বলেন ঃ

فلم ار مثل الحي حيا مصبحًا　　　ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا

"আমরা যে গোত্রের ওপর প্রত্যুষে হামলা করলাম তার মত গোত্র আর দেখিনি, আমরা যখন অশ্ববাহিনীর মোকবেলা করি তখন আমাদের মত দুর্ধর্ষ যোদ্ধাও কোথাও দেখা যায় না।'

ঊষা কালের এই বৈশিষ্ট্যের বিচারেই লোকে বন্ধুদের প্রভাতকাল কল্যাণময় হোক বলে দোয়া করতো। আনতারা ইবনে শাদ্দাদ আপন প্রেমিকাকে উপলক্ষ করে বলেন ঃ

يا دار عبلة بالجواء تكلمي　　　وعمي صباحا دار عبلة واسلمي

"জেওয়ায় অবস্থানকারী হে উবলার বাসগৃহ, তুমি কিছু বল এবং প্রত্যুষকালে আক্রমণকারীদের হাত থেকে সুরক্ষিত থাক।"

আরবে এও রেওয়াজ ছিল যে, শত্রু গোত্রের নেতাদেরকে গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থাতেই হত্যা করা হতো। এর পারিভাষিক নাম ছিল 'ফিতক' এবং এরূপ হত্যাকারীদের বলা হতো 'ফাত্তাক'। হারেছা ইবনে জালেম মুরী, বারাদ ইবনে কায়েস আল কানানী, সালীক ইবনে সালকা, তায়াব্বাতা শাররান প্রমুখ আরবের নাম করা 'ফাত্তাক' ছিলো।

নিহতদের লাশের অবমাননা

প্রতিশোধ পরায়ণতার আতিশয্যে মৃতের লাশকেও হিংস্রতা থেকে অব্যহতি দেয়া হতো না। লাশের নাক কান কাটা হতো। অংগ প্রত্যংগ কেটে জীবিতদের প্রতিশোধ মৃতদের কাছ থেকে নেয়া হতো। কখনো কখনো এমন জীববিতদের প্রতিশোধ মৃতদের থেকে নেয়া হতো। কখনো কখনো এমন সব পাশবিক ও লোম হর্ষক ক্রিয়াকান্ড করা হতো যা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। ওহোদ যুদ্ধের এ ঘটনা সর্বজন বিদিত যে, কোরেশ নারীরা মুসলিম শহীদদের কান কেটে মালা বানিয়ে গলায় পরেছিলো। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদা হজরত হামজা (রাঃ)-এর কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছিল। ইয়াহামীম যুদ্ধে বনী জাদীলা গোত্রের সরদার আসবা ইবনে আমর নিহত হলে বনু সানবাস গোত্রের এক ব্যক্তি তার দু'কান কেটে জুতোয় লাগিয়েছিল। কবি আবু সারওয়া সানবাসী সে সম্পর্কে গর্ব করে বলেন ঃ

نخصف بالآذان منكم نعالنا

"আমরা তোমাদের কান দিয়ে জুতোর তালি লাগাই।"

অপর একজন সানবাসী কবি বনু জাদীলাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

فان تبغضونا بغضة في صدوركم　　　فانا جدعنا منكم وشرينا

"তোমাদের মনে যদি আমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশ থেকে থাকে তবে সেটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা আমরা তোমাদের নাক কান কেটেছি এবং তোমাদের ধরে ধরে বিক্রি করেছি।"

কখনো কখনো শত্রু পক্ষীয় লাশগুলোর পা ধরে হিড় হিড় করে টানা হতো। জনৈক কবি বলেন ঃ

وشدوا شدة اخرى فجروا   بارجل مثلهم ورموا جُرَيْنا

"তারা আবার আক্রমণ চালালো। শত্রুর পা ধরে টানলো এবং জুরাইনকে তীর মারলো।"

কারো সাথে কঠোর শত্রুরা থাকলে তারা প্রতিজ্ঞা করতো যে, তাকে হত্যা করে তার মাথার খুলিতে মদ খাবে। ওহদ যুদ্ধে আছেম ইবনে ছাবেত রাঃ এর হাতে মুছাফে ইবনে তালহা ও জাল্লাছ ইবনে তালহা নামক দুই ভাই নিহত হয়। তাদের মা ছালাফা প্রতিজ্ঞা করলো যে হজরত আছেমের রাঃ মাথার খুলিতে মদ খাবে। পরে রজী নামক স্থানে হজরত আছেম (রাঃ) শহীদ হলে কোরেশরা তার লাশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য ছিলো ছালাফার নিকট তার খুলি বিক্রি করা।[১১] ২৫ বছর ব্যাপী চালু থাকা হারবুল ফাসাদ যুদ্ধে দুইপক্ষ পরস্পরের নিহতদের খুলিতে মদ খেয়েছিল। ইয়ামীম যুদ্ধেও এরূপ ঘটনা ঘটে।[১২] আবু সারওয়া সানবাসী অনুরূপ ঘটনার প্রতি ইংগীত দিয়েই বলেন ঃ

ونشرب كرهًا منكم فى الجماجم

"আমরা বিস্বাদ লাগা সত্ত্বেও তোমাদের মাথার খুলিতে মদ খাই।"

শত্রুপক্ষের লাশগুলোকে হিংস্র পশু দিয়ে খাইয়ে দেয়া হতো এবং একে গৌরবের কাজ মনে করা হতো। আনতারা বলেন ঃ

ان يفعلا ولقد تركتُ اباهما   جزر السباع وكل نسر قشعم

"তারা যদি আমাকে গালিগালাজ করে তবে সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। কেননা আমি তাদের বাপকে শিয়াল শকুন দিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলাম।"

শুরাইহ আবসী বলেন ঃ

واقسم لولا زرعه لتركته   عليه عوافٍ من ضباع وانسر

"শপথ করে বলছি যে, সে যদি বর্ম পরিহিত না হতো তাহলে তাকে আমি শকুন ও হিংস্র পশু দিয়ে খাইয়ে দিতাম।"

আবদুল মুতালিবের কন্যা আতেকা ফুজ্জার যুদ্ধ নিয়ে গর্ব করে বলেনঃ

وخيلنا غادرته   بالقاع تنهشه ضبع

"আমাদের–ঘোড় সওয়াররা মালেকের লাশকে উম্মুক্ত প্রান্তরে রেখে দিয়েছিল এবং মাংসাষী প্রাণীরা তাকে ছিড়ে ছিড়ে খিয়েছিল।"

মুহালহাল বাসুস যুদ্ধের উল্লেখ করে বলেন ঃ

قتلى تعاورها النسور اكفها   ينهشنها وحواجل الغربان

'সেই নিহতদের লাশের ওপর কাক ও শুকুনেরা দলে দলে আসতো এবং তাদের গোশত কুঁরে কুঁরে খেতো।"

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

প্রাগইসলামিক যুগের যুদ্ধ–বিগ্রহ প্রতিশ্রুতি পালনের কোন তোয়াক্কাই করা হতো না। শত্রুর প্রতিশোধ গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ হাতে এলে সমস্ত চুক্তি ও অঙ্গীকার ভেঙ্গে দেয়া হতো। বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। হজরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই আরবের কাফেরদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বনু কাইনুকা, বনু নজীর ও বনু কোরাইজা গোত্রের সাথে হজরতের চুক্তি হয়েছিলো। কিন্তু উক্ত তিন গোত্রই সময় মত তা ভেঙ্গে দেয়। বনু নজীর স্বয়ং হজরত রসূলে করীম সাল্লাহু আলাইয়ে ওয়াছাল্লাম কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলো। বনু কোরাইজা খন্দক যুদ্ধে প্রকাশ্যে ইসলামবিরোধী মহলের সাথে যোগ দেয়। বনু কায়নুকা কোরেশদের আস্কারা পেয়ে সর্বপ্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করে। রা'ল ও জাকওয়ান গোত্র নিজেই হজরতের নিকট কতিপয় লোক সাহায্যের জন্য চেয়ে পাঠায়। হজরত সাল্লাহু আলাইয়ে ওয়াছাল্লাম যখন ৭০ জন সাহাবীর একটি দল তাদের কাছে পাঠালেন তখন তারা বীরে মাউনায় গিয়ে তাদের সবাইকে হত্যা করে। বনু লিহইয়ান গোত্র 'রজী'নামক স্থানে হজরত খোবাইব (রাঃ) জায়েদ ইবনে ওয়াছনা ও আবুদুল্লাহ ইবনে তারেককে নিরাপত্তা দেয়। ফলে তারা যখন অস্ত্র সমর্পণ করেন তখন তিন জনকেই ধরে বেধে ফেলে। হজরত খোরাইবকে

হত্যা করে ও অন্য তিনজনকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে ফেলে। এধরনের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে,

لا يرقبون فى مومن الًّا ولا ذمة

"তারা কোন মুসলমানদের সাথে আত্মীয়তা কিংবা চুক্তি–অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য দেয় না।"

প্রাগইসলামিক যুগের যুদ্ধের এই নীতি ও পদ্ধতি। আরব সৈনিকদের গুণ বৈশিষ্ট্যে সবচেয়ে সুষ্ঠু বর্ণনা জনৈক কবি নিম্নরূপ দিয়েছেন ঃ

فلست بحاضران لم تزركم — خلال الدار مشعلة طحون

يدين بها العزيز اذا رآها — ويسقط من مخافتها الجنين

تشيب الناهد العذراء منها — ويهرب من مخافتها القطين

يطوف بها من النجار اسدٌ — كاسد الغيل مسكنها العرين

يظل الليث فيها مستكينا — له فى كل ملتفت انين

"তোমাদের বাড়ীর ঠিক সামনেই যদি একটি পিষ্টকারী ও দীর্ণকারী সেনাবাহিনী না আসে তাহলে আমি মোটেই সভ্য নাগরিক নই। সেই বাহিনী দেখা মাত্রই শকিমানেরা অনুগত হয়ে যায় এবং গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাতের আশংকা দেখা দেয়। যুবতী কুমারী মেয়েরা তা দেখে বুড়ী হয়ে যায় এবং যারা কখনো রনাঙ্গন থেকে চম্পট দেয় না, তারাও ভয়ে পালায়। সেই বাহিনীতে বনু নাজ্জারের সিংহ বাস করে। গভীর জংগলের সিংহগুলোর মতই তারা হিংস্র। যে জংগলে সিংহ সব সময় নীরব থাকে এবং স্রোতারা সিংহ যাকে চিরে খায় তার আর্তনাদই কেবল শুনতে পায়।"

রোম ও ইরানের সমর পদ্ধতি

আরবদের কথাই স্বতন্ত্র। তারা ছিল অসভ্য ও অশিষ্ট। সভ্যতা ও কৃষ্টির নাম নিশানাও তাদের মধ্যে ছিলো না। জ্ঞান–বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সম্পর্কে তারা ছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের মধ্যে এ ধরনের হিংস্রতা ও পাশবিকতা থাকা মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু সে যুগে যেসব জাতি সভ্যতা

ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করেছিলো তাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, সেটা আমাদের বিচার–বিবেচনা করে দেখা দরকার।

ইতিহাসে সে যুগের যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে অনেক তথ্য সঞ্চিত রয়েছে। যারা সে ইতিহাস পড়েছেন, তারা জানেন যে, অন্ততঃ এদিক দিয়ে সভ্য ও অসভ্য জগতের আচরণে তেমন কোন পার্থক্য ছিলোনা। এক জাতি যখন অন্য জাতির ওপর পরাক্রান্ত হতো তখন তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধপরিকর হতো, সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে ভেদাভেদ করা হতো না। শত্রুপক্ষের প্রতিটি ব্যক্তি হত্যার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত, পীড়িত, ধর্মজাজক, সন্যাসী–বৈরাগী, সকলকেই সামরিক তৎপরতার আওতায় নিয়ে আসা হতো। সেনাবাহিনীর চলাচলের পথের ফসল ও ফলের বাগান নষ্ট করা, দালানকোঠা ঘরবাড়ী ভেঙ্গে চুরমার করা, এবং জনবসতিতে লুটপাট চালানো একটা অতি মামুলী ব্যাপার ছিলো। কোন শহর নগর প্রবল প্রতিরোধের পর বিজিত হলে সেটা হতো তার জন্য মৃত্যু–ঘন্টা। ক্রুদ্ধ বিজেতা যখন সেখানে ঢুকতো তখন পাইকারী হত্যা শুরু করে দিতো। আর হত্যা করেও যখন প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ না হতো তখন শহরে আগুন লাগিয়ে দিতো। এমনকি এ ব্যাপারে সম্রাট আলেকজান্ডারও ব্যতিক্রম ছিলেন না। সিরিয়ার প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র মূর যখন ছয় মাস অবরোধ করে রাখার পর জয় করলেন তখন তিনি রাগের আতিশয্যে পাইকারী হত্যার নির্দেশ দিলেন। ফলে ঐ সময় যাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্যজাতি বলে মনে করা হতো তারা ৮ হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে এবং প্রায় ৩০ হাজার মানুষকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে। যুদ্ধবন্দীদের সে সময়ে হত্যা অথবা দাসত্ব এই দুটোর একটা গ্রহণ করতে হতো। তৃতীয় কোন পথ ছিলো না। কখনো শত্রুপক্ষের সেনাপতিদের এবং রাজা বাদশাহদেরও সম্ভব হলে কঠিন লাঞ্চনা ও নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হতো। রাষ্ট্রদূতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কিন্তু সে যুগে তারাও অনেক সময় বাড়াবাড়ি থেকে রেহাই পেতোনা। বিরোধী পক্ষের নিকট থেকে কোন বাদশাহর দরবারে এমন কোন বাণী বা তথ্য নিয়ে যাওয়া যাকে সে নিজের জন্য অবমাননাকর মনে করে মৃত্যুর ঝুঁকি গ্রহণেরই নামান্তর বলে মনে করতো। এরূপ ক্ষেত্রে দূতদের লাঞ্ছিত ও অপছন্দ হওয়া, কিংবা বন্দীদশা প্রাপ্তি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। এ রকম ক্ষেত্রে কখনো কখনো রাষ্ট্রদূতকে নিঃসংকোচে হত্যা করা

হতো। সবচেয়ে বড় মুছিবত হতো ধর্মীয় মহলের। দুর্ভাগ্য বশতঃ বিজিত দেশের অধিবাসীরা যদি ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হতো, তাহলে বিজেতার পয়লা কাজ হতো তাদের উপাসনালয় ধ্বংস করা, পবিত্র স্থান গুলোর অবমাননা করা এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করা। এমন কি কখনো কখনো বিজেতা এতদূর বাড়াবাড়িও করতো যে, বিজিতদেরকে তরবারীর ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরে বাধ্য করতো।

প্রাচীন যুগের সবচেয়ে উন্নত সাম্রাজ্য ছিল দুটোঃ রোম ও ইরান। সভ্যতা ও কৃষ্টি, জ্ঞান–বিজ্ঞান ও শিল্প–সাহিত্য এবং বাহ্যিক ঐশ্বর্য বৈভব ও শান–শওকত মোটকথা সকল দিক দিয়েই তারা সে যুগে দুনিয়ার সকল জাতির শ্রেষ্ঠ ছিলো। এজন্য আসুন, আমরা তাদেরই ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখতে চাই যে, তাদের সমর পদ্ধতি কিরূপ ছিল।

ধর্মীয় জুলুম

রোম ও ইরানের মধ্যে রাজনৈতিক মত পার্থক্য ছাড়া ধর্মীয় বিরোধও ছিলো। অগ্নি উপাসক ইরান ও খৃষ্ট্রীয় রোমের মধ্যে যখনই যুদ্ধ হতো এবং একে অপরের ভূখন্ডে প্রবেশের সুযোগ পেতো তখন বিজিতদের ধর্মের ওপরই নিপীড়ন ও অত্যাচার চালানো হতো সবচেয়ে বেশী। কোবাদের আমলে (খৃঃ ৫০১ থেকে ৫৩১) যখন ইরান সরকারের ইংগীতে হিরার বাদশাহ মোনজের সিরিয়ার ওপর আক্রমণ চালান, তখন তিনি আন্তাকিয়ায় ৪০০ সন্যাসিনীকে গ্রেফতার করে উজ্জা দেবীর বেদীতে উৎসর্গ করেন।[১৩] (History of persia sykes) খসরু পারভেজ যখন সিজার মারিসের প্রতিশোধ গ্রহণের ছলে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখন নিজ সাম্রাজ্যের চতুঃসীমার মধ্যেকার সমস্ত খৃষ্টীয় গীর্জা ধ্বংস করে দেন। মান্নতের যাবতীয় জিনিসপত্র লুণ্ঠন করেন এবং খৃষ্টানদেরকে বল প্রয়োগে অগ্নি–উপাসকে পরিণত করেন। ১৪ (Roman Empire, Gibbon) । ৬১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বাইতুল মাকদাস জয় করেন তখন সেখানকার প্রধান যাজক জিকরিয়াকে গ্রেফতার করেন এবং মুল ক্রুস ছিনিয়ে নেন। খৃষ্টানদের বিশ্বাস এই যে, এই ক্রুশেই হজরত ঈসা (আঃ)–কে বধ করা হয়েছিল। সেই অভিযানে খসরু পারভেজ সেন্ট হেলেনা ও কনষ্টান্টিনোপলের বিরাটকায় গীর্জায় আগুন ধরিয়ে দেন, তিনশো বছর ধরে সংগৃহীত ধর্মীয় নিদর্শনসমূহ এবং মান্নত ও উৎসর্গের

মূল্যবান জিনিসগুলো লুণ্ঠন করেন, এবং ৯০ হাজার খৃষ্টানকে হত্যা ও বন্দী করেন।[১৫] (Byzantine Empire, E.A. Ford)। এর জবাবে যখন হিরকিল উত্তর দিক দিয়ে ইরানের ওপর আক্রমন চালান তখন অগ্নি–উপাসকদের উপাসনালয়গুলো ধ্বংস করেন, জরদস্তের জন্মভুমি উরমিয়াহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং অগ্নি–উপাসকদের ধর্মের যথাসাধ্য অবমাননা করেন।[১৬] (Roman Empire, Gibbon)

রোমকদের সাথে শত্রুতা থাকার দরুণ ইরানের খৃষ্টান অধিবাসীদের ওপর চরম নিপীড়ন চালানো হতো। রোম সম্রাট যতদিন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি ততদিন ইরানের খৃষ্টানরা নিরাপদে ছিল। কিন্তু কনষ্টান্টিনোপল খৃষ্টবাদের দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ইরান তার খৃষ্টান প্রজাদের সাথে খারাপ আচরণ শুরু করে দেয়। ৩৩৯ খৃষ্টাব্দে শাপুর জুল আকতাফ বিশপ মারাশিমুন ও অন্য ১০৫ জন খৃষ্টীয় ধর্মযাজককে হত্যা করে এবং বহু সংখ্যক খৃষ্টীয় গীর্জা ধ্বংস করে দেয়। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত খৃষ্টানদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন চলতে থাকে।[১৭] (sykes)

মানভিয়া সম্প্রদায়কে নির্মুল করার জন্য বাহরাম যে নির্মম পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করেন তা ছিল সবচেয়ে লোমহর্ষক। মানী যখন জরদস্ত ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আলাদা ধর্ম প্রবর্তন করেন এবং লোকেরা ব্যাপকভাবে তার ধর্মে দীক্ষিত হতে আরম্ভ করে তখন বাহরাম নতুন ধর্মের অনুসারীদের পাইকারীভাবে হত্যা করতে অরম্ভ করেন। স্বয়ং মানীকেও গ্রেফতার করে হত্যা করেন। তার চামড়া খুলে তাতে ভুষি ভরে জুন্দীসাবুরের সদর দরজায় লটকিয়ে রাখেন। এই দরজা দীর্ঘদিন ধরে 'মানী দরজা' নামে খ্যাত ছিল। (আছারুল বাকিয়া, আল বেরণী)।

রাষ্ট্রদূতদের প্রতি বাড়াবাড়ি

নীতিগত ভাবে রাষ্টদুতদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণাটি সে সময়ে স্বীকৃত ছিল। রাজনৈতিক চিন্তানায়কগণ এই অনুভূতির গুরুত্ব ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ততটা সচেতনতার পরিচয় দেয়া হতো না। সিজার সিওরোস আলেকজান্ডারের দরবারে আর্দশেরের দুতগণ এই প্রস্তাব নিয়ে আসেন যে, "রোমকদের শুধু ইউরোপ নিয়েই সন্তুষ্ট

থাকা কর্তব্য এবং সিরিয়া দামাতোলকে ইরানীদের জন্য ছেড়ে দেয়া উচিত।” এতে সিজার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং দূতদেরকে বন্দী করেন।[১৮] (sykes)

নওশেরওয়ানের মত খ্যাতনামা বাদশাহর দরবারে যখন ভিজবল এলখানে আতরাকের দূত মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসেন তখন তিনি তা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান বোধক স্পষ্টোক্তি না করে নীরবে তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা অধিকতর সঙ্গত মনে করলেন। [১৯] (Ibid)

খসরু পারভেজের ক্রমাগত বিজয়াভিযানের ফলে যখন এশিয়া ও আফ্রিকায় রোম সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হয়ে ওঠে যখন সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিসর ও সমগ্র মধ্য এশিয়া রোমকদের হস্তচ্যুত হয়, এমনকি ইরানী সেনাবাহিনী কনষ্টান্টিনোপলের সন্নিকটবর্তী কাজী কুই নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হয় তখন হিরকিল সন্ধি প্রস্তাব সহকারে খসরুর নিকট দূত পাঠান। কিন্তু খসরু জ্যান্ত অবস্থায় প্রধান দুতের দেহের চামড়া খুলে ফেলেন ও অন্যান্য দুতদের বন্দী করেন। অতঃপর হিরকিলের নামে নিম্নরূপ শীরোনামে একটি বিধি দেনঃ “মহান প্রভূ, বিশ্ব সম্রাট খসরুর পক্ষ থেকে তার নির্বোধ ও কুচক্রী দাস হিরকিলের প্রতি।” [২০] (Byzantine Empire)

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার ব্যাপারেও এই উন্নত ও সভ্য জাতিগুলো কিছুমাত্র পিছিয়ে ছিল না। তাদের কাছে প্রয়োজনের সামনে অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির কোন মুল্য ছিলনা। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর রয়েছে যে, রোম বা পারস্য সম্রাটগণ যখনই আপন শত্রুকে শোচনীয় রকমের অসহায় ও নাজুক অবস্থায় পেয়েছেন, অমনি সমস্ত লজ্জা শরম বিসর্জন দিয়ে ও চুক্তি অঙ্গীকারকে সিকেয় তুলে রেখে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অন্যান্যদের কথা বাদ দিন। স্বয়ং নওশেরওয়ান ও জাষ্টিলিনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কারীদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন অথচ এরা দুজন হলো দুই সাম্রাজ্যের সর্বোত্তম প্রতিনিধি। নওশেরওয়ান যখন আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা রোধ করার জন্য শান্তির প্রয়োজন বোধ করেছেন, তখন জাষ্টিলীনের সন্ধি প্রস্তাব অকাতরে মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তি সই করেছেন। কিন্তু যখন ইটালীতে বেলিসারিওসের সাফল্যের মধ্যে রোম সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখতে পেলেন, তখন

হিরাকে দিয়ে গাচ্ছানের ওপর আক্রমণ করালেন এবং নিজে হিরার সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন যাতে রোমও স্বীয় মিত্র গাছছানকে সাহায্য করতেবাধ্য হয়।[২১] (গিবন)

অপর দিকে ৫৭১ খৃষ্টাব্দে যখন ইলখান আতরাক নওশেরওয়ানের প্রতি বিরূপ হয়ে জাষ্টিলীনের সাথে মিত্রতা করতে আগ্রহী হলো তখন জাষ্টিলীনও ইরান সাম্রাজ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এহেন সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন এবং মৈত্রী চুক্তি বাতিল করে ৫৭২ খৃষ্টাব্দে নওশেরওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।[২২] (সাইকস)

যুদ্ধের পাশবিক প্রক্রিয়া সমূহ

আদর্শগত ও নীতিগতভাবে সামরিক লোকদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে একটা মৌলিক ধারণা প্রাচীন যুগ থেকেই দুনিয়ায় চালু ছিল। প্রাচীন গ্রীসের আইন রচয়িতাগণ এরূপ বিধি রচনা করেন যে, নিহতদের সমাহিত করতে হবে, বিজিত নগরের যে সব লোক উপাসনালয়গুলোতে আশ্রয় নেবে তাদের হত্যা করা চলবেনা এবং খেলোয়াড় ও উপাসনালয়ের সেবকদের কিছুই বলা চলবে না।[২৩] (গ্রোটের হিষ্টরী অব গ্রীস) কিন্তু একে তো এই সব বিধি অন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য রচিত হয়নি বরং রচয়িতাদের নিজেদের গৃহ যুদ্ধের জন্য রচিত হয়েছিল। উপরন্তু সমসাময়িক শাসক ও সম্রাট কখনো ঐ বিধিগুলোকে আইনের মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করেননি এবং বাস্তবায়িতও করেন নি। রোম সাম্রাজ্য বিশেষভাবে অরোমীয় সাম্রাজ্য ও রাজ্য সমুহের আইন স্বাধীন অস্তিত্বের বৈধতাই মেনে নেয়নি। কাজেই তাদের সাথে আচরণ করতে গিয়ে কোন কর্তব্য বা অধিকারের প্রশ্নই তাদের কাছে উঠতো না। ইরানের অবস্থাও ছিল তাই। তাদের নিকট অ-ইরানীয় জাতিগুলো সভ্য জাতি পদবাচ্য ছিলনা এবং তারা ইরান সাম্রাজ্যের শত্রু রূপে গণ্য হতো। এ জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের বেলায় তারা নিজেদের জন্য কোন রকমের নৈতিক কর্তব্য অনুভব করতো না।

রোম ও ইরানের সামরিক ব্যবস্থাও এমনি ধরণের ছিল যে, তাতে নৈতিক মুল্যবোধের প্রতি আনুগত্য দেখানো সম্ভব ছিল না। তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ, সামরিক নিয়ম কানুন ও রীতিনীতি শিক্ষা দান ও সামরিক শৃংখলা

কায়েম রাখার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। যুদ্ধের সময় জঙ্গী জনতার বিরাট সামাবেশ ঘটতো। তারা প্রতিবেশী দেশে আক্রমন ও লুন্ঠন চালিয়ে বিরুদ্ধবাদী জাতিকে দমন করা, পরশ্ব অপহরণ করে প্রাচুর্য লাভ এবং সেবাদাস ও সুন্দরী প্রমোদ সঙ্গিনী অর্জন করার লোভে যুদ্ধ করতে যেত। তাদের শাসকদের সামনেও যুদ্ধের কোন নৈতিক লক্ষ্য থাকতোনা। তারা শুধু শত্রুকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিংবা ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই অস্ত্র ধারণ করতো। এই জন্যই তাদের সৈন্যরা শিশু, নারী, বৃদ্ধ, পশু, গাছপালা , মসজিদ–মন্দির মোট কথা কোন কিছুকেই অক্ষত থাকতে দিতনা। যা লুটপাট করা সম্ভব, তা লুটপাট করতো। যা সম্ভব নয় তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিত।

রোমকদের সাথে আফ্রিকার ভান্ডাল ও ইউরোপের গাথদের যুদ্ধ লেগেই থাকতো, তাদের সাথে যে পৈশাচিক আচরণ হতো, তার বর্ণনায় ইতিহাস পরিপূর্ণ। সিজার জাষ্টিনাইনের যুগে যখন ভান্ডালদের ওপর আক্রমণ করা হয় তখন গোটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। যুদ্ধের আগে এই জাতির কেবল যুদ্ধক্ষম পুরুষের সংখ্যাই ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার। এ ছাড়া নারী, শিশু ও দাসদের সংখ্যাও ছিল অনেক। কিন্তু রোমক বিজেতারা যখন তাদের করায়ত্ব করলো তখন একটি প্রণীকেও জ্যান্ত রাখলো না। গিবন বলেন যে, সমগ্র দেশ এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয় যে, একজন অচেনা পর্যটক সেই বিধস্ত জনপদে দিনের পর দিন ঘুরেও একটা মানুষের সাক্ষাত পায়নি। প্রোকো পিওস যখন প্রথম প্রথম উক্ত এলাকায় পদার্পণ করেন তখন তার বিপুল জন সংখ্যা এবং বাণিজ্য ও কৃষির অতুলনীয় উন্নতি ও প্রাচুর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। কিন্তু ২০ বছরের কম সময়ের মধ্যে সেই সমৃদ্ধিশালী জনপদ ধ্বংসপুরীতে পরিণত হয়। ৫০ লাখ মানুষের বিশাল জনপদ জাষ্টিনাইনের আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে নির্মুল হয়ে যায়।[২৪]

ইউরোপে গাথদের সাথেও এমনি ধরনের পাশবিক আচরণ করা হয়। তাদের বাদশাহ টৌটিলা রনাঙ্গণ থেকে পালিয়ে গিয়ে এক দুরবর্তী স্থানে গিয়ে মারা যায়। কিন্তু রোমক সৈন্যরা তার পেছনে ছুটতে থাকে এবং তার লাশের সন্ধান পায়। তারা লাশকে উলংগ করে ফেলে দেয়। অতঃপর তার রক্তাক্ত কাপড় মুকুট সমেত জাষ্টিনাইনের নিকট উপঢৌকন হিসেবে দেয়।[২৫]

৭০ খৃষ্টাব্দে যখন রোম সম্রাট টিটিওস বাইতুল মাকদাস জয় করেন, তখন দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী বালিকাদেরকে বিজেতার মনতুষ্টির জন্য নির্বাচিত করা হয়। ১৭ বছরের উর্ধ্ব বয়স্ক হাজার হাজার মানুষকে ধরে মিশরীয় খনিতে কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েক হাজার মানুষকে গ্রেফতার করে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে নিয়ে যাওয়া হয় শুধু মাত্র হিংস্র জন্তু দিয়ে খাওয়ানো, তরবারীর খেলায় কাটিয়ে দেওয়া ও পরস্পরকে কাটার পৈশাচিক উৎসবাদি করার জন্য। যুদ্ধকালে ৯৭ হাজার ব্যক্তিকে বন্দী করা হয়। তন্মধ্যে শুধু না খেতে পেয়ে মারা যায় তাদের মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭ শো ৪৯।[২৬]

রোম ও ইরানে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহেও অনুরূপ পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হতো। শাপুর জুল আফতাফ যখন আলজাজিরায় অভিযান চালান এবং এমিডা (বর্তমান দিয়ারে বকর) প্রচন্ড প্রতিরোধের পর বিজিত হয় তখন যুদ্ধ বিজেতা শহরে প্রবেশ করে পাইকারী গণহত্যার নির্দেশ দেন এবং তাকে এমনভাবে উজাড় করে দেয় যে, আর কখনো তা গড়ে উঠতে পারেনি। ৫৪০ খৃষ্টাব্দে যখন নওশেরওয়ান সিরিয়ার ওপর আক্রমণ চালান তখন তার রাজধানী আন্তকিয়াকে বিধ্বস্ত করে দেন, ব্যাপক গণহত্যা করেন এবং দালান কোঠা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন। এতেও যখন তার স্বস্তি হলোনা তখন শহরে আগুন লাগিয়ে দেন। ৫৭২ খৃষ্টাব্দে নওশেরওয়ান পুনরায় সিরিয়া আক্রমন করেন, ফামিয়া আন্তকিয়া প্রভৃতি শহরে লুণ্ঠন করেন ও পুড়িয়ে দেন। তারপর ২ লক্ষ ৯২ হাজার সিরীয়কে গ্রেফতার করে ইরান পাঠিয়ে দেন। বহু সংখ্যক সুন্দরী তরুনীকে ইলখা আতরাকের নিকট পাঠান যেন তাঁর অসন্তোষ দুরীভুত হয় এবং জাষ্টিনাইনের সাথে মৈত্রী ত্যাগ করেন। ৫৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আরমেনিয়া আক্রমন করেন এবং থিওডোসো পোলিশ জয় করতে না পেরে ক্যাপিডোসিয়ায় (ক্কাবাজেক্ক) ঢুকে যা সামনে পান তাই ধ্বংস করে দেন। এমনকি মালতিয়া (ণর্ফধভণ) কে পুড়িয়ে ভস্মীভুত করে দেন। শেষের দিকে খসরু পারভেজ রোম সাম্রাজ্যের ওপর যে ভয়াবহ আক্রমন চালান তা সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও মধ্য এশিয়ার জন্য প্রলয়ংকরী ঘটনা ছিল। কেবল মাত্র বায়তুল মাকদাসে যে জুলুম চালানো হয় তা ইতিপুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। দামেসক, আন্তকিয়া, হাল্ব প্রভৃতি শহরের পরিণতিও প্রায় একই রকম হয়েছিল।[২৭]

এই সব অমানুষিক কার্যকলাপ কখনো কখনো জঘন্যতম প্রতারনা, ধোকাবাজী ও কাপুরুষোচিত চক্রান্তের আকারে প্রকাশ পেত। আর্দশেরের এ ঘটনা সর্বজন বিদিত যে, তিনি যখন আরমানিস্তানের নরপতি খসরুকে সামরিক শক্তিতে পরাভূত করতে পারলেন না তখন তাকে গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে হত্যা করান।[২৮] রোম ও ইরানের ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা মোটেই বিরলনয়।

যুদ্ধবন্দীদের অবস্থা

সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করা হতো যুদ্ধবন্দীদের সাথে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নিজেদের ছাড়া অন্য সকল জাতিকে 'বর্বর' ও অসভ্য ভাবতো। তাদের আইনে এই ভাগ্যাহত গোষ্ঠীর জন্য হত্যা অথবা দাসত্ব ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যবস্থার অবকাশ ছিলনা। এরিষ্টটলের মত নীতিবাগিশ ব্যক্তি নিঃসংকোচে বলতেন যে, আল্লাহ বর্বরদেরকে কেবল দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[২৯] তাই এদেরকে দাস হিসেবে গ্রহণ করার জন্য যুদ্ধ করা অর্থোপার্জনের একটা বৈধ ও সম্মানজনক পন্থা।[৩০]

একদিকে এইসব ধারণা–বিশ্বাস রোমকদের মনে বিজাতীয়দের জান–মালের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমিয়ে দিয়েছিল। অপর দিকে রোমকদের সমাজ–মানসের বিকাশ এমন হিংস্র পরিবেশে হয়েছিল যে, লোকেরা খেলাধুলা ও মেলা–উৎসবাদিতে লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী দেখে খুশী হতো এবং সে সব দৃশ্যে কেবল অভিনয় নয়– বাস্তব ঘটনা দেখা অধিক পছন্দ করতো । যদি কোন ঘর পোড়ার দৃশ্য দেখানোর প্রয়োজন হতো, তা হলে তারা চাইত যে, সত্যি সত্যিই একটা ঘর পোড়ানো হোক। অনুরূপভাবে কোন মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা কিংবা কোন অপরাধীকে বাঘের খাঁচার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বধ করানোর দৃশ্য দেখতে গেলে সে ক্ষেত্রেও দর্শকরা আবদার ধরতো, কাউকে সত্যি সত্যি জীবন্ত পোড়ানো এবং কাউকে সত্যি সত্যি বাঘের খাঁচায় ছেড়ে দেয়া হোক। এ উদ্দেশ্যে সব সময়ই তাদের বিশেষ ধরনের কিছু লোকের দরকার হতো যাদের দিয়ে ঐসব হিংস্র উৎসবে আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করা যায়। রোমের স্বাধীন নাগরিকরা যে এর উপযুক্ত সাব্যস্ত হতে পারতো না তা বলাই বাহুল্য। তাই ভিন্ন দেশ থেকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আগত লোকদেরকে এই পৈশাচিক উল্লাসের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কোন কোন

সময় এইসব নারকীয় উৎসব এত বড় আকারে হতো যে, কয়েক হাজার লোককে একই সঙ্গে তরবারীর আঘাতে হত্য করা হতো। টিটিওসকে মানবজাতির প্রিয় ব্যক্তি (Darling of the Human Race) বলা হতো। এই টিটিওস একবার ৫০ হাজার হিংস্র পশুকে আটক করে কয়েক হাজার ইহুদী কয়েদীকে তাদের সাথে ছেড়ে দেন। ট্রজনের মেলায় ১১ হাজার হিংস্র পশু ও ১০ হাজার মানুষকে দিয়ে লড়াই করানো হতো। ক্লাডিওস একবার ১৯ হাজার মানুষের হাতে তরবারী দিয়ে লড়াই সংগঠিত করান এবং এভাবে নিজের পৈশাচিক আনন্দ চরিতার্থ করেন। সিজার অগাষ্টাস এক লিখিত দলিলে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ৮ হাজারটি তরবারীর খেলা এবং ৩৫১০ টি হিংস্র প্রাণীর উৎসব দেখেছেন। এ সমস্ত উৎসব কেবলমাত্র যুদ্ধবন্দীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হতো।

এ ছাড়া স্বাধীন রোমকদের গোলামী ও দাসত্ব করাও যুদ্ধবন্দীদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমাজে তাদের স্থান ছিল সবার নীচে। তাদের কোন নির্দিষ্ট নাগরিক অধিকার ছিলনা। তাদের প্রাণের কোন মুল্য ছিলনা। তাদের জীবনের একমাত্র উদ্ধেশ্য ছিল আপন প্রভুদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা। ঐতিহাসিক ফেরার বলেনঃ " তারা শৈশব কাটাতো লাঞ্ছনা–গঞ্জনার মধ্য দিয়ে, যৌবন কাটাতো কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে আর বার্ধক্যে শিকার হতো নির্মম অবহেলার। এভাবেই তারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের স্তরগুলো পার হয়ে যেত।"[৩১] রোমক আইন দাস শ্রেণীর মানুষের জন্য এত কঠোর ছিল যে, কোন দাস তার প্রভুর ওপর হাত তূললে তাকে এবং কখনো কখনো তার গোটা পরিবারকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো।[৩২] ৬১১ খৃষ্টাব্দে হিরাক্লিয়াসের সিংহাসনে আরোহনের অল্পকিছুদিন পরই যখন তার স্ত্রী ইউডোকসিয়ার মৃত্যু ঘটে তখন তার লাশ সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার পথে একটি দাসী মাটিতে থুথু নিক্ষেপ করে। এ অপরাধের জন্য তাকে তৎক্ষণাত গ্রেফতার করা হয় এবং হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়।[৩৩]

ফেরার বলেন যে, রোমের বিজয়াভিযানের পরিধি যখন বিস্তৃতি লাভ করে তখন দেশে আগমনকারী যুদ্ধ বন্দীর সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি এক সময়ে তাদের সংখ্যা ৬ কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়।[৩৪]

রোমের ন্যায় ইরানেরও যুদ্ধবন্দীদের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিলনা। মামুলী বন্দীদের কথা থাক। খোদ রোম সম্রাট সিজার ভ্যালোবীয়ান যখন প্রথম শাপুরের হাতে বন্দী হন, তখন তাকে শিকলে বেঁধে সমস্ত শহরে ঘুরিয়ে বেড়ানো হয়। তাকে সারা জীবন গোলামী খাটান হয়। অতঃপর মৃত্যুর পর তার চামড়া খুলে তাতে ভুষি ভরে দেয়া হয়।[৩৫] শাপুর জুল আকতাফের এ ঘটনা সর্বজন বিদিত যে, বাহরায়েন ও আলহাজার আরব যুদ্ধবন্দীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি তাদের বাহুতে ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে রশী ঢুকিয়ে সকলকে একসঙ্গে বেধে দেয়ার নির্দেশ দেন।[৩৬]

নৃশংসতার ঘটনা গুলো আরো বিভৎস হয়ে দেখা দেয় তখন যখন আমরা শুনতে পাই যে, মানুষের ওপর এ জুলুম কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধূ মাত্র খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ এবং রাজসিক শান-শওকত প্রদর্শনের জন্য করা হতো। আবার কখনো কখনো এমনও হতো যে, শুধুমাত্র রাজা-বাদশাদের হীন প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত প্রবাহিত করা হতো। খোদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের ঘটনা। খসরু পারভেজ নোমান বিন মুনজিরের মেয়ের সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনে তাকে নির্দেশ দিলেন তার মেয়েকে রাজকীয় হেরেমে ভর্তি করতে, কিন্তু নোমানের আরবীয় সম্ভ্রমবোধ এটা মেনে নিতে পারেনি। তাই তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে খসরু হিরার রাজ্য বাজেয়াপ্ত ও নোমানকে গ্রেফতার করার ফরমান জারী করলেন। নোমান বনী শায়বান গোত্রের তত্ত্বাবধানে ছেলে মেয়েদের রেখে নিজে পারস্য সম্রাটের দরবারে হাজির হয়ে কৃপা ভিক্ষা করলেন। কিন্তু পারস্য সম্রাট তাকে হত্যা করালেন এবং ৪০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন বনী শায়বানের নিকট থেকে নোমান বিন মোনজেরের পরিজনকে আনতে। জুকার নামক স্থানে এই সৈন্যদের সাথে আরবদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এভাবে একজন সম্রাট কেবল একটি সুন্দরী নারীর মোহে রক্তের বন্যা বইয়ে দিল।

এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সে যুগে যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা, সামরিক লোকদের কর্তব্য ও অধিকার, ক্ষমতায় কোন আত্মসংযম এবং যুদ্ধে রাগ ও দয়ার সংমিশ্রনের অস্তিত্ব বাস্তবে দুরে থাক, মানুষের ধারণা-কল্পনায়ও ছিলনা। সে সময়কার সবচেয়ে সভ্য বলে পরিচিত জাতিগুলোও যুদ্ধের ব্যাপারে হিংস্রতা ও পশুত্বের

আদিম স্তরে ছিল। সে সময়ে যুদ্ধ বলতে কেবল হত্যা ও লুটতরাজই বুঝাতো এবং তা শুধু শক্তিমানের প্রয়োজন ও অভিলাষ চরিতার্থ করার উপায় বলেই বিবেচিত হতো। ফলে নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা ও বর্বরতা, রক্তপাত ও পাশবিক নির্যাতন যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধ শব্দটা উচ্চারণ করতেই মানুষের মনে এমন একটা জিনিসের ছবি ভেসে উঠতো যার অন্তর্ভুক্ত ছিল নির্বিচার নরহত্যা এবং নগর ও জনপদকে ধ্বংস ও লূন্ঠন করার সম্ভাব্য সমস্ত পন্থা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী ঔদাসিন্য ও অসংযমের দরুন যুদ্ধের সাথে পৈশাচিক ক্রিয়া কলাপের এমন গভীর সম্পর্ক হয়ে যায় যে, মানুষ এমন কোন যুদ্ধের কথা কল্পনাই করতে পারতো না যে যুদ্ধ গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ থেকে মুক্ত। যে যুদ্ধে নারী , শিশু, বৃদ্ধ, আহত ও পীড়িতদের হত্যা করা হয় না। যে যুদ্ধে ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের ধর্মীয়, পবিত্র স্থান ও নিদর্শন সমুহের অবমাননা করা হয় না এবং যে যুদ্ধে নৈতিক নিয়ম বিধি পুরাপুরিভাবে পালিত হয়।

৩। ইসলামের সংস্কার

সম সাময়িক বিশ্বের এহেন নৈরাজ্যপূর্ণ পরিবেশে ইসলাম দিয়েছিল সংস্কারের ডাক। যুদ্ধের চরিত্রই সে পাল্টে দিয়েছিল এবং এ সম্পর্কে এমন একটা আদর্শ পেশ করেছিল যা তখনও পর্যন্ত মানব জাতির অজানা ছিল। তার আদর্শ এই ছিল যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ আসলে একটা পাপের কাজ এবং প্রত্যেক মানুষেরই তা পরিহার করা উচিত। কিন্তু যখন দুনিয়াতে তার চেয়েও বড় পাপের কাজ অনুষ্ঠিত হয়, যখন যুলুম হঠকারীতা এবং বিশৃংখলা ও অরাজকতায় পৃথিবী ভরে ওঠে এবং অহংকারী নরপিশাচেরা যখন বিশ্ববাসীর শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করে তোলে, তখন শুধুমাত্র সেই বৃহত্তর অনিষ্ট রোধের জন্য যুদ্ধকরা আবশ্যকই শুধু নয়-বরং অত্যাবশ্যক।

যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামের আদর্শ

এই আদর্শ অনুসারে যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করা ও তার অনিষ্ট সাধন করা নয় বরং উদ্দেশ্য হলো শুধু মাত্র তার ক্ষতি ও অনিষ্ট রোধ করা। এইজন্য ইসলামের নীতি হলো, যুদ্ধে শুধুমাত্র যতটা শক্তি প্রয়োগ না করলে ক্ষতি ও অনিষ্ট রোধকরা সম্ভব নয়, কেবল ততটাই প্রয়োগ করা

উচিৎ। আর সেই সীমিত শক্তির প্রয়োগও হওয়া চাই শুধুমাত্র সেই সব লোকের বিরুদ্ধে যারা কার্যতঃ যুদ্ধরত কিংবা বড়জোর যাদের দিক থেকে ক্ষতির আশংকা আছে। এ ছাড়া বাদবাকী সকল শ্রেণীর মানুষের যুদ্ধের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। আর শত্রুর যে সব জিনিসের সাথে যুদ্ধের সম্পর্ক নেই তাকেও আক্রমনের আওতায় আনা উচিৎ নয়। সে সময়কার সাধারণ অমুসলিমদের মস্তিস্কে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব ধারণা বিদ্যমান ছিল, ইসলামের এ ধারণা তা থেকে সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র। এ জন্য ইসলাম তখনকার প্রচলিত সমস্ত পরিভাষা বাদ দিয়ে কেবল 'জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহ' এই ভিন্নতর পরিভাষা তৈরী করেছে। এ পরিভাষায় ইসলামের মনোভাব সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং প্রতিহিংসামুলক যুদ্ধের ধারণা থেকে একে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছে। আভিধানিক দিক দিয়ে জিহাদ শব্দের অর্থ হলো "কোন কাজ সম্পাদনের বা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চুড়ান্ত চেষ্টা করা।"

حرب (হারব) শব্দটিতে ক্রোধের আক্রোশ ও লুণ্ঠণের ধারনা বিদ্যমান। روع (রও) শব্দটিতে যে ভীতি ও সন্ত্রাসের ছবি প্রতিবিম্বিত। شر (শার) শব্দটিতে যে পাপ ও অকল্যাণের ভাব নিহিত نطاح (নিতাহ) শব্দটিতে যে পাশবিকতা, হিংস্রতা ও পৈশাচিক নৃশংসতার ভাবধারা পরিস্ফুট এবং كريهة (কারিহা) শব্দে যে আপদ ও রূঢ়তার ধারণা বিরাজমান , জিহাদ শব্দে সে সবের কোনটিই নেই। বরং এ শব্দটি স্পষ্টতই বলে দিবে যে, মুজাহিদের আসল উদ্দেশ্য হলো অনিষ্ট রোধ করা এবং এ জন্য যতটুকু চেষ্টার প্রয়োজন, ততটুকুই সে করতে চায়। কিন্তু শুধু মাত্র "চেষ্টা" শব্দটিও ইপসিত মর্ম বিশ্লেষণের পথে যথেষ্ট ছিল না। কেননা এতে চেষ্টা কোন্ দিকের ও কোন্ পথের তা বুঝা যায় না। "চেষ্টা" ভালোর জন্যও হতে পারে, মন্দের জন্যও হতে পারে। তাই একে আরো খানিকটা সীমিত করার জন্য 'ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে কথাটা জুড়ে দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো প্রবৃত্তির কোন লালসা চরিতার্থ করা, দেশকে পদানত করা, কোন নারীকে হস্তগত করা, কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করা, কিংবা ধনসম্পদ, ক্ষমতা,পদমর্যাদা ও সুনাম–সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা যেন তার মধ্যে প্রবিষ্ট হতে না পারে। বরং শুধুমাত্র সেই চেষ্টাকে বুঝানোই এর উদ্দেশ্য যা শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।যার মধ্যে স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তিপুজার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই এবং তা শুধুমাত্র আল্লাহর মনোনীত ও পছন্দনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্যই নিয়োজিত।

এই পবিত্র ধারণার অধীন ইসলাম যুদ্ধের জন্য একটা পুর্ণাঙ্গ আইনগত বিধান রচনা করে দিয়েছে। সে বিধান যুদ্ধের নীতিমালা, তার নৈতিক বিধি–নিষেধ, যুদ্ধরতদের কর্তব্য ও অধিকার, সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে পার্থক্য ও উভয় শ্রেণীর লোকদের অধিকার, চুক্তিবদ্ধদের অধিকার, দুত ও যুদ্ধবন্দীদের অধিকার এবং বিজিত জাতিসমূহের অধিকার সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। সকলের জন্য মুলনীতি ও প্রয়োজনীয় খুটিনাটি বিধি নির্ণয় করা হয়েছে। সেই সাথে হযরত রসুলে করীম (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বহুসংখ্যক নজীরও পেশ করা হয়েছে যাতে আইনের বাস্তবায়ন এবং সমস্ত ছোটখাট ঘটনাবলীতে মুলনীতির প্রয়োগ পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে যায়।

যুদ্ধের উদ্দেশ্যের পারিশুদ্ধি

কিন্তু তাই বলে নিছক একটি কাগুজে আইন তৈরী করে ক্ষান্ত হওয়াই আইন তৈরীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলনা। বরং আসল উদ্দশ্য ছিল চারিত্রিক ত্রুটি সমুহের সংশোধন এবং যুদ্ধের হিংস্র পদ্ধতিসমুহ বাতিল করে এই সুসভ্য সুশীল আইনটি চালু করা। এ জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মন্ডিত ভ্রান্ত ধারণা সমুহ মানুষের মন থেকে দুর করা। এটা সম্পূর্ণরূপে মানুষের বুদ্ধির অগম্য ছিল যে, যুদ্ধ যদি ধন সম্পদ অর্জন, দেশ দখল, খ্যাতি লাভ, কিংবা জাতীয় ও বংশীয় অহম প্রকাশ করার জন্য না হয় তবে আর কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে জানের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে? স্বার্থ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উর্ধ্বেও যুদ্ধ থাকতে পারে এ কথা তারা ভাবতেই পারত না। তাই হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর পথে জিহাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন। যে সীমা ও শর্তাবলী তাকে তাগুত বা গায়রুল্লার পথে তথা আল্লাহর ক্রোধভাজন পথের জিহাদ থেকে পৃথক করে তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন এবং যুদ্ধের সেই পবিত্র ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দিলেন– যা ইসলাম মানব জাতির নিকট পেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদিস এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।[৩৭]

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে ঃ

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال، الرجل يقاتل

للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه

فمن فى سبيل الله ؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا

فهو فى سبيل الله،

"এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, একব্যক্তি গনিমতের মাল অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে, অপর এক ব্যক্তি নিজের বীরত্ব দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে? রসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দিলেন যে ব্যক্তি শুধু মাত্র আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, তার যুদ্ধই আল্লাহর পথে যুদ্ধ।"

আবু মুসা (রাঃ) অন্যত্র বলেনঃ

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

ما القتال فى سبيل الله ؟ فان احدنا يقاتل غضبًا و يقاتل حمية

فرفع اليه رأسه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا

فهو فى سبيل الله۔

"এক ব্যক্তি হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এল এবং বলল, হে রসুলুল্লাহ্! আল্লাহর পথের যুদ্ধ কি? আমাদের কেউ যুদ্ধ করে রাগের বশে, কেউ যুদ্ধ করে জাতীয় আভিজাত্যের বশে। তিনি মাথা তুলে জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, তার যুদ্ধই আল্লাহর পথের যুদ্ধ।"

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি এসে বললো, " হে রসূলুল্লাহ (সঃ) যে ব্যক্তি আর্থিক লাভ ও খ্যতির জন্য যুদ্ধ করে, তার সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? সে কি পুণ্য লাভ করবে? হযরত জবাব দিলেন, সে কিছুই পাবে না। প্রশ্নকর্তা বিস্মিত হলো। ফিরে এসে পুনরায় একই কথা জিজ্ঞাসা করল। হযরত তখন সেই জবাব দিলেন। তা সত্ত্বেও সে শান্ত হলোনা। তৃতীয় ও চতুর্থ বার ঘুরে ফিরে এসে একই প্রশ্ন করতে লাগলো। অবশেষে হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে শান্ত করার জন্য বলেন, ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصًا وابتغى به وجهه ,

'যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ কবুল করেন না।'

হযরত ওবাদা বিন ছামেত বর্ণনা করেন যে একবার হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গেল কিন্তু শুধু মাত্র উট বাধার রশী সংগ্রহ করার নিঁয়ত করলো, সে কেবল সেই রশীই পাবে। কোনই প্রতিদান লাভ করবেনা।"

হযরত মায়াজ বিন জাবাল বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

الغزو غزوان، فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام
وانفق الكريمة واجتنب الفساد فان نومه ونبهه اجر
كله واما من غزا رياء وسمعة وعصى الامام وافسد في الارض
فانه لا يرجع بالكفاف،

"যুদ্ধ দুই রকমের। যে ব্যক্তি খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং তাতে নেতার আনুগত্য করে। নিজের উত্তম সম্পদ ব্যয় করে এবং বিশৃংখলা ও অরাজকতা ছড়ায় না, সে জাগ্রত বা ঘুমন্ত যে অবস্থাতেই থাক, পুণ্য লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য এবং খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে, নেতার আনুগত্য করে না এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়ায় সে পাল্টা আজাব ভোগ করবে।"

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

اول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة، رجل استشهد
فاتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك
حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جرى
فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى في النار، الحديث ـ

"কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। প্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আনা হবে সে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিল। আল্লাহ তাকে নিজের নেয়ামত সমুহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে যখন

স্বীকার করবে, তখন আল্লাহ আবার জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি আমার জন্য কি করেছ? সে বলবে, আমি তোমার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি যুদ্ধ করেছিলে কেবল লোকে যাতে তোমার বীরত্বের তারিফ করে সে জন্য। তোমার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তার জন্য আজাবের নির্দেশ দেবেন। তাকে দোজখে ফেলে দেয়া হবে।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

يجئ الرجل آخذاً بيد رجل فيقول يا رب ! هٰذا قتلني

فيقول الله له لم قتلته ؟ فيقول قتلته لتكون العزة لك ،

فيقول انها لي ويجئ الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول ان هٰذا

قتلني ، فيقول الله لم قتلته ؟ فيقول لتكون العزة لفلان

فيقول انها ليست لفلان فيبوء باثمه -

“কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত ধরে নিয়ে আসবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি তাকে কেন হত্যা করেছিলে? সে বলবে, আমি ওকে এই জন্য হত্যা করেছিলাম যাতে পরাক্রম কেবল আপনার জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলবেন! হ্যাঁ, পরাক্রম আমার। এরপর অপর এক ব্যক্তি একটি লোককে হাত ধরে নিয়ে আসবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি ওকে কেন হত্যা করেছিলে? সে বলবে, ওকে এই জন্য হত্যা করেছিলাম যেন পরাক্রম অমুকের জন্য নির্দিষ্ট হয়। তখন আল্লাহ বলবেন, পরাক্রম তার ন্যায্য অধিকার ছিল না। অতঃপর তাকে তার অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে।”

এ শিক্ষা যুদ্ধকে সব রকমের পার্থিব উদ্দেশ্যের বশবর্তিতা ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত করে। খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের বাসনা, ক্ষমতা ও পরাক্রম লাভের আশা, ধন–সম্পদ ও গণিমত লাভের মোহ, ব্যক্তিগত ও জাতিগত শত্রুতার

প্রতিশোধ গ্রহণ মোট কথা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করাকে বৈধ রাখা হয়নি। এই স্বার্থগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পর যুদ্ধ নিছক শুষ্ক ও স্বাদ–গন্ধহীন একটি নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায়। এর পরিণতিতে হত্যা, ধ্বংস ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক––এমন প্রত্যাশা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। এমন কি অন্য পক্ষ থেকে যদি আক্রমণ বা বিশৃংখলা ও ফেৎনা–ফাসাদের শূরু হয় তা হলেও কেবল সেই অবস্থায় অস্ত্র ধারণ করা যাবে যখন এ ছাড়া অনিষ্টরোধ ও অবস্থা আয়ত্বে আসার আর কোন উপায় অবশিষ্ট না থাকে। স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لا تتمنوا لقاء العدو وسئلوا الله العافية فاذا لقيتموهم

فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف –

"শত্রুর মোকাবিলা কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে শান্তি প্রার্থনা কর। কিন্তু যদি মোকাবিলা অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় তা হলে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা কর। মনে রেখো, বেহেস্ত রয়েছে তরবারীর ছায়ার নীচে।"

যুদ্ধের পদ্ধতির পরিশুদ্ধি

উদ্দেশ্যের পরিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য সফল করার পদ্ধতিও সংশোধন করেছেন। এভাবে জাহেলিয়তের যুদ্ধ বিগ্রহে যে সব পৈশাচিক প্রক্রিয়া চালু ছিল, তা সব একে একে বন্ধ করে দেন। এ সম্পর্কে বহু সংখ্যক নিরোধমূলক আদেশ বর্তমান রয়েছে এবং সেগুলিতে সামগ্রিকভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

বেসামরিক লোকদের নিরাপত্তা

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো, যুদ্ধরতদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক সামরিক লোকজন, দ্বিতীয় বেসামরিক লোকজন। সামরিক লোক হলো যারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেয় কিংবা প্রচলিত রীতি অনুসারে বা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ যুবক পুরুষ। আর যারা প্রচলিত রীতিনীতি বা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির

বিচারে যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনা বা সাধারণভাবে নেয় না। যেমন নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, আহত, অন্ধ, পঙ্গু, উন্মাদ, পর্যটক, খানকায় বাসকারী তপস্বী, মন্দির ও উপাসনালয়ের সেবক এবং এমনি ধরণের অনিষ্টহীন লোকজন। ইসলাম প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকজনকে হত্যার অনুমতি দিয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকজনকে হত্যার অনুমতি দেয়নি।

একবার রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গণে এক মহিলার লাশ দেখতে পেলেন। তিনি রুষ্ট হয়ে বললেনঃ

ما كانت هٰذه تقاتل فيمن يقاتل

"এই মহিলা তো যুদ্ধকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

অতপর সেনাপতি হযরত খালেদ (রঃ) কে বলে পাঠালেনঃ

لا تقتلن امرأةً ولا عسيفًا

" কোন মহিলা কিংবা মজুরকে হত্যা করো না।" অন্য এক বর্ণনায় জানা যায় যে, এ ঘটনার পর হযরত মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ করে দেন।

এক হাদিসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

لا تقتلوا شيخا فانيا و لا طفلًا صغيرًا و لا امرأة، ولا
تغلوا وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب
المحسنين-

"কোন বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করো না। গণিমতের মাল অপহরণ করো না। যুদ্ধে যা কিছু হস্তগত হয় একত্র কর। ভালো কাজ ও ভালো ব্যবহার কর। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

মক্কা বিজয়ের সময় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন যে, কোন আহত ব্যক্তির ওপর হামলা করা চলবে না, প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে এমন কোন ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করা চলবে না এবং যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে তাকে কিছু বলা যাবে না। ৩৮

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত কোথাও সৈন্য প্রেরণের সময় উপাসনালয়ের নিরীহ সেবকদের ও আশ্রমের সাধক সন্নাসীদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিতেন।

এই সব খুটিনাটি বর্ণনা থেকে মুসলিম ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ এই মুলনীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে সব লোক যুদ্ধ করতে অক্ষম সচারাচর অক্ষম বলেই বিবেচিত হয়ে থাকেন, তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ করা বৈধ নয়, অবশ্য এ ব্যবস্থাটা শর্তহীন নয়। তারা যদি সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ না নেয় তবেই এই ব্যবস্থা। তাদের কেউ যদি সামরিক তৎপরতায় সত্যি সত্যিই শামিল হয় যেমন রুগ্ন ব্যক্তি খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে যুদ্ধের কৌশল শিখিয়ে দিতে থাকে। নারী শত্রুর গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত হয়, শিশু গোপন তথ্য আদান প্রদান করে, অথবা ধর্মীয় আশ্রম বা উপাসনালয়ের লোকেরা তার জাতির মধ্যে যুদ্ধের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তা হলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। কেননা সে নিজেই সামরিক লোকদের সাথে যোগ দিয়ে নিজেকে বেসামরিক লোকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের সার কথা হলো, সামরিক লোকদেরকে হত্যা করা যাবে--চাই তারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাক বা না থাক। আর বেসামরিক লোকদেরকে কেবল তখনই হত্যা করা যাবে যখন তারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে কিংবা সক্রিয় যোদ্ধাদেরই শোভা পায় এমন তৎপরতা চালায়। ৩৯

সামরিক লোকদের অধিকার

সামরিক লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ বৈধ থাকলেও সে অধিকারও শর্তহীন বা সীমাহীন নয়। এর জন্যও কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলা অপরিহার্য। এ সব বিধিনিষেধ ইসলামী আইনে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে যথাঃ

(১) **অতর্কিত অক্রমন নিষিদ্ধঃ** আরবদের নিয়ম ছিল, রাতের বেলা বিশেষতঃ শেষ রাতে যখন লোকেরা গভীর ঘুমে মগ্ন থাকতো অকস্মাৎ হামলা চালাতো। হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভ্যাস বন্ধ করে দিলেন এবং নিয়ম করে দিলেন যে সকাল হওয়ার আগে

শত্রুর ওপর আক্রমন চালানো যাবে না। হযরত আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) খয়বরের যুদ্ধের উল্লেখ করে জানানঃ

كان اذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح .

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন শত্রু গোষ্ঠির নিকট রাত্রিকালে পৌছলেও সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমন চালাতেন না।

(২) **আগুনে পোড়ানো নিষিদ্ধঃ** প্রতিহিংসার তীব্র আক্রোশে আরব অনারব সকলেই শত্রুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতো। হযরতএই পৈশাচিক প্রক্রিয়াও নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। হযরত বলেনঃ لا ينبغي ان يعذب بالنار الارب النار -

"আগুনে পোড়ানোর শাস্তি কেবলমাত্র আগুনের স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ দিতেপারেনা।"

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, একবার রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যুদ্ধে যেতে বললেন। সেই সাথে একথাও বলে দিলেন যে, অমুক দুইজনকে পুড়িয়ে দিও। কিন্তু যেই রওণা দিয়েছি, অমনি রসুলুল্লাহ ডেকে বললেনঃ

اني امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النّار فلا يعذب بها

الا الله ، فان وجدتموها ، فاقتلوهما -

"অমি তোমাদের আদেশ দিয়েছিলাম যে অমুক অমুককে পুড়িয়ে দিও। কিন্তু আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া শুধু আল্লাহরই শোভা পায়। সুতরাং লোক দুটোর দেখা পেলে তাদের হত্যা করো।"

একবার হযরত আলী কিছু সংখ্যক নাস্তিককে পুড়িয়ে মারেন। এতে হযরত ইবনে আব্বাস তাকে ডেকে রসুলুল্লাহর এ নির্দেশ জানিয়ে দেন; لا تعذبوا بعذاب الله ، আগুন আল্লাহর শাস্তি, এর দ্বারা তার বান্দাদের শাস্তি দেয়া উচিত নহে।

(৩) **নির্যাতন পূর্বক হত্যার নিষেধাজ্ঞাঃ** হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুকে বেঁধে হত্যা করা এবং নির্যাতন করে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। উবায়েদ বিন ইয়া'লা বর্ণনা করেন যে, আমরা আব্দুর রহমান বিন খালিদের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। এক জায়গায় আমাদের সৈন্যরা বারজন শত্রু

সেনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। আব্দুর রহমান তাদেরকে বেঁধে হত্যা করতে আদেশ দেন। হযরত আইয়ুব আনসারী যখন এটা জানতে পারলেন তখন বললেনঃ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبر

فوالذى نفسى بيده لوكانت الدجاجة ما صبرتها، فبلغ ذالك

عبد الرحمن بن خالد بن وليد فاعتق اربعة رقاب -

"আমি শুনেছি, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁধে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর কসম মুরগীও আমি বেঁধে বেঁধে হত্যা করতে প্রস্তুত নই। হযরত আব্দুর রহমান বিন খালেদ এ কথা জানতে পেরে চারটি দাস মুক্ত করে দেন।"

(৪) **লুটতরাজ নিষিদ্ধঃ** খয়বরের যুদ্ধে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর কিছু মুসলিম সৈন্য আয়ত্বের বাইরে চলে গেল এবং লুটপাট শুরু করে দিল। ইহুদীদের গোত্রপতি হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে রুক্ষভাবে বললোঃ

يا محمد ألكم ان تذبحوا حمرنا وتاكلوا ثمرنا وتضربوا نسائنا؟

"হে মুহাম্মদ! গাধা জবাই করা, ফল খাওয়া এবং স্ত্রীদের প্রহার করা কি তোমাদের শোভা পায়? হযরত তৎক্ষনাত ইবনে আওফকে মুসলিম সৈন্যদের اجتمعوا للصلوٰة। "নামাজের জন্য সমবেত হও" বলে ডাক দিতে নির্দেশ দিলেন। সমস্ত সৈন্যরা সমবেত হওয়ার পর হযরত (সঃ) দাঁড়িয়ে নিম্নরূপ ভাষণ দিলেনঃ

ايحسب احدكم متكأ على اريكته قد يظن ان الله لم يحرم

شيئا الا ما فى هذا القرآن، الا وانى والله قد وعظت وامرت ونهيت

عن اشياء انها لمثل القرآن اواكثر، وان الله تعالى لم يحل لكم ان

تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذن ولا ضرب نساءهم ولا اكل

ثمارهم اذا اعطوكم الذى عليهم -

"তোমাদের কেউ কি গর্বিত হয়ে এ রূপ মনে করছে যে, কোরআনে যা যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু নিষিদ্ধ নয়? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে যে সব উপদেশ দিয়ে থাকি, যা যা আদেশ বা নিষেধ করি, তাও কোরআনেরই মত বা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তোমাদেরকে আহলে কিতাবের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের মারপিট করা ও তাদের ফল খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা তারা যা যা দেওয়া উচিত তা ইতিমধ্যেই তোমাদেরকে দিয়েছে।"

একবার এক যুদ্ধের যাত্রা পথে মুসলিম সৈন্যরা কিছু সংখ্যক ছাগল লুণ্ঠন করে নিয়ে এল এবং তার গোশ্‌ত রান্না করে খেতে উদ্যত হলো। হযরত রসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে এসেই ডেগচি উল্টিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ ان النهبة ليست باحل من الميتة "লুটের জিনিস পত্র মৃত প্রাণীর গোশ্‌তের মতই অবৈধ।"

আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুটের জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন।[৪০] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শত্রুর দেশে অভিযান চালানোর সময় জনসাধারণের নিকট থেকে যা যা ছিনিয়ে নেয়া হয় তাকে লুটের জিনিস বলা হয়। এ ছাড়া গণিমতের জিনিসপত্র নিয়মিতভাবে বন্টন করার আগে গ্রহণ করা হলে তাও লুটের মালের শামিল।

পথে যদি দুধেল জন্তু পাওয়া যায় তা হলে তার মালিকের অনুমতি ছাড়া দুধ দুইয়ে পান করা চলবেনা। কঠিন প্রয়োজনের সময় কেবল এতটুকু অনুমতি আছে যে উচ্চঃ স্বরে তিন বার ডাকবে। অতঃপর যদি মালিক আসে অনুমতি নেবে। নচেত দুধ পান করবে।

(৫) সম্পদ নষ্ট করার উপরে নিষেধাজ্ঞাঃ সৈন্যদের অগ্রাভিযান চালানোর সময় ফসল নষ্ট করা, জনপদ সমুহে গণহত্যা ও অগ্নি সংযোগ করা যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এটা "ফাসাদ"এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۞ (البقره : ٢٠٥)

"সে যখন শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হয় তখন পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ানো এবং ফসল নষ্ট করা ও গণহত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ অরাজকতাকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আল–বাকারা–২৫)

হযরত আবুবকর (রাঃ) সিরিয়া ও ইরাকে সৈন্য পাঠানোর সময় যেসব নির্দেশ দেন তার একটা ছিল এই যে, জনপদসমুহকে ধ্বংস করা এবং ফসল নষ্ট করা চলবে না। একথা সত্য যে, সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে গাছপালা কেটে ও পুড়িয়ে ময়দান পরিস্কার করার অনুমতি আছে। বনু নজীরের অবরোধের সময় তা করাও হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, নিছক ধ্বংসাত্মক মানসিকতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে এরূপ করা অবৈধ।

ইসলাম বিরোধীরা বনু নজীরের ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে এরূপ অপবাদ দিতে চেষ্টা করেছে যে, ইসলাম যুদ্ধে ধ্বংসাত্মক তৎপরতাকে বৈধ মনে করে। এমনকি মুসলিম হাদিস বিশারদদেরও কেউ কেউ এ ঘটনাকে حرق الدور والنخيل (গাছপালা ও ঘরবাড়ী ধ্বংস করার) বৈধতার প্রমাণ বলে মনে করেন। কিন্তু ঘটনাবলীর গভীর তত্ত্বানুসন্ধানে গেলে বুঝা যায় যে, বনু নজীরের খেজুর গাছ কাটা ও পোড়ানো শুধুমাত্র সামরিক প্রয়োজনের খাতিরেই হয়েছিল–শত্রুর ক্ষতি করা কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নয়। প্রথমতঃ যে খেজুর গাছগুলো কাটা হয়েছিল তা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী لينة নামক একটি বিশেষ ধরনের খেজুর গাছ ছিল। কোরআনের আয়াতটি নিম্নরূপঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ

তোমরা লীনা জাতীয় যেসব গাছ মুলের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় কেটেছ কিংবা অক্ষত রেখেছ, সেটা আল্লাহরই অনুমতিতে হয়েছে। আল্লাহ এভাবে অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করতে চান। (সূরা আল–হাশর)

সোহাইলী বলেন যে, বনূনজীর এই খেজুরকে মৌল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো না। তাদের খাদ্য ছিল 'আজওয়া' ও 'বারনী' জাতীয় খেজুর। আল্লামা ইবনে হাজার বলেনঃ

قال السهيلي في تخصيصها بالذكر إيماءً إلى ان الذى
يجوز قطعه من شجر العدو ما لا يكون معداً للاقتيات لانهم كانوا
يقتاتون العجوة والبرني دون اللينة۔

"সোহাইলী বিশেষভাবে লীনার উল্লেখ করে এই ইংগীত উদ্ধার করেছেন যে, শত্রুর গাছপালার যেগুলোর ফল মৌল খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয় না কেবল সেগুলোই কাটা বৈধ। কেননা বনু নজীর 'আজওয়া' 'বারনী' খেত ,'লীনা' খেত না।" ৪১

তাছাড়া ঘটনাটা ইসলাম বিরোধীরা যেভাবে চিত্রিত করে থাকেন ঠিক সে ধরনের নয়। হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবরোধকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং তার উপস্থিতিতেই সৈন্যরা গাছ কেটেছিল এবং জ্বালিয়েছিল। এটুকু দেখেই বর্ণনাকারীরা ধরে নিয়েছেন যে, কাজটা হযরতের নির্দেশে বা অনুমতিতেই করা হয়েছিল। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, মুসলমানরা কেবল অবরোধের প্রয়োজনেই গাছ কাটা ও পোড়ানো শুরু করেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, কাজটা শরীয়তের দিক দিয়ে কেমন হচ্ছে, তারা হযরতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ هل لنا فيما قطعنا من اجر وهل علينا فيما تركنا من وزر؟

"আমরা যা কেটেছি কিংবা যা কাটিনি, তাতে কি আমাদের কোন পাপ পুণ্য হবে?" এ প্রশ্নের জবাবে নাজিল হলো আয়াতঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ

"লীনার গাছগুলো থেকে যে কয়টি তোমরা কেটেছ এবং যা কাটনি, সে সবই আল্লাহর অনুমতিতে হয়েছিল।"

হযরত জাবেরের বর্ণনাতেও এ কথাই বলা হয়েছে। গাছ কাটার পর লোকেরা হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল যে, হে রসুলুল্লাহ, আমরা যেসব গাছ কেটেছি তাতে পাপ এবং যেসব গাছ কাটিনি তাতে কি পুন্য হবে? এ জিজ্ঞাসার উত্তরেই ما قطعتم من لينة আয়াতটি নাজিল হয়।

মুজাহিদ এই বর্ণনার সমর্থন করে আয়াতটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই যে, কতক মুহাজির গাছ কাটতে শুরু করেছিলেন এবং কতক ছিলেন বিরত। এজন্য আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাজিল করে উভয়ের কাজ শুদ্ধ বলে রায় দেন। উক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, তোমাদের মধ্যে যারা অবরোধকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসু করার উদ্দেশ্যে 'লীনা' গাছ কেটেছে, তারাও ন্যায় পথে আছেন, যারা এ কাজকে 'ফাসাদ' বিপর্যয় বলে মনে করে এ কাজ থেকে বিরত থেকেছে তারাও ন্যায্য পথ অবলম্বন করেছে। কেননা উভয়েই আল্লাহর একটা না একটা নির্দেশ কার্যকরী করেছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইছহাকের ব্যাখ্যা হলোঃ বনু নজীর অবরোধ কালে যখন মুসলিম সৈন্যরা গাছ কাটতে আরম্ভ করে তখন বনুকোরাইজা হযরতকে বলে পাঠায় যে, হে মুহাম্মাদ! তুমি তো ফাসাদ-বিশৃংখলা ছড়াতে অন্যদের নিষেধ করে থাক এবং বল যে আমি সংশোধনকারী হয়ে এসেছি। তা হলে এ গাছ কাটার অর্থ কি? এটাই নাকি তোমার সংশোধন? তখন হযরত এবং মুসলমানরা ভীষন ভাবনায় পড়লেন। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদের সান্ত্বনার জন্য এ আয়াত নাজিল করেন ماقطعتم من لينة অর্থাৎ তোমরা যা কেটেছ এবং যা কাটনি সবই আল্লাহর অনুমতিক্রমে হয়েছে।

মোট কথা ঘটনার গভীরে গেলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত নিজে গাছ কাটার নির্দেশ দেননি বরং সৈন্যরা অবরোধের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে বিনা অনুমতিতে কয়েকটি গাছ কেটে ফেলেছিল। পরে আল্লাহ তায়ালা কাজটিকে এ জন্য বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন যে গাছ যারা কেটেছিল তাদের নিয়ত অরাজকতা সৃষ্টি এবং নাসকতার ছিলনা। কোন কোন ফেকাহবিদ এ থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শুধুমাত্র ঐ বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা বৈধ ছিল। এমন মনে করা চলবেনা যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে যে কোন সময়ে শত্রুর গাছপালা কাটা ও জ্বালানো বৈধ হবে। ইমাম আওজায়ী, লায়েছ ও আবু ছাওরের অভিমত এটাই। কিন্তু বেশীর ভাগ ফেকাহ বিশারদের অভিমত এই যে, অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ সামরিক প্রয়োজনে শুধুমাত্র প্রয়োজন পরিমাণেই এরূপ করা চলবে। অবশ্য ধ্বংস ও নসকতাকতার ইচ্ছা নিয়ে শত্রুর গাছপালা কাটা ও জ্বালানো ইত্যাকার কাজ করা যে হারাম ও অবৈধ সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আল্লামা ইবনে জারীর, আওজায়ী ও লায়েছের মত খন্ডন করতে গিয়ে লিখেছেনঃ

ان النهي محمول على القصد لذالك بخلاف ما اذا اصابوا ذالك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف.

"শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত নাসকতাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের সময় শত্রুর এমনিতেই যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাবে সেটা নিষিদ্ধ করা হয়নি। তায়েফে কামান দিয়ে গোলাবর্ষণের সময় যেমনটি হয়েছিল।" ইমাম আহমদের মতও তাইঃ

قد تكون في مواضع لا يجدون منه بدًا فاما بالعبث فلا تحرق.

"কাটা ও পোড়ানো অনিবার্য হয়ে দেখা দিলে তা করা যাবে। বিনা প্রয়োজনে করা যাবে না।"

এ ধরনের অনিবার্য ধ্বংসক্রিয়ায় আপত্তি করার অবকাশ নেই। বর্তমান যুগের সমর আইনেও অবরোধকে কার্যকর ও সফল করার জন্য এবং অবরুদ্ধরা যাতে গাছপালা ও দালানকোঠার আড়ালে আশ্রয় নিতে না পারে সে জন্য গাছপালা কেটে ফেলা, দালানকোঠা ভাঙ্গা এবং এমনকি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়াকে পর্যন্ত বৈধ রাখা হয়েছে।[৪২] (লরেন্সের প্রিন্সিপ্ল্স অব ইন্টারন্যাশনাল ল–র ৪৪১ পৃষ্ঠা দেখুন)

(৬) **লাশ বিকৃত করা নিষিদ্ধঃ** শত্রুর লাশের অবমাননা করা এবং তাদের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কাটাও ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে এজিদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,ঃ

نهى النبي صلى الله عليه وسلم من النهبى والمثلة.

হযরত রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুটের মাল গ্রহণ করতে ও লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন।

নবী (সঃ) সৈন্যদের যুদ্ধে পাঠানোর সময় এরূপ নির্দেশ দিয়ে পাঠাতেন لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. "প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করনা, গণিমতের মাল আত্মসাত করোনা এবং লাশের বিকৃতি ও অবমাননা করোনা।"

(৭) **বন্দী হত্যার নিষেধাজ্ঞাঃ** মক্কা বিজয়ের পর হযরত (সঃ) যখন শহরে প্রবেশ করেন তখন সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারি করেন যে–

لا تجهزن على جريح ولا يتبعن مدبر ولا يقتلن اسير ومن
اغلق بابه فهو آمن-

"কোন আহত ব্যক্তির ওপর আক্রমন করা চলবে না, পলায়নপর ব্যক্তির পশ্চাদধাবন করা চলবে না, যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা চলবে না, আর যে ব্যক্তি ঘরের দরজা আটকিয়ে ভেতরে বসে থাকবে তাকে কিছু বলা চলবেনা।"[৪৩]

একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একজন বন্দীকে হত্যা করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে নির্দেশ দেন। আব্দুল্লাহ প্রতিবাদ করে বললেন, আল্লাহ আমাদের বন্দী হত্যার অনুমতি দেননি। তবে নির্দেশ দিয়াছেন মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে অথবা অনুকম্পা প্রদর্শন করতে।[৪৪] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর যে কথা বলেছেন সেটা হলো ইসলামের সাধারণ নির্দেশ। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন এ অধিকার ও ক্ষমতা অবশ্যই রাখে যে, ইসলামের মারাত্মক শত্রু মুসলমানদের ওপর কঠোর নির্যাতন চালিয়েছে এমন ব্যক্তি অথবা চরম নৈরাজ্যবাদী ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী এমন ব্যক্তি যে কোন ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী– এ ধরণের লোকদেরকে গ্রেফতার হওয়ার পর হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। হযরত রসুলে করীম স্বয়ং বদর যুদ্ধের যুদ্ধ–বন্দীদের অন্য সকলকে মুক্তিপণ নিয়ে বা অনুকম্পা দেখিয়ে মুক্তি দিলেও উকপ ইবনে আবি মুয়াইতকে হত্যা করান। এ ব্যাপারে ইসলামী সরকার যে পদক্ষেপই নেবেন সরাসরি ও আপোষহীণভাবে নেবেন। মিত্র শক্তিবর্গ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে প্রহসন করে ছিল, ইসলামী সরকার তা করতে যাবে না।

(৮) **দূত হত্যার নিষেধাজ্ঞাঃ** দূত ও প্রতিনিধি বর্গকে হত্যা করতেও হযরত (সঃ) নিষেধ করেছেন। মিথ্যা নবূয়তের দাবীদার মুসায়লিমা যখন উবাবা ইবনুল হারিছকে চরম ধৃষ্টতাপুর্ণ বাণী দিয়ে দূত করে হযরতের নিকট পাঠান, তখন হযরত (সঃ) বলেনঃ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقك -

"দূত হত্যা যদি নিষিদ্ধ না হতো তা হলে আমি তোমার মস্তক ছেদন করতাম।"

এই মূলনীতির আলোকেই ফেকাহবিদগণ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে এসে দাবী করে, আমি অমূক দেশের দূত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসকের নিকট বানী নিয়ে এসেছি, তা হলে তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে ঢুকতে দিতে হবে। তার ওপর কোন বাড়াবাড়ি করা চলবেনা এবং তার ধন সম্পদ চাকর বাকর এমনকি অস্ত্র শস্ত্রেও হস্তক্ষেপ করা যাবেনা। অবশ্য সে যদি নিজের দাবী প্রমাণ করতে না পারে তা হলে সে কথা সতন্ত্র। ইসলামী সরকার তার সাথে কিভাবে আচরণ করবে, তা সে নিজেই ঠিক করে নেবে।[৪৫] কোন কোন ফেকাহবিদ এতদূরও বলেছেন যে, সেই ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রে বসে ব্যভিচার ও চুরি করলেও শরিয়তের শাস্তি সে পাবেনা।

(৯) **প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অবৈধতাঃ** প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, চুক্তি লংঘন, বিশ্বাস–ঘাতকতা ও চুক্তিবদ্ধদের সাথে বাড়াবাড়ি করার নিন্দা করে বহু সংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সে দিক থেকে এটা ইসলামে একটা জঘন্য পাপ কাজ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها لتوجد من مسيرة اربعين عامًا۔

"যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিককে হত্যা করবে, সে বেহেস্তের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ বেহেস্তের ঘ্রাণ পাওয়া যায় চল্লিশ বছরের পথের দুরত্ব থেকে।" অপর এক হাদিসে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেনঃ

اربع خلال من كن فيه كان منافقًا خالصًا من اذا حدّث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔

"চারটা দোষ এমন আছে যা কারো মধ্যে থাকলে সে পুরো মুনাফেক হবে। সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা ভঙ্গ করে। যখন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন তা লংঘন করে এবং যখন ঝগড়াঝাটি হয় তখন গালিগালাজ করে।"

অপর একটি হাদিসে আছেঃ

لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، الا ولا

غادر اعظم غدرًا من امير عامة۔

"কেয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর জন্য একটা ঝান্ডা থাকবে যা তার বিশ্বাসঘাতকতারই সমপর্যায়ভুক্ত হবে। মনে রেখ, যে জননেতা বিশ্বাসঘাতক হয় তার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেউ হতে পারে না।"

একবার আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) রোম সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমন চালাতে যাচ্ছিলেন। অথচ তখনো সন্ধির মেয়াদ শেষ হয়নি। আমীর মুয়াবিয়ার ইচ্ছা ছিল যে, মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই আক্রমন করবেন। কিন্তু আমর ইবনে আম্বাছা নামক জনৈক ছাহাবী সন্ধির মেয়াদকালে যুদ্ধের সাজসজ্জা এবং সীমান্তের দিকে সৈন্যদের অভিযাত্রাকেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পর্যায় ভুক্ত বলে অভিহিত করেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়ার কাছে ছুটে আসেন এবং বলেনঃ الله اكبر، وفاء لا غدر। "কি সর্বনাশ, চুক্তি পালন করুন, প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গবেন না।" হযরত মুয়াবিয়া কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেনঃ আমি হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ছাল্লামকে বলতে শুনেছি যে

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدًا ولا يشدنه

حتّٰى يمضى امده او ينبذ اليهم على سواء۔

"যার সাথে কোন জাতির চুক্তি থাকবে, তার উচিত চুক্তিতে কোন রদবদল না করা– যতক্ষণ সন্ধির মেয়াদ ফুরিয়ে না যায়। যদি অপর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় থাকে তা হলে সমতা বহাল রেখে চুক্তি অবসানের নোটিশ দেয়া উচিত।

(১০) উচ্ছৃংখলতা ও নৈরাজ্য নিষিদ্ধ

আরবদের অভ্যাস ছিল যে, যখন তারা পথে বেরুত তখন যাকে পেত তাকেই উত্যক্ত করত এবং যে জায়গায় শিবির স্থাপন করত সেই জায়গার পার্শ্ববর্তী গোটা এলাকায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ত যে রাস্তায় চলাই মুসকিল হয়ে যেত। মহানবী (সঃ) এটাও নিষেধ করে দিলেন। একবার হযরত জিহাদে

যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি জানতে পারলেন যে, মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে জাহিলিয়ত আমলের বিশৃংখলা বিরাজমান এবং গোটা এলাকায় তারা জনজীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। তিনি ঘোষণা করে দিলেন من ضيق منزلًا اوقطع طريقا فلاجهاد له "যে ব্যক্তি স্থানীয় বেসামরিক লোকদের উত্যক্ত করবে অথবা পথিকদের লূণ্ঠন করবে তাদের জেহাদ হবে না।" অন্যত্র বলেনঃ ان تفرقكم فى هذه الشعاب والاودية انما ذالكم الشيطان "তোমাদের এভাবে উপত্যকায় উপত্যকায় ও ঘাটিতে ঘাটিতে ছড়িয়ে পড়া একটা শয়তানের মত কাজ।"

আবু সা'লব খাসনী বলেন যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) এর নির্দেশের পর মুসলিম সেনাবাহিনীতে এমন শৃংখলা ফিরে এল যে, তারা কোথাও শিবির স্থাপন করলে তাদের সংঘবদ্ধতার জন্য মনে হতো যে একটা চাদর মেলে ধরলে সকলেই তার নীচে চলে আসবে।

(১১) হাঙ্গামা ও গোলযোগ সৃষ্টি অবৈধ

আরবদের যুদ্ধে এত হৈ চৈ ও শোরগোল হতো যে, তার নামই হয়ে গিয়েছিল وغى বা শোরগোল। ইসলাম গ্রহণের পর আরবরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিশ্বনবী (সঃ) এর অনুমতি দেননি। হজরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে ঃ

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا اشرفنا على
واد هللنا وكبرنا ارتفعت اصواتنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم
يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا،
انه معكم انه سميع قريب -

"আমরা হযরত রসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চলতাম। যখন কোন উপত্যকায় পৌছুতাম তখন উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম জপতাম। এতে হযরত বললেন, তোমরা ধীর স্থিরভাবে চল এবং মধ্যম স্বরে আল্লাহকে ডাক। কেননা তোমরা যাকে ডাকছ তিনি বধির নন, অনুপস্থিতও নন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন, অতি নিকটেই আছেন।"

হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাধারণ নির্দেশাবলী

সৈন্যদের অভিযান আরম্ভ করার সময় যুদ্ধ কালীন আচরণ সম্পর্কে আগাম উপদেশ দিয়ে দিতে হয় একথা ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতের জানা ছিলনা। অথচ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকেই আরবের নিরক্ষর নবী এটা উদ্ভাবন করেছিলেন। হযরত রসুলে করীম (সঃ) এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন কোন সেনাপতিকে যুদ্ধে পাঠাতেন তখন তিনি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে প্রথমে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন ঃ

اغزوا بسم الله وفى سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله،

اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا-

"আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে অভিযান শুরু কর। আল্লাহকে যারা অবিশ্বাস করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা খেলাপী করোনা। গণীমতের মাল আত্মসাৎ করো না। লাশ বিকৃত করোনা এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না।"

এর পর সৈন্যদেরকে বলে দিতেন শত্রুর সামনে তিনটে প্রস্তাব রাখতে– ইসলাম, জিজিয়া ও যুদ্ধ। যদি ইসলাম গ্রহণ করে তা হলে তাকে কিছু বলোনা। যদি জিজিয়া দিতে রাজী হয় তা হলে তার জান ও মালের ওপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করোনা। কিন্তু সে যদি তাও না মানে তবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ কর।

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় সৈন্য পাঠান তখন তাদেরকে দশটি নির্দেশ দিয়ে দেন। সকল ঐতিহাসিক ও হাদিস বিশারদগণ সেই নির্দেশগুলো উদ্ধৃত করেছেন। নির্দেশ এইঃ

(১) নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে কেউ যেন হত্যা না করে।

(২) লাশ যেন বিকৃত করা না হয়।

(৩) সন্যাসী ও তপস্যীদের যেন কষ্ট না দেয়া হয় এবং কোন উপাসনালয় ভাঙা চোরা না হয়।

(৪) ফলবান বৃক্ষ যেন কেউ না কাটে এবং ফসলের ক্ষেত যেন পোড়ানো না হয়।

(৫) জনবসতিগুলোকে (সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে) যেন জনশূন্য না করা হয়।

(৬) পশুদের যেন হত্যা করা না হয়।

(৭) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা চলবেনা।

(৮) যারা আনুগত্য স্বীকার করবে তাদের জান মালকে অবিকল মুসলমানদের জান মালের মত নিরাপত্তা দিতে হবে।

(৯) গনীমতের সম্পত্তি যেন আত্মসাৎ করা না হয়।

(১০) যুদ্ধে যেন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা না হয়।

সংস্কারের ফল

এই নির্দেশাবলী অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, ইসলাম যুদ্ধকে সমস্ত হিংসাত্মক কর্মকান্ড থেকে পবিত্র করে দিয়েছিল। অথচ সে সময়ে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছিল যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যুদ্ধবন্দী ও দূত হত্যা, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের হত্যা, যুদ্ধাহতদের হত্যা, অ–যুদ্ধরত বেসামরিক লোকদের হত্যা, অঙ্গ–প্রত্যংগ কাটা ও ছেড়া, লাশের অবমাননা, আগুন দিয়ে পোড়ানো, লুটপাট, রাহাজানি, ফসল ও জনপদ সমুহের ক্ষতি সাধন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও চুক্তি লংঘন, সৈন্যদের বিশৃঙ্খলা, আনুগত্যহীনতা, হৈ চৈ ও হাঙ্গামা সহকারে যুদ্ধ করা– এ সবই বে–আইনী ও নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। এভাবে যুদ্ধের একমাত্র যে পরিচয় অবশিষ্ট রইল, তা হলোঃ একজন বীর সৈনিক শত্রুর সর্বনিম্ন পরিমান ক্ষতি সাধন পূর্বক তার অকল্যাণ বা অনিষ্ট রোধ করে যে কাজের মাধ্যমে –তাই যুদ্ধ।

এই সংস্কারধর্মী শিক্ষা ও আদর্শ মাত্র আট বছরের মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক ফল দর্শিয়েছিল, তার সর্বোত্তম প্রতিফলন ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে। পাঠক প্রথমে ভাবুন, একটি যুদ্ধরত পক্ষ অপর যুদ্ধরত পক্ষের ওপর জয়লাভ করলে, বিশেষতঃ শত্রুর কোন বড় শহর দখল করলে, অসভ্য আরবদের কথা বাদ দিন, সুসভ্য রোমক ও ইরানীরাইবা কি করত। এর পর এটাও চিন্তা করুন যে, আরবরা মাত্র কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত জাহেলী রীতিনীতিতে অভ্যস্ত

ছিল। তারা মাত্র আট বছর পূর্বে যে শহর থেকে নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়ে বহিস্কৃত হয়েছিল, সেই শহরে আজ বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করছে; যে শত্রুতা তাদেরকে শুধু বহিস্কার করেই সন্তুষ্ট হয়নি বরং যেখানে যেখানে তারা হিজরত করে আশ্রয় নিয়েছে সেখান থেকেও তাদেরকে তাড়ানোর জন্য কয়েকবার চড়াও হয়েছে, সেই শত্রুদের ওপর আজ জয়লাভ করেছে। এহেন শহর এবং এহেন শত্রু মুঠোর মধ্যে এল, অথচ না হলো কোন গণহত্যা, না হলো কোন লুটপাট, না হলো কারো জানমাল ও ইজ্জত সম্ভ্রমের ওপর হস্তক্ষেপ। পুরানো কট্টর দুশমনদেরও কারো বিরুদ্ধে গৃহীত হলোনা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা। শহর দখলের গোটা কার্যক্রমে মাত্র ২৪ জন মানুষ নিহত হয়। তাও কেবল তখনই, যখন নগরবাসীদের দিক থেকেই প্রথম আক্রমণ আসে। সেনাপতি শহরে প্রবেশ করার পূর্বেই ঘোষণা করে দেন যে, তোমাদের ওপর কেউ হাত না তোলা পর্যন্ত তোমরাও কারো ওপর হাত তুলনা। শহরে প্রবেশ করেই ঘোষণা করা হয় যে, যে ব্যক্তি ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি অস্ত্র সমর্পণ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ। তারপর দখল ক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর বিজয়ী সেনাপতির সামনে আনা হলো পুরানো বাঘা বাঘা শত্রুকে। যে শত্রুরা ঐ সেনাপতিকে (দঃ) ১৩টি বছর ধরে অমানুষিকভাবে উৎপিড়ন করে তাঁকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছিল। যারা তাঁকে দেশান্তরিত করার পর তাঁকে ও তার আদর্শকে নির্মুল করার জন্য বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে বিপুল সাজ–সজ্জা করে গিয়েছিল, সেই শত্রুরা আজ তার সামনে আনত মস্তকে একান্ত অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে। বিজয়ী সেনাপতি তাদের জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা আজ আমার কাছ থেকে কি রকম ব্যবহার পাবার আশা কর?" বিজিতরা পরম অনুতাপের সাথে জবাব দিল; "তুমি আমাদের একজন মহানুভব ভাই এবং একজন মহানুভব ভাই এর ছেলে।" পরাক্রান্ত সেনাপতি বললেনঃ "যাও তোমরা স্বাধীন। আজ তোমাদের কাছে আমি কোনই কৈফিয়ত চাইবনা।" لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء! শুধু প্রাণ ভিক্ষাই দেয়া হলো তা নয়, বরং আট বছর আগে বিজয়ীদের যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি শত্রুরা এতদিন ভোগ–দখল করে যাচ্ছিল তাও ছিনিয়ে নেওয়া হলো না, দাবী ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন শত্রুও ছিল যারা ধৈর্যের সীমা বহির্ভূত ছিল। সেনাপতি শহরে প্রবেশ করার আগে এদের মধ্যে যাকে পাওয়া যায় হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যখন তারা মুঠোর মধ্যে এসে গেল, তখন তারাও সেই মহানুভবতা থেকে বঞ্চিত হলো না। বিজয়ী সেনাপতি (দঃ)–এর যুবতী কন্যা জয়নব (রাঃ)–এর খুনী হেবার বিন আসওয়াদ বিনয়ের সাথে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাকে ক্ষমা করা হয়। ওয়াহসী বিন হারব সেনাপতি (দঃ)–এর অতি প্রিয় চাচাকে হত্যা করেছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাকে ক্ষমা করা হয়। হিন্দা বিনতে উৎবা হজরত হামজার কলিজা টেনে বের করে চিবিয়ে খেয়েছিল। এমন চরম হিংস্রতা প্রকাশ করা সত্বেও এই মহিলা বিজেতাদের রোষ থেকে অব্যাহতি পেল এবং ক্ষমা পেল। ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা নিজেও ছিল ইসলামের বিরাট শত্রু। সে মুসলমান হয়ে এল এবং বিশিষ্ট সাহাবীতে পরিণত হলো। এ ছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে অবিছারাহ,সারা ও কাব ইবনে জুহায়ের এরা প্রত্যেকেই হযরতের রক্ত পিপাসু শত্রু ছিল। তারাও ক্ষমা পেল। কেবল হুয়াইরিস বিন নাকিয়াহ, আব্দুল উজ্জা বিন খাতাল এবং মাকীছ বিন ছাবাবাকে হত্যা করা হয়। অবশ্য তাও করা হয় শত্রুতার অপরাধে নয় খুনের বদলা হিসেবে।

পৃথিবীর সবচেয়ে অসভ্য জাতির মধ্যে মাত্র আট বছরেই নিষ্পন্ন হয়েছিল এই শুদ্ধি ও সংস্কার প্রচেষ্টা। আজকের এই সুসভ্য যুগে দুনিয়ার সুসভ্য জাতিগুলো যখন কোন শত্রুর শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে তখন বিজিতদের ওপর কি রকম মারাত্মক জুলুম নির্যাতন চালানো হয়, তা সকলেরই জানা আছে। বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা একে অপরের দেশে ঢুকে যে পাশবিক ধ্বংসক্রিয়া চালায়, সে দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করেছে এমন লোক আজও বেঁচে আছে। ভেবে দেখুন যে, আজ থেকে ১৩ শো বছর আগেকার সেই অন্ধকারময় যুগে যখন বিশ্ব সভ্যতার ভাগ্য বিধাতা ছিল খসরু পারভেজ ও হিরকিল –আরবের নিরক্ষর পল্লীবাসী জাতিটি তাদের নিকৃষ্টতম শত্রুর শহর দখল করে যে ভদ্র ব্যবহার করেছেন তা এ যুগের বিজেতাদের আবরণের তুলনায় কত সুন্দর ও নির্মল ছিল। ভাববার বিষয় যে, কত শক্তিশালী সংস্কার প্রচেষ্টা কত উঁচু মানের নৈতিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ এবং কতখানি সুষ্ঠু ও

মজবুত সামরিক নিয়ম শৃংখলার বলে এমন নজিরহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্ভবপর হয়েছিল।

৪–যুদ্ধের মানবিক বিধি সমূহ

যুদ্ধের যে অমানুষিক রীতি প্রথা তৎকালে দুনিয়ায় চালু ছিল এবং যা ইসলাম বন্ধ করেছিল। উপরে তারই আলোচনা করলাম। এখন আলোচনা করবো দুনিয়ায় যে সব নিয়ম কানুন চালু ছিলনা এবং ইসলাম চালু করেছিল তার কথা। ইসলাম যুদ্ধের ভ্রান্ত নিয়ম প্রথা বন্ধ করে দিয়ে নিজে কি ধরনের আইন কানুন চালু করেছিল, সেটাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ উদ্দেশ্যে আমরা শুধু সমর আইনের ভিত্তিমূল যার ওপর সেই মূলনীতি ও মৌলিক নির্দেশাবলীই আলোচনার আওতায় আনবো। আর খুটি নাটি বিধিমালা রচনার ভার ছেড়ে দেয়া হয়েছে সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ ও ফেকাহবিদদের ওপর। তারা নিজ নিজ যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে মুলনীতি সমুহের আলোকে ছোট খাট ব্যাপারে শরিয়াতের বিধান কি তা খুজে নেবেন। এ জন্য কেবল প্রাচীন ফেকাহর গ্রন্থাবলীতে যে সব বিস্তারিত বিধিমালা সন্নিবেশিত রয়েছে, তার মধ্যে সীমিত থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

নেতার আনুগত্য

যুদ্ধকে একটা নিয়মের আওতায় আনার জন্য ইসলাম সর্বপ্রথম সামরিক বিভাগে এক কেন্দ্রিকতার সৃষ্টি করেছে এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে আনুগত্যের কঠোর বিধান চালু করেছে। ইসলামের সমর বিধি সমুহের প্রথম বিধি হলো এই যে, সামরিক পদক্ষেপ তা যত ক্ষুদ্রই হোক অধিনায়কের অনুমতি ছাড়া নেয়া যাবেনা। শত্রুকে হত্যা করা, তার সম্পত্তি দখল করা, তাকে গ্রেফতার করা, তার সামরিক সাজ–সরঞ্জাম ধ্বংস করা আসলে বৈধ কাজ হলেও সেনাপতির অনুমতি ছাড়া করলে তা হবে অবৈধ ও পাপের কাজ। বদর যুদ্ধের আগে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাস (রাঃ) হজরত রাসুলে করীম (দঃ)–এর অনুমতি ছাড়াই কোরেশদের একটি দলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং কিছু গণিমতের মাল লুন্ঠন করে নিয়ে এলেন। এতে হজরত (দাঃ) ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং উক্ত গণিমতের মালকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। (দঃ)

সাধারণ সাহাবীরা তাকে এই বলে ভর্ৎসনা করেন যে, "তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়নি তা কেন করলে?" হযরত খালেদকে বনু জুজাইমার নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠান হয়। সেখানে ভুল বুঝাবুঝির বশে তিনি সেনাপতির অনুমতি ছাড়াই বেশ কিছু লোক হত্যা করেন। হযরত রসূলে করীম (সঃ) এ কথা জানতে পেরে রাগের আতিশয্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং তৎক্ষণাত হজরত আলীকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেনঃ اجعل امر الجاهلية تحت قدميك "তুমি এই জাহেলিয়াতের কাজটা পদতলে পিষ্ট করে দিয়ে আস"৪৬ (ফাতহুল বারী)

ইসলামে নেতার আনুগত্যকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের সমান জরুরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং নেতার অবাধ্যতার পরিণতি আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্যতার সমান বলা হয়েছে। হাদিসে আছেঃ

الغزو غزوان، فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام و
انفق الكريمة و اجتنب الفساد فان نومه ونبهته اجر كله واما
من غزا رياء و سمعة وعصى الامام وافسد فى الارض فانه لا
يرجع بالكفاف-

"যুদ্ধ দুই রকমের। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে, নেতার আনুগত্য করে, নিজের সর্বোত্তম সম্পদ এই দুই পথে ব্যায় করে এবং বিশৃংখলা অরাজকতা থেকে বিরত থাকে, তার ঘুম ও জাগ্রতাবস্থা দুটোই পুন্যের অধিকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ও খ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে, নেতার অবাধ্যতা করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, সে পূণ্য লাভ করতে পারবেনা।" অন্য এক হাদিসে আছেঃ

من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله، و
من يطع الامير فقد اطاعنى ومن يعص الامير فقد عصانى-

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করলো। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করলো, সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতা করলো। আর যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করে, সে যেন আমার আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি নেতার অবাধ্যতা করে, সে যেন আমার অবাধ্যতা করে।"

এই আইনগত কড়াকড়ি যুদ্ধে একটা নিয়মতান্ত্রিকতা এনে দিয়েছে। যুদ্ধকে নিছক রক্তের হোলিখেলায় পরিণত হতে দেয়নি যে, প্রত্যেক সৈনিক ব্যক্তিগতভাবে মানুষের জান মালের মালিক হয়ে বসা এবং হত্যা ও লুটতরাজের অবাধ লাইসেন্স পেয়ে যাবে। জাহেলিয়তের সময়ে সৈনিকেরা অবাধে লুটপাট করতো এবং বিজিত দেশে প্রবেশ কারার পর প্রত্যেকটি সৈনিক যাকে ইচ্ছা হত্যা করতে পারতো, যার ইচ্ছা, সম্পত্তি লুন্ঠ করতে পারতো, যে গ্রাম ও ফসলের মাঠকে ইচ্ছা করতো পুড়িয়ে দিতে পারতো এবং শত্রুপক্ষীয় জাতিকে ধ্বংস করার জন্য যা খুশী করতে পারতো। আলেকজান্ডারের সৈন্যদের শৃংখলার খ্যাতি ছিল। তারাও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। ইরানে অভিযান চালনোর সময় তার সৈন্যরা যেরূপ অবাধে দেশকে ধ্বংস করে তার বর্ণনা ইতিহাসে বর্ণিত। কিন্তু ইসলাম সেনাবাহিনীর জন্য যে সব নিয়ম নীতি নির্ধারণ করেছে তাতে সৈনিকদেরকে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতা সে দেয়নি। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে রক্তপাতের ঝুঁকিটা অতি গুরুতর ঝুঁকি। যে কোন মানুষ এত বড় ঝুঁকি নিতে পারে না। এবং যে কোন ব্যক্তি এর স্থান, কাল ও প্রয়োজন অপ্রয়োজন সম্বন্ধে ফয়সালা করতে পারে না। ইসলামী আইনে যুদ্ধের যাবতীয় কর্মকান্ডের দায়িত্ব এবং আদেশ নিষেধের সমস্ত ক্ষমতা একজন আমিরের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এমনকি একজন সৈনিক সেনাপতির অনুমতি ছাড়া শত্রু–ভূখন্ডের একটি গাছের ফলও খেতে পারে না।

প্রতিশ্রুতি পালন

ইসলামী আইনে যুদ্ধ ও সন্ধি–উভয় অবস্থাতেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে কঠোরভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আসলে ইসলামী নৈতিকতার একটা অন্যতম মুলনীতি হলো, যত কঠিন অবস্থাতেই হোক, আপন প্রতিশ্রুতি পালন করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে যত লাভই হোক এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে যত ক্ষতিই হোক, ইসলাম তার অনুসারীদের সেই লাভ বিসর্জন দিতে ও সেই ক্ষতি সহ্য করতে আদেশ দিয়েছে। কেননা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে যত বড় লাভই হোক, এ দ্বারা মানুষের আত্মা ও চরিত্রের যে ক্ষতি হয় তা ঐ লাভ দ্বারা পূরণ হতে পারে না। আবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করায় যত বড় বৈষয়িক ক্ষতিই হোক, এর দ্বারা যে আধ্যাত্মিক ও

নৈতিক উৎকর্ষ লাভ হয়, তাকে তা মোটেই ম্লান করতে পারে না। এই মূলনীতি যেমন ব্যক্তিগত জীবনে পরিব্যপ্ত তেমনি সামাজিক জীবনেও। আজকাল দুনিয়ার এরূপ রীতি হয়ে গেছে যে, এক ব্যক্তি যে সব কাজকে ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত লজ্জাকর মনে করে, সেই সব কাজ একটি জাতি সামগ্রিক জীবনে নিঃসংকোচে করে যায়। তাকে মোটেই দুষণীয় মনে করেনা। বড় বড় রাষ্ট্রের দক্ষ রাষ্ট্রনায়কগণ ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত চরিত্রবান ও সৌজন্যশীল হয়েও আপন রাষ্ট্রের স্বার্থে এবং আপন জাতির উন্নতি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, চুক্তি ভঙ্গ করা, প্রতিশ্রুতি লংঘন করা সম্পূর্ণ বৈধ মনে করেন। সভ্যতার বড় বড় দাবীদাররা এমন ধৃষ্টতার সাথে এ সব কাজ করে থাকেন যেন এগুলো মোটেই কোন দোষের কাজ নয়। কিন্তু ইসলাম এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ও সমষ্টিতে, শাসকে ও শাসিতে, ব্যক্তিতে ও জাতিতে কোন পার্থক্য করেনা। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, যে অবস্থায় এবং যে উদ্দেশ্যেই হোক, ব্যক্তিগত স্বার্থেই হোক কিংবা জাতীয় স্বার্থে, সর্বাবস্থায় ইসলাম তা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ط تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ط (النحل: ۹۱-۹۲)

"তোমরা যখন কারো সাথে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হও তখন তাকে আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার মত মনে করে তা পূর্ণ কর। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে মজবুতভাবে শপথ করার পর সে শপথ ভেঙ্গো না। তোমাদের তৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন, তা মনে রেখ। যে নারী নিজের শ্রম দিয়ে সূতা তৈরী করে পরে আবার তা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে, তোমরা তার মত হয়োনা। তোমরা এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীর চেয়ে বেশী ধনশালী ও বেশী সম্ভ্রান্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে প্রতারিত করার পন্থা হিসেবে শপথ করে থাক।"

সূরা নহল–১৩

এ ধরণের আয়াত কোরআন শরীফে অনেক আছে। এখানে সেই সমস্ত আয়াত আমি উদ্ধৃত করতে চাইনা। শরীয়াতের বিধান স্পষ্ট করে তোলার জন্য মাত্র কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করছিঃ

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ ...... اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ (الرعد: ٢١-٢٢)

"যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পালন করে, অঙ্গিকার ভঙ্গ করেনা এবং আল্লাহ যে জিনিস সংযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে বহাল রাখে এবং হিসাবের দিনকে ভয় করে, (তাদের জন্য শুভ প্রতিদান রয়েছে।)
(সূরা রাদ)

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ (آل عمران: ٧٦-٧٧)

"বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পালন করে এবং সংযম অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মত সংযমী লোকদেরকে ভালোবাসেন। আর যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার ও শপথ সমুহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে তাদের জন্য নিশ্চয়ই আখেরাতে কোন সম্মান নেই। আল্লাহ তাদের সাথে কথাও বলবেন না, তাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।"
(সূরা আলে– ইমরান–৮)

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝ (البقرة: ١٧٧)

"যারা অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা পূর্ণ করে, যারা দুঃখে, কষ্টে ও যুদ্ধে অবিচল থাকে, তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং সংযমী।" (আল–বাকারাহ–২২)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ (الانعام: ١٥٢)

"তোমরা কথা যখন বলবে ইনসাফের সাথে বলবে, চাই সে কথা কোন প্রিয়জনের বিরুদ্ধেই যাক। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। তোমরা যাতে উপদেশ গ্রহণ কর সেজন্য আল্লাহ তোমাদেরকে এ উপদেশ দিয়েছেন।"

(সূরা আনয়াম–১৯)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○ (بنی اسرائیل: ٣٤)

"ওয়াদা পালন কর। কেননা ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

(বনি ইসরাইল–৪)

এই শিক্ষার যে বাস্তব দৃষ্টান্ত হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে পাওয়া যায় তা পড়ে দেখলেই বুঝা যায় যে, ইসলামের ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির মুল্য কত। বদর যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তিনগুণ। এ সময়ে মুসলমানদের জনশক্তির প্রয়োজনিয়তা কত তীব্র ছিল, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এমন সময়ে হজরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং তার পিতা হাসিল বিন জাবির মুসলিম বাহিনীর দিকে রওনা দিলেন। পথে কাফেররা তাদের গতিরোধ করলো এবং বললো, 'তোমরা নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (দঃ)–কে মদদ যোগাতে যাচ্ছ।' তারা বললেন, না আমরা মদীনায় যাচ্ছি। কাফেররা তখন তাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দিল যে, তারা যুদ্ধে অংশ নেবেনা। তাঁরা দুজনেই সোজা বদরের ময়দানে গিয়ে হাজির হলেন এবং হজরত (দঃ)–কে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। হজরত তাদেরকে বললেন, "তোমরা মদীনায় চলে যাও। আমরা ওয়াদা পালন করবো এবং তাদের মোকাবিলায় জয়লাভের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব।"

হোদাইবিয়ার সন্ধিতে কোরেশদের সঙ্গে যে শর্তাবলী ঠিক হয়েছিল তার মধ্যে একটা ছিল এই যে, মক্কা থেকে কেউ পালিয়ে মদিনা গেলে মুসলমানরা ফেরত পাঠাবে। কিন্তু মদীনা থেকে পালিয়ে কেউ মক্কায় গেলে কোরেশরা তাকে ফেরত দেবে না। এই চুক্তি সবেমাত্র লেখা হচ্ছিল এই সময় আবু জুন্দল নামক সাহাবী মক্কার কাফেরদের আটকাবস্থা থেকে ছুটে পালিয়ে

মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছুলেন। তার পায়ে তখনো শৃংখল। শরীরে প্রহারের চিহ্ন। মুখে তার ঘোর দুশ্চিন্তার অভিব্যক্তি। তিনি হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট এসে বললেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে রেহাই দিন। সাধারণ মুসলমানরা তার অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন। ১৪ শো তরবারী হযরতের একটি ইংগীতের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল। তারা তাদের একজন মুসলমান ভাইকে মুক্ত করে আনার জন্য অস্থির হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু সন্ধির শর্ত স্থির হয়ে গেছে। চুক্তি লেখা হচ্ছিল । এজন্য আল্লহর রাসূল আবু জুন্দলকে মুক্ত করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলেন। তিনি শুধু বললেনঃ "আবু জুন্দল, ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ তোমার জন্য মুক্তির কোন উপায় অবশ্যই বের করবেন।"

মদীনায় ফিরে গিয়েই দেখতে পেলেন, আবু বুছাইর নামক অপর একজন সাহাবী মক্কার কাফেরদের শৃংখল মুক্ত হয়ে পালিয়ে এসেছেন। তার পেছনে মক্কার কাফেরদেরও দু'জন মানুষ এসেছে। তারা আবু বুছাইরকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানালো। হযরত জানতেন যে, মক্কায় মুসলমানদের ওপর কঠোর নির্যাতন হচ্ছে। বিশেষ করে পালানো কয়েদীর সাথে কি আচরণ হতে পারে, তাতো আরো ভালোভাবে বুঝতেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভাংলেন না।

হযরত রাসুলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা এই সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়।

নিরপেক্ষ লোকদের অধিকার

ইসলামে 'নিরপেক্ষতা' বলে কোন পরিভাষা নেই। চুক্তিবদ্ধ নাগরিকেরই একটি বিশেষ শ্রেণীকে বলা যায় নিরপেক্ষ নাগরিক। ইসলামী আইনের চোখে সমস্ত অমুসলিম নাগরিক দু'ভাগে বিভক্তঃ চুক্তিবদ্ধ ও অচুক্তিবদ্ধ। চুক্তিবদ্ধরা যতক্ষণ চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলবে, তাদের সঙ্গে শর্ত অনুযায়ী আচরণ করতে হবে এবং যুদ্ধের কোন কাজে তাদেরকে কোনভাবে জড়িত করা চলবে না। এটাই (Neutrality) বা নিরপেক্ষতার মর্মার্থ। এরপর আসে অচুক্তিবদ্ধদের কথা। তাদের সাথে কার্যতঃ যুদ্ধ চলুক বা না চলুক তাদেরকে বাস্তবিকপক্ষে যুদ্ধরতই মনে করতে হবে। কেননা ইসলাম অমুসলিমদের সাথে মৈত্রী ও শত্রুতা–এর মধ্যবর্তী কোন অবস্থা স্বীকার করে না।

চুক্তিবদ্ধদের সাথে যাবতীয় কার্যকলাপ চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী নিষ্পন্ন করতে হবে। তবে ইসলাম যুদ্ধের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধদের জন্য কতিপয় মৌলিক অধিকারও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যথাঃ

(১) চুক্তিবদ্ধ বা যতক্ষণ চুক্তি মেনে চলবে ততক্ষণ তাদেরকে যুদ্ধে জড়িত করা মুসলমানদের জন্য অবৈধ ঃ

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ
شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ
مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○ (التوبة: ٤)

"তবে মোশরেকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছিল, যারা চুক্তি লংঘন করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমরা চুক্তি মেনে চল। কেননা আল্লাহ সংযমীদের ভালো বাসেন।" (সূরা–তওবা–১)

(২) মুসলমানদের কোন গোষ্ঠী যদি অপর কোন চুক্তিবদ্ধ দেশে বাস করে এবং সেখানে তাদের ওপর জুলুম হয় তা হলে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তাদের সাহায্য করতে পারবে না।

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا
عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"অমুসলিম দেশের মুসলমানরা যদি ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চায় তা হলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু যে জাতির সাথে তোমাদের চুক্তি আছে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা চলবে না। মনে রেখ, তোমরা যেটাই কর, আল্লাহ তা দেখতে পান।[৪৭] (সূরা–আনফাল–১০)

এ আয়াতের অর্থ এই যে, এমন কোন সাহায্য করা যাবে না যা সামরিক সাহায্যের পর্যায়ে পড়ে। তাদের সাহায্যার্থে এমন কোন পদক্ষেপও নেয়া যাবে না যা অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল। অবশ্য এর অর্থ

এটাও নয় যে, অমুসলিম দেশে মুসলমান প্রজাদের ওপর জুলুম হতে থাকলে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানরা তা নির্বিকার চিত্তে ও নীরব দর্শক হয়ে দেখতে থাকবে। তারা শুধু চুক্তিলংঘন করতে অর্থাৎ সামরিক সাহায্য দিতে পারবে না। এছাড়া তাদের মজলুম ভাইদের নৈতিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক সাহায্যের জন্য যা কিছু করা চুক্তি অনুসারে এবং প্রচলিত আন্তর্জাতিক রীতি–নীতিতে সম্ভব, তা করতে পারবে এবং করতেও হবে।

(৩) যুদ্ধাবস্থায় চুক্তিবদ্ধ দেশের সীমান্ত অতিক্রম করা বৈধ নয়। শত্রু যদি পালিয়ে এরূপ কোন দেশে আশ্রয় নেয় তা হলে মুসলিম সৈন্যরা তার পিছু ধাওয়া করে সেখানে যেতে পারবে নাঃ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ - (النساء: ٨٩-٩٠)

“তারা যদি বিরত না হয় তা হলে তাদের আটক কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করোনা। তবে যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির সাথে গিয়ে মিলিত হয় তাদের কথা আলাদা।” (সূরা–নিসা–১২)

এই মৌলিক বিধান গুলো নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইনের ভিত্তি। এর আলোকে খুটিনাটি আইন প্রয়োজন মত তৈরী করে নেয়া যেতে পারে।”

যুদ্ধ ঘোষণা

যখন কোন জাতি বা সম্প্রদায় চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে শত্রুতা মূলক আচরণ করে তখন সে সম্পর্কে ইসলামী আইনের বিধান এই যে, সেই জাতি বা সম্প্রদায়কে যথারীতি আনুষ্ঠানিকভাবে চরমপত্র দিতে হবে এবং চুক্তি মেনে চলা ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার পর যুদ্ধ শুরু করে দিতে হবে।ঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ

"যদি তোমাদের কোন জাতি সম্পর্কে আশংকা হয় যে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, তা হলে তাদের চুক্তি তাদের ওপর নিক্ষেপ কর।" (আল–আনফাল–৭)

তাফসিরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে যে, তোমাদের শত্রুতা মূলক আচরণের দরুন আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার চুক্তি আর বহাল নেই। এরপর দেখতে হবে তারা দুষ্কর্ম ত্যাগ করে কিনা। যদি তবুও দুষ্কর্ম ত্যাগ না করে তা হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিতে হবে। [৪৮] অবশ্য যে ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ সুস্পষ্টভাবে চুক্তি লংঘন করে বা প্রকাশ্য আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে চরমপত্র দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকবেনা। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তখন যুদ্ধ ঘোষণা বা চরমপত্র না দিয়েই আক্রমণ করার অধিকার রাখে। মক্কা বিজয় ঠিক এই প্রক্রিয়াতেই হয়েছিল।

চরমপত্র প্রদানের বিধি সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার বলেনঃ

اى اطرح اليهم عهدهم وذالك بان يرسل اليهم من
يعلمهم بان العهد قد انتقض -

"চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি এই যে তাদের কাছে একজন দুত পাঠিয়ে জানিয়ে দিতে হবে যে, চুক্তি ভেঙ্গে গেছে।"

আল্লামা ইবনে কাছির বলেনঃ

اى اعلمهم بانك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك
وعلمهم بانك حزبٌ لهم وهم حزبٌ لك وانه لا عهد بينك
وبينهم على السواء - اى تستوى انت وهم فى ذالك -

"অর্থাৎ তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তুমি চুক্তি বাতিল করে দিয়েছ। উভয় পক্ষের কাছে এ কথা সমানভাবে জানাজানি হয়ে যাক যে, তোমরা তদের শত্রু এবং তারা তোমাদের শত্রু। এখন উভয় পক্ষের মধ্যে আর কোন চুক্তি রইল না।"

আজহারী বলেনঃ

اذا عاهدت قوما فخشيت منهم النقض فلا توقع بهم

بمجرد ذالك حتى تعلمهم

"যখন কোন সম্প্রদায়ের সাথে তোমাদের চুক্তি হয় এবং তারা চুক্তি লংঘন করবে বলে আশংকা বোধ কর তখন কেবল আশংকা হওয়া মাত্রই তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়না। তবে আগে তাদেরকে জানিয়ে দাও।"

ফকীহগণ শুধু জানিয়ে দেওয়াকেও যথেষ্ট মনে করেননি। চুক্তি ভঙ্গকারী সম্প্রদায়কে কিছু সময়ও দিতে বলেছেন যেন তারা শত্রুতা মূলক আচরণ পরির্তন ও সংশোধন করতে চাইলে তা করতে পারে। এ বিষয়ে ইসলামী আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানা যায় প্রথম শতকের একটি ঘটনার মাধ্যমে। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা ঐ ঘটনাটি সম্পর্কে বহু বড় বড় নাম করা ফেকাহ বিদের অভিমতও জানবার সুযোগ পেয়েছি। আব্দুল মালেক ইবনে সালেহ তখন সাইপ্রাসের শাসন কর্তা। সাইপ্রাসের লোকেরা সন্ধি চুক্তি লংঘন করলো। আব্দুল মালেক হজরত লায়েছ বিন সাদ, মালেক ইবনে আনাছ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, মুছা ইবনে আইয়ান, ইসমাইল বিন আইয়াস, ইয়াহিয়া বিন হামজা, আবু ইসহাক ফাজারী প্রমুখ প্রখ্যাত ফেকাহ বিশারদকে জিজ্ঞাসা করেন فانبذ اليهم على سواء –এ আয়াতের মর্মানুসারে চুক্তি ভঙ্গ করা যায় কি না? করা গেলে কিভাবে করা যায়? উক্ত ফকিহগণ এ প্রশ্নের যে জবাব দেন তার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেলঃ

লায়েস বিন সাদ বলেনঃ

"যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে তাদেরকে এক বছর সময় দেয়া হোক যাতে পরস্পর পরামর্শ করার সুযোগ পায়। যদি কেউ জিম্মী হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে আসতে চায় তবে আসুক। যদি কেউ রোমক এলাকায় চলে যেতে চায় তবে সেও যাক। আর যে ব্যক্তি সাইপ্রাসে বসেই যুদ্ধ করতে চায় তার সাথে তোমাদের যুদ্ধ করার অধিকার আছে।"

ইমাম মালেক লিখলেনঃ

"আমার মতে চুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। বরং তাদের শেষ সুযোগ দেওয়া উচিৎ। আল্লহ তায়ালা বলেছেন, فاتموا اليهم عهدهم

তারা সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও যদি ফিরে না আসে, যদি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে বদ্ধপরিকর হয় এবং যদি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা তোমাদের কাছে সত্য বলে প্রমাণিত হয় তা হলে তাদের হামলা করা যায়।”

মুছা ইবনে আইয়ান লিখলেনঃ

“ইতিপুর্বে যখনই এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে, শাসকগণ সময় দিয়েছেন। এমনও হতে পরে যে, সাইপ্রাসের একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক এ কাজ করছে। কিন্তু সাধারণ জনগণ এতে অংশ নিবেনা। এ জন্য আমার মত এই যে, তাদের চুক্তি বহাল রাখা হোক এবং সন্ধির শর্তাবলী পূর্ণ করা হোক যদিও তাদের মধ্যে কিছু গোলযোগকারী লোক রয়েছে।”

এ ব্যাপারে হজরত ওমর (রাঃ) –এর সিদ্ধান্তও এই যে, চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে কিছুটা সময় দেওয়া উচিৎ। তাঁর খেলাফতকালে উমাইর বিন ছা'দ লিখেছিলেন যে, আমাদের এলাকায় 'আরবুচ্ছ' নামক একটা জায়গা আছে। সেখানকার লোকেরা শত্রুকে আমাদের গোপন খবর পৌঁছায়। কিন্তু শত্রুর গোপন খবর আমাদের নিকট পৌছায় না। হজরত ওমর জবাবে লিখলেন যে, আগে তোমরা তাদেরকে বল যে, আমরা তোমাদেরকে একটা ছাগলের বদলে দুটো ছাগল, একটা গরুর বদলে দুটো গরু এবং এভাবে প্রত্যেক জিনিসের বদলে দ্বিগুণ জিনিস দেবো। তোমরা এ জায়গা ত্যাগ করে চলে যাও। যদি তারা মেনে নেয় ভালো। নচেৎ তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আমাদের উভয় পক্ষের চুক্তির অবসান হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে এক বছর সময় দাও। এক বছর পর তাদেরকে তাড়িয়ে দিও।[৪৯] (বালাজুরীর ফুতুহুল বুলদান)

যুদ্ধ বন্দী

একটু আগেই বলেছি, যে, ইসলাম যুদ্ধ বন্দীদের হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু কেবল হত্যা থেকে রেহাই দেয়ার আদেশ দিয়েই ইসলামী আইন ক্ষান্ত থাকেনি। বরং তাদের সাথে সর্বাধিক পরিমাণ নম্রতা ও উদারতা প্রদর্শন করতেও বলেছে। পবিত্র কোরআনে ইয়াতিম, মিছকীন ও বন্দীকে আহার করানোর প্রশংসা করা হয়েছে এবং একে পূণ্যবান লোকদের কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যথাঃ–

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝
اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝ اِنَّا
نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝ (الدهر: ٨تا١٠)

"তারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিছকিন, ইয়াতিম ও বন্দীকে আহার করায় এবং বলে, আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য তোমাদের আহার করাই। আমরা তোমাদের কাছে কোনরূপ প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না। আমরা শুধু সেই কঠিন দিনের ভয় করি যেদিন নিদারুন কষ্টে মানুষের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে।" (সুরা–দাহর–১)

হযরত রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় কয়েদী ও বন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিতেন। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে যারা হযরত ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে নির্যাতন করে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছিল তারা যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হয়ে এল তখন তিনি সাহাবাদেরকে নির্দেশ দেন তাদের সাথে উদার ও মহৎ আচরণ করতে। সাহাবারা এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাদেরকে নিজেদের চেয়ে ভালো খাদ্য খাওয়ান এবং নিজেদের চেয়ে আরামে রাখেন। কোন কোন সাহাবা নিজে খেজুর খেতেন এবং বন্দীদেরকে রুটি ও ছালুন খাওয়াতেন, কিছু বন্দীর কাপড় ছিলনা। হযরত নিজে তাদের জন্য কাপড়ের বন্দোবস্ত করেন। অথচ তখন মুসলমানদের প্রচন্ড অভাব। যুদ্ধবন্দীদের একজন ছিল বিশিষ্ট কবি ও অগ্নিক্ষরা বক্তা সোহায়েল বিন আমর। সে হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় বক্তৃতা করে বেড়াত। হযরত ওমর পরামর্শ দিলেন ওর দাঁত ভেঙ্গে দিতে। কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন আমি যদি তার চেহারা বিকৃত করি তবে আল্লাহ আমার চেহারা বিকৃত করবেন।" কিছুদিন বন্দী রাখার পর হযরত সকলকে ফিদিয়া নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

অবশ্য এর আগে যে ঘটনা ঘটে তাতে বদর বন্দীদের সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী নীতিরও আভাস পাওয়া যায়। হাদিস ও তফসির গ্রন্থাবলীর বর্ণনা মতে বন্দীদের নিয়ে হযরত প্রথমে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন যে, ওদের কি করা যায়? মুহাজেরদের মনে তখনো মক্কার জুলুমের স্মৃতি

অমান। মাত্র দু'বছর আগে এই সব লোকই তাদেরকে মক্কা থেকে তাড়িয়েছিল। আবার এখন তাদেরকে মদিনায়ও স্বস্তির সাথে থাকতে দেবেনা বলে আক্রমন করেছিল। এ জন্য অধিকাংশ সাহাবীর মন তাদের বিরুদ্ধে রুষ্ট ছিল। এ ছাড়া ঐ সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। কাফেররা তাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তাদের সংখ্যায় একটা মানুষও বৃদ্ধি পাওয়া মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ছিল। এই জন্য স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানদের কাম্য ছিল এই যে, যথা সম্ভব শত্রুর শক্তি চূর্ণ করা হোক এবং যে কয়জন মানুষ যুদ্ধবন্দী হয়ে এসে শত্রুর শক্তি থেকে খসে পড়েছে তারা যেন আবার শত্রুর সাথে মিলিত হয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করতে না পারে। তৃতীয় ঐ সময়ে মুসলমানদের দিনের পর দিন অনাহারে কাটছিল। তাদের নিজেদের খোরাকীর জন্যও পর্যাপ্ত উপকরণ ছিলনা। এ জন্য যুদ্ধবন্দীদেরকে যুদ্ধাবসান পর্যন্ত বন্দী রাখা এবং তাদের খোরাকী সরবরাহ করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে ছিল। এই সব দিক লক্ষ্য রেখে হযরত ওমর (রাঃ) রায় দিলেন ওদের ঘন বনে আগুন ধরিয়ে তাতে ফেলে দেয়া হোক। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন দয়া ও করুণার মূর্ত প্রতিক। তিনি মত দিলেন যে, ওদেরকে ক্ষমা করা হোক। এই সব রকমারী মতামত শোনার পর হযরত রসুলে করীম (দঃ) বললেন, "আল্লাহ তায়ালা কারো মন দুধের মত নরম করে দেন, কারো মন পাথরের মত শক্ত করে দেয়। আবু বকরের তুলনা চলে হযরত ইবরাহীম ও ইসার সাথে, আর ওমরের তুলনা হয় হযরত নূহের সাথে।" অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, হত্যাও নয়, ক্ষমাও নয় ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। সে মতে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো।

প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুসারে এই সিদ্ধান্তের জন্য ভৎসনা স্বরূপ নিম্নের আয়াতটি নাজিল হয়ঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ لَوْلَا
كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ (انفال: ٦٧-٦٨)

"যুদ্ধবন্দী থাকবে অথচ চুড়ান্তভাবে রক্তপাত করা হবেনা এটা কোন নবীর পক্ষে শোভন নয়। তোমরা কেবল পার্থিব সম্পদ চাও। অথচ আল্লাহ

চান আখেরাত। তিনিই পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী। (যুদ্ধবন্দীদের ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়ার অনুমতি সংক্রান্ত) আল্লাহর বিধান যদি ইতিপূর্বে (সূরা মুহাম্মদে) না আসতো তা হলে তোমরা যে ফিদিয়া নিয়েছ তার জন্য তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন আজাব আসতো।"

(সূরা আনফাল–৯)

পক্ষান্তরে মুসলিম মনিষীদের একটি ক্ষুদ্র দলের অভিমত এই যে, এই ভৎর্সনা ফিদিয়া গ্রহণের নয় বরং আল্লাহর অনুমতি গ্রহণের পূর্বেই মুসলমানরা গণীমত কুড়াতে শুরু করে দিয়েছিল এ জন্য। ইমাম তিরমিজী তদীয় হাদিস গ্রন্থের তফছির অধ্যায়ে, ইমাম আবু ইউসুফ তদীয় গ্রন্থ কিতাবুল খারাজে এবং ইমাম ইবনে জারীর তাবারী তদীয় তফসীর গ্রন্থে নিম্ন লিখিত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেনঃ

فلما كان يوم بدر وقعوا فى الغنائم قبل ان تحل
لهم، فانزل الله لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

"যখন বদরের যুদ্ধ হলো, মুসলমানরা গনিমতের মাল লুটতে শুরু করে দিল। অথচ তখনো তা হালাল করা হয়নি। এ কারণেই لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ এ আয়াতটি নাজিল করেন।"

সে যাই হোক। এটা এক রকম সর্ববাদী সম্মত কথা যে, উক্ত আয়াতটি বদর যুদ্ধের সময়ই নাজিল হয় এবং শুধুমাত্র বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গেই নাজিল হয়। কোন স্থায়ী ও সাধারণ আইন প্রণয়ণ এ আয়াতের উদ্দেশ্য ছিলনা। যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইসলামের আসল আইন সূরা মুহাম্মদে বর্ণিত হয়েছে এবং সেটাই সাধারণ বিধি। হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উক্ত আয়াত অনুযায়ীই সারা জীবন যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। সূরা মূহাম্মদের উক্ত আয়াত থেকে যে সাধারণ বিষয়টি জানা যায় তা হলো, যুদ্ধ শেষে বন্দীদের হয় ফিদিয়া নিয়ে নচেৎ ফিদিয়া ছাড়াই চেড়ে দিতে হবে, অথবা বন্দী রেখে সদাচরণ করতে হবে।

আয়াতটি এই ঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتَّىٰ إِذَا

اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً (محمد: ٤)

"কাফেরদের সঙ্গে যেই তোমাদের মোকাবিলা হবে, অমনি হত্যা করতে আরম্ভ করে দেবে। যখন তাঁদের পরাজিত করে ফেলবে, তখন বন্দী করবে। এরপর অনুকম্পা দেখাও ৫০ অথবা ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দাও– সে তোমাদের ইচ্ছা।" (সূরা মুহাম্মাদ–১)

সাধারণতঃ হযরত রসূলে করীম (সঃ) এ আয়াতের আলোকে ফিদিয়া না নিয়েই বন্দীদের ছেড়ে দিতেন। জিবালে তানয়ীম নামক স্থানে মক্কার ৮০ জন লোক মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা চালায় এবং শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই গ্রেফতার হয়ে যায়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের পেশ করা হলে তিনি সকলকে ফিদিয়া ছাড়াই ছেড়ে দিলেন। হোনাইন যুদ্ধে হাওয়াজেন গোত্রের ৬ হাজার কয়েদীকে ফিদিয়া ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়। এতে সে এত মুগ্ধ হয় যে তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যায়। এসব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বিশেষতঃ অভাবের সময় ফিদিয়া গ্রহণ করতেন।

দাসত্বের প্রশ্ন

এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন ওঠে। ইসলাম যুদ্ধ বন্দীদেরকে দাসদাসী বানিয়ে রাখার যে অনুমতি দিয়েছে এবং যুদ্ধবন্দিনী নারীদের ভোগ করাকে যে বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়েছে তার ভিত্তি কি? যদি এ অনুমতি ও বৈধতা সত্যিই ইসলামে থেকে থাকে, তা হলে তা উক্ত فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً আয়াতে বর্নিত বিধির সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? প্রশ্ন উথাপিন কারীরা এই প্রশ্নকে যেভাবে পেশ করেছে এবং ইসলামের কোন কোন প্রবক্তা এর যা জবাব দিয়েছে, তা দেখলে মনে হয় দু'পক্ষের কেউই ব্যাপারটা নিয়ে ভালোভাবে তলিয়ে চিন্তা করেন নি। ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের দাসদাসী করার বিধি আছে সে কথা নিশ্চিন্তভাবে সত্য। আর দাসীদের সাথে যৌন সম্ভোগের অনুমতি আছে সে কথাও সত্য। কিন্তু এর কারণ ও ভিত্তি কি। তা বুঝবার জন্য প্রথমে কয়েকটা বিষয় ভালো করে জেনে নেয়া দরকার। প্রথম কথা হলো, যে যুগে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের কোন রেওয়াজ ছিলনা। যখন মুসলমানরা অন্য জাতির হাতে গ্রেফতার হতো, তখন তারা দাসদাসী হয়ে থাকতো। কাজেই মুসলমানদের কাছেও শত্রু পক্ষীয় লোকেরা বন্দী হয়ে এলে

তাদের পক্ষে তাদেরকে দাসদাসী বানিয়ে রাখা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। কদাচ কোথাও বিনিময়ের সুযোগ হলে মুসলমানরা খুশী মনে সে সুযোগ গ্রহণ করেছে। ফাতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে হাজার লিখেছেনঃ 'মুসলমান কয়েদী থাকতো এবং প্রত্যেক পক্ষ নিজ নিজ বন্দীদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে একমত হতো, তা হলে বিনিময় করতে চাইলে তা করা উচিৎ[৫১]–সে ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল–সকলেই একমত।[৫২] স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যে বন্দী বিনিময় করেছেন– তারও প্রমাণ রয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরিমিজীর বর্ণনা অনুসারে হযরত (দঃ) এর পর দু'জন মুসলমান কয়েদীর মুক্তির বিনিময়ে একটি মোশারেক বালিকাকে মুক্ত করেন।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন সময় যুদ্ধে একটি শহরের অধিকাংশ পুরুষ মারা যেত। এমনকি কখনো কখনো এমনও হতো যে, একটি জনপদের অস্ত্র ধারনোপযোগী সকল পুরুষ খতম হয়ে যেত। এমতাবস্থায় বে–ওয়ারিশ নারী ও শিশুদের লালন পালনের ব্যবস্থা বিজয়ী জাতির দায়িত্বে তাদের সোপর্দ হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব ছিল না। আর এ ব্যবস্থাটা যখন বিজয়ী জাতিকে করতে হতো, তখন নারীদের নিরাপত্তা বিধান ও তাদের পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য মুসলিম পুরুষদের সাথে তাদের বিয়ের অনুমতি দেয়া ছাড়া আর কি উপায় ছিল? এর চেয়ে ভালো পন্থা আর কিইবা হতে পারতো এ ভাবে তারা ইসলামী সমাজেরও সদস্য হতে পেরেছিল এবং হাজার হাজার নারীর স্বামী হারা হওয়ার যে সামাজিক আনাচার দেখা দেয়া অনিবার্য ছিল, তার পথও রুদ্ধ হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে যুদ্ধে ধৃতা নারীদের ব্যাপারে ইসলামী আইনের যে বিধি রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

১। বন্দিনীদেরকে ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে, না বিনিময় করতে হবে, না সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করা হবে– সে সম্পর্কে সরকার যতক্ষণ সিদ্ধান্ত না নেবেন ততক্ষণ তারা আটক থাকবে। এ সময়ে কোন সৈনিক যদি তাদের কোন মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তা হলে সেটা হবে ব্যভিচার। ইসলামে ব্যভিচারের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছে অবিকল সেই শাস্তিই তার প্রাপ্য হবে।

২। সরকার যখন দাসী বানানোরই সিদ্ধান্ত নেবেন তখন তাদেরকে যথারীতি বন্টন করবে এবং আইনসম্মতভবে এক একটি নারীকে এক একটি পুরুষের মালিকানায় দিয়ে দেবে।

(৩) এভাবে যে নারীকে কোন ব্যক্তির মালিকানায় দেয়া হবে, সে ব্যক্তি সে নারীর একবার ঋতু শেষ না হওয়া কিংবা গর্ভধারিনীহলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে যৌন সঙ্গম করতে পারবে না। তার আগে সঙ্গম করা হারাম।

(৪) তার সাথে সঙ্গম করার অধিকার কেবল ঐ ব্যক্তিরই থাকবে–যার মালিকানায় তাকে সোপর্দ করা হয়েছে। অন্য কোন ব্যক্তি যদি তাকে স্পর্শ করে তা হলে সে ব্যভিচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং এর শাস্তি ইসলামে কি তা সবারই জানা।

(৫) কোন সৈন্য উল্লিখিত বিধির বহির্ভূত অন্য কোন পন্থায় অমুসলিম অঞ্চলে শত্রুপক্ষীয় নারীদের সাথে সঙ্গম করলে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং শাস্তিপাবে।

এই সুসভ্য, পবিত্র ও বিধিসঙ্গত পদ্ধতির সাথে এ যুগের তথাকথিত 'সভ্য' সেনাবাহিনীর অনাচারের কোন তুলনাই চলে না। বিজিত এলাকায় ঢুকে তারা চারিদিকে সতিত্ব হরণ ও ধর্ষণের যে সয়লাব বইয়ে দেয় এবং কাম চরিতার্থ করার জন্য জুলুম, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও হিংস্রতার যেসব দৃষ্টান্ত রাখে, তা একজন সভ্য মানুষ মুখে উচ্চারণও করতে পারে না।

তৃতীয়তঃ ইসলাম যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস–দাসীরূপে গ্রহণ করার শুধু অনুমতিই দিয়েছে–নির্দেশ–দেয়নি। এ অনুমতিকে কাজে পরিণত করা বা না করা মুসলমানদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। শুধু ইচ্ছাধীনই নয়, খোলাফায়ে রাশেদার কর্মপদ্ধতি দেখলে মনে হয়, তা কাজে না লাগানোই শ্রেয়। মিশর, সিরিয়া, ইরাক, আফ্রিকা, আরমেনিয়া ও ইরান অভিযানকালে বহু এলাকা বিনা প্রতিরোধে বিজিত হয়েছে এবং সেসব এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রেফতার ও বন্দী হয়েছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক ছাড়া কাউকে গোলাম বানানো হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে য়ে, একজন সেনাপতি বেশ কিছু লোককে গোলাম বানিয়ে ফেলেছে। খলিফা যেই জানতে পেরেছেন, অমনি

মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন যে, মিশরের কিছু কিছু গ্রাম প্রচন্ড প্রতিরোধের পর বিজিত হয়েছিল। মুসলমানরা ঐসব গ্রামের লোকদেরকে গোলাম বানিয়ে হজরত ওমরের নিকট মদিনায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হজরত ওমর (রাঃ) তাদেরকে মুক্তি দিয়ে তাদের স্ব–স্ব গ্রামে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যে, এদেরকেও সাধারণ কিবতীদের সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধ নাগরিক বা জিম্মি বানিয়ে নেয়া হোক।[৫৩] এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলামরূপে বরণ করে নেয়া জরুরী কিংবা উত্তম কোনটাই ছিল না। বরং বন্দী বিনিময়ের রীতি ছিল না বলে তাকে একটা "অনিবার্য পাপাচার" রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল।

চতুর্থতঃ ইসলাম শুধু যুদ্ধে ধৃত লোকদেরকে দাসত্বে বরণ করে নেয়ার অনুমতি দিয়েছে এবং তাও একান্ত বাধ্য হয়ে। তবে স্বাধীন লোকদেরকে ধরে বিক্রি করা যা আদিম যুগের একটা প্রচলিত রীতি ছিল এটা ইসলাম কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করেছে। হজরত রসুলে করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

ثلثة انا خصمهم يوم القيامة، رجل اعطى بى ثم غدر
ورجل باع حرًا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرًا فاستوفى منه ولم
يعط اجره

"তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হবোঃ এক ব্যক্তি হলো সেই, যে কোন অমুসলিম নাগরিককে নিরাপত্তা দিয়ে পরে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, দ্বিতীয়, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বেচে তার দাম খেয়েছে, তৃতীয়, যে ব্যক্তি কোন শ্রমিকের দ্বারা পুরা কাজ নিল কিন্তু মজুরী দিল না।" (বোখারী, কিতাবুল বুয়ূ)

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, ইসলামে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস–দাসীরূপে গ্রহণ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে ও বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে বৈধ রেখেছে। তবে এটা যদি বিনাশর্তে বৈধ রাখতো, তা হলে মুসলমানদের মধ্যে আরব জাহেলিয়াত এবং রোম ও ইরানের অনুরূপ গোলামী ব্যবস্থা চালু হয়ে যেত। এমনকি ভারতের শত্রুদের মত এই যুদ্ধবন্দীদের একটা আলাদা নীচু জাত সৃষ্টি হয়ে যেত। কিন্তু ইসলামের নিয়ম

হলো, যেসব জিনিসকে সে প্রত্যক্ষ সংস্কারের আওতায় আনতে অসুবিধা বোধ করেছে, সেগুলোকে সে থাকতে দিয়েছে কিন্তু যেমন ছিল তেমনভাবে নয়। সে এইসব বিষয়ে পরোক্ষ সংস্কারের এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করে যে, সেগুলোর সমস্ত অনিষ্টকারিতা ও ক্ষতিকর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। দাসত্বের ব্যাপারেও সে এই কর্মপন্থাই অনুসরণ করেছে। দাসত্বের প্রথা একেবারে উৎখাত করা বহুবিধ কারণে কঠিন ছিল। তাই সে এর বাহ্যিক রূপটা অক্ষত রেখেছে এবং পরোক্ষভাবে এর মূল বিষয়টা এমনভাবে পাল্টে দিয়েছে যে, তা একটা মারাত্মক সামাজিক ক্ষতির কারণ না হয়ে একটা চমৎকার মানবিক কল্যাণাধারে পরিণত হতে পেরেছে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম অনেকগুলো পথ অবলম্বন করেছে, তন্মধ্যে তিনটি হলো প্রধানঃ

(১) গোলামকে স্বাধীন করা এবং স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে কোন গোলামকে সাহায্য করাকে বিরাট পুণ্যের কাজ বলে অবহিত করেছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ اَوْ اِطْعَامٌ فِىْ يَوْمٍ
ذِىْ مَسْغَبَةٍ ۝ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ (البلد: ١٢–١٦)

" পুণ্যের কঠিন পথ কি, তা তুমি কি জান? গোলামকে স্বাধীন করা এবং ক্ষুধার সময় নিরন্ন ইয়াতিম কিংবা দরিদ্র মিসকিনকে আহার করনো।"
(সূরা আল–বালাদ–১)

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময়ই নানাভাবে গোলামকে স্বাধীন করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতেন। যদ্দরুণ মুসলামানদের মধ্যে গোলাম আজাদ করার প্রতি বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। একবার জনৈক গ্রাম্য লোক হজরতের নিকট হাজির হয়ে বললো, "এমন একটা কাজের উপদেশ দিন যা দ্বারা আমি বেহেস্তে যেতে পারি।" মহানবী বললেন "বেশী করে গোলাম আযাদ কর।" আর এক হাদীসে আছেঃ

من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوًا بعضو

"যে ব্যক্তি কোন মুসলিম গোলামকে মুক্ত করে, গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গ দোযখের আগুন থেকে অব্যাহতি পাবে।"

অন্য একটি হাদীসে আছেঃ من اعتق نفسًا مسلمة كانت فديته

من جاهم "যে ব্যক্তি একজন মুসলামানকে স্বাধীন করবে, তার জন্য সেটা ফিদিয়া (মুক্তিপণে) পরিণত হবে।"হজরত ইমাম জায়নুল আবেদীণ যখন এ হাদীস শুনলেন যে, "যে ব্যক্তি কোন গোলামকে আজাদ করে দেবে তার প্রতিটি অঙ্গ গোলামের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বদলে দোজখের আগুন থেকে নিস্কৃতি পাবে" সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর গোলাম মুতারিফকে স্বাধীন করে দিলেন। এই গোলাম তিনি দশ হাজার দেরহাম দিয়ে কিনেছিলেন।

গোলাম আজাদ করার আগ্রহ আরো বাড়ানোর জন্য হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন যে, যত বেশী দাসী ও পছন্দ সই গোলাম আজাদ করা হবে তত বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে। হজরত আবুজর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ای الرقاب افضل؟ কি রকম গোলাম মুক্ত করা ভাল? "হজরত জবাব দিলেনঃ اغلاها ثمنا وانفعها عند اهلها "সবচেয়ে মুল্যবান এবং মনিবের সবচেয়ে উপকারী।" অনুরূপ ভাবে দাসীকে ভালো লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয়া ও বিয়ে করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা হয়েছেঃ

من كانت له جارية ادبها واحسن تعليمها

واعتقها وتزوجها كان له اجران،

"যে ব্যক্তি তার বাঁদীকে উত্তম শিক্ষা দিয়ে স্বাধীন করে দিল এবং বিয়ে করলো সে দু'টো পূণ্যের অধিকারী হবে।"

বিভিন্ন গুণাহর জন্য কাফফারা হিসেবেও গোলাম মুক্ত করাকে সর্বোত্তম কাফফারা বলে গণ্য করা হয়েছে। সূর্য গ্রহণ ও অন্যান্য বিপদ আপদের সময়ও গোলাম মুক্ত করাকে বিপদ মুক্তির উপায় বলে জানানো হয়েছে। মোট কথা, সর্বপ্রকারে গোলাম মুক্ত করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় পন্থা ছিল এই যে, দাস–দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার, সদয় ও নম্র আচরন করতে কঠোভাবে তাকিদ দেয়া হয়েছে। হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে নিজ উম্মতকে যেসব ওছিয়ত করে যান তার মধ্যে প্রথমে ছিল নামাজের আদেশ, তারপর ছিল ভৃত্যদের সাথে সদ্দাচরণের নির্দেশ।[৫৪] জাহেলিয়াতের যুগ থেকে দাসত্বের যে ধারণা বদ্ধমুল ছিল, তার প্রভাবে এসে কখনো কখনো সাহাবারা

দাস–দাসীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে বসতেন। এজন্য হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার নিজের প্রিয়তম সাহাবীদেরকেও ধমক দিয়েছেন ও ভর্ৎসনা করেছেন। মারুদ বিন ছুয়াইদ একবার দেখেন, হযরত আবুজর গিফারী যে ধরনের চাঁদর গায়ে জড়িয়েছেন, তার গোলামও অনুরূপ চাঁদর গায়ে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? তিনি জবাব দিলেন, "একবার আমি এক গোলামকে গাল দিয়েছিলাম।" সে সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট গিয়ে নালিশ করে দিল। হজরত খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং আমাকে ডেকে বললেনঃ আবুজর, তোমার মধ্য থেকে এখনো জাহেলিয়াতের গন্ধ দুর হলো না। অতপর বললেনঃ

ان اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم

فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه

مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم

"ওরা তোমাদের সেবক এবং তোমাদের ভাই। আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের অনুগত বানিয়েছেন। সুতরাং যার অধীনে তার কিছুসংখ্যক ভাই থাকবে সে যেন নিজে যা খায়, তাদেরকেও তাই খাওয়ায়, আর নিজে যা পরে তাদেরকেও যেন তাই পরায়। তোমরা ওদের ওপর ওদের শক্তির চেয়ে বেশী বোঝা চাপিও না, আর যদি খুব ভারী কোন দায়িত্ব চাপাও তবে নিজেরাও তাদের সঙ্গে কাজ করে তাদের সাহায্য কর।"

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার আমি নিজের গোলামকে প্রহার করেছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, পেছন থেকে কে যেন বলছেঃ اعلم ابامسعود الله اقدر عليك منك عليه "হে মাসউদ! জেনে রেখ, তুমি এই নিরিহ গোলামটির ওপরে যতটা পরাক্রান্ত, আল্লাহ তোমার ওপর তার চেয়েও বেশী প্রতাপান্বিত।" ফিরে তাকিয়ে দেখি, হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি তৎক্ষণাৎ বললাম هو حر لوجه الله "ওকে মুক্ত করে দিলাম।" তখন হযরত বললেন, তুমি এ কাজটা না করলে আগুনের আযাবে পতিত হতে।"

একবার এক ব্যক্তি এসে বললো, " আমরা ভৃত্যকে কতবার মাফ করবো।" তিনি জবাব দিলেন, اعفوا عنه فى كل يوم سبعين مرة। "সে যদি প্রতিদিন ৭০ বারও ভুল করে, তবু তাকে ক্ষমা করে যেতে থাকবে।"

সুয়াইদ বিন মাকরান বলেন, আমরা ছিলাম সাত ভাই। সেই সাথে একজন ভৃত্যও ছিল। একবার আমার ছোট ভাই তার মুখে থাপ্পড় মারলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামটি মুক্ত করে দিতে বললেন। তাঁর পুত্র মুয়াবিয়া বলেন, একবার আমি আমার গোলামকে থাপ্পড় মারি। পিতা জানতে পেরে আমাদের উভয়কে ডাকলেন এবং গোলামকে বললেন, " মোয়াবিয়ার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও।"[৫৫]

আরবে নিয়ম ছিল, গোলামকে عبدى (আমার দাস) এবং দাসীকে أَمَتِى (আমার দাসী) বলে ডাকা হতো এবং মনিব নিজেকে رب বলে ডাকতো। হযরত (সঃ) এটা বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, দাস দাসীকে যথাক্রমে فتاى ও فتاتى (আমার ছেলে ও মেয়ে) বলে ডাকবে এবং নিজেকে سيدى বা مولاى (আমার নেতা, আমার অভিভাবক) বলে ডাকিও। আরবরা গোলামকে নিজের ধারে বসতে দিতেও ঘৃণা বোধ করতো কিন্তু হজরত (সঃ) বললেন, ওদেরকে একই থালায় বসিয়ে খাওয়াও আর তা যদি না পার, অন্ততঃ নিজের খাবার থেকে দু'এক গ্রাস ওদেরকে খেতে দাও।

এসব নির্দেশ মানার উদ্দেশ্য একইঃ গোলামদেরকে সম্মানে ও আরামে রাখা এবং পরিবারের সদস্য বানিয়ে রাখা।

(৩) ইসলামী আইনে গোলাম–বাদীকে এত ব্যাপক অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তারা প্রায় স্বাধীন মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ফৌজদারী আইনে তাদেরকে স্বাধীনদের সমান নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। তাদের সম্পদ যে চুরি করে, তাদের যে হত্যা করে , তাদের নারীদের যে শ্লীলতা হানি করে, তাদের দৈহিক ক্ষতি যে করে, সে গোলাম কিংবা স্বাধীন যেই হোক– তাকে একই অপরাধে স্বাধীন লোকদের সাথে করলে যে শাস্তি ভোগ করতে হয় সেই শাস্তিই ভোগ করতে হবে। অনুরূপভাবে দেওয়ানী আইন তাদের সম্পত্তির ওপর তাদের মালিকানা স্বীকার করে এবং তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে যেভাবে খুশী হস্তক্ষেপের ব্যাপক এখতিয়ার প্রদান করে। আইনের বিচারে তাদের মনিবেরও অধিকার নেই যে, তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে

তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন রকমের হস্তক্ষেপ করে কিংবা তাদের কোন রকম দৈহিক ক্ষতি সাধন করে (কেবল শিক্ষামূলকভাবে প্রহার করা ছাড়া এবং তাতেও নম্রতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) কিংবা তাদের কোন বৌ–ঝির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখে।[৫৬] (তৎকালীন রোমে এরূপ প্রথা চালু ছিল যে, কোন গোলামের মেয়ের বিয়ে হলে প্রথম রাত কাটাতে হত মনিবের সাথে। খৃষ্টান পাদ্রীও এই নির্লজ্জ জুলুমের প্রতিবাদ করতো না। স্পিরিট অব ইসলাম, সৈয়দ আমীর আলী)

আইনের চেয়ে বড় কথা হলো, ইসলামী সমাজ তাদেরকে কার্যকরভাবে সমতার মর্যাদা প্রদান করেছে। সমাজ জীবনে গোলামদের স্থান কোন প্রকারেই স্বাধীনের চেয়ে নীচে ছিল না। জ্ঞান চর্চা, রাজনীতি, ধর্ম, সামাজিকতা মোট কথা সকল বিভাগেই তাদের জন্য উন্নতির পথ উন্মুক্ত ছিল। গোলাম হওয়া তাদের জন্য কোন দিক দিয়েই উন্নতির অন্তরায় হয়নি। হজরত রসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার ফূফাতো বোন জয়নবকে নিজের স্বাধীন করা গোলাম জায়েদ ইবনে হারেসের সাথে বিয়ে দেন। জয়নব পরে উম্মুল মুমেনীনের গৌরবে ভুষিতা হন। হজরত ইমাম হোসাইনের বিবাহ হয় ইরানের এক রাজকন্যার সাথে– যিনি যুদ্ধে বাঁদী হয়ে এসেছিলেন। ইমাম জয়নুল আবেদীন এই বাঁদীর পেট থেকেই জন্মগ্রহণ করেন। আর ইমাম জয়নুল আবেদীনের উত্তর পুরুষেরাই ইসলামের সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বংশধর। তাবেয়ী ফকীহদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবুবকর বাঁদীর পেটের সন্তান। ইমাম হাসান বসরী তাবেয়ী ইমামদের শিরমণি এবং তাসাউফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। তিনি একজন গোলামের পুত্র। কোটি কোটি মুসলমানের পথ প্রদর্শক এবং মুসলিম বিশ্বের ইমাম আজম বা শ্রেষ্ঠতম নেতা বলে পরিচিত ইমাম আবু হানিফা বনু তাইমুল্লাহর গোলামদের বংশোদ্ভূত বলে জানা যায়। প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা মুহাম্মদ বিন সিরীন–যাকে একজন প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ী ইমাম বলে গণ্য করা হয়– তিনি একজন গোলামের সন্তান। তাঁর পিতা সিরীন এবং মা সুফিয়া দুজনই ছিলেন গোলাম ও বাঁদী। কিন্তু এমন মর্যাদাবান গোলাম ও বাঁদী যে, হযরত সুফিয়াকে তিনজন উম্মুল মুমিনীন পরপর পুত্রবধূ করে ঘরে তোলেন এবং সিরীনের সাথে তার বিয়ে পড়ান উবাই ইবনে কাবে'র ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাহাবী। ইমাম মালেকের ওস্তাদ হযরত

নাফে যাকে নিয়ে তিনি গর্ব করতেন– তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের গোলাম। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফেকাহবেত্তা ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক একজন গোলামের পুত্র। প্রখ্যাত তফসীরবেত্তা ইমাম ইকরামা নিজেই একজন গোলাম ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের দাদা যুদ্ধবন্দী হিসেবে এসেছিলেন। মক্কার মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি আতা ইবনে আবি রাবাহ, ইয়ামেনের ইমাম তাউস বিন কায়সান, মিশরের ইমাম ওয়াজিদ বিন হাবিব, সিরিয়ার ইমাম মাকহুল, আলজিরিয়ার ইমাম মায়মুন বিন মিহরান, খোরাসানের ইমাম দাহহাক, কুফার ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী– এরা সকলেই ছিলেন গোলামের বংশধর। সালমান ফারসী ছিলেন একজন গোলাম এবং হযরত আলী বলতেন, سلمان منا اهل البيت অর্থাৎ সালমান আমাদের আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত। হযরত বেলাল হাবশী একজন গোলাম ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তার সম্পর্কে বলতেন, بلال سيدنا ومولى سيدنا অর্থাৎ বিলাল আমাদের গোলাম এবং আমাদের মনিব। হযরত সোহাইব রুমী ছিলেন একজন গোলাম যাকে হযরত ওমর ইমামতির জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। হযরত সালেম ছিলেন আবু হুজাইফার গোলাম। তার সম্পর্কে হযরত ওমর ইন্তেকালের সময় বলেছিলেন, সালেম যদি আজ জীবিত থাকতো তবে আমি তাঁকে খেলাফতের জন্য মনোনীত করে যেতাম। হযরত উসামা ইবনে জায়েদ ছিলেন গোলামের সন্তান। তাঁকে হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মুমুর্ষুকালে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন পরিচালিত সেই বাহিনীতে হযরত আবুবকর (রাঃ) –এর ন্যায় সাহাবীও ছিলেন। হযরত ওমর তদীয় পুত্র আবদুল্লাহকে বলেন, তোমার বাবার চেয়ে উসামার বাবা হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ)– এর নিকট অধিক প্রিয়। আর উছামা স্বয়ং রসুলুল্লাহর নিকট তোমার চেয়েও প্রিয়। এতো গেলো প্রাথমিক যুগের কথা। পরবর্তীকালে যখন ইসলামের প্রাণশক্তি দুর্বল হয়ে যায় তখনও কুতুবুদ্দীণ আইবেক, শামসুদ্দিন আলতামাস এবং গিয়াসউদ্দীন বলবনের ন্যায় গিয়াসউদ্দীন বলবনের ন্যায় গোলাম গণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছেন। সুলতান মাহমুদ গজনীর সমসাময়িক বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিজয়ী ছিলেন। তিনিও বংশগতভাবে তুর্কী গোলাম ছিলেন। মিশরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত গোলামদের রাজত্ব চলেছে।

এসব গোলামদেরকে গোলাম বলবে? স্বাধীনদের কি তাদের চেয়ে বেশী উন্নতি, সম্মান ও ক্ষমতা লাভের সুযোগ ছিল? তারা গোলাম বলে সমাজ জীবনে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছুতে তাদের পক্ষে কি কোন বাধা ছিল? এরই নাম যদি গোলামী হয়, আর গোলামী যদি এ ধরনেরই জিনিস হয়ে থাকে, তা হলে স্বাধীনতাকে গোলামী নাম দিতে আপত্তি কি?

বস্তুত এভাবেই ইসলাম গোলামীকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করতে করতে স্বাধীনতার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। শুধু কাছেই পৌঁছিয়ে দেয়নি, তার সাথে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছে যে, উভয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকতে দেয়নি। "গোলামী" শব্দটা অবশিষ্ট থেকেছে তবে বাস্তব ক্ষেত্রে গোলামীর চেহারা একেবারেই বদলে গেছে।

গণিমতের সমস্যা

ইসলামে গণিমতের মালের বৈধতাও এ ধরনেরই একটা ব্যাপার। ইসলামবিরোধীরা এ জিনিসটা নিয়ে অনেক হৈ চৈ করেছে। ইসলামের পক্ষ হয়ে যারা জাবাব দিতে গেছেন তাদেরও অনেকে ভুল ওকালতি করেছেন। আসল ব্যাপার হলো, ইসলাম গোলামী বা দাসত্বের ক্ষেত্রে যে পর্যায়ক্রমিক সংস্কারের পথ বেছে নিয়েছে, গণিমতের মালের ব্যাপারেও সেই কর্মপন্থাই অবলম্বন করেছে। আরব্য সমাজে গণিমতের মালের লোভ কেমন প্রকট ছিল, তা ইতিপূর্বে আরব কবিদের বর্ণনা থেকে জানা গেছে। গণিমতের মালের মোহেই একজন সাধারণ আরব যুদ্ধের ঝুঁকি গ্রহণ করতো এবং নিজে মরতে ও অন্যকে মারতে উদ্বুদ্ধ হতো। লুঠতরাজ তো আরবদের যুদ্ধের শাব্দিক অর্থের একটা অংশ ছিল। লুঠতরাজের কথা না ভেবে حرب বা যুদ্ধের কথা তারা ভাবতেই পারতো না। ইসলাম যখন আসল, তখন আরবরা এই চিরাচরিত লোভ ও মোহ নিয়েই ইসলামে প্রবিষ্ট হলো। শত শত বছরের এই পুরুষানুক্রমিক মানসিকতাকে রাতারাতি পাল্টে দেয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ইসলাম যে নওমুসলিম আরবদের চরিত্র সংশোধন করতে চেয়েছিল তাদের অবস্থা ছিল এইরূপ যে, গণিমতের মালের প্রতি তারা স্বভাবগত ভাবেই বে–এখতিয়ার আকৃষ্ট হতো এবং রণাঙ্গনে গণিমতের মাল দেখে নিজেদের সংযত করতে পারতো না। বদর যুদ্ধের পূর্বে হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে

জাহাশের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী শত্রুর খোঁজ–খবর নিতে বাতনে নাখলায় প্রেরণ করেন। পথে কোরেশদের কতিপয় ব্যবসায়ীর সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। গণিমতের মাল দেখে তার বাহিনীর লোকজন সংযম হারিয়ে ফেললো এবং ঐ ব্যবসায়ীদের খুন করে তাদের যাবতীয় সম্পত্তি লূণ্ঠন করে নিয়ে এলো। ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে বদর যুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণসমূহের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৭] বদর যুদ্ধে একদিকে কোরেশদের বাণিজ্যিক বহর সিরিয়া থেকে আসছিল অপরদিকে কোরেশ সৈন্যরা মক্কা থেকে আসছিল। এ সময়ে সৈন্যদের শক্তি চুর্ণ করা যদিও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল, তথাপি মুসলিম বাহিনীর সাধারণ বাসনা ছিল আগে বাণিজ্য বহরকে লুণ্ঠন করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ
وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ
يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ ۝ (انفال: ٧)

"আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুটো কাফেলার একটির ওপর তোমাদের বিজয় লাভ হবে, অথচ তোমরা চাইছিলে যে, দুর্বল ও নিরস্ত্র দলটি তোমাদের হস্তগত হোক। অপর দিকে আল্লাহ চাইছিলেন যে, নিজের বানী সমূহ দ্বারা সত্যকে সত্য করে দেখাবেন এবং কাফেরদের মূলোৎপাটন করে ক্ষান্ত হবেন।"–(সূরা আনফাল–১)

এরপর যখন যুদ্ধে জয় লাভ হলো, তখন সাহাবীদের পক্ষে গণিমতের মোহ সংযত করা কঠিন হয়ে পড়লো। তারা আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষা না করেই গণিমত কুড়াতে আরম্ভ করে দিলেন। এ সম্পর্কে আয়াত নাজিল হলোঃ [৫৮]

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ۝ (انفال: ٦٨)

" আগে থেকেই আল্লাহর ফয়সালা এসে গেছে বলে রক্ষা। তা না হলে তোমরা যা নিচ্ছ তার জন্য তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভুগতে হতো।"

–(সূরা আনফাল–৯)

ওহুদ যুদ্ধে এই গণিমত–লোলুপতাই জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করলো। কোরেশদের পরাজয় ঘটা মাত্রই সাহাবাগণ গণিমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন, এমনকি যে কয়জন সৈনিককে হজরত গিরিপথ পাহারায় নিয়োগ করেছিলেন, সেই দিশাহারা অবস্থায় তাদেরও আর হজরতের নির্দেশ মনে থাকলো না। এর ফল হলো এই যে, মুসলিম বাহিনী শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো এবং কাফের বাহিনী পেছন ফিরে এমন হামলা চালালো যে, স্বয়ং হজরত রসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আহত হলেন। হোনাইন যুদ্ধেও এরূপ হয়েছিল। প্রথম আক্রমণে শত্রুরা দিশাহারা হয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে মুসলিম বাহিনী গণিমত লুটতে আরম্ভ করে দেয়। তাদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখে বনু হাওয়াজেনের তীরন্দাজরা এমন আক্রমণ চালালো যে, তখন নামকরা নামকরা বীর মুজাহিদের ময়দানে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়লো। বোখারীতে এই মর্মে বারা' ইবনে আজেবের স্বীকারোক্তিও উদ্ধৃত হয়েছে। ৫৯

অবশ্য এ ঘটনাবলী আমি সাহাবায়ে কেরামের নিন্দা সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছি না। আসলে যে কথা বলতে চাইছি তা হলো এই যে, গণিমতের মোহ ছিল একটা সহজাত ঝোঁক। শত শত বছরের ঐতিহ্যের ফলে মানুষের মন মানসে ও স্বভাব–প্রকৃতিতে তা এতটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, কোন মানবীয় সংগঠন এমনকি সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় পূণ্য আত্মা ও নিস্বার্থ লোকদের পক্ষেও তার প্রভাব মন–মগজ থেকে অত শীঘ্র মুছে ফেলা সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় ইসলামের ন্যায় একটা বিজ্ঞান সম্মত জীবনাদর্শ–যা মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে চায় না, সংশোধন করতে চায় তার পক্ষে গণিমতকে হালাল করে দিয়ে তার লোভ কমানো ও তার সীমা সংকুচিত করার চেষ্টা করাই ছিল শ্রেষ্ঠতম পন্থা। বস্তুতঃ ইসলাম এই পন্থাই অবলম্বন করেছে। ইসলাম কি কারণে গণিমতকে হালাল করেছে, সে সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ স্বীয় কিতাবুল খারাজে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم

لقوم سود الرؤس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها

فلما كان يوم بدر اسرع الناس فى الغنائم فانزل الله عز وجل

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا،

"হজরত রসুলূল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্বে কোন মানব গোষ্ঠীর জন্য গণিমত হালাল ছিল না। আকাশ থেকে একটা আগুন নেমে আসত এবং গণিমতের মালকে গ্রাস করতো।৬০ বদরের যুদ্ধ যখন হলো তখন মুসলমানরা গণিকতের মালের প্রতি অতি মাত্রায় ঝুঁকে পড়লো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হলো যে, যদি আগেই আল্লাহর ফয়সালা না আসতো তা হলে তোমাদের ওপর বড় রকমের আজাব নাজিল হতো। যাক, এখন যা কিছু সংগ্রহ করো, তাকে হালাল ও পবিত্র ঘোষণা করা হলো। এখন ওগুলো খাও।"

এ হাদিস থেকে জানা যায় যে, গণিমতের মাল আগে হালাল ছিল না কিন্তু মানব প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় ঝোঁক দেখে তাকে হালাল করা হলো। তা সত্ত্বেও শুধু মাত্র প্রবৃত্তির প্রাধান্যই মেনে নেয়া হয়নি বরং তার সংশোধন ও তাকে সীমিত করণের জন্য বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের মন থেকে গণিমতের লোভই দূর হয়ে গেছে। সামান্য যে টুকু অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তার সংশোধনার্থে গণিমতের মালের ওপর বিভিন্ন রকমের বাধ্য বাধকতা আরোপ করা হয়েছে এবং খোদ গণিমতের পরিধীও খুবই সীমিত করে দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তিনটি কর্মপন্থার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১–ইসলামে গণিমতের মালকে এত তুচ্ছ করে দেখান হয়েছে, ধর্মপ্রাণ লোকদের মধ্যে তার প্রতি আর কোন আকর্যণই নেই। প্রথমে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গণিমত লাভ করার মানসে যুদ্ধ করবে সে জেহাদের সওয়াব পাবে না। যারা পার্থিব স্বার্থের মোহ থেকে মনকে মুক্ত ও পবিত্র করে শুধু আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করবে, সওয়াব পাবে কেবল তারাই। অতপর যখন মনে গণিমতের মালের চেয়ে আখেরাতের পূণ্য অর্জণের আগ্রহ বেশী হয়ে গেল তখন বলা হলো যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যুদ্ধের ফায়দা লাভ করবে তার আখেরাতের পূণ্য কম হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ফায়দা গ্রহণ করবে না সে আখেরাতের পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে।

ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة الا تعجلوا ثلثي اجرهم من الأخرة ويبقى لهم الثلث، وان لم يصيبوا غنيمة تم لهم اجرهم۔

"যে সেনাবাহিনী আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে এবং গণিমতের মাল পাবে সে যেন আখেরাতের সওয়াবের দুই তৃতিয়াংশ ইহকালেই পেয়ে গেল এবং তার জন্য শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ বাকী রইল। আর যে গণিমত পেল না সে আখেরাতের পুরো সওয়াব পাবে।"৬১

এই মহান শিক্ষা মুসলমানদের মন মানসে গণিমতের মালের আকাঙ্খার চেয়ে আখেরাতের সওয়াবের আশা তীব্রতর করে দিয়েছে। ফলে যে আরবরা একদিন গণিমতের মাল দেখে দিশাহারা হয়ে যেত, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তারা এমন নিস্বার্থ ও মোহমুক্ত হয়ে গেল যে, গণিমতের মাল তাদের সামনে রাখা হলেও তারা নিতে অস্বীকার করে দিত। হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনে যখন তবুক যুদ্ধের জন্য ডাক দেয়া হলো তখন ওয়াছিলা বিন আসকা অন্যান্য লোককে বললেন, আমাকে যদি কেউ যুদ্ধে নিয়ে যায় তবে তাকে আমি গণিমতের মালের অর্ধেক দিয়ে দেব। আনসারদের মধ্য থেকে একজন এ শর্ত মেনে নিল এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যে সব জিনিস গণিমত হিসাবে সংগ্রহ করে তা থেকে ওয়াসিলা খুবই উত্তম মানের কয়েকটি তরুণ উট পান। এ গুলো নিয়ে তিনি সেই আনসারীর নিকট চলে গেলেন এবং বললেন, আমি আপনাকে যে গণিমতের মালের অর্ধেক দিতে চেয়েছিলাম এই যে সেই গণিমত। কিন্তু আনসারী তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, গণিমত লাভ আমার উদ্দেশ্য ছিল না, আমি চাই আখেরাতের পূণ্য।"৬২

একবার জনৈক বেদুঈন হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জেহাদে যোগদান করলো। যুদ্ধ চলাকালে কিছু গণিমতের মাল হযরতের হস্তগত হলো এবং তিনি অন্যান্য মুজাহিদের ন্যায় উক্ত বেদুঈনের জন্য একটা অংশ নির্দিষ্ট করলেন। বেদুঈন যখন ব্যাপারটা জানতে পারলো তখন রসুলুল্লাহর দরবারে এসে বললো, আমি এই সম্পদ লাভের জন্য আপনার পদানুসরণ করছিনা। আমি চাই এখানে (গলার দিকে ইংগিত করে) একটা তীর খাই এবং শহীদ হই।"৬৩

(২) গণিমতলব্ধ সম্পদে পংগু, মিছকিন ও দরিদ্র লোকদের লালন পালন এবং সাধারণ জাতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য এক পঞ্চমাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ

وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ (انفال ۔ ۴۱)

"জেনে রাখ, তোমরা গণিমতলব্ধ সম্পদ যেটুকুই পাওনা কেন, তার এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহ, তার রসুল এবং আত্মীয়–স্বজন, এতিম মিসকিন ও মুসাফিরের প্রাপ্য।" (সূরা আনফাল–৫)

এ ভাবে গণিমতের মালের একটা উল্লেখ যোগ্য অংশ বিভিন্ন পুণ্যকর্মের জন্য বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে এবং সৈনিকদের বরাদ্দ খুবই কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

(৩) প্রাগৈসলামিক যুগে কোন সেনাবাহিনী শত্রু পক্ষের দেশ থেকে যাই এবং যে ভাবে লুণ্ঠন করুক তাকেই বলা হতো গণিমত। কিন্তু ইসলাম শুধুমাত্র রনাঙ্গনে শত্রু পক্ষীয় সৈন্যদের পক্ষ থেকে বিজয়ী পক্ষের হস্তগত করা সম্পদকে গণিমতের মাল বলেছে। এ দ্বারা একদিকে শান্তি প্রিয় নিরীহ বেসামরিক জনবসতি সমূহ থেকে সাধারণ লুঠতরাজের মাধ্যমে যা হস্তগত হবে, তা গণিমত হবে না। অপরদিকে বিনা যুদ্ধে সন্ধি অথবা যুদ্ধ নয় চুক্তি দ্বারা যে সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় অথবা রনাঙ্গনের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে সম্পদ মুসলমানদের করায়ত্ব হয় তাও গণিমত নয়। অনুরূপভাবে সামরিক অভিযানের ফলে যে সম্পদ শত্রু পক্ষীয় দেশের মালিকানা থেকে বহির্গত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মালিকানার আওতায় আসে, তাও গনিমত নয়। ইসলাম এই দ্বিতীয় প্রকারের সম্পত্তিকে সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্রের মালিকানা বলে ঘোষণা করেছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ

خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰی مَنْ يَّشَآءُ

وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ

الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ط (الحشر: ٦-٧)

"বিনা যুদ্ধে অর্জিত যে সম্পদ আল্লাহ স্বীয় রসুলকে দিয়েছেন সেটা তোমাদের উট বা ঘোড়া দাবড়িয়ে অর্জন করতে হয়নি। আল্লাহ তার রসুলকে যার উপর ইচ্ছা পরাক্রান্ত করে দেন। তিনি সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং যে সম্পদ আল্লাহ তদীয় রসুলকে বিনা যুদ্ধেই দিয়েছেন। সেটা আল্লাহ, তার রসুল, আত্মীয়,এতিম, মিছকিন ও মুসাফেরদের প্রাপ্য। যেন সম্পদ কেবল তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের মধ্যে আবর্তিত হতে না থাকে।" –(সূরা আল হাশর–১)

এ আয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছে যে, সেনাবাহিনী রনাঙ্গনে ঘোড়া বা উট দাবড়িয়ে অর্থাৎ যথারীতি যুদ্ধ করে যে সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে, কেবলমাত্র সেটাই গণিমতের মাল। আর যে সম্পদ ঘোড়া বা উট দাবড়ানো অর্থাৎ যথারীতি যুদ্ধ চালানোর প্রত্যক্ষ ফল নয়, সেটা ইসলামী রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত সম্পদ এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কাজে ব্যয়িত হবে।

এ বিধানকে প্রথম দিকে শুধুমাত্র রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তি সত্তার জন্য নির্দিষ্ট মনে করা হয়েছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন তলিয়ে চিন্তা করলেন তখন দেখতে পেলেন যে, (ফায়, বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ) এর ছয়জন হকদার উল্লেখ করা হয়েছেঃ আল্লাহ, রসুল,আত্মীয়–স্বজন, এতিম, মিছকিন ও পথিক। এদের মধ্যে শুধু রসুল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। আল্লাহ তো চিরঞ্জীব আছেনই। আত্মীয়–স্বজন,এতিম, মিছকিন ও পথিক কেয়ামত পর্যন্ত বর্তমান। সুতরাং একা রসুল বিদায় নিয়েছেন বলে বাদবাকী পাঁচ জন হকদার তাদের প্রাপ্য থেকে কি কারণে বঞ্চিত থাকবেন? তা ছাড়া স্বয়ং রসুলের হক দায়ীত্বও কেবল তা ব্যক্তিত্বের জন্যই নির্দিষ্ট ছিলনা, বরং তিনি নিজ জীবনে যে মহৎ কাজ সম্পন্ন করতেন তার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আর সে কাজতো এখনো যথারীতি বিদ্যমান। সুতরাং ফায় থেকে রসূলের অংশও বাদ যাচ্ছে না। আরো একটা কথা এই যে, ফায়কে ছয়জন হকদারের প্রাপ্য রূপে গণ্য করার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছিল তা ছিল এই যে, এই সম্পদ যেন কেবল বিত্তশালীদের মধ্যেই

ঘোরাফিরা করে তেলা মাথায় তেল দেবার কাজ সমাধা না করে বরং দেশের সর্বস্তরের মানুষ যেন এ দ্বারা উপকৃত হয়। এ উদ্দেশ্যের কার্যকারিতা রসুলের জীবদ্দশাতে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। যতদিন দুনিয়া থাকবে ততদিনই এটা থাকবে। এ কারণেই এরূপ আইন তৈরী করা হলো যে, "ফায়' এর মাল আল্লাহ ও রসুলের কাজে ও মুসলিম জাতির সর্বস্তরের মানুষের সেবার কাজে নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে।[৬৪]

এ আইনের আলোকেই হযরত ওমর (রাঃ) বিজিত দেশ সমূহকে সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করার দাবী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সৈন্যদের শুধু যুদ্ধের সময় শত্রুদের নিকট থেকে গণিমত আকারে অর্জিত সম্পদের ভাগ নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে সা'দ ইবনে আবি অক্কাসকে লেখা হযরত ওমরের চিঠিটা ইসলামী আইনকে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দেয়। ঐতিহাসিক বালাজুরির বর্ণনা অনুসারে চিঠির ভাষা নিম্নরূপঃ

"তোমার চিঠি পেলাম। তুমি লিখেছ যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সম্পদ ও ভুমির আকারে যে গনিমত প্রদান করেছেন, তা ভাগ–বন্টন করে দেয়ার জন্য লোকেরা দাবী জানাবেন। তুমি আমার এ চিঠি পাওয়ার পর সৈন্যরা উট ও ঘোড়া দাবড়িয়ে যা কিছু সম্পদ ও জীব–জন্তু হস্তগত করেছে তার এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকীটা সব সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দাও। অধিকৃত ভূমি ও খাল–বিল কৃষকদের হাতেই থাকতে দাও। ও সব দিয়ে মুসলমানদের বেতন দেওয়ার কাজ চলবে। নচেত এ সব সম্পত্তও যদি এ যুগের লোকদের মধ্যেই বিলি বন্টন করে দাও তা হলে পরবর্তীদের জন্য কিছুই থাকবে না।" [৬৫]

হযরত আবু উবায়দা যখন সিরিয়া জয় করেন তখনও সৈন্যরা গোটা দেশকে গণিমত ধরে নিয়ে তা ভাগ করে দেয়ার দাবী তুলেছিল। এ কথা তিনি হযরত ওমরকে জানান এবং তার নির্দেশ চেয়ে পাঠান। জবাবে খলিফা এক সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন। উল্লিখিত আয়াতের আলোকেই তিনি নির্দেশ দেনঃ

فاقرما افاء الله عليك فى ايدى اهله واجعل الجزية

عليهم بقدر طاقتهم

"বিনা যুদ্ধে যে সব ভু–সম্পত্তি অধিকার করেছে তা তার মালিকদের কাছেই থাকতে দাও এবং তাদের ওপর সামর্থ অনুসারে কর বসাও।"[৬৬]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সৈন্যরা যুদ্ধ করার সময় যা কিছু হস্তগত হবে, তাই নিজের জন্য রেখে দেবে–ইসলাম এটা বৈধ রাখেনি। এটা গণিমত নয়, চুরি ও খেয়ানত এবং সুস্পষ্টভাবে হারাম। গণিমতের ব্যাপারে ইসলামের বিধি হলো, সৈন্যরা যা কিছু পাবে, যুদ্ধ শেষে প্রধান সেনাপতির সামনে তা হাজির করবে। এমনকি সূচ, সুতা এবং এক টুকরো রশীও কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে না। অতঃপর প্রধান সেনাপতি তা থেকে এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য আলাদা করে রাখবেন।[৬৭] বাদবাকী চার অংশ ইনসাফের সাথে সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করবেন। একমাত্র খাদ্য জাতীয় দ্রব্যাদি এ বিধানের ব্যতিক্রম। এ জাতীয় জিনিস সৈনিকরা প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারে।

এ ভাবে ইসলাম একদিকে গণিমতের লোভ হ্রাস করেছে। কেননা এই লোভই ছিল লুঠতরাজের আসল উৎস। অপর দিকে এমন সব আইন চালূ করেছে, যা গণিমতের পরিধি সীমিত করে দিয়ে শুধুমাত্র যূদ্ধ চলাকালে পরাজিত সৈন্যদের কাছ থেকে পাওয়া সম্পদকেই গণিমত বলে নির্ধারণ করেছে। আবার এই গণিমতের সম্পদ থেকেও এক পঞ্চমাংশ বিভিন্ন সৎকাজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছে।[৬৭] ফলে গণিমতের মাল হুবহু পাশ্চাত্য আইনে বিধৃত Spoils of war বা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ এরই প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত আইন রচয়িতা একে বিজেতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রূপে স্বীকার করে নিয়েছে। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, পাশ্চাত্য আইন যুদ্ধলব্ধ সমস্ত সম্পদকে রাষ্ট্রের সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে। আর ইসলাম শুধুমাত্র এক পঞ্চমাংশ দিয়েছে রাষ্ট্রকে বাকীটা বীর সৈনিকদের দিতে বলেছে। কেননা তারা আপন প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে তা অর্জন করেছে।[৬৮]

সন্ধি ও অনাক্রমণ চুক্তি

ইসলামী সমর পদ্ধতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মুসলমানদের সব সময়ই সন্ধির জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ইসলাম যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করে না বরং সংস্কার সংশোধন, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করে। কাজেই সন্ধি, সমঝোতা ও আপোষ দ্বারা যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় তা হলে অস্ত্র ধারণের পূর্বে সেই সুযোগ অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। এই জন্যই ইসলাম যুদ্ধের শেষ সীমা নির্ধারণ করেছে সংঘর্ষের কারণ দূর হওয়া এবং যুদ্ধের প্রয়োজন ফুরিয়ে

যাওয়া পর্যন্ত। حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ এবং حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ এর এটাই মমার্থ। পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ, শত্রু যদি সন্ধির আবেদন জানায় তবে তা খোলা মনে গ্রহণ করতে হবে।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَاِنْ يُّرِيْدُوْۤا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (الانفال: ٦١-٦٢)

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝোঁকে তবে তুমিও সেদিকে ঝোক এবং আল্লাহর ওপর ভরসা কর। কেননা তিনি সব কিছুই জানেন এবং শোনেন। আর যদি শত্রুরা তোমাকে ধোকা দিতে চায় তা হলে তুমি কোনো পরোয়া করো না। আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং মোমেনদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন।" (সূরা আনফাল–৮)

যদি কোন শত্রু অস্ত্র সমর্পণ করে এবং মুখে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে, তা হলে তার ওপর হাত তোলা যাবেনাঃ

فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝ (النساء: ٩٠)

"তারা যদি তোমাদের দিক থেকে হাত টেনে নেয়, যুদ্ধ বন্ধ করে এবং সন্ধির ইচ্ছা ব্যক্ত করে তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের ওপর হাত তোলার কোন অবকাশ রাখেন নি।" (সূরা আন নিসা–১২)

শত্রু পক্ষীয় লোকজনকে যদি বিচ্ছিন্ন ভাবে পাওয়া যায় এবং তারা নিরাপত্তা চায় তা হলে তাদের হত্যা করা বৈধ হবেনা বরং তাদেরকে শান্তির সাথে থাকতে দিতে হবে এবং তারা যখন স্বদেশে ফিরে যেতে চাইবে তখন তাদের নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

"মোশরেকদের কেউ যদি তোমাদের আশ্রয় চায় তা হলে তাকে আশ্রয় দাও। সে আল্লাহর বাণী শুনুক। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ ও মূর্খ।" (সূরা তাওবাঃ ১)

প্রথম দিকে এ আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার। ইমাম ইবনে জারীর ও ইবনে কাছিরের মতও তাই। এর মর্ম এই যে, তাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে আল্লাহর কথা শোনাও। এতে সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে ভালো কথা। আর যদি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট না হয় তবে তাকে হত্যা করোনা বরং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাকে তার বাসস্থানে পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু আয়াতের ভাষার ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য করে ইমামগণ এ আয়াত থেকে একটি আইন তৈরী করেছেন। অমুসলিম দেশ থেকে যারা ব্যবসায়, পর্যটন, উচ্চতর শিক্ষা লাভ কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে আসতে চায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রয়ে থাকতে চায়, তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে আসতে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অনুমতি দিতে হবে।[৬৯] এ জন্য প্রথম শর্ত এই যে, তাদেরকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ঢুকতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে গোয়েন্দা বলে ধরে নেয়া হবে এবং গোয়েন্দার জন্য অন্য সব আইনের মত ইসলামী আইনেও মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। হানাফী ফকীহগণের মতে এ ধরনের আশ্রয় গ্রহণের সর্বোচ্চ মেয়াদ এক বছর পর উক্ত বহিরাগত আশ্রয় গ্রহণকারীকে নোটিশ দিতে হবে যে, হয় ফিরে যাও নচেৎ জাতীয়তা বদল করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে যাও।[৭০] এতদসত্ত্বেও অধিকারের দিক থেকে জিম্মী অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ নাগরিক এবং আশ্রয় গ্রহণকারীর মধ্যে তেমন বেশী পার্থক্য নেই। আশ্রয় গ্রহণকারীর জন্য শরীয়ত অত্যন্ত ব্যাপক সুযোগ সুবিধা নির্ধারণ করেছে। তার কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করা হবে না। সে যত বড় অপরাধ করুক, যে আশ্রয় তাকে দেয়া হয়েছে তা বাতিল হবেনা। সে যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করে কিংবা ডাকাতি, রাহাজানি করে অথবা মুসলিম নারীর শ্লীলতা হানি করে, তা হলেও তাকে সাধারণ মুসলমানদের মতই শাস্তি দেয়া হবে। এমনকি সে যদি গোপনে গোপনে ইসলামী রাষ্ট্রের খবরাবরও শত্রুর কাছে পৌঁছায় তথাপি চুক্তি টুটবেনা। কেবল অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে।[৭১] এ সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি তার প্রতি শুধু এটুকু কঠোরতা প্রয়োগ করা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম বা অমুসলিম নাগরিক যদি তাকে হত্যা করে তবে হত্যাকারীকে কেসাসের শাস্তি (খুনের বদলে খুন)

দেয়া হবে না। তাকে কেবল দিয়াত (রক্তপণ) দিতে হবে। অবশ্য এর কারণ শুধু এই যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক নয়। অ–নাগরিকের নাগরিকের সমান অধিকার কোন সরকারই দেয়না। বিশেষতঃ সেই অ–নাগরিক যদি এমন কোন দেশের অধিবাসী হয় যার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন চুক্তিও নেই, নিয়মিত রাজনৈতিক সম্পর্কও নেই।

বিজিত জাতি সমূহের সাথে আচরণ

যুদ্ধের সমস্যাবলী নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ হলো। এখন যুদ্ধের আনুসঙ্গিক বিষয়গুলোর উপরও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। শত্রুর মধ্যে যখন প্রতিরোধ বা প্রতিশোধের শক্তি থাকে তখন তার সাথে সদাচরণ করা অনেকটা 'ঢিলাটির বদলে পাটকেলটি' খাওয়ার আশংকার দরুন হতে পারে। কিন্তু যখন তার প্রতিরোধ শক্তি একেবারেই শেষ হয়ে যায় এবং সে নিরূপায় হয়ে নিজেকে বিজেতার কৃপা ও করুণার ওপর ছেড়ে দেয়, তখন তার সাথে উদার ও সহৃদয় আচরণ, পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ পূণ্য কর্ম, তাতে সন্দেহ নেই। এ দ্বারা বিজেতার নিয়ত বা উদ্দেশ্যের সততা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুত বিজিতের সাথে বিজেতার আচরণ কেমন হবে তা প্রকৃত পক্ষে নির্ভর করে বিজেতার উদ্দেশ্যের ওপর। কি উদ্দেশ্যে সে দেশ জয় করেছে তার ওপর। সে যদি ধন–সম্পদ লাভের জন্য দেশ জয় করে থাকে, তা হলে তার শাসন নীতিতে বল প্রয়োগ মূলক শোষণ প্রাধান্য পাবে। যদি ধর্মীয় শত্রুতার ভিত্তিতে করে থাকে তা হলে সরকারের নীতিতে ধর্মীয় গোড়ামী ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি মুখ্য হয়ে উঠবে। তার দেশ জয়ের পিছনে যদি নিছক সম্প্রসারণবাদী মনোভাব, রাজ্য ক্ষুধা ও স্বৈরাচার প্রীতি কার্যকর থেকে থাকে তা হলে সরকারের গোটা কর্মকান্ড জুলুম, অহংকার ও আধিপত্যবাদ ভিত্তিক হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে যদি বিজেতার উদ্দেশ্য সত্যিকার সংস্কার ও সংশোধন ছাড়া অন্য কিছু না হয় তা হলে সে বিজিত জাতির সম্পদও লুণ্ঠন করবে না, ধর্মীয় অত্যাচার, উৎপীড়নও চালাবে না, জুলুম শোষণও চালাবে না, প্রজাদের অবমাননা ও লাঞ্ছনার শিকার করে তাদেরকে গোলাম বানাতেও প্রবৃত্ত হবে না। তার সরকার হবে ন্যায়নীতি, উদার নীতি, সাম্য ও বদান্যতা মূলক। তার রাজনীতির প্রধান আদর্শ হবে, বিজিত জাতিকে বিশৃংখলা, অরাজকতা, হঠকারীতা ও অহংকার থেকে মুক্ত রাখা এবং তাদেরকে পূর্ণ

নিরাপত্তা সহকারে নৈতিক, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ দান। এবার এ মানদন্ডের নিরীখে আমরা দেখবো ইসলাম তার বিজিত জাতিগুলোর সাথে কেমন আচরণ করে, তার আইন বিজিতদেরকে কিরূপ মর্যাদা প্রদান করে, তার শরিয়ত তাদেরকে কি কি অধিকার দেয় এবং সর্বোপরি তার সরকার তাদের সাথে একটি সংস্কারক সরকারের উপযুক্ত আচরণ করে না নৈরাজ্যবাদী সরকারের উপযোগী আচরণ করে।

বিজিতদের দুই শ্রেণী

ইসলামী আইন সকল বিজিতকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে; প্রথমত যারা আপোষে আনুগত্য প্রকাশ করে, দ্বিতীয়ত যারা যুদ্ধ করে পরাজিত হয়। এই উভয় শ্রেণীর বিজিতদের আইনগত মর্যাদা ও অধিকারে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। এ জন্য আমরা উভয়ের বর্ণনা আলাদা আলাদাভাবে দেবো।

চুক্তিবদ্ধ

যুদ্ধের পূর্বে কিংবা যুদ্ধ চলাকালে যারা আনুগত্য গ্রহণে সম্মত হয়ে যায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ শর্তাবলী স্থির করে নেয়, তাদের সাথে উক্ত চুক্তির শর্তানুসারেই যাবতীয় কাজ সমাধা করতে হবে। এটাই ইসলামী আইনের বিধি। আজকালকার সভ্য জাতিগুলো কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজই করে। শত্রুকে আনুগত্য মেনে নিতে সম্মত করার জন্য প্রথমে কতিপয় শর্ত স্থির করা এবং পরে যখন তারা পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণে এসে যায় তখন তার সাথে ভিন্নতর আচরণ করা তাদের রাজনৈতিক আদত – অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলাম একে অবৈধ, হারাম এবং মহাপাপ বলে গণ্য করে। ইসলামের মতে, কোন পক্ষের সাথে কোন চুক্তি হলে তার শর্তাবলী ভালো লাগুক বা না লাগুক, এক চুল পরিমাণও তা লংঘন করা যাবে না। চাই তাতে দু'পক্ষের তুলনামুলক মর্যাদায় এবং শক্তির ভারসাম্যে যত পার্থক্যই হোক না কেন। হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم

باموالهم دون انفسهم وابناءهم (وفى حديث فيصالحونكم على

صلح) فلا تصيبوا منهم فوق ذالك فانه لا يصلح لكم

"যদি তোমাদের কোন জাতির সাথে যুদ্ধ হয় এবং তোমরা জয়লাভ কর আর সেই জাতি নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান–সন্ততির জান বাচানোর জন্য তোমাদেরকে কর দিতে রাজী হয় (অন্য হাদিসে আছে, তোমাদের সাথে একটা সন্ধিপত্র সই করে) তা হলে তোমরা তাদের কাছ থকে নির্ধারিত করের চাইতে একটি কনাও বেশী নিও না। কেননা সেটা তোমাদের জন্যে বৈধ হবে না।"[৭২]

অপর এক হাদিসে আছে, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

الا من ظلم معاهدًا او انتقصه او كلّفهٗ فوق طاقته

او اخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة۔

"সাবধান! কেউ যদি চুক্তি বদ্ধ প্রজার ওপর জুলুম করে, কিংবা তার অধিকার কম দেয়, কিংবা তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা তার ওপর চাপায় কিংবা তার কাছ থেকে কোন জিনিস তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রহণ করে, তার বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন আমি নিজেই বাদী হব।"[৭৩]

এই দুটো হাদিসেরই শব্দে ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতার ভাব লক্ষ্যণীয়। এ থেকে এই সাধারণ বিধি পাওয়া যায় যে, চুক্তিবদ্ধ জিম্মি প্রজাদের সাথে সন্ধিপত্রে যে শর্তাবলী স্থির হবে, তাতে কোন রকমের হ্রাসবৃদ্ধি বা রদবদল করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। তাদের ওপর কর–খাজনাও বাড়ানো যাবে না, তাদের জমি–জায়গাও দখল করা যাবে না, তাদের দালান–কোঠাও বাজেয়াপ্ত করা চলবে না, তাদের ওপর কঠোর ফৌজদারী আইনও প্রয়োগ করা চলবে না, তাদের ধর্মেও হস্তক্ষেপ করা চলবে না, তাদের মান–সম্মানের ওপরও আক্রমণ চালানো যাবে না, আর এমন কোন কাজ করা যাবে না যা জুলুম, মানহানি, ক্ষমতা বহির্ভুত দায়িত্বের বোঝা চাপানো অথবা বিনা অনুমতিতে তার কোন জিনিস নেয়ার পর্যায়ে পড়ে। এই সুস্পষ্ট নীতি থাকার কারণেই ইসলামের ফেকাহবিদগণ আপোষে বিজিত জাতিসমূহের জন্য কোন আইন রচনা করেন নি। কেবল একটা মূলনীতি নির্ধারণ করেই ছেড়ে দিয়েছেন যে, তাদের সাথে আমাদের যাবতীয় কাজ সমাধা সন্ধির শর্ত অনুসারে। ইমাম আবূ ইউসুফ লিখেছেনঃ

يوخذ منهم ما صولحوا عليه ويوفى لهم ولا يزاد عليهم.

"সন্ধিতে তাদের কাছ থেকে যা নেয়ার শর্ত স্থির হয়েছে, তাই নেয়া হবে। তাদের জন্য সন্ধির শর্তাবলী পূর্ণ করতে হবে, তাদের ওপর কোন দায় দায়িত্ব বাড়ানো চলবে না।" (কিতাবুল খারাজ)[৭৪]

সন্ধিপত্রের জন্য যে নিয়মকানুন নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, সে তো জানা কথাই। সময় ও সুযোগ বুঝে যে রকম শর্ত স্থির করা সংগত মনে হবে, তাই করতে হবে। তা সত্ত্বেও হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্ন জাতির সাথে যেসব সন্ধিপত্র সই করেছিলেন তা থেকে আমরা অন্ততপক্ষে শত্রুপক্ষের সাথে মুসলমানদের সন্ধির অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতিগুলো জানতে পারি। এই মূলনীতিগুলো তুলে ধরার জন্য আমি এখানে কয়েকটি ঐতিহাসিক সন্ধিপত্র উদ্ধৃত করছিঃ

নাজরানবাসী সন্ধির আবেদন করলে হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে যে সন্ধিপত্র লিখে দেন, তাতে খাজনার পরিমাণ নির্ধারণের পর লিখে দেনঃ

ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله

على انفسهم وملتهم، وارضهم واموالهم وغائبهم وشاهدهم

وعيرهم وبعثهم وامثلتهم لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير حق

من حقوقهم وامثلتهم لا يفتن اسقف من اسقفيته و

لا راهب من رهبانيته ولا واقه من وقاهيته على ما تحت

ايديهم من قليل اوكثير وليس عليهم رهق ولا دم جاهلية

ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطاء ارضهم جيش، من سأل

منهم حقا بينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران

ومن اكل منهم الربا من ذى قبل فذمتى منه بريئة و

لا يوخذ منهم رجل بظلم آخر ولهم على ما فى هذه الصحيفة

جوار الله وذمة محمد النبى ابدا حتى ياتى امر الله، ما نصحوا

واصلحوا فيما عليهم.

"নাজরানের খৃষ্টান ও তাদের প্রতিবেশী[৭৫] (ইয়ুদী ও অন্যান্য সকলের জন্য) আল্লাহর আশ্রয় এবং আল্লাহর নবী ও রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রক্ষাকবজ ঘোষিত হল, এ রক্ষাকবজ তাদের প্রাণ সমূহের জন্য, তাদের ধর্ম, তাদের জমি, তাদের ধন সম্পদ, তাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত লোকদের তাদের উট সমূহ, তাদের দূত গণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানিদি ও নির্দশনাদি[৭৬] (ক্রুশ ও গীর্জায় রক্ষিত ছবি ইত্যাদি) সবকিছুর জন্য। তারা এখন পর্যন্ত যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই থাকবে। তাদের কোন অধিকার কোন নির্দশন বদলানো হবে না। তাদের কোন যাজককে যাজকত্ব থেকে, কোন সন্ন্যাসীকে তার সন্ন্যাস থেকে এবং গির্জার কোন সেবককে তার সেবকত্ব থেকে কিছুতে সরানো হবে না[৭৭] তাদের ওপর জাহিলী যুগের কোন খুনের দায়–দায়িত্ব রইল না। তাদের সমারিক চাকরি করতে কিংবা দেশ রক্ষা চাঁদা দিতে বাধ্য করা হবে না এবং কোন বহিরাগত সৈন্যদেরকে তাদের ভূমিতে ঢুকতে দেয়া হবে না।[৭৮] যদি কোন ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে কোন দাবী উথাপন করে তবে উভয়পক্ষের মধ্যে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে তার মীমাংসা করা হবে। নাজরানবাসীকে জালেমও হতে দেয়া হবে না মজলূমও না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে সুদ খেয়েছে তার দায় দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।[৭৯] (অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে সুদের ভিত্তিতে টাকা দিয়েছে, চুক্তির পর সে যদি খাতকের কাছ থেকে সুদ আদায় করার জন্য দাবী তোলে তা হলে আমরা তা আদায়ের ব্যবস্থা করতে বাধ্য নই) এদের কাউকে অন্য কারো অপরাধের জন্য পাকড়ানো হবে না, এই সন্ধিপত্রে যা কিছু আছে তার জন্য আল্লাহর জামানত ও আল্লাহর নবী মূহাম্মদের রক্ষা কবচ ঘোষণা করা হয়েছে। এ রক্ষা কবচ চিরদিনের জন্য। যতদিন আল্লাহর ফয়সালা না আসে ততদিনের জন্য। যতদিন তারা হীতাকাংক্ষী থাকে এবং এই চুক্তি অনুসারে তাদের নিকট যা কিছু অধিকার প্রাপ্য হয় তা যতদিন তারা দিতে থাকবে ততদিনের জন্য।"

হযরত আবুবকরের (রাঃ) আমলে খালেদ ইবনে ওলিদ হীরাবাসীকে যে সন্ধিপত্র লিখে দেয় তাতে তিনি সকল অধিবাসীর ওপর সর্বমোট ৬০ হাজার দিরহাম অর্থাৎ দরিদ্র অভাবী লোকদের বাদে অবশিষ্ট সমগ্র জনপদের ওপর

মাথা প্রতি দশ দিরহাম (আড়াই টাকা) করে বার্ষিক খাজনা নির্ধারণ করেন এবং তার বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দেনঃ

لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصر من قصورهم
التي كانوا يتحصنون فيها اذا نزل بهم عدوٌ لهم، ولا يمنعوا
من ضرب النواقيس ولا من اخراج الصلبان في يوم عيدهم[١]

"তাদের কোন উপাসনালয় গীর্জা ভাঙ্গা হবে না, শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে সব দুর্গে তারা লুকাতো কোন দুর্গও ভাঙ্গা হবেনা, তাদেরকে বাঁশী বাজাতেও নিষেধ করা হবেনা, তাদের উৎসবের দিন ক্রুশ বের করতেও বারণ করা হবেনা।"[৮০]

হযরত ওমর (রাঃ) বায়তুল মাকদাসবাসীকে যে সন্ধিপত্র লিখে দেন তাতে ছিলঃ

اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم ولكنائسهم و
صلبانهم وسقيمها وبريها وسائر ملتها انه لا يسكن
كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من
صليبهم ولا من شيئٍ من اموالهم، ولا يكرهون على
دينهم ولا يضار احد منهم[٢]

"তাদেরকে রক্ষা কবচ দিলাম তাদের জান–মাল, গীর্জা, ক্রুশ এবং তাদের রুগ্ন ও সুস্থদের জন্য। এলিয়ার সমস্ত অধিবাসীর জন্যই এ রক্ষা কবচ। প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে যে, তাদের গীর্জাকে মুসলমানদের আবাসে পরিণত করা হবে না। তা ধ্বংসও করা হবে না, তার প্রাচীর ও ভবনগুলোকেও ছোট করা হবে না, তাদের ক্রুশ ও তাদের ধন–সম্পত্তির কিছুমাত্র ক্ষতি সাধন করা হবে না। ধর্মের ব্যাপারে তাদের ওপর কোন বাড়াবাড়ি করা হবে না। তাদের কারো কোন অনিষ্ট করা হবে না।" বলা প্রয়োজন যে, এ সন্ধিপত্র যখন সই করা হয়, তখন জেরুজালেমবাসীর প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছিল।[৮১]

দামেস্কবাসীকে হযরত ওমর নিম্মরূপ সন্ধিপত্র লিখে দেন ঃ

اعطاهم امانا على انفسهم واموالهم وكنائسهم

وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيئ من دورهم لهم

بذالك عهد الله وذمة رسوله ...... لا يعرض لهم الا

بخير اذا اعطوا الجزية-

"তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো তাদের জান মালের জন্য, তাদের গীর্জাসমূহ ও নগরীর প্রাচীরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তাদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গা হবে না, ও মুসলমানদের বসতি করা হবে না। এ ব্যাপারে তাদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও তার রসূলের রক্ষা কবচ দেয়া হলো। তাদের সাথে সদাচরণ ছাড়া অন্য কিছু করা হবে না– যাবত তারা জিজিয়া দেয়া অব্যাহত রাখবে।"[৮২] উল্লেখযোগ্য যে, এ চুক্তি যখন সই হয় তখন অধিক শহর যুদ্ধ করে জয় করা হয়ে গেছে।

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ 'আনাত' বাসীকে নিম্নরূপ সন্ধিপত্র লিখে দেনঃ

لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى ان يضربوا نواقيسهم

في اى ساعة شاؤا من ليل او نهار الا في اوقات الصلوة وعلى

ان يخرجوا الصلبان في ايام عيدهم-

''তাদের কোন উপাসনালয় বা গীর্জা বিধ্বস্ত করা হবেনা। তারা নামাজের সময় বাদে রাতে দিনে যখন খুশী বাঁশী বাজাতে পারবে। উৎসবের দিনে তারা ক্রুশ মিছিলও বের করতে পারবে।"

বা'লা বাক্কের অধিবাসীদেরকে হযরত আবু উবায়দা যে সন্ধিপত্র লিখে দেন তা নিম্নরূপ ঃ

هذا كتاب امان لفلان ابن فلان واهل بعلبك،

رومها وفرسها وعربها على انفسهم واموالهم وكنائسهم و

دورهم داخل المدينة وخارجها وعلى ارحائهم ...... ممن

اسلم فله ما لنا وعليه ما علينا و لتجارهم ان يسافروا الى حيث ارادوا

من البلاد التى صالحنا عليها وعلى من اقام منهم الجزية والخراج،

"অমুকের ছেলে অমুক[৮৩] (বার্লাবাক্কের শাসক) এবং বার্লাবাক্কাবাসী আরব, ইরানী ও রোমক সকলের জন্য এটা নিরাপত্তার ঘোষণাপত্র। নিরাপত্তা তাদের জান, মাল গীর্জা ও ভবনসমূহের জন্য –চাই তা শহরের ভেতরে থাক কি বাইরে। তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হবে দায়িত্ব ও অধিকারে তারা আমাদের সমান হবে। এদের ব্যবসায়ীরা আমাদের সাথে যেসব দেশ চুক্তিবদ্ধ সেখানে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। যারা আপন ধর্মে বহাল থাকবে তাদের জিজিয়া ও খাজনা দিতে হবে।"

ওবিলের সন্ধিপত্র জাবির ইবনে মুসলিমা (রাঃ) লিখেনঃ

هٰذا كتاب من حبيب مسلمة لنصارىٰ اهل وبيل و

مجوسها ويهودها شاهدهم وغائبهم انى امنتكم على انفسكم

واموالكم وكنائسكم وبيعكم وسور مدينتكم فانتم امنون

وعلينا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم واديتم الجزية والخراج۔

'জাবির ইবনে মুসলিমার পক্ষ থেকে ওবিলবাসীর জন্য এই ঘোষণাপত্র জারী হলো। ওবিলবাসী খৃষ্টান, অগ্নি উপাসক, ইহুদী, উপস্থিত ও অনুপস্থিত–সকলের জন্য আমি নিরাপত্তা ঘোষণা করি, তোমাদের জান–মাল, গীর্জা উপাসনালয় এবং নগরীর প্রাচীরের জন্য। যতক্ষণ তোমরা ওয়াদা পালন করবে এবং জিজিয়া ও খাজনা দেয়া অব্যাহত রাখবে, ততক্ষণ আমাদেরও কর্তব্য প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।"

আজরবাইজানের সন্ধিপত্রে হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান লিখেছিলেনঃ الامان على انفسهم واموالهم ومللهم وشرائعهم۔

"তাদের জান, মাল ও ধর্ম মতের জন্য নিরাপত্তা দেয়া হলো।"

জুরজানের সন্ধিপত্রে একই হোজাইফা লেখেনঃ

لهم الامان على انفسهم واموالهم ومللهم وشرائعهم

ولا يغير بشئ من ذالك ۔

"তাদের জান, মাল ও ধর্ম মতের জন্য নিরাপত্তা দেয়া হলো এবং এর কোনটাতেই কোন রদবদল হবে না।"

মাহে দীনারের সন্ধিপত্রে তিনি লেখেনঃ

لا يغيرون عن ملة ولا يحال بينهم وبين شرائعهم

"তাদেরকে ধর্ম পাল্টাতে বাধ্য করা হবেনা, তাদের ধর্মীয় আইন কানুনেও হস্তক্ষেপ করা হবে না।

এত বিস্তারিতভাবে এইসব সন্ধিপত্র উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য এই যে, পাঠক যেন ইসলামের সন্ধির প্রকৃতি ও ধরণ সম্পর্কে এ কথা সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারেন। একটা দুটা সন্ধিপত্র দেখে এরূপ ধারণা হতে পারত যে, কোন বিশেষ অবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা হয়তো বাধ্য হয়ে এ ধরণের শর্ত মেনে নিয়ে থাকবেন। কিন্তু এখানে আরব, সিরিয়া, আলজেরিয়া ও ইরান প্রভৃতি দেশের বেশ কয়েকটি দেশের সন্ধিপত্র দেয়া হলো। ইতিহাসে এ ধরনের আরো বহু সন্ধিপত্র পাওয়া যাবে। এর সব কয়টিতেই একই ধরনের উদারতা ও সহৃদয়তার মনোভাব প্রতিফলিত। আমরা বিশেষভাবে শুধু রসূলে করীম (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের সেইসব সন্ধিপত্র উদ্ধৃত করেছি যা পূর্ণ বিজয়ের পর সাক্ষরিত হয়েছে। নাজরানের সন্ধিপত্র যখন সাক্ষরিত হয় তখন সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। নাজরানবাসী ঘাবড়ে গিয়ে তাদের সরদারকে সন্ধির জন্য পাঠিয়েছিল। হীরার চুক্তি যখন হয় তখন তাদের আশ পাশের গোটা এলাকা খালেদ ইবনে ওলীদ কর্তৃক বিজিত হয়েছে। হীরাবাসী আপন মঙ্গলের স্বার্থেই আনুগত্য প্রকাশে উদ্যোগী হয়। দামেস্ক ও বাইতুল মাকদাসের বিজয় যে প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছিল, সেতো জানা কথাই। মুসলমানরা ইচ্ছা করলে সহজেই তরবারীর জোরে বিজয় সম্পূর্ণ করতে পারতেন। বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচার করতে চায় অথবা ভিন্ন ধর্মের নামনিশানা মুছে ফেলার জন্য অথবা লুঠতরাজ ও দেশ জয়ের জন্য তরবারী উত্তোলন করে–এমন কোন জাতি এহেন পরিস্থিতিতে এরূপ সব শর্তের অধীন সন্ধি করতে পারেনা।

অচুক্তিবদ্ধ

বিজিতদের দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে, যারা মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ চালিয়েছে এবং মুসলিম বাহিনী যখন তাদের সমস্ত অবরোধ চূর্ন করে বিজয়ীর

বেশে শহরে ঢুকেছে কেবল তখনই অস্ত্র সমর্পণ করেছেন। এ ধরণের বিজিতদের সম্পর্কে ইসলাম বিজয়ীদের এ অধিকার স্বীকার করেছে যে, তারা ইচ্ছা করলে সমস্ত অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষদের হত্যা করতে পারে, তাদের নারী ও শিশুদের গোলাম বানিয়ে নিতে পারে এবং তাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি করায়ত্ব করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, তাদেরকে জিম্মিতে পরিণত করাই উত্তম এবং যুদ্ধের আগে যেমন ছিল তেমন অবস্থায় রাখাই শ্রেয়। পাঠক জানেন, সে যুগে সাধারণ রীতি ছিল–বিজিতদের গোলামে পরিণত করা, তাদের ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং নগর সমুহ পদানত হওয়ার পর গণহত্যা চালিয়ে তাদের সামরিক শক্তি একেবারে চূর্ণ করে দেয়া। সমসাময়িক সেই সাধারণ মানসিকতাকে রাতারাতি পাল্টে ফেলা ইসলামের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। যুগের ধারার সাথে যুদ্ধ করা ইসলামের সংস্কার পদ্ধতির পরিপন্থী ছিল। এ জন্য একদিকে সে প্রচলিত রসম রেওয়াজ দ্বারা প্রভাবিত মস্তিস্ক গুলোকে শান্তিতে রাখার জন্য প্রাচীন রীতি ও প্রথাকে শাব্দিক দিক দিয়ে বহাল রেখেছে। অপর দিকে হজরত রসুলুল্লাহ ও সাহাবাগণ সদুপদেশ ও বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে একটা সহৃদয়তা ও উদারতার জন্ম দিয়েছিলেন যে, তারা নিজেরাই উক্ত অনুমতি দ্বারা লাভবান হওয়া পছন্দ করতেন না। ফলে পর্যায়ক্রমে এমন এক বিকল্প রসম রেওয়াজ জন্মলাভ করলো যা পূর্বতন রসম রেওয়াজকে কার্যতঃ বাতিল ও রহিত করে দিল। শুধু নবুয়ত ও খেলাফতের যুগ নয় গোটা ইসলামী শাসনামলের ইতিহাস সাক্ষী যে, মুসলমানরা হাজার হাজার দেশ ও শহর শক্তি প্রয়োগে জয় করেছে। কিন্তু কোন একটিতেও গণতহ্যা চালায়নি, অধিবাসীদেরকে গোলামেও পরিণত করেনি। তাদের সহায় সম্পদও বাজেয়াপ্ত করেনি।[৮৪] (বনু কোরাইজার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছিল এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে) হজরতরে জীবদ্দশায় খায়বর বল প্রয়োগে বিজিত হয়েছিল। হযরত (সঃ) খায়বর বাসীকে জিম্মী হিসেবে গ্রহণ করেন। মক্কাও শক্তির জোরে বিজিত হয়। কিন্তু জমি সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করা হয়নি। অধিবাসীদেরকেও গোলামে পরিণত করা হয়নি। হোনাইন যুদ্ধে হাওয়াজেন গোত্র পরাজিত হলো এবং হজরতের নির্দেশে তাদেরকে ক্ষমা করা হলো। হজরত ওমরের সময় যখন ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হয় তখন প্রথম বারের মত মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বিজয়ের ফল স্বরূপ জমির বন্টন করা ও অধিবাসীদের গোলামে পরিণত করার দাবী

ওঠে। তারা হযরত ওমরকে বলেনঃ "আমরা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে জমি অধিকার করেছি। কাজেই আপনি আমাদের মধ্যে জমি বন্টন করে দিন এবং অধিবাসীদেরকে গোলামে পরিণত করুন।"[৮৫] কিন্তু হজরত ওমর অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তাদের মনোভাব পাল্টে দিলেন। তাদের প্রাচীন মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটালেন। এ প্রশ্নে সাহাবাদের কাউন্সিল অধিবেশনে যে বিতর্ক হয়, ইমাম আবু ইউসুফ তা পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছেন। সেটা পড়ে দেখলেই বুঝা যায় যে, চরিত্র সংশোধনের ঐ কাজ কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে। হজরত বিলাল (রাঃ) এবং হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ দাবী করছিলেন যে, জমি সৈন্যদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হোক এবং অধিবাসীদেরকে গোলাম বাদীতে পরিণত করা হোক। কিন্তু হজরত ওসমান হজরত আলী, হজরত তালহা, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এবং আনছারদের সমস্ত বড় বড় সাহাবী এর বিরোধী ছিলেন। তাদের সকলেরই মত ছিল, দেশকে ভাগবাটোয়ারা করা এবং অধিবাসীদেরকে গোলাম–বাদী বানানো কোন মতেই সংগত হবে না। হজরত ওমর নিজেই এর কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেনঃ

"আমার মত এই যে, জমি তার অসুমলিম অধিবাসীদের হাতেই রেখে দেই। অতঃপর তাদের জমির ওপর খাজনা এবং তাদের ওপর জিজিয়া বসাই। এতে করে এই জমি মুসলিম সৈনিক, তাদের সন্তান সন্ততী ও পরবর্তী বংশধরের জন্য 'ফায়,–(বিনা যুদ্ধে অধিকৃত সম্পদ)–এ পরিণত হবে। এখন আপনারাই বলুন, এই এলাকা গুলোকে ভাগ বন্টন করে দিয়ে লোকদের ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিণত করা কি ঠিক হবে? আমাদের মতে কি সিরিয়া, আলজিরিয়া, কুফা, বসরা ও মিশরের মত বড় বড় প্রদেশকে সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া প্রয়োজন? তা করলে অতঃপর কর্মচারীদের বেতন এবং গরীবদের দৈনিক ভাতা কোথেকে আসবে?"

এই ভাষণের পর সমগ্র কাউন্সিল ঐকমত্য সহকারে হযরত ওমরের প্রস্তাব মঞ্জুর করে নিলেন এবং সমগ্র ইরাকবাসীকে জিম্মীতে পরিণত করা হলো। সিরিয়া বিজয়ের পরও বিতর্ক উঠেছিল এবং হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়ান ছিলেন বন্টনের দাবীর প্রধান উদ্যোক্তা। কিন্তু হযরত ওমর অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে সেটাও ইরাকের মতই মিটিয়ে ফেলেন।[৮৬] এর পর

আর কখনো মুসলমানরা অমন দাবী তোলেনি। ভারত থেকে নিয়ে স্পেন পর্যন্ত ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার অসংখ্য ভূ–খন্ড তারা বল প্রয়োগে জয় করেন অথচ কোথাও বিজয়ের ফল ভোগ করতে চাননি।

এ ধরণের বিজিতদেরকে যখন জিম্মীতে পরিণত করা হয় তখন তাদেরকে কয়েকটি অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। ফেকাহর গ্রন্থাবলীতে সে সব অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। নিম্নে সেই বিধান সমূহের সংক্ষিপ্ত সার দেয়া যাচ্ছে। এ থেকে বুঝা যা, জিম্মীদের এই শ্রেণীটির শাসন তান্ত্রিক মর্যাদাকি।

১। মুসলমানদের প্রধান অধিনায়ক তাদের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে জিম্মী হিসেবে গ্রহণ করার চুক্তি আপনা আপনিই সম্পাদিত হয়ে যাবে। তাদের জান মালের হেফাজত করা মুসলমানদের উপর ফরজ হয়ে যাবে। কেননা জিজিয়া গ্রহণ করার সাথে সাথেই জান মালের নিরাপত্তার অধিকার আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[৮৭] এর পর অধিনায়ক কিংবা সাধারণ মুসলমানগণ তাদের সম্পত্তি দখল করা বা তাদেরকে গোলামে পরিণত করার কোন অধিকার থাকেনা। হযরত ওমর হযরত আবু ওবায়দাকে দ্বার্থহীন ভাষায় লিখেছিলেন,
فاذا اخذت منهم الجزية فلا شيئ لك عليهم ولا سبيل- তুমি যখন তাদের কাছ থেকে জিজিয়া নিয়েছ তখন আর তাদের ওপর তোমার কোন হস্তক্ষেপের অধিকার রইল না।”[৮৮]

২। জিজিয়া গ্রহণ দ্বারা যে নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হলো তার ফলে জিম্মীরাই তাদের জমির মালিক হবে। তার মালিকানা তাদের উত্তরাধিকারীদের প্রতি আবর্তিত হবে। তারা তাদের সম্পত্তিতে স্বাধীনভাবে বেচাকেনা করতে পারবে, দান করতে পারবে, বন্ধক রাখতে পারবে।[৮৯] ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৩। জিজিয়ার পরিমাণ কি হবে, সেটা নির্ধারিত হবে তাদের আর্থিক অবস্থার অনুপাতে। যে ব্যক্তি বিত্তশালী তার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী, যে ব্যক্তি মধ্যবিত্ত তার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম এবং যে গরীব তার কাছ থেকে নেয়া হবে আরো কম। আর যার কোন জীবিকার সংস্থান নেই, যার

জীবন পুরোপুরিভাবে অন্যদের দান ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল, তাদের জিজিয়া মাফ করে দেয়া হবে। জিজিয়ার জন্য কোন বিশেষ পরিমাণ যদিও নির্ধারিত নেই, তথাপি তা নির্ধারণ করার সময় দেখতে হবে পরিমাণটা যেন এমন হয় যা তারা সহজে দিতে পারে। হযরত ওমর (রাঃ) বিত্তশালীদের ওপর মাসিক এক টাকা, মধ্যবিত্তদের ওপর আট আনা এবং দরিদ্র দিন মজুরদের ওপর চার আনা নির্ধারণ করেন।[৯০]

৪। জিজিয়া বসাতে হবে শুধুমাত্র তাদের ওপর যারা যুদ্ধরত বা যুদ্ধক্ষম। অ–যুদ্ধক্ষম ও অযুদ্ধরত লোকজন–যথা শিশু, নারী, উম্মাদ, অন্ধ, পঙ্গু, উপাসনালয় সমূহের সেবক বৃন্দ, খুনখুনে বুড়ো, ভিক্ষুক ও সন্যাসী, এক বছরের ও বেশী সময় ধরে রুগ্ন ও দাসদাসীর ওপর জিজিয়া আরোপিত হবেনা।[৯১]

৫। বল প্রয়োগে বিজিত শহরে উপাসনালয়গুলো দখল করার অধিকার মুসলমানদের আছে। কিন্তু সেই অধিকার কাজে না লাগানো এবং সৌজন্য স্বরূপ তা তাদের দখলে থাকতে দেয়া উত্তম। হযরত ওমরের শাসনামলে যতগুলো দেশ বিজিত হয়েছে তার কোথাও কোন উপাসনালয় ভাঙ্গা হয়নি বা তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) লিখেছেন, "উপাসনালয়গুলো যেমন ছিল তেমনি রাখা হয়েছে। ভাঙ্গাও হয়নি, কোনও রকম হস্তক্ষেপও তাতে করা হয়নি।[৯২]" অবশ্য প্রাচীন উপাসনালয় সমূহ কোন অবস্থাতেই ভাঙ্গা বৈধ নয়।[৯৩]

জিম্মীদের সাধারণ অধিকার

এবারে আমরা জিম্মীদের সাধারণ অধিকার নিয়ে আলোচনা করবো। চুক্তিবদ্ধ ও অচুক্তিবদ্ধ, বিনা যুদ্ধে বিজিত কিংবা যুদ্ধের পর বিজিত সকল জিম্মীর জন্যই এসব অধিকার।

১। জিম্মীর রক্তের মূল্য মুসলমানের রক্তের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং সমান। কোন মুসলমান যদি জিম্মীকে হত্যা করে তবে মুসলমানকে হত্যা করলে যেমন কেসাস বা খুনের বদলে খুনের শাস্তি দেয়া হয়, এ ক্ষেত্রেও তেমনি দেয়া হবে। হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে একজন মুসলমান একজন জিম্মীকে হত্যা করে।

হযরত হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড দানের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, انا احق من وفى بذمته 'নিরাপত্তার চুক্তি কার্যকরী করার সব চেয়ে বেশী দায়িত্ব আমার ওপরই পড়ে।'৯৪ হযরত ওমরের সময় বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি হীরার জনৈক জিম্মীকে হত্যা করে। হযরত ওমর (রাঃ) নির্দেশ দিলেন হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পন করতে। তাকে সমর্পন করা হলো এং উত্তরাধিকারী তাকে হত্যা করলো,৯৫ হযরত ওসমানের আমলে হযরত ওমরের ছেলে উবায়দুল্লাহকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কেননা তিনি হযরত ওমরের হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণের সন্দেহে হরমজান ও আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করেন। হযরত আলীর শাসনামলে জনৈক মুসলমানের বিরূদ্ধে একজন জিম্মীকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়ার পর তিনি তাকে মৃত্যু দন্ডের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বললো; আমি মাফ করে দিলাম। কিন্তু তিনি তাতে আশ্বস্ত না হয়ে বললেন, لعلهم فزعوك او هددوك "ওরা বোধ হয় তোমাকে শাসিয়েছে বা ভয় দেখিয়েছে।" সে জবাব দিল, না, আমি রক্তপণ পেয়েছি। আমি মনে করি একে খুন করলে আমার ভাই ফিরে আসবেনা। তখন তিনি হত্যাকারীকে মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন, من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا "যে ব্যক্তি আমাদের জিম্মী তার রক্ত আমাদের রক্তের সমান, তার রক্তপণ আমাদের রক্তপণের সমান।"৯৬ অণ্য এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন,

انما قبلوا عقد الذمة لتكون اموالهم كاموالنا ودماؤهم كدمنا

"তারা এজন্যই জিম্মী হতে রাজী হয়েছে যে তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মত এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মত নিরাপদ হয়ে যাবে।" এই উক্তির ভিত্তিতেই ফকিহগণ এই বিধি রচনা করেছেন যে, কোন মুসলিম যদি কোন জিম্মীকে ভুলক্রমে হত্যা করে তা হলে একজন মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করলে তার জন্য যে পরিমাণ দিয়াত বা রক্তপণ দিতে হয় জিম্মীর জন্যও সেই পরিমাণ দিয়াত দিতে হবে।৯৭

(২) ফৌজদারী আইনের বেলায় জিম্মি ও মুসলমানের মর্যাদা সমান। অপরাধের যে শাস্তি মুসলমানকে দেওয়া হবে জিম্মিকেও সেই শাস্তি দেওয়া হবে। জিম্মির মাল মুসলমান চুরি করুক, কিংবা মুসলমানের মাল জিম্মি চুরি করুক উভয় অবস্থাতে চোরের হাত কাটা হবে। জিম্মি কোন মুসলিম নারীর

সাথে কিংবা মুসলমান কোন জিম্মি নারীর সাথে ব্যভিচার করুক, উভয় অবস্থাতেই একই রকমের শাস্তি হবে।[৯৮]

(৩) দেওয়ানী আইনের বেলায়ও জিম্মি ও মুসলমানের মধ্যে পূর্ণ সাম্য বিরাজমান। হযরত আলীর উক্তি اموالهم كاموالنا –এর অর্থই এই যে, আমাদের সম্পত্তির যে রকম রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তাদের সম্পত্তিও ঠিক সেই রকম রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে জিম্মীদের অধিকারের দিকে এত বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যে, কোন মুসলমান যদি তাদের মদ নষ্ট করে বা শুকরকে মেরে ফেলে তা হলেও তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দোররে মোখতারে আছেঃ

ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره اذا اتلفه

"মুসলমানরা জিম্মিদের শরাব বা শুকর ধ্বংস করলে তার দাম দিতে বাধ্য থাকবে।"[৯৯]

(৪) মুসলমানকে যেমন প্রহার করা, গালিগালাজ করা, গীবত করা বা অন্য যে কোন ভাবে কষ্ট দেওয়া জায়েজ নয়; তেমনি জিম্মির বেলায়ও এসব বৈধ নয়। দোররে মোখতারে বলা হয়েছেঃ

ويجب كف الاذى عنه وتحرم غيبته كالمسلم

(৫) কাউকে জিম্মী হিসাবে গ্রহণ করার পর মুসলমানরা সে চুক্তি ভাংতে পারবে না, কিন্তু জিম্মিরা যত দিন ইচ্ছা চুক্তি রাখতে পারে, যখন ইচ্ছা ভাংতে পারে। বাদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ[১০০] واما صفة العقد

فهو لازم فى حقنا حتى لا يملك المسلمون نقضه بحال من الاحوال

واما فى حقهم فغير لازم "জিম্মিদের সাথে যে চুক্তি, তা আমাদের বেলায় বাধ্যতামূলক। আমরা মুসলমানরা কোন অবস্থাতেই তা ভাঙতে পারি না। কিন্তু তাদের বেলায় বাধ্যতামূলক নয়।"[১০১]

(৬) জিম্মি যত বড় অপরাধই করুক, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব থেকে সে বঞ্চিত হবে না। এমন কি জিজিয়া বন্ধ করে দিলে, কোন মুসলমানকে হত্যা করলে, হজরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লামের প্রতি আপত্তিকর উক্তি করলে, অথবা কোন মুসলিম নারীর শ্লীলতা হানি করলেও

না। কেবল দুই অবস্থায় তার নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তা চুক্তি বাতিল হবে। এক, সে যদি ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে শত্রুর সাথে গাঁটছড়া বাঁধে। দ্বিতীয়, সে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে বিশৃংখলা ও অরাজকতা ছড়ায়।[১০২]

(৭) জিম্মিদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কার্যকলাপ তাদের ধর্মমত অনুসারে সম্পাদিত হবে। তাদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকর করা হবে না। যেসব কাজ তাদের ধর্মেও অবৈধ, তা থেকে তো তাদেরকে বিরত রাখতেই হবে। অবশ্য যেসব কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ এবং তাদের ধর্মে বৈধ, তা তারা নিজেদের আবাসিক এলাকায় অবাধে করতে পারবে। তবে যেসব জায়গা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত[১০৩] এবং যাকে তারা ইসলামী অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, ইসলামী সরকার ইচ্ছা করলে সে সব জায়গায় তাদেরকে সেই সব কাজ কারার স্বাধীনতা দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। বাদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

ولا يمنعون من اظهار شيئ مما ذكرنا من بيع الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس فى قرية او موضع ليس من امصار المسلمين ولو كان فيه عدد كثير اهل الاسلام وانما يكره ذالك فى امصار المسلمين وهى التى يقام فيها الجمع والاعياد والحدود....... واما اظهار فسق يعتقدون حرمته كالزنا وسائر الفواحش التى حرام فى دينهم فانهم يمنعون من ذالك سواء كانوا فى امصار المسلمين او فى امصارهم۔[৩]

"যেসব গ্রাম ও এলাকা ইসলামী অনুষ্ঠানাদির জন্য নির্দিষ্ট নয় সেখানে জিম্মিদেরকে মদ ও শুকর বিক্রি করতে, ক্রুশ মিছিল বের করতে ও বাঁশী বাজাতে বাধা দেয়া চলবে না– চাই সেখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন। কিন্তু যেসব এলাকায় জুময়ার নামাজ পড়া হয়, ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী আইনের শাসন

পরিচালিত হয় সেখানে এসব কাজ করতে দেওয়া অবাঞ্ছনীয়। তবে যে সব কাজ হারাম বলে তারাও মানে যেমন ব্যভিচার বা অনুরূপ অন্যান্য অশ্লীলতা যা তাদের ধর্মগ্রন্থেও অবৈধ, তা করতে তাদেরকে সর্বাবস্থায়ই বাধা দেয়া হবে– তা সেটা ইসলামী এলাকাতে হোক কিংবা তাদের নিজস্ব এলাকাতে হোক।[১০৪]

কিন্তু ইসলামী এলাকাতেও তাদেরকে শুধু ক্রুশ ও মুর্তির মিছিল বের করা এবং প্রকাশ্যে বাঁশী বাজাতে বাজাতে বাজারে বের হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে[১০৫] যাতে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষ না হয়। নিজেদের প্রাচীন উপাসনালয়গুলোর মধ্যে তারা সব রকমের উপাসনাকর্ম সম্পন্ন করতে পারে। ইসলামী সরকার তাদের সে সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখেনা।

(৮) ইসলামী এলাকাগুলোতে জিম্মিদের যেসব উপাসনালয় আগে থেকে বর্তমান, তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। সেগুলো ভেঙ্গে গেলে তা একই জায়গায় পুন নির্মাণ করা যাবে। নতুন উপাসনালয় বানানো চলবে না।[১০৬]

(৯) যেসব এলাকা ইসলামী এলাকা নয়, সেখানে জিম্মিরা নতুন উপাসনালয়ও গড়তে পারবে। যেসব ইসলামী এলাকায় সেখানকার নেতারা জুময়া, ঈদ ও ইসলামী আইনের শাসন বন্ধ করে দিয়েছেন, সেখানেও জিম্মিরা নতুন উপাসনালয় নির্মাণ ও কাফেরী আচার অনুষ্ঠান করতে পারবে।[১০৭] হযরত ইবনে আব্বাস নিম্নরূপ ফতোয়া দিয়েছেনঃ

أما مصر مصرته العرب فليس لهم أن يحدثوا
فيه بناء بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس ولا
يظهروا فيه خمرًا ولا يتخذوا فيه خنزيرًا وكل مصر كانت
العجم مصرته ففتحه الله على العرب فنزلوا على حكمهم
فللعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا لهم
بذلك

"যেসব শহরকে মুসলমানরা গড়ে তুলেছে, তাতে জিম্মিদের নতুন উপাসনালয় ও গীর্জা তৈরী করা, বাঁশী বাজানো, মদ খাওয়া ও শুকর

পালন করা বৈধ নয়। তবে যেসব শহর অমুসলিমরা গড়ে তুলেছে, যেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের হাতে বিজিত করেছেন এবং তারা মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিয়েছে, সেখানে অমুসলিমদের অধিকার চুক্তি অনুযায়ী নির্নীত হবে। মুসলমানদের সে সব অধিকার দিতেই হবে।”[১০৮]

(১০) জিজিয়া ও খাজনা আদায়ের প্রশ্নে জিম্মিদের ওপর বলপ্রয়োগ করা অবৈধ। তাদের সাথে নম্রতা ও উদারতার আচরণ করতে বলা হয়েছে। তারা বহন করতে পারে না এমন কোন দায়িত্ব তাদের ওপর চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে। জিজিয়ার পরিমাণ নির্ধারনের বেলায়ও জিম্মিদের ওপর বলপ্রয়োগ অবৈধ। হযরত ওমর (রাঃ)–এর অন্তিম উপদেশ যে لا يكلفوا فوق طاقتهم

“যে পরিমাণ কর দেয়া তাদের ক্ষমতাবহির্ভূত তা দেয়ার জন্য তাদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করো না।”[১০৯]

জিজিয়ার বিনিময়ে তাদের স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করা চলবে না। আলী (রাঃ)–এর নির্দেশঃ

لا تبيعن لهم في خراجهم حمارا ولا بقرة ولا كسوة شيئا ولا صيفا لخراج

“খাজনা আদায়ের জন্য তাদের গাধা গরু বা কাপড় বিক্রি করে দিও না।”[১১০] অপর এক ক্ষেত্রে হযরত আলী আপন কর্মচারীকে পাঠানোর সময় বলেনঃ

“তাদের শীত–গ্রীষ্মের কাপড়, তাদের খাওয়ার উপকরণাদি, তাদের কৃষি কাজ করার পশু খাজনা আদায় করার জন্য বিক্রি করো না। টাকা আদায় করার জন্য কাউকে প্রহার করো না। কাউকে দাঁড় করিয়ে রাখার শাস্তি দিওনা, খাজনার বিনিময়ে কোন জিনিস নিলামও করো না। কেননা আমাদেরকে তাদের শাসক বানানো হয়েছে সেজন্য নম্রতার সাথে আমাদের সব কিছু আদায় করতে হবে। তোমরা যদি আমার এই নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ কর তবে আল্লাহ আমার পরিবর্তে তোমাকে পাকড়াও করবেন। আর আমি যদি জানতে পারি যে, তুমি আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছ তা হলে আমি তোমাকে বরখাস্ত করে দেব।”[১১১]

হযরত ওমর সিরিয়ার গভর্ণর হযরত আবু উবায়দাকে যে ফরমান লিখে পাঠান তাতে অন্যান্য আদেশের মধ্যে একটি আদেশ এও ছিলঃ

وامنع المسلمين من ظلمهم والاضرار بهم واكل اموالهم الا بحلها۔

"মুসলমানদেরকে নিষেধ করে দিও, তারা যেন অমুসলিম জিম্মিদের ওপর অত্যাচার করে না, তাদের ক্ষতি না করে এবং অবৈধ পন্থায় তাদের সম্পদ আত্মসাৎ না করে।"১১২

সিরিয়া সফরকালে হযরত ওমর (রাঃ) দেখতে পেলেন তাঁর কর্মচারীরা জিজিয়া আদায় করতে গিয়ে জিম্মীদেরকে শাস্তি দিচ্ছে। তিনি বললেন "ওদের কষ্ট দিওনা। তোমরা যদি তাদেরকে আজাব দাও তাহলে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে আজাব দেবেন।"১১৩

হিশাম ইবনে হাকাম হামুসের জনৈক সরকারী কর্মচারীকে দেখেন, তিনি জনৈক কিবতীকে জিজিয়ার জন্য রৌদ্রে দাঁড় করাচ্ছেন। তিনি তাঁকে ভৎ'র্সনা করলেন এবং বললেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ঃ

ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا،

"যারা দুনিয়াতে মানুষকে আজাব দেয়, আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন।"১১৪ মুসলিম ফকিহগণ কর প্রদানে যারা টালবাহানা করে তাদেরকে উর্ধপক্ষে বিনাশ্রমে কারাদন্ড দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেনঃ

ولكن يرفق بهم ويحبسون حتى يردوا ما عليهم۔

"তাদের প্রতি নম্র আচরণ করতে হবে এবং কর না দেয়া পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে।"১১৫

(১১) জিম্মীদের মধ্যে কেউ যদি দেউলে বা দরিদ্র হয়ে পড়ে তাহলে তার জিজিয়াই শুধু মাফ করা হবে না, বরং তার জন্য বায়তুল মাল থেকে ভাতাও বরাদ্দ করা হবে। হযরত খালেদ হীরাবাসীকে যে নিরাপত্তা সনদ লিখে দেন, তাতে লেখেনঃ

وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابته

آفة من الآفات او كان غنيا فافتقر وصار اهل دينه

يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله۔

"আমি তাদের জন্য এ অধিকার দান করেছি যে, যে ব্যক্তি বার্ধক্যের জন্য অকর্মন্য হয়ে যাবে অথবা যার ওপর কোন বিপদ আসবে, কিংবা যে আগে ধনী ছিল এখন দেউলে হয়ে গেছে এবং তার স্বধর্মীয় লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করেছে, তার জিজিয়া মাফ করা হবে এবং তাকে ও তার সন্তান–সন্ততিকে মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে ভরণ পোষণ দেয়া হবে।"[১১৬]

একবার হযরত ওমর দেখেন যে, একজন বৃদ্ধ জিম্মী ভিক্ষা করছে। তিনি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, 'জিজিয়া দেয়ার জন্য ভিক্ষা করছি।' তখন তিনি তার জিজিয়া মাফ করে দিলেন, তার জন্য ভাতা নির্ধারন করলেন। বায়তুলমালের দায়িত্বশীল কর্মচারীকে লিখলেনঃ " এটা আমাদের পক্ষে মোটেই উচিত হয় না যে, যৌবনে আমরা ওর দ্বারা লাভবান আর বার্ধক্যে ওকে লাঞ্ছিত করবো।"[১১৭]

দামেস্ক সফরকালে হযরত ওমর অক্ষম জিম্মীদের জন্য ত্রাণভাতা নির্ধারণ করার নির্দেশ জারী করেন।[১১৮]

(১২) কোন জিম্মী যদি মারা যায় এবং তার কাছে যদি জিজিয়া পাওনা থাকে, তবে সেটা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে না, তার উত্তরাধিকারীদের ওপরও তার দায়–দায়িত্ব চাপানো হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেনঃ

ان وجبت عليه الجزية فمات قبل ان توخذ منه اواخذ بعضها وبقى البعض لم يوخذ بذالك ورثته ولم توخذ من تركته۔

"যদি তার ওপর জিজিয়া প্রাপ্য থাকা অবস্থায় আদায় না হতেই মারা যায় অথবা কিছু আদায় ও কিছু বাকী থাকে তাহলে সেটা তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে নেয়া হবে না, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও না।"[১১৯]

(১৩) মুসলমান ব্যবসায়ীদের মত জিম্মী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য পণ্যের ওপরও কর বসবে। তবে শর্ত এই যে, মূলধনের পরিমাণ ২০০ দিরহামের কম না হয় অথবা সে ২০ মেসকাল সোনার মালিক হয়।[১২০] প্রাচীনকালে ফকীহগণ অমুসলিম ব্যবসায়ীর ওপর বাণিজ্য শূল্ক শতকরা ৫ ভাগ এবং মুসলমান ব্যবসায়ীর ওপর শতকরা ২½ ভাগ আরোপ করা হয় বটে। তবে সেটা কোরআন ও হাদিসের কোন সুস্পষ্ট উক্তির ভিত্তিতে আরোপিত হয়নি। ফকীহগণের ইজতেহাদ এবং সাময়িক বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরেই তা হয়েছিল। সে সময়ে মুসলমানদেরকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জেহাদে ও ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতে হতো। এ জন্য তাদের বাণিজ্য যাতে পথে না বসে এবং তাদের উদ্যম–উৎসাহে ভাটা না পড়ে সে জন্য তাদের ওপর কর কমানো হয়েছিল।

(১৪) জিম্মীদেরকে সামরিক বিভাগে চাকুরী করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। দেশ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব শুধুমাত্র মুসলমানদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে।[১২১] যেহেতু এই রক্ষাণাবেক্ষণের বিনিময়েই তদের নিকট থেকে জিজিয়া আদায় করা হয়, তাই ইসলাম তাদেরকে সামরিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা যেমন বৈধ মনে করে না, তেমনি বৈধ মনে করে না তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা না থাকলে তাদের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করাকে। মুসলমানরা যদি তদেরকে রক্ষা করতে না পারে তা হলে জিম্মীদের জিজিয়ার টাকা দ্বারা লাভবান হওয়ার তাদের কোন অধিকার থাকতে পারে না। ইয়ারমুক যুদ্ধে রোমকরা মুসলমানদের সাথে লড়াই করার জন্য বিরাট সৈন্য সমাবেশ করে এবং মুসলমানদের সিরিয়ার সমস্ত বিজিত এলাকা ছেড়ে দিয়ে একটা কেন্দ্রীয় স্থানে সমবেত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন হযরত আবু ওবায়দা অধীনস্থ সামরিক অফিসারদের লিখে পাঠান যে, তোমরা জিম্মীদের কাছ থেকে জিজিয়ার খাজনা বাবদ যে টাকা আদায় করেছো তা সব ফিরিয়ে দাও। তাদেরকে বলে দাও যে, এখন আমরা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনে অক্ষম। তাই রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তার বিনিময়ে যে টাকা আমরা নিয়েছিলাম তা তোমাদের ফেরত দিচ্ছি। [১২২] " এই নির্দেশ মোতাবেক সকল সেনাপতি করের টাকা ফেরত দেন। [১২৩] ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন যে

মুসলমানরা যখন জিজিয়ার টাকা ফিরিয়ে দিল তখন সেখানকার অধিবাসীরা বললো, তোমাদের সরকারের ন্যায়বিচার আমাদের কাছে পূর্বমত সরকারের জুলুম নির্যাতনের চেয়ে অনেক প্রিয়। এখন থেকে আমরা হিরকিলের কোন কর্মচারীকে শহরে ঢুকতে দেবনা। যদি লড়াই করে হেরে যাই তবুও না।”

ইসলামী আইনের এ কয়টি বিধি এখানে উদ্ধৃত করে একথাই বলতে চাইছি যে, ইসলাম আপন বিজিত জাতি সমূহের সাথে যে ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও সাম্যের আচরণ করেছে, তার নজির অতীত জাতি সমূহের ইতিহাসে তো পাওয়া যাবেই না, এমন কি অনেকাংশে তা এযুগের সুসভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও মিলবে না। আইন শুধু একটা কাগুজে আইন নয়, বরং তা কি ভাবে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে তার এক ও উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। আমি এই আইনের প্রতিটি ধারার সাথে হাদিস ও ইতিহাসের প্রামান্য গ্রন্থাবলী থেকে বেশ কতগুলো নজীরও তুলে ধরেছি। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবাগণ কি ভাবে এ আইন বাস্তবায়িত করেছেন তা যেন পাঠক বুঝতে পারেন। হযরত রসূলে করীম (সঃ)–এর যুগ ও সাহাবাদের যুগের পরও মুসলিম ইমাম ও ফকীহগণ সব সময় এই আইনকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করাতে সচেষ্ট থেকেছেন। হঠকারী শাসকগণ যখনই এর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তখনই আলেম ও ফকীহগণ তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে কিংবা অন্তত পক্ষে তাদের দ্বারা তার প্রতিকার করাতে চেষ্টা করেছেন। এটা ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, উমাইয়া খলিফা ওলিদ বিন আব্দুল মালেক দামেস্কের ইউহান্না গীর্জাটি জবরদস্তিমূলকভাবে খৃষ্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মসজিদের সাথে সংযুক্ত করেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর খৃষ্টানরা তার কাছে ঐ জুলুমের অভিযোগ নিয়ে আসে। তিনি কর্মচারীদের নির্দেশ দেন যে, মসজিদের যে অংশ গীর্জার জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে তা ভেঙ্গে খৃষ্টানদের কাছে সমর্পণ করা হোক।[১২৪]

এজিদ তনয় ওলিদ রোমকদের আক্রমণের ভয়ে সাইপ্রাসের জিম্মী অধিবাসীদের নির্বাসিত করে সিরিয়ায় পুনর্বাসিত করেন। এতে মুসলিম ফকিহগণ ও সাধারণ মুসলমানরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হন এবং একে একটা মহাপাপ বলে গণ্য করেন। এর পর ওলিদ যখন পুনরায় তাদেরকে

সাইপ্রাসে নিয়ে পুনর্বাসিত করেন তখন তার প্রশংসা করা হয় এবং ন্যায় বিচারের প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়।[১২৫]

ঐতিহাসিক বালাজুরী বলেন, একবার জাবালে লুবনানের অধিবাসীদের একটি গোষ্ঠী বিদ্রোহ করে। সালেহ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ তাদের দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যরা অস্ত্রধারণকারী সমস্ত পুরুষকে হত্যা করে। অবিদ্রোহীদের একাংশকে নির্বাসিত করে এবং একটি অংশকে বসবাস করতে দেয়। ইমাম আওজায়ী তখন জীবিত; তিনি সালেহকে উক্ত জুলুমের জন্য কঠোরভাবে ভৎর্সনা করলেন এবং একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। সেই চিঠির কয়েকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

"জাবালে লুবনানের জিম্মীদের ব্যাপার তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ। তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিল যারা বিদ্রোহকারীদের মধ্যে শামিল হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি তাদের একাংশকে হত্যা করেছ এবং একাংশকে বহিস্কার করেছ। আমি বুঝিনা কতিপয় বিশেষ লোকের অপরাধের শাস্তি সর্বসাধারণকে কিভাবে দেওয়া যেতে পারে? কিসের ভিত্তিতে তাদেরকে ঘরবাড়ী ও জমিজমা থেকে উৎখাত করা যেতে পারে। আল্লাহর বিধান রয়েছে 'لا تزر وازرة وزر اخرى' "একজনের অপরাধের দায়িত্ব আর একজন বহন করেনা" এ বিধান অবশ্য পালনীয়। তোমার জন্য উপদেশ এই যে, তুমি হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাটা মনে রেখ ঃ "যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিককে উৎপীড়নের শিকার করবে, কিংবা তার ওপর তার ক্ষমতার চেয়ে বেশী বোঝা চাপাবে তার বিরুদ্ধে আমি নিজেই বাদী হবো।"[১২৬]

এ ধরণের আরও অসংখ্য দৃষ্টান্তে ইতিহাসের পাতা ভরপুর। এ সব পড়লে বুঝা যায় যে, মুসলিম ইমাম ও মনিষীগণ সব সময়ই জিম্মীদের অধিকারের প্রতি সমর্থন প্রদান করেছেন। কখনো কোন বাদশাহ যদি তাদের ওপর বলপ্রয়োগ বা জুলুম করে থাকে, তবে সেটা ইসলামী আইনের সুস্পষ্টভাবে পরিপন্থী এবং তার দায়িত্ব ইসলামের ওপর চাপানোর কোনই অবকাশ নেই।

জিম্মীদের পোশাক সমস্যা

ইসলামে অবশ্য একটা বিষয় রয়েছে যা নিয়ে বিদ্রোহীরা অনেক প্রশ্ন তোলার সুযোগ পেয়েছে। সে জিনিসটা হলো জিম্মীদের পোশাক সমস্যা। কিন্তু

দুঃখের বিষয় এই যে, প্রথম দিকে এ বিষয়টা যে আকারে বিরাজমান ছিল পরে তাকে তা থেকে ভিন্নতর রূপ দেয়া হয়েছে। এ জন্যই লোকেরা মনে করে নিয়েছে যে, ইসলাম জিম্মীদের অবমাননা ও হেয় করার জন্য এক বিশেষ ধরণের পোশাক ও বিশেষ ধরণের সামাজিক বেশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)–এর যুগে কতিপয় চুক্তিতে এরূপ শর্ত বিদ্যমান যে, জিম্মীরা একটা বিশেষ পোশাক পরতে পারবে না এবং মুসলামানদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ, হীরার চুক্তিতে আমরা একটা কথা দেখতে পাইঃ

ولهم كل ما لبسوا من الزى الا زى الحرب من غير ان
يتشبهوا بالمسلمين۔

"তারা যে কোন পোশাক ও বেশভূষা ধারণ করতে পারবে, কেবল সামরিক পোশাক পরতে পারবেনা এবং মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে পারবে না।"[১২৭]

দামেস্কের চুক্তির শর্তাবলী যদিও খৃষ্টানদের পক্ষ থেকেই পেশ করা হয় তথাপি তাতে এরূপ কথা দেখা যায়ঃ

ولا نتشبه بهم فى شيئ من ملابسهم فى قلنسوة
ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر۔

"আমরা মুসলমানদের সাথে তাদের কোন পোশাকে সাদৃশ্য অবলম্বন করবো না, টুপিতেও না, পাগড়ীতেও না, জুতায়ও না, চুলের সিতাতেও না।"[১২৮]

আমাদের ফেকাহশাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতেও এ ধরণের বিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বাদায়েগ্রন্থে আছেঃ

ان اهل الذمة يوخذون باظهار علامات يعرفون
بها ولا يتركون يتشبهون بالمسلمين فى لباسهم۔

"জিম্মীদেরকে এমন সব নিদর্শন ও আলামত ধারণ করতে হবে যা দিয়ে তাদেরকে চেনা যায়। মুসলমাদের সাথে সাদৃশ্য হতে পারে এমন কোন বেশ ভুষা তাদেরকে ধারণ করতে দেয়া হবে না।"[১২৯]

ইমাম আবু ইউসুফ স্বীয় গ্রন্থ কিতাবুল খারাজেও এরূপ বিধান উল্লেখ করেছেন যে, জিম্মীদের মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্যমুলক বেশভুষা অবলম্বন করা উচিত নয়।[১৩০]

এ সব বিধি আমাদের ইমামদের থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, সে কথা সত্য। কিন্তু এর উদ্দেশ্য তাদেরকে হেয় করা নয়, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের পরস্পরের সাথে মিশে যাওয়া থেকে রক্ষা করাই এর লক্ষ্য। [১৩১] ইসলামী আইনে শুধু জিম্মীদেরকে মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়নি,বরং মুসলমানদেরকেও জিম্মীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে বারণ করা হয়েছে। পোশাকের সাদৃশ্যের মধ্যে যে সামাজিক অনাচারের উৎস নিহিত, ইসলাম সে সম্পর্কে উদাসীন নয়।[১৩২] বিশেষতঃ পরাধীন জাতির মধ্যে প্রায়ই এরূপ দোষ দেখা দেয় যে, তারা নিজেদের জাতীয় পোশাক ও জাতীয় কৃষ্টিকে হেয় মনে করতে যাচ্ছে এবং শাসক জাতির পোশাক ও আচার-পদ্ধতি অবলম্বন করতে গর্ব বোধ করে। এই গোলাম সুলভ মানসিকতা আজও দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের এই উপমহাদেশেও দেখতে পাই, দেশীয় লোকদের অনেকেই ইংরেজী পোশাক পরে খুব গর্ব অনুভব করেন এবং ভাবেন, যেন উন্নতির অতি উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছেন। অথচ কোন ইংরেজ কখনো এ দেশীয় পোশাক পরে না। পরলেও তা একান্তই ইংরেজদের অনুষ্ঠানে পরে তাও গৌরবের উপকরণ হিসাবে নয় বৈচিত্র বা কৌতুকের অভিপ্রায়ে।[১৩৩] পরাধীনতার এই মনস্তাত্মিক বৈশিষ্ট্য মুসলিম মনিষীরা উপলব্ধি করতেন। এ জন্য তারা জিম্মীদেরকে মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করে তাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননা করেননি, বরং তাদের জাতীয় সম্মান ও মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টাই করেছেন। এ ধরনের আইন কিছু লোকের দৃষ্টিতে অবমাননাকর মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের মতে এতে অবমাননার কিছু নেই। আমরা বরঞ্চ খুশীই হতাম যদি আমাদের ইংরেজ প্রভুরা আমাদেরকে ইউরোপীয় পোশাক পরিচ্ছদ ও কৃষ্টি ধারণ করতে নিষেধ করেতন।

৫-- কতিপয় ব্যতিক্রম

যুদ্ধ ও আনুসংগিক ব্যাপারে ইসলামের যে বিধিমালা রয়েছে, উপরে তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটেছিল। আপাত দৃষ্টিতে ঐ ঘটনাগুলো উপরোল্লিখিত আইন ও বিধিমালা থেকে আলাদা রকমের বলে মনে হয়। একজন অজ্ঞ লোক এরূপ সন্দেহে পড়ে যেতে পারে যে, উপরে যে বিধিমালা বর্ণনা করা হয়েছে, তা হয়তো প্রকৃত ইসলামী বিধি নয়। আর যদি তা হয়ও,তবে ইসলামী আইনে বৈপরিত্য বা স্ববিরোধিতা রয়েছে। অথবা হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবাদের কর্মধারায় ইসলামী আইনের বিরোধী ছিল। এ জন্য অধ্যায় শেষ করার পূর্বে ঐ ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

বনু নজীরের উচ্ছেদঃ

এ জাতীয় ঘটনাবলীর প্রথমটা হচ্ছে বনুনজীরের উচ্ছেদ। বনু নজীর একটা ইহুদী গোত্র। কয়েকশো বছর ধরে তারা মদীনায় বাস করে আসছিল। হিজরতের পর হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অনাক্রমন চুক্তি হয়। বদরের যুদ্ধের পর তিনি তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেন। ইসলাম বিরোধীরা এ ঘটনার অপব্যাখ্যা দেয় যে, হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) বনু নজীরের সাথে প্রতারণা করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ!) অর্থাৎ যখন তিনি দুর্বল ছিলেন তখন তাদের সাথে চুক্তি করেন। আর যেই শক্তিশালী হলেন অমনি চুক্তি ভঙ্গ করে তাদেরকে নির্বাসিত করলেন। কিন্তু এটা ঘটনার একটা অবাস্তব ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এর বিস্তারিত বিবরণের ওপর নজর দিলে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থা চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তখন দেখা যাবে যে, ওয়াদা ভঙ্গের জন্য রসুলুল্লাহ (সঃ) নন বনু নজীরই দায়ী। আর তাদের বিরুদ্ধে হযরতের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ জুলুম নয় বরং সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত।

আসল ব্যাপার হলো, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন, তখন ইহুদিদের অন্যান্য গোত্রের মত বনু নজীরের সাথেও চুক্তি করেছিলেন।[১৩৪] চুক্তির মুলকথা ছিল, দুইপক্ষের কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বা শত্রুতামূলক পদক্ষেপ নেবে না, একে অপরের শত্রুদেরও সাহায্য করবে না। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেনঃ وادعهم على ان لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه -

'তিনি তাদের সাথে এই শর্তে মৈত্রী স্থাপন করেন যে, তারা তার সাথে যুদ্ধও করবেনা তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুদেরও সাহায্য করবে না।[১৩৫]

এই চুক্তির পর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাধারণ মুসলমানরা তাদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যান এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত মেলামেশা শুরু করে দেন। কিন্তু চুক্তির শর্তের সম্পূর্ণ বরখেলাপ তারা অবিশ্বাসী কোরেশদের সঙ্গে গোপনে যোগসাজশে লিপ্ত হয় এবং গোপনে গোপনে তাদেরকে মুসলমাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে থাকে। মুসা বিন উকবা এ সম্পর্কে মাগাজীতে লিখেছেনঃ كانت نضير قد دسوا الى قريش وحضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلوهم على العورة "বনু নজীর কোরেশদের সাথে যোগসাজশ করতো, তাদেরকে রসুলুল্লাহ (সঃ)–এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানী দিত এবং তাদেরকে গোপন তথ্য সরবরাহ করতো।" [১৩৬]

তারা শুধু এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং কয়েকবার তাঁকে হত্যার চেষ্টাও করে। একবার তারা হযরত (সঃ) কে খবর দেয় যে, আপনি নিজের সাথে তিনজন লোক নিয়ে আসুন। আমরাও আমাদের তিনজন আলেম পাঠাচ্ছি। একটা মধ্যবর্তী স্থানে তাদের সাথে আপনার বিতর্ক হবে। আপনি যদি তাদের ওপর ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করে দিতে পারেন তাহলে আমরা আপনার ওপর ঈমান আনবো। হযরত (সঃ) এই চ্যালঞ্জ গ্রহণ করলেন। কিন্তু নির্ধারিত স্থান অভিমুখে রওনা করার পূর্বমুহূর্তে বনু নজীরের এক মহিলা তার মুসলমান ভাইকে জানায় যে, ইহুদীরা সড়কি নিয়ে আসছে এবং তোমাদের নবীকে (সঃ) হত্যা করতে চায়। এ কথা শুনে তিনি যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন।[১৩৭]

আর একবার হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বনুআমেরের দুই ব্যক্তির রক্তপণ মিটাতে বনু নজীরের ওখানে গেলেন। বাহ্যতঃ তারা বন্ধুর মত আচরন করলো এবং আশ্বাস দিল যে, আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু গোপনে পরামর্শ করলো যে, "এই লোকটাকে এমন সুবিধাজনক অবস্থায় আর কখনো পাওয়া যাবে না।' তাই আমাদের একজন ঘরের ছাদের ওপর চড়াও হয়ে তাঁর ওপরে একখানা ভারী পাথর ফেলে দিক।" যে কথা সেই কাজ, আমর বিন জাহাস বিন কা'বকে এ কাজের জন্য

মনোনীত করা হলো। কিন্তু যথাসময়ে জানতে পেরে তিনি সেখান থেকে উঠে চলে এলেন।[১৩৮] (তাবারী)

শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়লো। ক্রমাগত ওয়াদাখেলাপী ও চক্রান্তের দরুন বনু নজীরের ওপর আস্থা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লো। কখনো বাহির থেকে শত্রুর আক্রমণ হলে এই "গৃহ শত্রু বিভীষণেরা" মদিনাকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে– এমন আশংকা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠতে লাগলো। এমনকি গোপনে হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ)–কে শহীদ করে দেয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছিল না। মুসলমানরা তাদের দিক থেকে এমন সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েছিল যে, একবার জনৈক সাহাবী মুমুর্ষ অবস্থায় অছিয়ত করেন যে, "আমার মৃত্যুর খবর তোমরা হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের বেলায় দিও না। হয়তো তিনি আমার জানাজায় শরীক হবার জন্য বেরুবেন আর পথে কোন ইহুদী তাঁকে হত্যা করবে।[১৩৯]" এহেন অবস্থায় উক্ত বিশ্বাসঘাতক দুশমনদের ব্যাপারে আর নির্বিকার থাকার উপায় ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ দেখালেন এবং অতর্কিতে আক্রমন করার পরিবর্তে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে পাঠিয়ে দিয়ে চরমপত্র দিলেন যে, "তোমরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। কাজেই হয় তোমরা নিজেরাই দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ কর, নচেত আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হব।" অপর দিকে মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে বলে পাঠালো যে, তোমরা কিছুতেই মদীনা ত্যাগ করো না আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। ফলে তারা হযরতের চরমপত্রের জবাব দিল যে ঃ انا لا نريم دارنا فاصنع ما بدا لك۔ "আমরা আমাদের দেশ ছাড়বো না, তুমি যা খুশী করতে পার।"[১৪০]

এরপরও কে বলতে পারে যে, হযরতের তাদের সাথে যুদ্ধ করা সঙ্গত ছিল না? তিনি তাদেরকে শেষ সুযোগ দিয়েছিলেন এবং সুস্পষ্টভাবে চুক্তিলংঘণ করার মুখেও উদারতার শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়লেন এবং তাদের এলাকা অবরোধ করলেন। কিন্তু রক্তপাত পর্যন্ত আর যেতে হলো না। অবরোধের প্রচণ্ডতাই তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দিল। তারা নিজেরাই আবেদন করলো যে, আপনি আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিন। আমরা মদীনা থেকে বেরিয়ে সিরিয়া চলে যাব। আমাদের উট একবারে যা বইতে পারে, তা নিয়ে যাব। বাদবাকী সব কিছু এখানে রেখে

যাব। এই শর্ত হযরত মঞ্জুর করলেন এবং তাদের এক চুলও ক্ষতি হলো না।[১৪১] সন্ধি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বালাজুরি লিখেছেনঃ

ثم صالحوه على ان يخرجوا من بلده ولهم ما حملت الابل الا الحلقة والآلة۔ তারা এই শর্তে হযরতের সাথে সন্ধি করলো যে, তারা মদীনা থেকে বেরিয়ে যাবে এবং অস্ত্র ও বর্ম ছাড়া যতটা মালপত্র তাদের উট বয়ে নিতে পারে নিয়ে যাবে।"[১৪২]

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেনঃ فسئلوا ان يجلوا عن ارضهم على ان لهم ما حملت الابل فصولحوا على ذالك۔ "অতঃপর তারা আবেদন জানালো যে, আমাদের উট যতটা মালপত্র নিতে পারে তা আমাদের নিতে দেয়া হোক এই দাবী মেনে নিয়েই তাদের সাথে সন্ধি করা হলো।"[১৪৩]

যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর অতি সহজেই শত্রুদেরকে পরাজিত করে পুরো প্রতিশোধ নেয়া যেতে পারতো। এমতাবস্থায় তাদের শর্তাবলী মেনে নেয়াও তাদের শুধু জানই নয় বরং মালও নিয়ে সহিসালামতে যেতে দেয়া যে মহানুভবতা ও আপোষপ্রিয়তারই লক্ষণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে ব্যক্তি রক্ষপাত ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপই করতে চায় না, বরং শুধুমাত্র অনিষ্ট ও অকল্যাণ রোধ করতে এবং দুষ্টকে দমন করতে চায়, কেবলমাত্র তার দ্বারাই এ কাজ সম্ভব। কিন্তু এই মহানুভবতার যে প্রতিদান হযরত (সঃ) কে দেয়া হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত তিক্ত। মুঠোর মধ্যে পেয়েও যে দুশমনদের তিনি দয়াপরবশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারা মদীনা থেকে বেরিয়ে সমগ্র আরবে হযরতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলো। মাত্র দু'বছরের মধ্যেই তারা ২৪ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হয়। যদি তিনি সেই সময়ই (যখন বাগে পেয়ে ছিলেন) ঐ সাপগুলোর মাথা গুড়িয়ে দিতেন, তা হলে এতবড় ঝড়ের সম্মুখীন তাঁকে হতে হতো না। কিন্তু তিনি যে ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন। পরাজিত শত্রুর করুণা ভিক্ষামুলক মিনতি প্রত্যাখ্যান করা তাঁর জন্য শোভন হতো না। তিনি তাদের প্রতি হিংসার তীব্রতার কথা বেশ জানতেন। তিনি এও জানতেন যে, ঐ নাযকতাকারী গোষ্ঠী চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানালে হযরত তা মঞ্জুর করলেন।

বনু কোরায়জার ঘটনাঃ

বনু কোরায়জার ব্যাপক হত্যাকাণ্ড নিয়ে আপত্তি, অভিযোগ উঠেছে আরো বেশী। এরাও ইহুদী এবং বনু নজীরের মত মদীনায় বাস করতো। হযরত যখন মদীনায় এলেন, তখন তিনি তাদের সাথেও অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় অনাক্রমণ চুক্তি সই করলেন। বনু নজীরের সাথে যখন যুদ্ধ হয় তখন তিনি পুনরায় বনু কোরায়জাকে চুক্তি সম্পাদনে আহ্বান জানান এবং পুরানো চুক্তির নবায়ন করেন।[১৪৪] কিন্তু খন্দক যুদ্ধের সময় তারা প্রকাশ্যে শত্রুর সাথে সহযোগিতা করে। তাই তিনি যুদ্ধ শেষে বনু কোরায়জার ওপর আক্রমণ চালালেন। তিনি গোত্রের সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে হত্যা করলেন, শিশু ও নারীদেরকে গোলাম বাঁদী বানালেন এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি মুসলমানাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এ ঘটনার জন্য ইসলাম বিরোধীরা হযরতের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ তোলে কিন্তু এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পড়লে এর বাস্তবতা ও বিরোধীদের ধারণা থেকে ভিন্নতর বলে সাব্যস্ত হয়।

আগেই বলেছি যে, বনু কোরায়জার সাথে দু'বার চুক্তি হয়েছিল একটা সাধারণ চুক্তি। সমস্ত ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে বনু কোরায়জাও এ চুক্তির আওতায় এসেছিল। এভাবে দু' দুবার চুক্তি হওয়ার পর বনু কোরায়জার উচিত ছিল হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) ও তার সঙ্গী সাথীদের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রতিহিংসামূলক কাজে অংশ না নেয়া। কিন্তু খন্দক যুদ্ধের সময় যখন বনু নজীরের উস্কানীতে আরবের বড় বড় গোত্র ইসলামকে খতম করার জন্য মদীনার ওপর চড়াও হলো, তখন বনু কোরায়জা হুয়াই বিন আখতাবের প্ররোচনায় প্রকাশ্যে চুক্তি ভেঙ্গে দিল এবং যুদ্ধে শামিল হয়ে গেল।[১৪৫] হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) তাদের চুক্তি ভঙ্গের কথা জানতে পেরে সাদ ইবনে মায়াজ ও সাদ ইবনে উবাদাকে তাদের নিকট পাঠালেন এবং চুক্তি রক্ষার উপদেশ দিলেন। কিন্তু তারা স্পষ্টভাবে বললো যে, তোমাদের সাথে আমাদের কোন চুক্তিনেই।

এমন আকস্মিকভাবে ও অসময়ে বনু কোরায়জার চুক্তি ভেঙ্গে দেয়ায় এবং যুদ্ধে যোগদান করায় মদীনা দু'দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। একদিকে কোরেশ ও গেতফান গোত্রের সৈন্যরা। অন্যদিকে বনু কোরায়জা সব চেয়ে নাজুক হয়ে দাঁড়ালো মুসলিম নারীদের রক্ষা করার সমস্যা। তাদেরকে

যে দুর্গে পাঠানো হয়েছিল, তা ছিল বনু কোরায়জার আক্রমণের সীমার মধ্যে এবং তারা দুর্গ ঘেরাও করার হুমকিও দিচ্ছিল। এ পরিস্থিতিতে মুসলমানরা চরম ভীতি ও সন্ত্রাসে দিশাহারা হয়ে পড়লো। এমনকি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে হানাদারদের সাথে আপোষ রফা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে গেলেন।[১৪৬] পবিত্র কোরআনে সেই চরম সংকট মুহূর্তের কথা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ
الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

"তারা যখন তোমাদের ওপরে দিয়ে এবং নীচ দিয়ে চড়াও হলো, যখন তোমাদের চোখ অন্ধকারে ছেয়ে গেল, যখন হৃদপিন্ড মুখের কাছে আসার উপক্রম হলো এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকমের খারাপ ধারণা করতে আরম্ভ করলে, তখনই হয়েছিল মুমীনদের প্রকৃত পরীক্ষা এবং তাদেরকে প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত করা হয়েছিল" (সূরা আহজাব)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত হোজায়ফা বলেনঃ "সেই রাতে আমাদের ত্রাস দেখার মত ছিল। একদিকে আবু সুফিয়ান তার অনুরূপ বিশাল বাহিনী নিয়ে ওপর দিক থেকে চড়াও হয়েছিল। অপর দিকে বনু কোরায়জা নীচের দিক থেকে এগিয়ে আসছিল এবং তাদের আক্রমণে আমাদের ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।"[১৪৭]

এমন ভয়াবহ ও মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার পর তাদের আর কোন সুযোগ দেয়া আত্মহত্যার শামিল হতো। এ জন্য খন্দক যুদ্ধের মেঘ কেটে যাওয়া এবং বহিরাক্রমণের আশংকা দূরীভূত হওয়ার পর হযরত কাল বিলম্ব না করে বনু কোরায়জাকে অবরোধ করলেন। ১৫ থেকে ২৫ দিন পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী তাদের দুর্গের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। যখন তারা দেখলো, এ অবরোধ কিছুতেই টুটবার নয়, তখন তারা হযরতের নিকট বাণী পাঠালো যে, সাদ ইবনে মায়াজ আমাদের সম্পর্কে যে রায় দিবেন, আমরা তাই মেনে নেব।[১৪৮] কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে হযরতের ওপর সমর্পণ করে দিয়েছিল। সাদ ইবনে মায়াজ

ছিলেন বনু কোরায়জার মিত্র গোত্রের লোক। প্রাগৈসলামিক যুগে আন্তগোত্রীয় মিত্রতা রক্ত সম্পর্কের মতই ঘনিষ্ট ও অটুট ছিল। তাকে শালিশ বানালে বনু কোরায়জার প্রতি অবিচার হবে এমন সন্দেহ কারোই ছিলনা।[১৪৯] তাই রসুলুল্লাহ (সঃ) ইবনে মায়াজকে শালিশ বানালেন। বনু কোরায়জার পক্ষ থেকেও তাকে শালিশ মেনে নেয়া হলো। সাদই ফয়সালা করে দিলেন যে, বনু কোরায়জার সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদের গোলামে পরিণত করা হোক। আর তাদের ধনসম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হোক। এই শালিশের রায় অনুসারেই সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে হত্যা করা হয়।

সুতরাং এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ হযরতের বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরোপ করার আর কোন অবকাশ নেই। কেউ বলতে পারবেন না যে, তিনি আক্রমণ চালিয়ে চুক্তি লংঘন করেছেন। তবে দ্বিতীয় অভিযোগটা এখনো থেকে যাচ্ছে যে, প্রতিশোধটা খুবই কঠোরভাবে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু একে নিষ্ঠুরতা বা কঠোরতা নামে অভিহিত করার আগে কয়েকটা বিষয় ভালো ক'রে উপলদ্ধি করা প্রয়োজন।

(১) বনু কোরায়জা ও তাদের স্বজাতীয় বনুনজীরের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের রেকর্ড দেখে নতুন করে কোন চুক্তি সম্পাদন সম্ভব ছিল না। তাদেরকে আর বিশ্বাস করার উপায় ছিল না যে, নতুন চুক্তিকে তারা আবার কোন নাজুক মুহূর্তে ভেঙ্গে দেবে না।

(২) তাদের দুর্গ মদীনার একেবারেই নিকটে অবস্থিত ছিল। এমন প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতা করার পর তাদের এত নিকটে অবস্থিতিতে সব সময়ই ভয় ছিল কখন কোন শত্রুকে সরাসরি মুসলমানদের বাড়ী ঘরের ওপর চড়াও করে দেয়।

(৩) তাদের নির্বাসিত করায়ও ভালাই ছিল না। ইতিপূর্বে বনু নজীরকে নির্বাসিত ও বিতাড়িত করার ফল দাঁড়িয়ে ছিল এই যে, তারা দুরে বসে খুব নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পেরেছিল এবং সৈন্য সমাবেশ করে মদীনার ওপর আক্রমণ চালাতে পেরেছিল।

(৪) এসব সত্ত্বেও হযরত নিজে তাদের জন্য শাস্তির প্রস্তাব করেননি। বরং

তাদের মত নিয়েই এমন একজন সর্বসম্মত শালিশ নিয়োগ করা হয়েছিল যিনি তাদের কয়েকপুরুষ ধরে মিত্র ছিলেন।

(৫) শালিশী সম্পর্কে এটা সারা দুনিয়ার সর্বস্বীকৃত বিধান যে, দু'পক্ষের ঐকমত্য সহকারে যখন কাউকে শালিশ বানানো হয় তখন সেই শালিশ যে রায় দেবেন তা উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হয়।

(৬) হযরত সাদ ইবনে মায়া'জ (রাঃ) যে রায় দিয়েছিলেন, তা তাওরাতেরবিধানঅনুসারেইদিয়েছিলেন।[১৫০] এজন্য কোন ইহুদী উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে টু–শব্দটি করেনি। তাওরাতের সংশ্লিষ্ট আয়াতটির অনুবাদ নিম্নরূপঃ 'তুমি যখন কোন নগরবাসীর সাথে যুদ্ধ করতে যাও তখন আগে তাকে আপোষ–মীমাংসার প্রস্তাব দাও। তখন যদি নগরবাসী তোমার প্রস্তাবে সায় দেয় এবং তোমার জন্য দরজা খুলে দেয় তা হলে সেই নগরীর সমস্ত প্রাণী তোমার অনুগত হবে এবং তোমার সেবা করবে। আর যদি তারা তোমার সাথে সন্ধি না করে বরং তোমার সাথে যুদ্ধ করে তা হলে তুমি তাদের ঘেরাও কর। যখন আল্লাহ সেই নগরীকে তোমার আয়ত্বাধীন করে দেবেন, তখন সেখানকার প্রতিটি পুরুষকে তিক্ষ্ণধার তরবারী দিয়ে হত্যা ক'রো। তবে যে সব নারী, শিশু ও পশু সেই নগরীতে পাবে তাদেরকে গণিমত হিসেবে নিয়ে নিও।'

(৭) তাদের মধ্যে শুধু অস্ত্র ধারণে সক্ষম যেসব পুরুষ তাদেরকেই হত্যা করা হয়েছিল। কেননা তাদের দিক থেকেই যুদ্ধ ও বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা ছিল। এদের হত্যার পর নারী ও শিশুদেরকে নিজেদের অভিভাবকত্বে নিয়ে নেয়া ছাড়া মুসলমানদের পক্ষে আর কিইবা উপায় ছিল?

এ কথা কয়টি বুঝে নেয়ার পর স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, বনু কোরায়জার সাথে যে আচরণ করা হয়েছিল তা যথার্থ ইনসাফ মোতাবেকই হয়েছিল এবং এছাড়া তাদের সাথে অন্য কোন আচরণ করা সম্ভব ছিল না।

কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকান্ডঃ

নবুয়ত যুগের আরেকটি ঘটনার ওপর প্রবল আপত্তি তোলা হয়। হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের একজন শত্রু কা'ব ইবনে আশরাফকে গোপনে হত্যা করিয়ে দিয়েছিলেন। বিরোধীদের বক্তব্য এই যে,

এটাও জাহেলিয়াতের সেই গুপ্ত হত্যা এবং এটা শুধু কাপুরুষতারই লক্ষণ নয়, বরং যুদ্ধের ভদ্র রীতিনীতির বরখেলাপ। কিন্তু এ ঘটনারও কয়েকটা বিশেষ কারণ ছিল–যা বিরোধীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদী এবং বনু নজীর গোত্রীয়। হিজরতের পর তার গোত্রের সাথে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে চুক্তি হয়, কা'বও তার আওতাভূক্ত ছিল। কিন্তু ইসলামের প্রতি এবং বিশেষভাবে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর প্রতি তার ছিল চরম শত্রুতা ও বিদ্বেষ। সে হযরতের নামে শ্লেষাত্মক ও বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করতো ও পাঠ করতো। মুসলিম নারীদের সম্পর্কে জঘন্য রকমের প্রণয় কবিতা রচনা করতো[১৫১] এবং কোরেশদেরকে হযরতের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিত।[১৫২] বদরের যুদ্ধে যখন হযরত জয়লাভ করলেন তখন সে ভীষণভাবে মর্মাহত হয় এবং ক্রোধের আতিশয্যে বলে ওঠেঃ والله لئن كان محمد اصاب هولاء القوم لبطن الارض خيرٌ لنا من ظهرها۔ "খোদার কসম, মুহাম্মদ যদি সত্যিই কোরেশদেরকে পরাজিত করে থাকে তাহলে আমাদের জন্য পৃথিবীর পিঠের ওপর থাকার চেয়ে তার পেটের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়াই ভালো।"

এরপর সে মদীনা থেকে মক্কায় চলে যায়। সেখানে সে অত্যন্ত করুণভাবে কোরেশদের নিহত নেতাদের নামে 'মুরসিয়া' পাঠ করে এবং কোরেশদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকে। মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল তার এসব কার্যকলাপ। এই চুক্তির দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে তার ওপরও ছিল। কেননা সে ঐ গোত্রেরই লোক। কিন্তু তথাপি এ পর্যন্ত হয়তো তাকে কোন না কোন যুক্তিতে ক্ষমা করা যেতে পারতো। কিন্তু এ সব কিছু ছাড়িয়ে গিয়ে সে শত্রুতার বশে এতদুর ধৃষ্টতা দেখায় যে, হযরতকে হত্যা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে যায়। সে হযরতকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করার এক কুটিল ষড়যন্ত্র আঁটে। আল্লামা ইবনে কাছির আবু মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, কা'ব একটি দলের সাথে মিলিত হয়ে এরূপ ব্যবস্থা করেছিল যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)–কে নিজের বাড়ীতে ডেকে এনে গোপনে হত্যা করে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াত নাজিল হয়ঃ

إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

"একটি দল যখন তোমাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার দুরভিসন্ধি করেছিল। আল্লাহ তাদের হাতকে তোমাদের প্রতি প্রসারিত হতে বাধা দেন"।

(সুরা আল মায়েদা –২)

ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইয়াকুবী লিখেছেনঃ اراد ان يمكر برسول الله -

"সে (ক'াব) হযরত রসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আল্লাহহি ওয়াসাল্লামকে প্রতারণাপূর্বক হত্যা করতে চেয়েছিল।

এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, কা'বের অপরাধের তালিকা এই সর্বশেষ হত্যার ষড়যন্ত্র দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ করে এবং এর পরে তাকে হত্যা করার বৈধতায় আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সে নিজের গোত্রীয় চুক্তি ভঙ্গ করলো, মুসলমানদের শত্রুদের সাথে যোগসাজশ করলো, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন জ্বালালো এবং সর্বশেষে মুসলমানদের নেতাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটিলো। এমন লোকের শাস্তি হত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে? তার একার কার্যকলাপের জন্য তার জাতির বিরুদ্ধে তো আর যুদ্ধ ঘোষণা করা যেতে পারে না। আর সেজন্য প্রকাশ্য ময়দানে তার সাথে মোকাবিলা করে তাকে হত্যা করাও সম্ভব ছিল না। কেননা তার গোত্রও জড়িয়ে পড়তো। এদিকে বুন নজীরের কাছ থেকেও এরূপ আশা করা যেত না যে,তারা কা'বকে এইসব তৎপরতা থেকে বিরত রাখবে। কেননা সমগ্র গোত্রের আচরণই তারই মত শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় পরিপুর্ণ ছিল। তাছাড়া সে ইসলামের অন্যান্য শত্রুদের সাথে মিলিত হয়েও কখনো প্রকাশ্যে ময়দানে যুদ্ধ করতে আসেনি। বরং সবসময় কেবল পর্দার পেছনে বসেই ষড়যন্ত্র করতো। এ জন্য পর্দার পেছনেই তাকে খতম করিয়ে দেয়া ছাড়া তার অনিষ্ঠকারিতা নির্মূল করার আর কোন উপায় অবশিষ্ট ছিল না। তাই হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনোন্যপায় হয়ে এই শেষ কর্মপন্থাই গ্রহণ করলেন। মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করিয়ে দিলেন।

এই ঘটনা থেকে এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, শত্রুপক্ষীয় নেতাদেরকে গোপনে হত্যা করানো ইসলামের সমর আইনের কোন স্থায়ী ধারা, তা যদি হতো তা হলে হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই আগে

আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের মত শত্রুকে হত্যা করতেন। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে এ ধরনের সমস্ত শত্রুদের এক এক করে হত্যা করতে পারতো এমন বীরের অভাব ছিলনা। কিন্তু সমগ্র নবুয়ত ও খেলাফত যুগের ইতিহাসে আমরা কা'ব ইবনে আশরাফ ও আবুরাফে'[১৫৩] ব্যতীত এমন আর একটি লোকেরও নাম দেখিনা যাকে এ ভাবে গোপনে হত্যা করা হয়েছে। অথচ হযরতের দুশমন মাত্র এই দু'জনই ছিল না। সুতরাং এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শত্রুকে গোপনে হত্যা করা ইসলামের কোন স্থায়ী সমর নীতি নয়। এটা শুধু মাত্র এমন বিশেষ অবস্থায় বৈধ যখন শত্রু নিজে ধরা দেয় না এবং পর্দার আড়ালে বসে গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে।

আবু রাফে' কে? আবুরাফে সম্পর্কে বোখারী শরীফে বলা হয়েছে যে,

كان ابورافع يوذى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعين عليه،

"আবু রাফে' হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিত এবং তার বিরুদ্ধে শত্রুদের উস্কানী দিত।" ইবনে আ'য়েজ বর্ণনা করেন যে

كان ممن اعان غطفان وغيرهم من مشركى العرب بالمال الكثير،

'সে গেতফান প্রভৃতি মোশরেক গোত্রকে হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল।" তাবারী বলেছেন, كان حزب الاحزاب على رسول الله، "সে খন্দক যুদ্ধে রসুলুল্লাহ (সঃ)–এর বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেছিল।" ইবনে সা'দ লিখেছেনঃ قد اجلب فى غطفان ومن حوله من مشركى العرب وجعل لهم الجعل العظيم لحرب رسول الله، "সে রসুলুল্লাহর (সঃ) বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গেতফান ও অন্যান্য মোশরেকদের এক বিরাট বাহিনী সমাবেশ করে।" ইবনে আছীর লিখেছেনঃ كان يظاهر كعب ابن اشرف على رسول الله، "সে কা'ব ইবনে আশরাফকে হজরতের বিরুদ্ধে সাহায্য করতো।" ইতিহাস থেকে আরো জানা যায় যে, সেও কা'ব ইবনে আশরাফের ন্যায় নিজে কখনো প্রকাশ্য ময়দানে আসতো না। বরং পর্দার আড়ালে বসে শত্রুকে অর্থ ও সৈন্য দিয়ে হযরতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিত।

খায়বরের ইহুদী উচ্ছেদঃ

নবুয়ত যুগের পর খেলাফত যুগের যে ঘটনাটি সম্পর্কে ইসলাম বিরোধীরা সবচেয়ে বেশী আপত্তি তোলে, সেটা হলো হযরত ওমর কর্তৃক খয়বরের ইহুদী উচ্ছেদ। তাদের কথা হলো হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের ভিত্তিতে খায়বরের ইহুদীদের বন্দোবস্ত দিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রজায় পরিণত হয়েছিল, তখন হযরত ওমর কোন্ অধিকারে তাদের উচ্ছেদ ও নির্বাসিত করলেন? এতে করে তিনি কি জিম্মীদের সাথে চুক্তি লংঘন এবং তাদের অধিকার নষ্ট করেননি? প্রশ্নটা বাহ্যতঃ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসে এই ঘটনার যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে এ প্রশ্নের সত্যিকার কোন গুরুত্ব থাকেনা।

খায়বর যখন বিজিত হয় তখন প্রথম প্রথম হযরত রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইহুদীদের সন্ধি এই শর্তে হয়েছিল যে, হযরত তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেবেন। আর তারা ঐ এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।[১৫৪] কিন্তু সন্ধির পর যখন জমির স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়ার সময় এল তখন খায়বরবাসী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন জানালো যে, " আপনি আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন এবং এ ব্যাপারে আমাদের সাথে বন্দোবস্ত করেন। কেননা আমরা খেজুরের বাগান এবং কৃষি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখি।" হযরত তাদের এ আবেদন মনজুর করলেন এবং তাদের সাথে অস্থায়ী বন্দোবস্ত করলেন। বন্দেবস্তের শর্তাবলী নির্ধারণের সময় স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিলেনঃ اقركم ما اقركم الله "যতদিন আল্লাহ তোমাদের রাখবেন তত দিন আমি তোমাদের রাখবো।"[১৫৫] এর অর্থ এই যে, তোমাদেরকে স্থায়ীভাবে রাখা হবে না। বরং আল্লাহর বিধান অনুসারে যতদিন আমাদের জাতীয় স্বার্থ তোমাদের রাখার অনুমতি দেবে ততদিন তোমাদের থাকতে দেয়া হবে। আর যখন তোমাদের কার্যকলাপ ভালো হবে না, তখন এই সন্ধিপত্র অনুসারে তোমাদের নির্বাসিত করতে পারবো। ইবনে হাজার এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ "আল্লাহ যতদিন রাখবেন" রসূলুল্লাহর এই উক্তির মর্ম এই যে, যতদিন আল্লাহ তোমাদের এখানে থাকার মেয়াদ নির্ধারণ করে রেখেছেন, ততদিন আমরা তোমাদের থাকতে দেবো। কিন্তু যখন আমরা তোমাদেরকে উচ্ছেদ করতে চাইব এবং উচ্ছেদ করবো,

তখন আমাদের সেই কাজ দ্বারাই প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যতদিন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে।[১৫৬] আবু দাউদ আরো স্পষ্ট করে বলেছেনঃ كان عامل خيبر على ان نخرجهم اذا شئنا

"হযরত (সঃ) তাদেরকে এই শর্তে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন যে, আমাদের যখন খুশী তাদেরকে বের করে দিতে পারবো।[১৫৭]

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাদের সাথেএমন কোন চুক্তি ছিল না যার বিচারে তাদের উচ্ছেদ চুক্তি লংঘনের পর্যায়ে পড়তে পারে। এখন প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, অর্ধেক খাজনার ভিত্তিকে তাদের সাথে যে অস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় সেটা বাতিল করা হলো কিসের ভিত্তিতে? এ প্রশ্নের জবাবের জন্য নিম্নের ঘটনাবলী দৃষ্টিপথে রাখা প্রয়োজন। সন্ধির মাত্র দিন কয়েক না যেতেই তাদের এক মহিলা হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ)–কে দাওয়াত দিয়ে বিষ খাইয়ে দিল। পরে যখন ঘটনার তদন্ত করা হয় তখন অপরাধিনী তার অপরাধের কথা স্বীকার করে। সেই সাথে তাতে যে অন্যান্য ইহুদীদের ষড়যন্ত্রও ছিল, তাও প্রমাণিত হয়।[১৫৮]

নবুয়তের যুগেই তারা আবদুল্লাহ ইবনে ছাহল ইবনে জায়েদ আনসারী নামক সাহাবীকে গোপনে হত্যা করে একটি খালের কিনারে ফেলে রাখে।[১৫৯]

হযরত ওমরের আমলে তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরে নিয়ে কক্ষ থেকে নীচে ফেলে দেয়। ফলে তা'র একখানা হাত ভেঙ্গে যায়।[১৬০]

প্রথমোক্ত ঘটনাবলী বিশেষ কয়জন লোকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাই সাধারণ লোকদেরকে তাদের অপরাধের জন্য দায়ী মনে করা হলো না। কিন্তু এই শেষোক্ত অপরাধটি প্রকাশ্যেই করা হয় এবং এতে গোটা সম্প্রদায়ের শত্রুতামুলক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এজন্য হযরত ওমর ব্যাপারটা সাহাবাদের অধিবেশনে পেশ করলেন। তিনি এ সম্পর্কে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেনঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على اموالهم وقال نقركم ما اقركم الله وان عبد الله

ابن عمر خرج الى ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت
يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا و
تهمتنا، وقد رأيت اجلاءهم۔

"হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) খায়বরের ইহুদীদেরকে তাদের সম্পদের বিনিময়ে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আল্লাহ তোমাদেরকে যতদিন রাখেন, আমরা ততদিন রাখবো। এখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর সেখানে তার জায়গা দেখতে গিয়েছিল। রাত্রে তার ওপর আক্রমন চালানো হয় এবং তার হাত পা ভেঙ্গে দেয়া হয়। তারা ব্যতীত আমাদের আর কোন শত্রু নেই। তারাই আমাদের শত্রু এবং তাদের ওপরই আমাদের সন্দেহ। এজন্য আমার মতে তাদেরকে উচ্ছেদ করা উচিত। [১৬১]

হযরত ওমরের এই প্রস্তাবের সাথে সবাই একমত হলেন এবং ইহুদীদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কিন্তু এই অপরাধীদেরকেও খালি হাতে তাড়িয়ে দেয়া হয়নি। তাদের ধনসম্পত্তি কেড়ে রাখা হয়নি। যা তারা রেখে গেছে, বায়তুলমাল থেকে তার পূর্ণ বিনিময় মুল্য দেয়া হয়েছে। ভ্রমণের সুবিধার্থে উট ও অন্যান্য সরঞ্জাম দেয়া হয়েছে। এমনকি উটের রশীও সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। [১৬২]

অবশ্য একথা সত্য যে, কোন রেওয়ায়েতে ইহুদীদের উচ্ছেদের অন্য একটি কারণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হযরত ওমর যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিছ শুনলেন যে, لا يجتمع دينان في جزيرة العرب "আরব উপদ্বীপে দু'টো ধর্ম একত্রে থাকবে না।" তখন তিনি তার সত্যাসত্য যাচাই করলেন। যখন কথাটা সত্য প্রমাণিত হলো, তখনই ইহুদীদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিলেন। বালাজুরী[১৬৩] ও ইমাম জুহরী[১৬৪] হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আরব থেকে সমস্ত অমুসলিমকে তাড়াতে হবে, এমন কথা এ হাদিসে দাবী করা হয়নি। ইমাম জুহরীর রেওয়ায়েত থেকেও তা বুঝা যায়। তিনি বলেছেন, হাদীসটি খাঁটি বলে প্রমাণিত হবার পর হযরত ওমর সমগ্র আরবে ঘোষণা করে দিলেন যে من كان له من اهل الكتا "ইঞ্জিল ও তাওরাতের অনুসারীদের মধ্যে কারো কাছে যদি কোন চুক্তি থেকে থাকে তবে সে যেন তা নিয়ে আসে, আমি বাস্তবায়িত করবো।"[১৬৫]

জানা কথা যে, সকল অমুসলিমকে নির্বিচারে আরব থেকে বিতাড়িত করাই যদি হাদিসের উদ্দেশ্য হতো তা হলে তিনি ঐ ঘোষণা জারী করাতেন না। বরং কারো চুক্তি থাক বা না থাক, সমস্ত অমুসলিমকে এক সঙ্গে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু তা যখন তিনি করেননি, বরং চুক্তিবদ্ধদের কাছে চুক্তিপত্র চেয়েছেন এবং তাদের চুক্তি বাস্তবায়িত করা হবে বলে ওয়াদাও করেছেন তখন তার মর্ম এটাই হবে যে, এ হাদীস দ্বারা নির্বিচারে বহিষ্কার করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ নীতি নির্ধারণ–যা অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এরূপ মনে করার কোন ভিত্তি নেই যে, দুই ধর্মের একত্রে উপস্থিতি পছন্দনীয় ছিলনা বলেই একটি জিম্মী সম্প্রদায়কে দেশান্তরিত করা হয়েছে। বরং ঘটনার অধীকতর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মনে হয় এই যে, খায়বরের ইহুদীদের ক্রমাগত ওয়াদাখেলাপী ও বিশ্বাসঘাতকতায় অতিষ্ঠ হয়ে হযরত ওমর তাদের উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েও একটা জিম্মী সম্প্রদায়ের সাথে এরূপ করতে ইতস্ততঃ বোধ করেছিলেন। সে জন্য তিনি শরিয়তের কোন দলীল–প্রমাণ হয়তো খুঁজছিলেন। ঠিক এই সময়েই তিনি এ হাদিসটি পেয়ে এবং তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মনস্থির করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বর্ণনাকারীগণ এই একটি ঘটনাকে দুটো আলাদা ঘটনার রূপ দেন এবং দুটো পৃথক রেওয়ায়েতের আকারে বর্ণনা করতে থাকেন।

নাজরানবাসীর উচ্ছেদ

খেলাফতে রাশেদার দ্বিতীয় যে ঘটনাটি খায়বরের চেয়েও বেশী আপত্তি ও অভিযোগের কারণ ঘটিয়েছে, সেটা হলো নাজরানের খৃষ্টানদের উচ্ছেদ। খায়বরের ইহুদীরাতো যুদ্ধের মাধ্যমেই বিজিত হয়েছিল এবং তাদের সাথে প্রথমে এই শর্তেই সন্ধি হয় যে, তারা নির্বাসন বরণ করে নেবে। এজন্য বিরোধীরা সেখানে প্রশ্ন তোলার বেশী সুযোগ পায়নি। কিন্তু নাজরানবাসী যুদ্ধ ছাড়াই আপনা থেকে আনুগত্য প্রকাশ করে এবং জিজিয়া দিয়ে হযরতের নিকট থেকে যথারীতি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নেয়। এ জন্য তাদের উচ্ছেদকে ইসলাম বিরোধীরা স্পষ্ট ওয়াদা ভঙ্গ বলে অভিহিত করে। তাদের সমস্ত আপত্তির ভিত্তি হলো এই যে, সন্ধিপত্রে তাদেরকে শর্তহীন নিরাপত্তা দেয়া

হয়েছিল। হযরত ওমর অবৈধভাবে সেই নিরাপত্তা চুক্তি বাতিল করেন। কিন্তু ঘটনার গভীরতর তদন্তে গেলে এ অভিযোগ ভুল বলে প্রমাণিত হবে।

নাজরানবাসীর সাথে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে চুক্তি হয়েছিল তাতে খৃষ্টানদেরকে এই শর্তে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যতক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকবে এবং তার প্রাপ্য ঠিকমত দিতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আশ্রয় ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ষা কবচ লাভ করবে। বালাজুরী ও ইমাম আবু ইউসুফ যে চুক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছেঃ

لهم ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد
النبي ابدا حتى ياتي امر الله، ما نصحوا او اصلحوا فيما عليهم۔[১]

"তাদের জন্য এই চুক্তিপত্রে যা কিছু আছে তার বিনিময়ে আল্লাহর আশ্রয় ও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরস্থায়ী রক্ষা কবচ ঘোষিত হলো। যতক্ষণ আল্লাহর ফয়সালা না আসে, যতক্ষণ তারা হিতাকাংখী থাকে এবং তাদের কাছে যা প্রাপ্য তা ঠিকমত দিতে থাকে, ততক্ষণ এই রক্ষা কবচ বলবত থাকবে।"[১৬৬]

অনুরূপভাবে হযরত আবুবকর (রাঃ) খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর যে চুক্তি পত্র তাদের লিখে দেন তাতেও স্পষ্টভাবে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, وعليهم النصح والاصلاح فيما عليهم من الحق - "ইসলামী রাষ্ট্রের হিত কামনা ও প্রাপ্য দিতে থাকা তাদের জন্য বাধ্যতামুলক।"[১৬৭]

এই চুক্তি অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্র যেমন তাদের নিরাপত্তা ও তাদের সাবেক অবস্থা বহাল রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তেমনিভাবে নাজরানবাসীর কাছ থেকেও অঙ্গীকার নিয়েছিল যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকবে এ অঙ্গীকার দুনিয়ার সকল সরকারই তার প্রজাদের কাছ থেকে নিয়ে থাকে। কিন্তু নাজরানবাসী এ অঙ্গীকার কতখানি পালন করেছিল? তারা ما نصحو او اصلحوا অব্যাহত হীত কামনা ও প্রাপ্য প্রদান এর শর্ত কতখানি পালন করেছিল? ইতিহাস থেকে আমরা এ প্রশ্নের যে জবাব পাই তা নৈরাশ্যজনক। তারা ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। ইমাম আবু ইউসুফ

কিতাবুল খারাজে পরিস্কারভাবে লিখেছেনঃ "اجلاهم لانه خافهم على المسلمين وقد كانوا اتخذوا الخيل والسلاح فى بلادهم" হযরত ওমর তাদেরকে এ জন্য দেশান্তরিত করেন যে, তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের আশংকা করছিলেন। তারা নিজ অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়ার সমাবেশ ঘটিয়েছিল।"১৬৮

আরবের মানচিত্রের ওপর একটা নজর বুলালেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নাজরানবাসীর এইসব প্রস্তুতি কি ভীষণ বিপদের ইংগিত বহন করছিল। একদিকে তাদের অব্যবহিত উত্তরেই ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হেজাজ অবস্থিত ছিল। অপরদিকে ছিল তাদের সামনেই লোহিত সাগরের অপর তীরে ইথিওপিয়ার (তৎকালীন হাবসা বা আবিসিনিয়া) খৃষ্টান সাম্রাজ্য। নাজরানবাসী যদি নিজেদের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে হেজাজের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বসতো এবং সহধর্মী আবিসিনিয়াকে আবরাহার অসম্পুর্ণ পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ করার জন্য নিজেদের সাহায্যার্থে ডেকে আনতো, তাহলে মুসলমানদের কি সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হতে হতো, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

ইবনে আছীর ও বালাজুরী বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তার কল্যাণে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে চল্লিশ হাজারে গিয়ে ঠেকেছিল। আর আর্থিক প্রাচুর্য তাদের ভেতরে গৃহযুদ্ধের প্রবণতা বাড়িয়ে তুলেছিল। তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী হযরত ওমরের কাছে গিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো এবং একদল অপর দলকে উচ্ছেদ করার জন্য হযরত ওমরকে পরামর্শ দিত। প্রথম দিকে হযরত ওমর সমস্যাটি অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধির দরুন যখন স্বয়ং ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়লো, তখন তিনি সুযোগ বুঝে তাদের উচ্ছেদের নির্দেশ জারী করলেন।১৬৯

এতদ্‌সত্বেও, তাদের বিদ্রোহ প্রস্তুতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া সত্বেও তাদেরকে একেবারেই ইসলামী রাষ্ট্রের চতুঃসীমা থেকে বিতাড়িত করা হয়নি। শুধুমাত্র আরব থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তাদেরকে "আল্লাহর আশ্রয় ও হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ষা কবচ" থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। বরং সেই আশ্রয় ও রক্ষা কবচের আওতার মধ্যেই একটি অবাঞ্ছিত স্থান থেকে সরিয়ে অন্য একটি বাঞ্ছিত স্থানে সরিয়ে দেয়া

হয় মাত্র। নাজরান থেকে তাদের বহিষ্কারের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, তারা হেজাজ ও আবিসিনিয়ার মধ্যস্থলে একটা বিপজ্জনক সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে যেন না থাকে। এর চেয়ে বেশী তাদেরকে আর কোন শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য ছিল না। তাই হযরত ওমর তাদেরকে একই নাজরানের ইয়ামনী এলাকা থেকে বের করে ইরাকী এলাকায় স্থানান্তরিত করেন। তাদের ভুমির পরিবর্তে ভুমি দেন, দুই বছরের জিজিয়া মাফ করে দেন, ইয়ামন থেকে ইরাক পর্যন্ত যাওয়ার সমস্ত সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করেন এবং কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়ে দেন যে, তাদের যেন কোন রকম কষ্ট না হয়। ইমাম আবু ইউসুফ এই ফরমানকে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। এর কয়েকটি অংশ নীচে দেয়া হলোঃ

"সিরিয়া ও ইরাকের কর্মচারীদের মধ্যে যার কাছেই তারা যাক, তিনি যেন তাদের বাসযোগ্য জমি দেন। যে জমিতে তারা চাষ করবে, তার ফসল তাদের জন্য আল্লাহর রাহের সদকা স্বরুপ। সে জমি তাদের জন্য ইয়ামনে তারা যে জমি রেখে গেছে, তার বিনিময় স্বরুপ। এই জমিতে তাদের ওপর কোন হস্তক্ষেপ যেন না করা হয়।...... কেউ যদি তাদের ওপর জুলুম করে, তবে সেখানে অবস্থানকারী মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা তারা আমাদেরই আশ্রিত একটি জাতি। তাদের জিজিয়া ২৪ মাসের জন্য মাফ করে দেয়া হলো।।"[১৭০]

আপত্তি উথাপন কারীরা এত সব তথ্য ভুলে গিয়ে শুধু এটুকু মনে রেখেছেন যে, নাজরানবাসীর সাথে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, হযরত ওমর তা ভঙ্গ করে তাদেরকে উচ্ছেদ করেছেন। কিন্তু এই গোটা পরিস্থিতি সামনে রেখে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, আজকের এই বিংশ শতাব্দীতেও যদি কোন মানব গোষ্ঠী নাজরানবাসীর মত চরিত্রের পরিচয় দেয় এবং তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থানও যদি নাজরানবাসীর মত হয় তা হলে একটি সভ্য দেশ আপন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সেই মানব গোষ্ঠীটির সাথে কি রূপ আচরণ করবে?

৬। আধুনিক সমর আইন প্রণয়ন

এই অধ্যায়ে এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো তাতে জানা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত যুদ্ধের বাস্তব দিক সমূহের কোন একটি দিককেও একটি সুষ্ঠু

আইনের আওতাভুক্ত না করে ক্ষান্ত হয়নি। পৃথিবীতে যুদ্ধের যতগুলো পৈশাচিক ও হিংস্র রীতি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইসলাম তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়েছে এবং যুদ্ধ ও যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নতুন মানবোচিত আইন প্রণয়ন করেছে। কিছু কিছু প্রাচীন রীতিকে চালু রাখলেও যুগের চাহিদার আলোকে অনেকটা পরিশুদ্ধ ও পরিবর্তিত আকারে তা রেখেছে এবং তার মধ্যে পর্যায় ক্রমিক সংস্কার সংশোধনের এমন উপযোগিতা ও নমনীয়তা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, সভ্যতার বিবর্তন , পরিস্থিতি ও পরিবেশের ওলট পালট ও মানবিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে তাতে যেন আপনা আপনি সংশোধন হতে থাকে। আবার কতকগুলো নতুন বিধিও চালু করেছে। এ গুলিতেও উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য এমন নমনীয়তা রাখা হয়েছে যে, প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন অনুসারে তা থেকে শাখা-প্রশাখা ও খুটিনাটি বিধি তৈরী করা যেতে পারে। সেই সাথে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবাগণ এমন নমুনা রেখে গেছেন যে, তার দ্বারা শরীয়তের মূল দাবী ও প্রাণ শক্তি কি, তা পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই প্রাণশক্তিকে সামনে রেখে আমরা প্রতিটি নতুন ঘটনায় ও অবস্থায় ইসলামী কর্মনীতি কি হওয়া উচিত, তা বুঝতে পারি। প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে ফকিহগণ এই উপাদান থেকেই একটা পুর্ণাঙ্গ সমর বিধি প্রণয়ন করেছিলেন যা পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যে চালু ছিল। কিন্তু সে যুগের সমর বিধি বর্তমান যুগের জন্য যথেষ্ট নয়। সে যুগের প্রণীত বহু খুটিনাটি বিধি এ যুগে অচল। আবার বর্তমান যুগের সামরিক রীতি ও সামাজিক বিবর্তনের কারণে অনেক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এ সবের জন্য প্রয়োজনীয় খুটিনাটি বিধি প্রাচীন ফেকাহ গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। এ জন্য আমাদের মূল উৎস কোরআন ও হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা প্রয়োজন। এতে যে সব মৌলিক ও খুটিনাটি বিধি আছে, তার আলোকে আজকের প্রয়োজন অনুপাতে একটা পূর্ণাঙ্গ আইন রচনা করা আমাদের কর্তব্য। এই নতুন আইন প্রণয়নের কাজ এমনভাবে হওয়া উচিত যে, যে সব ব্যাপারে খুটিনাটি বিধি আমরা কোরআন ও হাদিসে পাই, তা হুবহু গ্রহণ করবো। আর যে সব ব্যাপারে শুধুমাত্র মৌলিক বিধান দেওয়া হয়েছে, খুটিনাটি বিধি দেওয়া হয়নি, সে সব ব্যাপারে শরীয়তের মূলনীতি, প্রাচীন মুসলিম মনিষীদের মতামত এবং বর্তমান যুগের প্রয়োজনের আলোকে খুটিনাটি বিধি তৈরী করতে হবে। আর যে সব ব্যাপারে

শরীয়ত আমাদেরকে গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষমতা দিয়েছে সেসব ক্ষেত্রে এ যুগের পরিত্যক্ত জিনিসগুলোকে আমরাও বর্জন করতে পারি(হারাম বা অবৈধ করতে নয়) এ সব ক্ষেত্রে এ প্রাচীন ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের লিখিত গ্রন্থাবলীর ওপর আমাদের পুরোপুরি নির্ভর করাও উচিত নয়, আবার তা একেবারে উপেক্ষা করাও ঠিক নয়। এই মহান মনিষীগণ যে মূল্যবান কাজ করে গেছেন তা একেবারে বৃথাও নয় যে, আজে বাজে কাগজের মত ফেলে দেব। আবার শরীয়তের মৌল বিধানের ন্যায় অটল এবং অকাট্যও নয় যে, যুগের প্রয়োজন অনুপাতে তাতে কোন পরিবর্তন আনা যাবেনা। এই উভয় পন্থার মধ্যে আমাদেরকে একটা মধ্যম পথ অবলম্বন করতে হবে। সেই মধ্যম পথ হলো, তাদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের যে টুকু এ যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটুকু আমরা গ্রহণ করবো আর যে টুকু অচল ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটুকু বাদ দিয়ে সরাসরি শরীয়তের মূল উৎস থেকে খুটিনাটি বিধি সংগ্রহ করবো।

উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কোরআন ও হাদিসে আমরা যুদ্ধবন্দী, আহত,পীড়িত ও নিরপেক্ষদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে এবং এ ধরনের আরো বহু বিষয় সম্পর্কে শুধু মূলনীতি পাই। বিস্তারিত খুটিনাটি বিধি পাওয়া যায় না। এই যে শুধুমাত্র মূলনীতি বলে দিয়ে ক্ষান্ত থাকা এবং বিস্তারিত খুটিনাটি না বলার তাৎপর্য এই যে, শরিয়ত প্রত্যেক যুগের মুসলমানদেরকে সেই যুগের প্রয়োজন অনুসারে খুটিনাটি বিধি তৈরীর অধিকার দিয়েছে। সুতরাং এ সব বিধির জন্য আমাদের পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর (হিজরী) লিখিত ফেকাহ গ্রন্থাবলীর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তাতে যে সব খুটিনাটি বিধিমালা রয়েছে, তা গ্রহণ করারও আবশ্যকতা নেই। আমাদের কর্তব্য হলো যুগের দাবী অনুসারে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুগোপযোগী আইন তৈরী করা। এমনকি প্রচলিত আইন সমূহের মধ্যে যেগুলো যতখানি শরীয়তের দাবীর সাথে সামঞ্জস্যশীল তা ততটুকু আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং এ যুগের আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও চুক্তিগুলোতেও আমরা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শামিল হতে পারি। ইসলাম এ অধিকার আমাদের দিয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি বর্তমান অধ্যায়ে শীরয়তের আসল উৎস কোরআন ও হাদীস থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ আইনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে দিতে পারে এমন সমস্ত মৌল ও খুটিনাটি বিধি উদ্ধৃত করেছি। সেই সাথে যেখানে যেখানে প্রাচীন মনীষীদের বক্তব্য সমূহ আধুনিক যুগ–

চাহিদার সামঞ্জস্যশীল মনে হয়েছে, তাও উল্লেখ করেছি। আর যে কয়টি ব্যতিক্রমধর্মী বিধি দেখে বাহ্যিক–দৃষ্টিতে লোকদের মনে ইসলামী আইনে স্ববিরোধিতা ও বৈপরিত্য রয়েছে বলে সন্দেহ হয়, তারও ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। এখন এই সব উপাদান সামনে রেখে ফেকাহ শাস্ত্রের সর্বাধুনিক 'সমর বিধি' রচনা করা আধুনিক ফেকাহ শাস্ত্রকারদেরই কাজ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

অন্যান্য ধর্মে যুদ্ধ

কোন জিনিস ভুল না ঠিক, তা নির্ণয় করার জন্য আগে দেখতে হয় খোদ সেই জিনিসটা কেমন? তারপরে দেখতে হয়, অন্যান্য জিনিসের মাঝে তার মর্যাদা কি? এই দুই দিক দিয়েই যখন তা ভালো প্রমাণিত হয় তখনই তাকে যথার্থ শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট দেয়া হয়। তত্ত্বানুসন্ধানের এই পদ্ধতি অনুসারে আমরা প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করেছি। এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বাকী। এ পর্যায়ে আমরা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মোকাবেলায় রেখে এবং তারপরে আধুনিক সমর আইনের সাথে তুলনা করে দেখবো যে, তাদের প্রক্রিয়া ইসলামী প্রক্রিয়ার তুলনায় কেমন। যেখানে তারা যুদ্ধকে বৈধ রেখেছে, সেখানে তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ইসলামের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি থেকে ভালো না মন্দ। আর যেখানে তারা যুদ্ধকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে, সেখানে তাদের শিক্ষা ও আদর্শ মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, না ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ তার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

আন্তঃ ধর্মীয় তুলনামূলক পর্যালোচনার মূলনীতি

ধর্মের সাথে ধর্মের তুলনা করা খুবই কঠিন কাজ। মানুষ যে মতবিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল হয়, তার বিপরীত ও বিরোধী মতবিশ্বাসের প্রতি সে খুব কমই সুবিচার করতে পারে। এ দুর্বলতা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে অত্যন্ত ব্যাপক। বিশেষত ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে এটা নিকৃষ্টতম গোড়ামী ও সংকীর্ণতার রূপ ধারণ করেছে। এক ধর্মের অনুসারী যখন অন্য ধর্মের সমালোচনা করে তখন সব সময়ই তার খারাপ দিকগুলোই খুঁজে বের করে। আর ভালো দিকগুলো হয় দেখতেই চেষ্টা করেনা, নচেত দেখেও দেখেনা এবং ইচ্ছাপূর্বকভাবে তাকে গোপন করার চেষ্টা করে। ধর্মীয় সমালোচনা দ্বারা সে আসলে সত্যানুসন্ধান করতে চায় না, বরং যে মতটি সে ভালো মত যাচাই বাছাই না করে গ্রহণ করেছে, তাকে সঠিক প্রমাণ করতে চায়। এ পদ্ধতিতে

আত্মধর্মীয় তুলনা মুলক পর্যবেক্ষেণের সমস্ত উপকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। এ দ্বারা যে ধর্মের পক্ষে এই বিভ্রান্তিকর প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তারও কোন লাভ হয় না। তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য যদি সত্যানুসন্ধান এবং সত্য গ্রহণ করা ছাড়া কিছু না হয়ে থাকে, তা হলে এ কর্মপন্থা সে উদ্দেশ্য সাধনে মোটেই সহায়ক নয়। এক শ্রেণীর লোক প্রথম থেকেই মনে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধবাদী মত বদ্ধমূল করে নেয়, তারপর ঐ ধর্মের উজ্জল দিকগুলো ঢেকে রেখে কেবল তার খারাপ দিকগুলো সন্ধান করত সেই ধর্মের উপর নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার কাজে নিয়োজিত হয়। আর শুধু এ উদ্দেশ্যে তারা ঐ বিরুদ্ধবাদী ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনাও করে থাকে। এটা সুস্পষ্ট অসততা ও ধোকাবাজী। এতে করে প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করা যায় না। আর এ ধরণের সফলতা কোন সত্য ধর্মের জন্য গৌরবজনকও হতে পারে ন। আর সত্য ও সততার দৃষ্টিতে তেমন ধর্মের কোন মর্যাদা থাকতে পারেনা। এ ধরনের দুর্নীতি ও ধোকাবাজীর মাধ্যমে কেউ যদি সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসীও হয় তাহলে সেই বিশ্বাস নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। কেননা তার ভিত্তিই হবে ভ্রান্ত।

সম্ভাব্য এ সব ক্রুটি থেকে আত্মরক্ষা করে আত্মধর্মীর তুলনামূলক পর্যালোচনাকে একটা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে দিতে হলে প্রথমে তুলনার জন্য কয়েকটা মূলনীতি নির্ধারন করা এবং তা কঠোর ভাবে মেনে চলা আবশ্যক, আমার মতে সে মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্চনীয়ঃ

(১) এক ধর্মের শিক্ষাকে সঠিক প্রমান করার জন্য অন্যান্য সকল ধর্মের শিক্ষাকে পুরোপুরি ভ্রান্ত প্রমাণ করা অপরিহার্য নয়। এটাও জরুরী নয় যে এক ধর্মে সত্য আছে বলে অন্য কোন ধর্মে তা একেবারেই থাকবে না। সত্য হচ্ছে একটা সাধারণ ও কেন্দ্রীয় একক। যেটুকু সত্য নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তা মূলত এই কেন্দ্রীয় এককেরই অংশ, তারই শাখা প্রশাখা। স্থানও কালের পরিবর্তনে তার মৌলিকত্ব ও বাস্তবতা পরিবর্তিত হয় না। যে সত্য আমাদের ধর্মে আছে, তা যদি অন্য ধর্মেও থেকে থাকে তা হলে তা দু'ধর্মের কোনটারই ক্রুটি বা কলংক নয় যে, অনর্থক তা গোপন করতে হবে। আসলে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, দুই ধর্মই কোন একটা সাধারণ সত্য উৎস থেকে উৎসারিত এবং কমবেশী তার প্রবাহ দু'ধর্মের মধ্যেই নিহিত।

অতএব সত্যের যেটুকু প্রবাহ এবং যে ধরনের প্রবাহ কোথাও বর্তমান তার যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে। অনর্থক টালবাহানা করে তাকে মূল্যহীন ও মর্যাদাহীন সাব্যস্ত্য করার জন্য শক্তির অপব্যয় করা অনুচিত।

(২) যে ব্যক্তি দাবী করে যে, সত্য তার ধর্মে ব্যতীত আর কোথাও নেই, সে অন্যান্য ধর্ম ছাড়াও খোদ সত্যের ওপরও জুলুম করে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সত্যের আলো কম বেশী সব ধর্মেই রয়েছে। তবে বিজ্ঞ মনীষীরা যখন কোন একটা ধর্মকে অন্যান্য ধর্মের ওপর অগ্রগণ্য মনে করেন তখন সেরূপ মনে করার কারণ এই হয়ে থাকে যে, তাদের দৃষ্টিতে সেই ধর্মে সত্যের পূর্ণতর প্রতিফলন ঘটেছে। সুতরাং আন্তঃ ধর্মীয় তুলনামূলক পর্যবেক্ষণে কোন ছাত্রের পূর্বাহ্নে এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকা চাই না যে, তার প্রিয় ধর্ম ছাড়া অন্য সব ধর্ম সত্যের জ্যোতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। তার বরং বুঝা দরকার যে, হক ও বাতিল তার কাছে মিশ্রিতভাবেই আসবে এবং নিজের বিবেক বুদ্ধি ও নির্বাচন ক্ষমতা প্রয়োগ করে হককে হক ও বাতিলকে বাতিল বলে গ্রহণ করা ও একটিকে অপরটির সাথে মিশ্রিত হতে না দেওয়াই তার কাজ।

(৩) ধর্মীয় তত্ত্বানুসন্ধানের কাজে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, কোন ধর্মের উগ্র বিরোধী ও গোড়া অনুগামী উভয় শ্রেনীর লেখকদের লেখা বই–পুস্তক পড়া থেকে যেন বিরত থাকা হয়। প্রাথমিক তত্ত্বানুসন্ধানের বেলায় এ জাতীয় লেখকদের বই পড়লে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা যায় ন। কেননা যে ধর্ম নিয়ে কোন ব্যক্তি তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত, সে ধর্মের আসল চেহারা দেখতে পাওয়ার আগেই তার চোখের ওপর একটা বিশেষ রঙ্গের চশমা এঁটে দেয়া হয়–যার দরুণ সে ঐ ধর্মকে তার প্রকৃত চেহারায় কখনো দেখতে পায় না। যদি এই তত্ত্বানুসন্ধানকে একটা সঠিক সিন্ধান্তে পৌঁছানো প্রয়োজন হয় তা হলে একটি ধর্মকে অন্যরা কি আকারে দেখে, তা না দেখে সেই ধর্ম নিজে নিজেকে কি আকারে দেখায়, সেটাই আগে বুঝতে হবে। এজন্য যথাসম্ভব প্রত্যেক ধর্মের মূল উৎসগুলো অধ্যয়ন করা উচিত। সেগুলো পড়ে তার আলোকে আপন বিবেকের সাহায্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ঐ ধর্ম কতদুর নির্ভুল এবং কতটাইবা ভ্রান্ত। এরপর সে যখন নিজের একটা মত স্থির করে নেবে, তার অন্যদের মতামত পড়ে দেখায় কোন ক্ষতি নেই। কেননা তখন সে সত্য ও মিথ্যা এবং হক ও বাতিলের মধ্যে সহজেই পার্থক্য করতে পারবে।

পরবর্তী পাতাগুলোতে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধর্মের মতামত ও শিক্ষা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে এই তিনটি মূলনীতিকে মেনে চলা হয়েছে। আপন ধর্মের সমর্থন করার আবেগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনের চেষ্ট করা হয়েছে।

পৃথিবীর চারটে বড় বড় ধর্ম

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে দুনিয়ার ছোট বড় সকল ধর্মের যুদ্ধ সংক্রান্ত মতামত ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সকল ধর্ম নিয়ে এরূপ সার্বিক আলোচনা করা সহজও নয় তার প্রয়োজনও নেই। দুনিয়ার যে কয়টি ধর্ম তার অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য, তার প্রভাবের ব্যাপকতা এবং অতীত ও বর্তমান গৌরবের বিচারে বড় ধর্ম বলে গণ্য হয়ে থাকে, সাধারণত আন্তঃধর্মীয় তুলনামূলক পর্যালোচনা কেবলমাত্র সেই ধর্মের মধ্যেই সীমিত থাকে। এই নীতি অনুসরণ করেই আমি আমার আলোচনাকে চারটে প্রধান ধর্মের মধ্যে সীমিত রাখবো যথা–হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টানধর্ম।

যুদ্ধ সংক্রান্ত মতামতে এ চারটে ধর্ম দুই শিবিরে বিভক্তঃ একটা শিবির যুদ্ধকে বৈধ বলে রায় দিয়েছে। এতে আছে হিন্দু ধর্ম ও ইহুদীবাদ। অপর শিবির যুদ্ধকে অবৈধ মনে করে। এ শিবিরে রয়েছে খৃষ্টান ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। আমরা প্রথম শিবির থেকেই আলোচনা শুরু করতে চাই।

১–হিন্দু ধর্ম

হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, আসলে হিন্দুধর্ম বস্তুটা কি? শব্দটি সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত সেই অর্থে এ মতবাদ আদৌ ধর্মই নয়। ধর্মের জন্য একটা কেন্দ্রীয় আকিদা–বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন –যার ওপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের সেই ধরনের কোন কেন্দ্রীয় আকিদা–বিশ্বাস আমাদের নজরে পড়ে না। এতে আছে আলাদা আলাদা কতকগুলো শ্রেণী। আকিদা–বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার পদ্ধতি, কৃষ্টি, উপাসনা ও ধর্মগ্রন্থ সবই এদের পরস্পর থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তা সত্ত্বেও এই শ্রেণী সমূহের সকলেই একই ধর্মের লোক বলে পরিচিত[১৭১] এবং সকলেই "হিন্দু" নামে অভিহিত। এ জন্য যখন আমরা কোন ব্যাপারে

হিন্দুধর্মের অভিমত চাই, তখন এর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোনটাকে জিজ্ঞাসা করবো –সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য হিন্দুদের নতুন ধর্মীয় চিন্তাধারা এই সমস্যাকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে, যদিও ধর্মীয় মতদ্বৈত এখনো আছে। কয়েকটা বিশেষ গ্রন্থের মধ্যে আপন ধর্ম-বিশ্বাসকে কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তাদের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ এই গ্রন্থ কয়টিকে নিজেদের ধর্মের ভিত্তি হিসেবে মেনে নিয়েছে। এই গ্রন্থ তিনটি ঃ চার বেদ, গীতা ও মনুসংহিতা। আমি হিন্দুধর্ম নিয়ে যেটুকু আলোচনা করতে চাই, তা এই তিনটি গ্রন্থের ভিত্তিতেই করবো।

হিন্দুধর্মের তিনটি যুগ

উক্ত তিনটি গ্রন্থ ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তিনটে পৃথক যুগের সাথে সম্পৃক্ত। এতে যুদ্ধ সংক্রান্ত হিন্দু আদর্শের তিনটে দিক প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

আর্যজাতি যখন মধ্য এশিয়া থেকে বেরিয়ে ভারতবর্ষের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর বর্ণ, প্রজাতিক ঐতিহ্য ও ধর্মের ধারক আদিম ভারতীয়দের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, বেদ সে যুগেরই সৃষ্টি। এখানকার অচেনা শত্রুদের বিরুদ্ধে হানাদারদের মনোভাব কেমন ছিল, তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি ছিল এবং তারা তাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করার পক্ষপাতী ছিল বেদের শ্লোকগুলো থেকে এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়।

উত্তর ভারতে যখন আর্যদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আর্যদের দুটো প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে গেছে, সে যুগের গ্রন্থহলো গীতা। এ গ্রন্থখানিতে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ধর্মীয় নেতার মুখ থেকে আমরা হিন্দুদের যুদ্ধ সংক্রান্ত দার্শনিক চিন্তাধারার সন্ধান পাই।

আর ভারত যখন পুরোপুরিভাবে 'আর্যবর্তে' পরিণত হয়েছে অনার্যদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং আর্য সভ্যতা যখন পূর্ণ শক্তি নিয়ে বিকাশমান, তখনকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধিমালা সন্নিবেশিত হয়েছে মনুসংহিতায়। এতে যুদ্ধের নিয়মকানুন এবং বিজিত জাতিসমূহের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

পরবর্তী আলোচনায় এই ধারাক্রম অনুসারেই আমরা অগ্রসর হবো।

বেদের যুদ্ধ সংক্রান্ত শিক্ষা

চারখানা গ্রন্থকে বেদ বলা হয়। এর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন ঋগবেদ, তারপর যজুবেদ, তারপর শামবেদ, অতপর অথর্ববেদ। এই সব বেদের শ্লোক সমুহকে বিষয় বস্তুর ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই শ্লোকে একাধিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ জন্য আমি বিষয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য না রেখে কোন না কোন ভাবে যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত এমন শ্লোক গুলোকে প্রত্যেক বেদ থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ ১৭২

ঋগবেদ

ঋগবেদের যে শ্লোকগুলোতে যুদ্ধ সংক্রান্ত বক্তব্য আছে, তা নিম্নরূপঃ

"হে ইন্দ্র! সেই সম্পদ দাও যা আনন্দ দেয়। বিজয়ীর চিরন্তন বিজয়লব্ধ সম্পদ দাও যা আমাদের প্রচুর সাহায্য করতে পারে, যার সাহায্যে আমরা মুখোমুখি যুদ্ধে শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে পারি।"১ ঃ ৮ ঃ '১ ঃ ২

"হে জ্বলন্ত আগুন! তোমাতে পবিত্র তেল ঢালা হয়। তুমি আমাদের সেই সব শত্রুকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও–যাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করে পাপিষ্ঠ ও পংকিল আত্মা সমুহ।(১ ঃ ১২ ঃ ৫)

"ইন্দ্র ও বর্ধনার সাহায্যে আমরা বিপুল সম্পদ–সঞ্চয় করবো। হে ইন্দ্র ও বর্ধনা, তোমাদের আমরা সম্পদের জন্য নানাভাবে ডাকি। আমাদেরকে বিজয়ী করো।''(১'১৭ ঃ ৬ ঃ ৭)

"প্রত্যেক দুর্মুখকে হত্যা কর। যে গোপনে আমাদের কষ্ট দেয় তাকেও নিশ্চিহ্ন করে দাও। হে ইন্দ্র, আমাদেরকে হাজার হাজার সুদর্শণ ঘোড়া ও গাভী দাও।"

"তুমি আর্য্য ও দাস্যদের[১৭৩] মধ্যে পার্থক্য কর! যারা অধার্মিক, তাদের শাস্তি দাও এবং যার ঘাস (দেবতার অর্ঘ্য দেয়ার জন্য) কেটে রাখা হয়েছে তার হাতে সপে দাও।" (১ ঃ ৫৯ ঃ ৮)

ঐসব সুন্দর অগ্নিশিক্ষা ও সোমরসের বিন্দুসমূহের খুশী হয়ে আমাদের ঘোড়া ও গাভীর অভাব দূর কর। এই বিন্দুসমূহের দোহাই, হে ইন্দ্র,

দাস্যদের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দাও যেন তাদের ঘৃণা থেকে আমরা রক্ষা পাই এবং প্রচুর সম্পদ অর্জন করতে পারি। হে ইন্দ্র, আমাদেরকে প্রচুর ধনসম্পদ ও খাদ্য সংগ্রহ করতে দাও...যেন আমরা বীরদের মত শক্তি অর্জন করতে পারি। জীবজন্তু ও ঘোড়া লাভ করার এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা।" (দাস্য অর্থ অনার্য) (১ ঃ ৫৩ ঃ ৪ ঃ ৫)

হে ইন্দ্র, আমাদেরকে বাড়ন্ত ঐশ্বর্য্য দান কর, সেই শক্তি ও পরাক্রম দান কর যা দিয়ে জাতিসমূহকে পরাজিত করা যায়, আমাদের বিত্তশালী সরদারদের বহাল রাখ, আমাদের রাজাদের রক্ষা কর, আমাদেরকে সম্পদ, খাদ্য ও ভদ্র সন্তান দাও।" (১ ঃ ৫৪ ঃ ১১)

"হে অগ্নি! তোমার বিত্তশালী পুজারীরা যেন আরো খাদ্য লাভ করে, আমরা যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করি। আমরা যেন শত্রুদের সাথে লড়াই করে প্রচুর সম্পদ লাভ করতে পারি এবং দেবতাদেরকে যেন তার অংশ দিতে পারি। হে অগ্নি, আমরা যেন তোমার সাহায্যে ঘোড়ার দ্বারা ঘোড়া, মানুষের দ্বারা মানুষ এবং বীরের দ্বারা বীর জয় করতে পারি।' ১ঃ ৭৪ঃ ৫–৯)

"মহা শক্তিমান ইন্দ্র রাজা নিজের গৌরবর্ণের[১৭৪] (আক্রমণকারী আর্য) বন্ধুদের সহযোগে ভুমি জয় করলেন, সূর্যের কিরণ এবং সাগর জয় করলেন। হে ইন্দ্র! আমাদের সহায় থাক যেন আমরা নির্ভয়ে সম্পদ লুটতে পারি।"

"হে ইন্দ্র, তুমি পুরুর জন্য, আপন ভৃত্য দেবদাসের জন্য এবং আপন পুজারীর জন্য ৯০টি দুর্গ চুরমার করেছ। এই শক্তিমান অতিথগোর জন্য শিম্বারকে পর্বত থেকে নামিয়েছেন, আপন শক্তির বলে বিরাট ধনভাণ্ডার বন্টন করেছেন। ইন্দ্র যুদ্ধে স্বীয় আর্য পুজারীদের সাহায্য করেছেন। তিনি প্রত্যেক যুদ্ধে বহু বিজয় প্রস্তুত করে রাখেন।" (১ ঃ ১৩০ ঃ ৭৮)

"হে ইন্দ্র মঘন! আমরা যুদ্ধে তোমার সাহায্য পেয়ে যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের যেন পরাজিত করতে পারি। আজকের দিনে যারা সোমরস ঢালে তাদেরকে কল্যাণ দাও। আমরা আমাদের এই কোরবানীতে আপন শক্তি দেখিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করি।" (১ ঃ ১৩২ ঃ ১)

"বীর সেনানীরা যখন নিখুঁত মানচিত্রসহ সেনাবাহিনীকে সামনে এগিয়ে দেয় তখন তারা নিয়মিত যুদ্ধে বিজয় লাভ করে, খ্যাতির সন্ধানে আরো এগিয়ে যায় এবং জনগণকে দমন করে যায়।" (১ ঃ ১৩২ ঃ ৫)

"হে ইন্দ্র! তুমি সব সময়ই আমাদের সকলের রক্ষক। তুমি অত্যন্ত ভদ্র। আমাদেরকে আমাদের সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর তুমি বিজয় দানকারী। আমরা যেন পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য পাই।" (১ ঃ ১৭৪ ঃ ১০)

"রণাঙ্গণ থেকে সম্পদ লুণ্ঠনকারী হে বীর! মানুষের গাড়ী দ্রুত চালাও। একটা দাহ্যমান জাহাজের মত অধার্মিক দাস্যদের জ্বালিয়ে দাও হে বিজয়ী।"

"হে মঘন হে ইন্দ্র! তোমার সাহায্যে আমরা আমাদের শক্তিশালী দুশমনদেরকে যেন পরাজিত করতে পারি। তুমি আমাদের সহায় ও রক্ষক হও। আমাদেরকে এগিয়ে দাও, আমাদেরকে শক্তিশালী কর। আমাদের প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য দাও।" (১ ঃ ১৭৯ ঃ ৫)

"আমরা যেন তোমার সাহায্যে সম্পদ লাভ করতে পারি। তোমার সাহায্য ও আর্যদের শক্তির বলে আপন দুশমন দস্যুদের যেন পরাজিত করতে পারি।"

"হে বীর! তুমি আমাদের প্রতাপান্বিত বীরদের সাথে মিলিত হয়ে এমন দুঃসাহসী কীর্তি দেখাও, যা তোমাকেই পূর্ণ করতে হবে। শত্রু নিজের শক্তির মিথ্যা দম্ভের স্ফীত। তাদের হত্যা কর এবং তাদের সমস্ত মালপত্র এখানে আমাদের কাছে নিয়ে এস।"(২ ঃ ৩ ঃ ১০)

"হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধের ময়দানে পশু লাভ করার জন্য যুদ্ধ করে এসেছ। কেননা বহু লোক তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।" (৫ ঃ ৩৩ ঃ ৪)

"ইন্দ্র সূর্য ও ঘোড়া জয় করে সেই গাভী হস্তগত করছেন; যে অনেককে তৃপ্তি দিয়েছে। তিনি সোনার আড়ৎ জয় করেছেন এবং দস্যুদের পরাজিত করে আর্যবর্ণকে রক্ষা করেছেন।(৩ ঃ ৩৪ ঃ ৯)

"হে আগুনের দেবতা! যে আমাদের ওপর গোপন হামলা চালায়' যে প্রতিবেশী আমাদের ক্ষতি করে, তাকে তুমি মিত্রের শক্তি দ্বারা, চির অনির্বাণ শিখা দ্বারা ও তীব্র দাহক তাপ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও। আমাদের সাহায্য কর যেন আমরা এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করি এবং সেই সাথে বীরোচিত সম্পদ ভাণ্ডার লাভ করি। (৭–৪ ঃ ৫ ঃ ৬)

"হে ইন্দ্র! আমাদেরকে বীরোচিত সম্মান দান কর। রণাঙ্গন থেকে সম্পদ লাভ করা যায় এমন দক্ষতা ও ক্রমবর্ধমান শক্তি দাও। তোমার

সাহায্যে যেন আমরা যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করতে পারি– চাই তারা আপন হোক কি পর হোক। আমরা যেন যে কোন শত্রুর ওপর বিজয়ী হতে পারি। হে বীর! আমরা যেন তোমার সাহায্যে উভয় প্রকারের শত্রুকে হত্যা করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী হতে পারি।

"তুমি দাস গোত্রগুলোর সাথে গ্রীষ্মকালীন দুর্গগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ করেছ। সেগুলো ছিল তাদের আশ্রয় স্থল। তুমি তাদের সকলকে হত্যা করে পুর্দকণার সাহায্য করেছ।" (৬ ঃ ২০ ঃ ১)

"হে ইন্দ্র! আমাদের এত সম্পদ দাও যেন আকাশ যেমন পৃথিবীর ওপর ছেয়ে আছে–সেইভাবে শত্রুকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারি–এমন সম্পদ দাও যা সম্পদ বাড়িয়ে দেয়, যা দিয়ে উৎপাদনশীল জমি জয় করা যায় এবং যে সম্পদ শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে পারে।" (৬ ঃ ২০ ঃ ১)

"হে দেবতাগণ! আমরা এমন এক দেশে এসেছি, যেখানে ঘাস তৃণলতা কিছুই নেই। এটা এমন জায়গা যা প্রশস্ত হলেও আমাদের লালন পালনের জন্য যথেষ্ট নয়। হে বৃহস্পতি! জীব–জন্তু লাভ করার জন্য যুদ্ধে সাহায্য কর। হে ইন্দ্র! এই ভক্তের জন্য একটা উপায় বের কর। সে দিন দিন আর্য্যদের আবাসভূমি থেকে সেই কুৎসিত জীবকে বিতাড়িত করে চলেছে। সেই বীর এই সব হীন আচরণকারীদেকে নদীর মোহনায় হত্যা করেছে।"

"তীর ধনুকের সাহায্যে আমরা যেন গবাদিপশূ লাভ করতে পারি, তীর ধনুকের সাহায্যে আমরা যেন যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি। তীর ধনুক যেন শত্রুদের দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে দেয়। তীর ধনুক সজ্জিত হয়ে আমরা যেন সমস্ত দেশ জয় করতে পারি।"(জে ৪–১ঃ ৭৫ ঃ ৬ আরো দেখুন যজুর্বেদ শুভ্র। অধ্যায়–২৯,স্তোত্র–৩৯)

"হে ইন্দ্র! রণাঙ্গণ যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠবে তখন আমাদের সেই নরাধম শত্রুদের শেষ করে দাও, যারা আমাদের গালমন্দ করে। দুর্মুখ লোকদের বদদোয়া থেকে আমাদেরকে দুরে রাখ। আমাদেরকে বিপুল ধন সম্পদ দাও। আমাদের প্রতি–পক্ষের হাতিয়ার চূর্ণ করে দাও। আমাদেরকে প্রচুর খ্যাতি ও ধন ঐশ্বর্য দাও। আমাদের প্রতিপক্ষ যেন সহজেই পরাজিত হয়। হে বীর! আমরা যেন বিজয়ী হতে পারি, যুদ্ধলব্ধ সম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারি। হে ইন্দ্র!

আমাদের মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়ে আশ্বস্ত কর। আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। আমাদের প্রচুর খাদ্য ও বীর সন্তান দাও।

(৬–৫–৩–২ ঃ ২৫ ঃ ৭)

"হে মঘন, আমাদের শত্রুদের তাড়িয়ে দাও। ধন সম্পদ লাভের জন্য যুদ্ধে আমাদের সহায় হও।" (৭ ঃ ৩২ ঃ ২৫)

"হে বীর। আমরা যেন তোমার বন্ধুসুলভ সাহচর্য্যে আমাদের ক্রুদ্ধ শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি এবং বন্য গাভীর অধিকারী সম্প্রদায়ের সাথে লড়াইতে যেন টিকে থাকতে পারি। (৮ ঃ ২১ ঃ ১১)

"তুমি ঘুনে খাওয়া গাছকে চূর্ণ করে দাও। দাসদের শক্তি নির্মূল করে দাও। আমরা ইন্দ্রের সাহায্যে তাদের সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ যেন নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিতে পারি। (৮ ঃ ৪০ ঃ ৬)

"হে অগ্নি! হে দেবতা! লোকেরা শক্তি অর্জনের নিমিত্ত তোমার প্রশংসা করে। তুমি শত্রুকে ভয় দিয়ে বেসামাল করে দাও। হে অগ্নি! তুমি কি গবাদিপশু লাভের জন্য এবং ধন–সম্পদ লাভের জন্য আমাদের সাহায্য করবেনা? (৮ ঃ ৬৪ ঃ ১০–১১)

আমরা যুদ্ধে যেন তোমার কৃপার অধিকারী হই। দেবতাদের জন্য আমাদের পবিত্র নজরানা ও প্রার্থনার উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে পারি।

(দালখিলা–৫–৭)

"হে ইন্দ্র! সঞ্চিত সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক! সম্পদের আকাংখায় আমরা তোমার হাত ধরেছি। কেননা আমরা তোমাকে চিনি। হে বীর! গবাদি পশুর মালিক! আমাদেরকে প্রচুর মূল্যবান সম্পদ দান কর। নাম করা ঋষিদের সাথে মজবুত হয়ে আমাদের শত্রুদের পরাজিত করে আমাদেরকে মূল্যবান সম্পদ দান কর। সত্য ইন্দ্র! দুর্গসমূহ চূর্ণ করে দাস্যদের হত্যা করে আমাদেরকে মূল্যবান সম্পদ দান কর।" (১০ঃ ৪৭ঃ ১–৩৪)

"আমাদের আশে পাশে রয়েছে যত সব ধর্মহীন দাস্য। তারা বিবেক –বুদ্ধি হীন, মানবতা বিবর্জিত ও অজানা আইনের অনুসারী (১০ ঃ ২২ ঃ ৮)

"শত্রুকে ধ্বংসকারী! দাস্যদের ধ্বংসকারী! তুমি আমাদেরকে সব রকমের সম্পদ দাও (১০ ঃ ৮৩ ঃ ৩)

"তুমি আমাদের শুত্রুদের হত্যা কর, তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ভাগ করে দাও। নিজের শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাও, বিদ্বেষ পরায়ন শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করে দাও। হে মিনু, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের ওপর জয়লাভ কর, তাদেরক ছিড়ে ফেল,হত্যা কর, শত্রুদের নির্মূল কর।

(১০ ঃ ৮৪ ঃ ২–৩)

"যুদ্ধ কর হে সত্যের বলে বলিয়ান। তুমি যুদ্ধ কর এবং যে সম্পদের ভাগ বন্টন করা এখনো হয়নি তা থেকে আমাদের অংশ দাও।" (১০ ঃ ১১২ ঃ ১০)

"হে ইন্দ্র! তুমি দাস জাতিগুলোর ওপর বিজয়ী হও।"

আমাকে আমার সমগোত্রীয়দের ওপর বিজয়ী কর। প্রতিপক্ষের ওপর আমাকে জয়লাভের শক্তি দাও। শত্রুকে হত্যা করার ক্ষমতা দাও, শক্তি দাও। শক্তিশালী শাসক বানাও, জীবজন্তুর মালিক কর।"(১০ ঃ ১০ ঃ ১৬৫)

যজুরবেদ

যজুরবেদে আমরা যুদ্ধ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলো দেখতে পাইঃ

"এই অগ্নি যেন আমাদেরকে প্রশস্ত জায়গা এবং আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করে। আমাদের শত্রুদেরকে যেন আমাদের সম্মুখে মেরে তাড়িয়ে দেয়। সম্পদ লাভের যুদ্ধে যেন সম্পদ লুণ্ঠন করে। বিজয়ী অগ্রাভিযানে যেন শত্রুকে পরাজিত করে।" (৮ ঃ ৪৪)

"হে অগ্নি! আমাদের প্রতিরোধকারী দলগুলোকে পর্যুদস্ত করে দাও। আমাদের শত্রুদের তাড়িয়ে দাও।হে অজিত! দেবতাদের অস্বীকারকারী প্রতিপক্ষকে হত্যা কর। তোমার পুজারীকে মহত্ব ও ঐশ্বর্য দান কর।"

"হে দাস্য বিনাশক। পাথ্য তোমাকে প্রজ্জলিত করেছে। তুমি প্রত্যেক যুদ্ধে সম্পদ লাভ কর। (১১ ঃ ৪ ঃ ৩৪)

"যে ব্যক্তি আমাদের ক্ষতি করার চিন্তা করে, যে ব্যক্তি আমাদের বিদ্বেষের চোখে দেখে, যে ব্যক্তি আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করে ও কষ্ট দেয়। তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও।"

হে তীব্র হুতাশনঃ আমাদের সম্মুখে শিখা বিস্তার কর। আমাদের শত্রুদের জ্বালিয়ে দাও। হে জ্বলন্ত আগুন। আমাদের সাথে যে অসদাচরণ করে, তুমি

তাকে শুকনো কাঠের মত ভস্মকরে দাও। হে অগ্নি! ওঠ। আমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করে তাদের তাড়িয়ে দাও এবং আপন ঐশী শক্তির পরিচয় দাও।”

(১৩ ঃ ১২ ঃ ১৩)

“হিংস্র জন্তু তার হাতিয়ার। নর খাদক জন্তুও তার হাতিয়ার। হিংস্র জন্তুদেরকে নমস্কার জানাই। তারা যেন আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমাদের ওপর যেন দয়া করে। যারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আমরা যাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি তাদেরকে যেন ঐসব জন্তুর গ্রাসে পরিণত করতে পারি। (১৫ ঃ ১৫)

“হে ইন্দ্র! তুমি নিজের শক্তির জন্য খ্যাতিমান। তুমি দৃপ্ত দৃঢ়। তুমি ভীষণ যোদ্ধা, বীর ও রক্ত পিপাসু, বিজয়ী, গরু লুণ্ঠনকারী, তুমি বিজয়ের গাড়ীতে সওয়ার হও। তুমি আস্তাবল সমুহ উম্মুক্তকারী, গরু সমুহ লুণ্ঠনকারী। তুমি একটা পুরো বাহিনীকে পরাজিত ও ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখ। ভাইগন, তোমরা তার পেছনে এসো। নিজেকে বীরদের ন্যায় স্বাধীন ছেড়ে দাও। ইন্দ্রের মত বীরত্ব ও দুর্ধর্ষতা দেখাও। আমাদের শত্রুদের বুদ্ধি ঘুলিয়ে দাও। হে অপুয়া![১৭৫] তুমি এদেরকে ধরে নিয়ে যাও। এদের ওপর আক্রমন চালাও। তাদের হৃদপিন্ডগুলোকে আগুনে ভাজ। তাদেরকে জ্বালিয়ে দাও। এ ভাবে আমাদের শত্রুরা সব সময় অন্ধকারে থাকবে”। (১৭ ঃ ৩৭ ঃ ৪৪)

শামবেদ

শামবেদের যে মন্ত্রগুলোতে যুদ্ধের কথা আলোচিত হয়েছে, তা নিম্নে দেয়া হলোঃ

“হে ইন্দ্র” আমাদের সাহায্যের জন্য এমন কার্যকর সম্পদ দাও যার দ্বারা জ্ঞাণীগুনী লোকদের ওপর শাসন চালানো যায়। হে শক্তিমান! আমাদেরকে ক্ষমতারূপী সম্পদ দাও। ইন্দ্র ও পুষণকে আমরা যেন বন্ধুত্ব ও স্বাচ্ছন্দের জন্য ডাকি। আমরা যেন তাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের জন্য ডাকি।”

“আমরা কবিরা তোমাকে এই জন্য ডাকি যেন নিজেদের জন্য সম্পদ ও ক্ষমতা লাভ করি। হে ইন্দ্র! হে বীর কেশরী! লোকেরা যুদ্ধে তোমাকে ডাকে। ঘোড়ার দৌড়ে তোমাকে ডাকে। কর্মতৎপর লোকেরা আপন নিষ্ঠাবান মিত্র পুরন্ধীর সাথে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করবে।”

"আমরা যখন রস বের করি, তখন হে ইন্দ্র! হে বীর কেশরী! আমরা তোমার গুনগান করি। এমনকি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লুণ্ঠন করার সময়ও গুনগান করি। আমাদেরকে স্বচ্ছল কর। আমরা যেন চতুরতার সাথে তোমার বিশেষ রক্ষাকবচের অধীন জয়লাভ করতে পারি। হে ইন্দ্র। আমরা তোমার সোজা হাত ধরি। তুমিই ধনসম্পদের মালিক। আমরা তোমার কাছেই সম্পদ চাই। যেহেতু আমরা জানি, তুমি বীর এবং গবাদি পশুর মালিক, কাজেই আমাদেরকে চাকচিক্যময় টাকা পয়সা ও সম্পদ দাও। যুদ্ধ ও গৌরবের মহান নেতা! আমাদেরকে গবাদি পশুর ওলানের একটা অংশ দাও।"

(৪ ঃ ১ ঃ ৪–৫–৬)

"নজর নিয়াজ দিয়ে গুনগান কর। যিনি আনন্দ দেন, যিনি কালো ভুতদের[১৭৬] তাড়িয়ে দিয়েছেন।" (৪ ঃ ২ ঃ ৪–১১)

"হে বীর! প্রচুর গরুর অধিকারী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুমি আমাদের মিত্র হও। আমরা যেন আমাদের ক্রুদ্ধ শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি।"

"যুদ্ধ চাকচিক্যময় ও ক্লান্তিহীনভাবে সে কালো রং এর মানুষগুলোকে তাড়াতে তাড়াতে ভাল্লুকের মত অগ্রসর হয়। হে সোমরস! তুমি দুশমনদের বধ করার সাথে সাথে উদ্বেলিত হও। হে বুদ্ধি ও আনন্দ দানকারী! যারা দেবতাকে মানেনা তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে দাও।"

"রথ সমুহের সামনে বীর সেনাপতি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের বাসনায় অগ্রসর হয়। তার সৈন্যরা আনন্দ প্রকাশ করে।" (৬ ঃ ১ ঃ৫ ঃ১)

"যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লুন্ঠনের সময় আমাদের ওপর সর্বজন বাঞ্ছিত সর্বোত্তম ধন সম্পদের সমুদ্রে বইয়ে দাও।" (৬ ঃ ২ ঃ ১ ঃ ৫)

"তার সাথে জয়লাভ করার চেষ্টায় আমরা যেন শত্রুর কাছ থেকে যাবতীয় ধনসম্পদ নিয়ে নেই। আদম সন্তানের সমস্ত ঐশ্বর্য ও গৌরব যেন নিয়ে নেই। (দ্বিতীয়াংশ ১ ঃ ১ ঃ ৮ ঃ ৩)

"তার কাছ থেকে আমরা এমন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চাই যাতে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য থাকবে, যাতে অসংখ্য গাভী থাকবে।"

"হে দেবতাদের বন্ধু! তুমি নিজের উত্তম আনন্দদায়ক রসের সাথে উদ্বেলিত হও। নরাধম পাপীদের হত্যা করতে করতে শত্রদেরকে তাদের

বিদ্বেষ সমেত বধ করতে করতে, ক্রমে শক্তি অর্জন ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে করতে উদ্বেলিত হও। তুমি প্রচুর ঘোড়া ও গরু লাভ করতে পারবে।"
(২ ঃ ১ ঃ ১৫ ঃ ১২)

ইন্দ্রের কৃপা চিরন্তন, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সমর্থন সহযোগিতা কখনো বন্ধ হয় না। যখন সে আপন পুজারী লোকদেরকে গাভীতে পরিপূর্ণ যুদ্ধাহরিত সম্পদ দেয়।" (২ঃ ১ঃ ৩)

"হে মঘন! গর্জনকারী! তোমার অকল্পনীয় সাহায্য দ্বারা আমাদেরকে গরুতে পরিপূর্ণ কোন গোচারণ ভূমিতে নিয়ে চল।" (২ঃ ২ঃ ১১)

"হে শক্তিমান বীর! নির্ভীকভাবে অপরিমিত যুদ্ধাহরিত সম্পদ লুণ্ঠন কর। হে কর্মতৎপর মঘন! আমরা পরম আগ্রহে হলুদ বর্ণের সম্পদ[১৭৭] ও বড় একটা পশুর পাল চাই। (৩ ঃ ১২ ঃ ২ ঃ ২)

"হে সত্য দেবতাগণ! আমরা যেন তোমাদের কাছ থেকে প্রচুর খাদ্য সম্ভার এবং থাকার জায়গা পাই। হে মিত্র! আমরা যেন তোমাদের আপনজনে পরিণত হই। হে মিত্র! আমাদের রক্ষা কর। হে রক্ষক! আমরা যেন দাস্যদেরকে স্বহস্তে করতলগত করতে পারি।" (৩ ঃ ২ ঃ ৮ ঃ ২–৩)

"হে বীর! হে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লুণ্ঠনকারী! তুমি মানুষের গাড়ী তীব্র গতিতে চালিত কর। হে বিজয়ী! একটা প্রজ্জ্বলিত জাহাজের ন্যায় ধর্মহীন দাস্যদের জ্বালিয়ে দাও।" (৬ ঃ ৩ ঃ ২০ ঃ ৩)

"সেই সুন্দর যখন আমাদের গান শোনেন তখন আমাদের থেকে তাদের প্রচুর গো–সম্পদকে লুকিয়ে রাখেন না। তিনি যেন আপন বলে আমাদের জন্য গরুর গোয়াল খুলে দেন, তা যারই হোক না কেন? দাস্যদের হত্যাকারী সেই গোয়ালের দিকেই গমণ করে।" (৮ ঃ ২ ঃ ৪ ঃ ২–৩)

ইন্দ্র এবং অগ্নি একটা প্রচন্ড অভিযান চালিয়ে নব্বইটি দুর্গ অধিকার করেছেন– যা দাস্যদের অধিকারভুক্ত ছিল। (৮ ঃ ২ ঃ ১৭ ঃ ৩)

অথর্বেদ

অথর্বেদে যুদ্ধসংক্রান্ত বহু আলোচনা হয়েছে। কয়েকটি মন্ত্র এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

"হে অগ্নি! তুমি জতুধনদেরকে (অনার্য শত্রুদেরকে অথবা অপবিত্র আত্মাদেরকে) এখানে বেঁধে নিয়ে এস এবং তারপর আপন গর্জন দ্বারা তাদের মাথা চূর্ণ করে দাও।" (১ ঃ ৭ ঃ ৭)

"হে সোমরসপায়ী! জতুধনদের সন্তান–সন্ততিদেরকে টেনে হিচড়ে নিয়ে এস এবং ধ্বংস করে দাও। স্বীকারোক্তিকারী পাপীর দুই চোখ বের করে নাও।"

"হে মিনো![১৭৮] তুমি শক্তিমানের চেয়ে বেশী শক্তিমান হয়ে এদিকে এস এবং আপন ক্রোধ দ্বারা আমাদের সমস্ত দুশমনদের ধ্বংস করে দাও। হে "শত্রু" ও দাস্যদের হত্যাকরী! তুমি আমাদেরকে সর্বপ্রকারের ধন–সম্পদ দাও।" (৪ ঃ ৩২ ঃ ১–৩)

"সত্যিকার শক্তির অধিকারী হে রাজা! যে আমাদেরকে দুঃখ দেয় এবং আমাদের সাথে শত্রুর মত আচরণ করে তাকে জ্বালিয়ে দাও। যে ব্যক্তি কোন দুঃখ না পেয়েও আমাদের দুঃখ দেয় অথবা দুঃখ পেয়ে আমাদেরক যন্ত্রণা দেয় তাকে আমি আগুন ও দেশ দানারের দো তরফা শাস্তি দেব।"

(৪ ঃ ৩৬ ঃ ১–২)

"আমি পিশাচদেরকে[১৭৯] নিজের শক্তিতে জয় করবো এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেবো। যে আমাকে কষ্ট দেবে তাকে আমি হত্যা করবো এবং আমার ইচ্ছা সফলকাম হবে। (৪ ঃ ৩৬ ঃ ৪)

"হে পিশাচেরা! রুদ্র যেন তোমাদের গলা কেটে দেয় এবং তোমাদের হাড় চূর্ণ করে দেয়। জতুধনগণ! এখানে আমাদেরকে মর্যাদা নিয়ে থাকতে দাও। হে মিত্র বরণ! তুমি লোভী রাক্ষসদেরকে মেরে তাড়িয়ে দাও। তারা যেন কোন আশ্রয়স্থল এবং কোন নিরাপদ জায়গা না পায়। তারা সকলে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে একত্রে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।" (৩ ঃ ৬৭ ঃ ৬)

"আমাদের এই শত্রুরা যেন হস্তহীন হয়ে যায়। আমরা তাদের শিথিল বাহুগুলোকে যেন অকর্মন্য করে দিতে পারি। হে ইন্দ্র! এই ভাবেই আমরা যেন তাদের সমস্ত ধন–সম্পদ পরস্পরের মধ্যে বন্টন করে নিতে পারি।" (৪ঃ ৩৬ঃ ৪)

"তাদেরকে ষাঁড়ের চামড়ার মধ্যে সেলাই করে দাও। তাদেরকে হরিণের

ন্যায় কাপুরুষ বানিয়ে দাও। শত্রুরা পালিয়ে যাক এবং তাদের গবাদি পশু আমাদের কাছে চলে আসুক।" (৬ ঃ ৬৭ ঃ ৩)

"আমরা যেন ইন্দ্রের সাহায্যে শত্রুর সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারি। আর আমি যেন বরুনের আইন অনুসারে তার অহংকার ও দুস্কৃতিকে দমন করতে পারি।" (৭ঃ ৯ঃ ২)

"হে আগুনের দেবতা! তুমি অনার্যদের চামড়ার মধ্যে ঢুকে পড়, যেন তোমার ধ্বংসকারী তীর (অর্থাৎ শিখা) তাদেরকে ভস্ম করে দেয়। হে জাতভেদ! তাদের গ্রন্থিগুলোকে চূর্ণ করে দাও। হে কাঁচা গোশত ভক্ষণ কারী ও গোশত সন্ধানকারী! তাকে ধ্বংস করে দাও।" (৮ঃ ৩ঃ ৪)

"হে অগ্নিরাজ! তুমি যেখানেই কোন জতুধনকে দাঁড়াতে কিংবা ঘুরতে দেখবে অথবা যাকে শুন্যে উড়ন্ত দেখবে, সেখানেই সক্রোধে তাকে তীর দিয়ে বিদ্ধ কর।" (৮ঃ ৩ঃ ৫)

"অনার্যদের কলিজাকে তীর দিয়ে বিদ্ধ কর। যারা তোমার ওপর অক্রমণ করতে উদ্যত হয় তাদের বাহু ভেঙ্গে দাও৷ হে আগুন! এই শয়তানদের সামনে জ্বলে ওঠ এবং তাদেরক মেরে ফেল। মড়া খেকো শকুন তাদের খেয়ে ফেলুক। এই অপবিত্রাত্মাকে মানুষ খেকোর মত তাক করে তার উর্দ্ধঙ্গের তিনটি অঙ্গকেই ভেঙ্গে ফেল। আপন শিখা দিয়ে তার হাড় চূর্ণ কর। হে অগ্নি! তার নিম্নাঙ্গকে তিন টুকরো করো।" (৮ঃ ৩ঃ ৬ঃ ৭ঃ ১০)

"হে ইন্দ্র সোম! তুমি ইতর দুশনকে জ্বালিঁয়ে দাও, ধ্বংস করে দাও। হে দেবতা! যারা ক্রমাগতভাবে শুধু কষ্ট দেয় তাদেরকে পর্যুদস্ত কর, সেই নির্বোধদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দাও, জ্বালিয়ে দাও, জবাই কর, আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দাও এবং এই পেটপুজারী রাক্ষসদেরকে টুকরো টুকরো করে দাও।" (৩ঃ ৪ঃ ১ ঋগবেদ ১০ঃ ৮৭ঃ ৫ঃ ১০)

"অতএব, হে গো–দেবী! ব্রাহ্মণের ওপর জুলুমকারী, অপরাধী, কৃপন এবং দেবতাদের নিন্দাকারীকে আপন শতগিরি বিশিষ্ট বান দিয়ে ধ্বংস কর– যা ছোরার মত ধারালো। তার মাথাকে ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও, তার মাথার চুল ছিড়ে ফেল, তার শরীরের চামড়া খুলে ফেল, তার রগ টেনে ছিড়ে ফেল, তার দেহ থেকে টুকরো টুকরো করে গোশত বের কর। তার হাড় চূর্ণ

করে দাও, তার মাথার খুলির মধ্য থেকে মগজ বের কর। এবং তার সমস্ত অংগ প্রত্যংগ ও জোড়া ছিন্ন কর।" (১২ ঃ ৫ ঃ ৬৫ ঃ ৭১)

"দুর্গচূর্ণকারী ধনাঢ্য ইন্দ্র শত্রুদেরকে নির্মূল করেছে এবং বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রতার সাথে দাসদেরকে পরাজিত করেছে। সে আপন শক্তি দ্বারা, অদম্য সাহস দ্বারা ও বিস্ময়কর চাতুর্য দ্বারা দাস্যদেরকে ধ্বংস করেছে। সে সোনার গুদাম দখল করেছে। দাস্যদেরকে হেস্তনেস্ত করেছে এবং আর্যদেরকে নিরাপদ করে দিয়েছে।" (২০ঃ ১১ঃ ১ঃ ৬৯)

যুদ্ধ সংক্রান্ত বৈদিক আদর্শের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

যুদ্ধ সংক্রান্ত বৈদিক শিক্ষা উপরে হুবহু উদ্ধৃত করেছি। এ সবের সত্যিকার মর্ম কি তা বুঝাবার সুবিধার্থে একই সাথে একই বিষয়ের একাধিক মন্ত্র উল্লেখ করেছি। এ গুলো পড়লে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায় তা নিম্নে আলোচিত হলোঃ

১–আর্যরা এমন একটা জাতির সাথে যুদ্ধরত ছিল যারা বর্ণ, জাতি, ধর্ম ও ভৌগোলিক আবাসভুমির দিক দিয়ে তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। আর্যরা ছিল হানাদার এবং অনার্যদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের স্থলে নিজেদের বসতি স্থাপনের জন্য তারা আক্রমণ চালিয়েছিল।

২–তারা ঐ জাতিকে ভুত, প্রেত, পাপাত্মা বা শয়তান মনে করতো। দাস, দাস্য, রাক্ষস, জর্তুধন, পিশাচ প্রভৃতি ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ দ্বারা তাদেরকে অভিহিত করতো। তাদেরকে মানবতা বহির্ভূত বুদ্ধিবিবেক বিবর্জিত এবং আর্যদের তুলনায় হীন ও ইতর ভাবতো। এ জন্যই তারা শত্রুদেরকে নিজেদের সম মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছিল।

৩–তাদের দৃষ্টিতে যুদ্ধের কোন নৈতিক লক্ষ্য ছিল না। তারা কেবল ধনসম্পদ চাইত। তারা চাইত গরু, ঘোড়া ও অন্যান্য গবাদি পশুর প্রাচুর্য। উর্বর জমি, আরামদায়ক বাড়ীঘর এবং খাদ্যসম্ভারই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাদের খায়েশ ছিল শুধু ক্ষুদ্রতর জাতিগুলোকে পর্যুদস্ত করার, বীরত্ব ও পৌরুষের খ্যাতি অর্জনের এবং শাসক সুলভ শানশওকত জাহির করার ও পররাজ্য দখলের। চারটি বেদের কোথাও যুদ্ধের এর চেয়ে মহত্তর ও উচ্চতর কোন উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

৪–অনার্যদের সাথে তাদের যুদ্ধ কোন আপোষযোগ্য বিবাদের ভিত্তিতে বাধেনি। সে বিবাদ ছিল এমন যে, দু পক্ষের কোন একটির পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ে তার মীমাংসা সম্ভব ছিল না। ঐ জাতিগুলো আর্য বংশোদ্ভুতছিল না এবং তারা আর্যদের দেবতাদের পূজা করত না এটাই ছিল তাদের আক্রমণের একমাত্র কারণ। আর্য বংশোদ্ভুত না হওয়ার তো কোন প্রতিকার নেই। কেননা জাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। এরপর আসে আর্য দেবতাদের পুজা করার কথা। এটাও সম্ভব ছিল না এইজন্য যে, আর্যদের ধর্ম প্রচার মুলক ধর্ম ছিল না। বেদ চতুষ্টয়ের কোথাও এমন ইংগিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না যে, আর্যরা অনার্যদেরকে কোন ধর্ম বা আদর্শের দিকে আহবান জানিয়েছে। তারা এমন কথাও কাউকে বলেনি যে, অমুক অমুক নীতি মেনে নিয়ে তোমাদেরকে আমরা সমমর্যাদা দিয়ে আমাদের সমাজের মধ্যে শামিল করে নেব। আমরা বরঞ্চ এটাই জানি যে, আর্যরা অনার্যদেরকে জন্মগতভাবেই অত্যন্ত নীচ, অপবিত্র ও ইতর মনে করতো এবং তাদেরকে আর্যদের উপাসনায় অংশ গ্রহণ বা তাদের ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করার উপযুক্ত মনে করতো না। এ কারণেই যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের আদিম অধিবাসীরা শুদ্র হয়ে থাকত অথবা জঙ্গলে ও পর্বতে গিয়ে বসবাস করতে রাজী না হয়েছে, ততক্ষণ ঐ দুপক্ষের যুদ্ধ থামে নি।

৫– বেদ চতুষ্টয়ের শ্লোকগুলোতে আর্য হানাদারেরা তাদের দুশমনদের সাথে যুদ্ধে বাস্তবিক পক্ষে কি ধরনের ব্যাবহার করতো সে কথা জানা যায় না বটে। তবে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, তাদের মনে উক্ত দুশমনদেরকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দেয়ার বাসনা বিদ্যমান ছিল। জীবন্ত মানুষের চামড়া খুলে ফেলা, তাদের গোশ্‌ত টুকরো করে কাটা, আগুনে পোড়ানো,অঙ্গ– প্রত্যঙ্গকে কাটা ও বিকৃত করা, হিংস্র জন্তু দিয়ে খাইয়ে দেয়া, জীবন্ত মানবকে পশুর চামড়ার মধ্যে সেলাই করে দেয়া, তাদের শিশু সন্তানদের পর্যন্ত জবাই করা ইত্যাকার শাস্তি তারা তাদের দুশমনদের দিতে চাইত এবং দেবতাদের নিকট সেজন্য প্রার্থনা জানাত। যাদের মনে এ ধরনের ইচ্ছা বিরাজ করে, তাদের কাজ ও বাস্তব আচরণ কেমন হতে পারে তা অনুমান করতে কারোরই কষ্ট হয় না।

গীতার [১৮০] সমর দর্শন

হিন্দুধর্মে গীতা একখানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। এর বিশেষ করণ এই যে, এটি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতার উপদেশে পরিপূর্ণ। মিঃ–বাল

গঙ্গাধর তিলকের মতে "গীতা ভগবৎধর্মের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ।" এতে হিন্দু দর্শনকে এত প্রাঞ্জলভাবে এবং এর অলংকার মন্ডিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে এদিক দিয়ে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। হিন্দু আধ্যাত্মবাদের অনেক দিক নিয়ে এতে আলোচনা করা হলেও যুদ্ধই এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। কেননা একজন যুদ্ধবিমুখ সৈনিককে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থখানা লিখিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা সর্বজন বিদিত ঘটনা। প্রাচীন আর্য সভ্যতা যখন পূর্ণোদ্যমে বিকাশমান, তখন সম্পদ ও ক্ষমতা লিপ্সার দুরুণ হস্তিনাপুরের রাজপরিবারে বিভেদ কলহ দেখা দেয়। কুরু ও পান্ডব দুই প্রতিপক্ষ হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ভারতের বড় বড় রাজাগণ উভয় পক্ষের সমর্থনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমে আপোষের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা সফল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত রনাঙ্গণেই উভয় পক্ষ নিজ নিজ ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তার রথের লাগাম হাতে নেন। যুদ্ধের ময়দানে যখন প্রেমের গভীর অনুভূতির বশে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাকে এক সুদীর্ঘ উপদেশ দেন। এতে তিনি যুদ্ধের দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই উপদেশই ভগবৎগীতা।[১৮১] রণাঙ্গনে আপন আত্মীয় স্বজনকে দেখে যখন অর্জুনের মনে যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগলো তখন তিনি গভীর বেদনার সাথে শ্রীকৃষ্ণকে বললেনঃ

'হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করার অভিলাষ নিয়ে আমার যে সব আপনজন এখানে এসেছে, তাদের দেখে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে আসছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীর কাপছে, লোম খাড়া হচ্ছে, ধনুক আমার হাত থেকে খ'সে পড়ে যাচ্ছে। হে কৃষ্ণ! সমস্ত প্রলোভন আমার কাছে এখন ফিকে মনে হচ্ছে। আপনজনদের হত্যা করে আমার কি লাভ হবে বুঝতে পারছিনা। হে কৃষ্ণ! আমার বিজয় লাভের আকাংক্ষা নেই। আমি রাজ্যও চাইনা। সুখও চাইনা। হে গোবিন্দ! রাজত্ব ও আরামের জীবনে আমাদের লাভ কি? যাদের জন্য রাজত্ব, আনন্দ, উল্লাস ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সংগ্রহ করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়, তারাই জীবন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশা ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে—এরা যদিও আমাদের হত্যা করার জন্যই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তথাপি হে মধুসদন! আমি স্বর্গলোকের রাজত্বের জন্যও

তাদেরকে হত্যা করা পছন্দ করিনা। আর এই মরজগতের মূল্যই বা কি? আপন আত্মীয় কুরুদেরকে মারা আমাদের জন্য মোটেই সঙ্গত নয়। কেননা, হে মধুসুদন! আপনজনদেরকে মেরে আমরা কিভাবে সুখী হব? একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কি শোচনীয় পরিণতি হয় তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তা সত্ত্বেও এই পাপ থেকে বিরত থাকার চিন্তা আমাদের মনে না এসে পারে কি করে? পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দরুন সমস্ত প্রাচীন পারিবারিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যায়। আর পরিবারের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পরিবারের ওপর অধর্ম ও অন্যায়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।...আমি শুনেছি, যাদের পারিবারিক ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যায় তারা সুনিশ্চিতভাবে নরকে যায়। কি আশ্চর্য! রাজসিক আনন্দ বিলাস বিহারের লালসায় আমরা আপন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি। এ আমরা একটা ভীষণ পাপকর্ম করার প্রস্তুতি নিয়েছি। এর চেয়ে বরং হাতিয়ার ফেলে দেয়াই আমার পক্ষে ভালো। আমি ওদের কিছুই উস্কানী দেবনা, পাছে অস্ত্রধারী কুরুরা আমাকে মেরে ফেলে।"

অর্জুনের এই পবিত্র ও সহৃদয় মনোভাব দেখে শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে বললেনঃ

"হে অর্জুন! এই নাজুক ও সংকটজনক মুহূর্তে তোমার মনে ভুল চিন্তা কি করে এল! মহাজনেরা তো এসব বিষয়ে কখনো মনযোগই দেননি। এটা তো একটা বিপদজনক চিন্তা। এর অনিবার্য পরিণতি চরম লাঞ্ছনা ও অপযশ ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি এমন কাপুরুষ হয়ো না। এটা তোমার জন্য শোভনীয় নয়। মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেল এবং উঠে দাঁড়াও।" (২ ঃ ২ ঃ –৩)

অর্জুন বললোঃ

"এই মহাত্মা কুরুগণকে হত্যা করার চেয়ে পৃথিবীতে ভিক্ষে করে জীবন যাপন করাও ভালো। কেননা এই ধন সম্পদের লোভে যদি আমি উক্ত মহাত্মাগণকে হত্যা করি তাহলে তাদের রক্তে রঞ্জিত সম্পদ আমার এই পৃথিবীতেই ব্যবহার করতে হবে। ...... যাদেরকে হত্যা করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আমাদের কোন বাসনাই থাকতে পারেনা, সেই কুরুরাই আজ আমাদের সামনে সারিবদ্ধ (২ ঃ ৫–৬)

অর্জুনের এই কথাগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এটা ছিল আসলে একটা গৃহ যুদ্ধ। একই পরিবারের দুটো অংশ রাজত্ব লাভের জন্য একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল সেই গৃহযুদ্ধে অর্জুনের মন এই ভ্রাতৃ হনন ও ক্ষমতা লিপসার বিরুদ্ধে সচকিত হয়ে উঠলো। বিবেকের দংশনে প্রভাবিত হয়ে সেই সৃজন সৈনিকটি যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তার ধ্যান ধারণার প্রতিবাদ করলেন এবং তার সামনে একটা নতুন দর্শন পেশ করলেন। গীতার ভাষায় সেই দর্শন এরূপঃ

"যাদের শোকে কাতর হওয়া উচিত নয়, তুমি তাদের শোকে কাতর হচ্ছো। তারপর আবার জ্ঞানের মহড়া দেখাচ্ছো। আসল ব্যাপার হলো, একজন জ্ঞানী মানুষ কারো প্রাণ থাকলো কি গেল, তার বিন্দুমাত্রও পরোয়া করেনা। দেহধারীদের যেমন এই দেহেই বাল্য, শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য লাভ ঘটে, তেমনিভাবে পরে নতুন দেহও পাওয়া যায়। এ জন্য জ্ঞানী লোকদের এ ব্যাপারে কোনোই মোহ নেই।" (২ ঃ ১১ – ১৩)

"দেহের মনিব আত্মা অবিনশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত ও তুমি যুদ্ধ কর। যেসব দেহ এই আত্মাকে লাভ করে তা নশ্বর। সুতরাং হে অর্জুন! তুমি যুদ্ধ কর। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আত্মাকে হত্যা করা হয় কিংবা আত্মা হত্যা করে, সে সত্যিকার জ্ঞান লাভ করেনি। কেননা এই আত্মা মরেও না, মারেও না। আত্মা কখনো জন্মলাভও করে না, মৃত্যুও বরণ করে না। এমনও নয় যে, একবার জন্মাবার পরে তা আর জন্মাবে না। এটা কখনো বুড়ো হয় না। এটা চিরন্তন ও অবিনশ্বর। এজন্য দেহকে মারলে আত্মা মরে না। হে অর্জুন! যে ব্যক্তি জেনে নিয়েছে যে এই আত্মা অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, কখনো তা বুড়োও হবে না, শেষও হবে না, সে একজন মানুষকে কি করে মারতে পারে? একজন মানুষ যেমন পুরানো কাপড় খুলে নতুন কাপড় পরে, ঠিক তেমনি দেহের মালিক আত্মা পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে থাকে। অস্ত্র দিয়ে এ আত্মাকে কাটা যায় না, আগুন দিয়েও তা পোড়ানো যায় না, পানি দিয়েও ভেজানো যায় না, বাতাসেও শুকানো যায় না।..... কাজেই এই আত্মাকে এরূপ নশ্বর মনে করে তার জন্য পরিতাপ করা তোমার উচিত নয়।"
(২ ঃ ১৮ – ২৫)

"তুমি যদি এরূপ ধারণা পোষণ করে থাক যে, আত্মা শাশ্বত ও অবিনশ্বর নয়, দেহের সাথেই জন্মে এবং তার সাথেই মরে যায় তাহলেও হে মহাবাহু!

তার জন্য পরিতাপ করা তোমার জন্য সংগত নয়। কেননা যে জন্মেছে তার মৃত্যু অবধারিত, আর যে মরে তার জন্মলাভ করাও সুনিশ্চিত। তাই এমন অবধারিত ব্যাপারে পরিতাপ করা তোমার উচিত নয়।" (২ ঃ ২৬ – ২৭)

"সকলের দেহে বসবাসকারী দেহের মালিক আত্মাকে কেউ কখনো মারতে পারে না। এজন্য হে ভারত, কোন প্রাণীর জন্য পরিতাপ করা তোমার সাজে না।" (২ ঃ ৩০)

কিছু দূর অগ্রসর হয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্য একটা দর্শন বর্ণনা করেন। সে দর্শন তা নিজের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

"তুমি যদি সকল পাপীর চেয়ে বেশী পাপ করে থাক, তাহলেও এই জ্ঞানের তরী দিয়েই তুমি সমস্ত পাপ তরিয়ে যাবে। প্রজ্জ্বলিত আগুন যেমন সমস্ত কাষ্ঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়, তেমনি হে অর্জুন, এই জ্ঞানরূপী আগুন ও কর্মের ভালো–মন্দের সমস্ত বিধিবন্ধনকে জ্বালিয়ে দেয়।" (৪ ঃ ৩৬–৩৭)

"হে ধনঞ্জয়! সেই আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিকে কর্ম আপন শৃংখলে বাঁধতে পারে না, যিনি কর্মযোগের সাহায্যে সমস্ত কর্মের শৃংখল ভেঙ্গে ফেলেছেন, যার সমস্ত সন্দেহ সংশয় জ্ঞান দ্বারা দুরীভূত হয়েছে। কাজেই তোমার মনে অজ্ঞানতাজনিত যে সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছে, তা তুমি জ্ঞানরূপী তরবারী দ্বারা কেটে ফেল এবং কর্মযোগের ওপর ভর করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" (৪ঃ ৪১–৪২)

"যে ব্যক্তি কর্মযোগে আত্মনিয়োগ করেছে, যে ব্যক্তি আপন মন ও স্নায়ুকে করায়ত্ব করতে পেরেছে এবং সকল জীবের আত্মার সাথে যার আত্মা একাকার হয়ে গেছে, সে সবরকমের কর্ম করা সত্ত্বেও কর্মের পাপ পুণ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় না।" (৫ঃ ৭)

"যে ব্যক্তি নিজেকে ব্রহ্মার হাতে সমর্পণ করে এবং কর্মের সংশ্রবের উর্দ্ধে উঠে কাজ করে, তাকে পাপ স্পর্শ করতে পারেনা, যেমন পদ্ম পাতায় পানি লাগেনা।" (৫ঃ ১০)

গীতার সমর দর্শন পর্যালোচনা

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ সমূহের বস্তুসংক্ষেপ পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে এইঃ

(১) যেহেতু জন্মান্তরবাদের আলোকে মানুষ একবার মৃত্যু বরণ করে পুনরায় দ্বিতীয় জন্মলাভ করে, তাই তাকে হত্যা করা মোটেই দোষের কাজ নয়। মরার পর সে আবার জন্ম লাভ করবে এবং তার অবিনশ্বর আত্মার এই হত্যায় কোন ক্ষতি হবে না।

(২) শরীরের জন্য কাপড়ের গুরুত্ব যতটা, আত্মার জন্য দেহের গুরুত্বও ততখানি। সুতরাং কারো দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া পুরানো কাপড় ছিড়ে ফেলার সমান। এরূপ কাজকে হত্যা এবং এর ফলকে মৃত্যু নামে অভিহিত করা অতঃপর একে পাপ ও অপরাধ মনে করা এবং তা নিয়ে দুঃখ করা নিছক অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। দিব্যজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে যে ব্যক্তি বাহ্যত কাউকে হত্যা করে সে আসলে তাকে হত্যা করেনা বরং কেবল তার আত্মার ওপর থেকে দেহের আবরণটা তুলে নেয়। এটা কোনই আক্ষেপের ব্যাপার নয়। হত্যার দ্বারা যদি আত্মাও মারা যেত তাহলে সেটাই হতো আক্ষেপের ব্যাপার।

(৩) নশ্বর জিনিসের বিনাশ অবধারিত। মানুষের যখন একদিন মরতেই হবে, তখন তাকে মেরে ফেললে ক্ষতি কি? যা হবার তা তো হবেই। তা আমাদের হাতেই হোক, কিংবা প্রকৃতির হাতে। একদিন প্রকৃতি তো তাকে মারবেই। কাজেই আজ যদি আমরা তাকে মেরে ফেলি তাহলে দোষ কি?

(৪) যে ব্যক্তির জ্ঞান লাভ হয় তার জন্য ন্যায় ও অন্যায়ের বাছবিচারের কোন বধ্যবাধকতা থাকেনা। তার জন্য সব কিছুই বৈধ হয়ে যায়। কর্মে ন্যায় ও অন্যায়ের বাছবিচার করতে হয় কেবল যারা জ্ঞানী নয় তাদের। সুতরাং জ্ঞানলাভ করলেই হলো। এরপর কোন জঘন্য খারাপ কাজও পাপ বলে গন্য হবেনা।

এরূপ শিক্ষার স্বাভাবিক ফল এই হওয়াই উচিৎ যে, মানুষের কাছে অন্য মানুষের প্রাণের কোন মূল্য ও মর্যাদা থাকতে পারেনা। যার যখন ইচ্ছা হবে, নিজের ভাই–এর দেহকে পুরানো কাপড় মনে করে দ্বিখন্ডিত করে দেবে।

আর যখনি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তখন দেহের নশ্বরত্ব এবং আত্মার অবিনশ্বরতার দর্শন বর্ণনা করে হত্যার দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া যে ব্যক্তি জ্ঞানী হবার দাবীদার হবে তার জন্য শুধু হত্যা কেন, কোন অপরাধই আর অপরাধ থাকবেনা, কোন পাপই পাপ বলে গন্য হবেনা। সে স্বাধীন ভাবে সব রকমের অপরাধ করেও নিস্পাপ ও নিরপরাধই থেকে যাবে।

গীতা একদিকে যুদ্ধের এমন অবাধ লাইসেন্স ও শর্তহীন অনুমতি দিয়েছে। অপরদিকে তার আঠারোটি অধ্যায়ের কোথাও সে একথা বলেনি যে, যে রক্তপাতের জন্য মানুষকে সে এমনভাবে প্ররোচিত করেছে তার উদ্দেশ্যটা কি। সেই মহৎ লক্ষ্যটি কি, যার জন্য সে মানব জাতির রক্তপাতকে এবং দেহ ও আত্মার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে এরূপভাবে বৈধ মনে করে। যুদ্ধের কথা আলোচনা করতে গেলে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একটা মৌলিক প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। কেননা এই ভয়াবহ কাজটি পবিত্র ও পুণ্যকর্মে পরিণত হতে পারে একমাত্র তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পবিত্রতার জন্য। নচেৎ অবৈধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য যত ভদ্রভাবে ও সৌজন্যের সাথেই যুদ্ধ করা হোকনা কেন, তা অবৈধ যুদ্ধই হবে এবং নৈতিক চারিত্রিক বিধির আলোকে তাকে হিংস্রতা ও পাশবিকতা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবেনা। কিন্তু গীতা এই মৌলিক প্রশ্নটাকে পরিস্কারভাবে এড়িয়ে গেছে এবং মানবজাতিকে এ ক্ষেত্রে কোন পথনির্দেশ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি।

তবুও কয়েকটি শ্লোকের বর্ণনাভঙ্গী থেকে কিছুটা অনুমান করা যায় যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে গীতার দৃষ্টিভঙ্গী কি? এক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ বলেনঃ

"হে অর্জুন! এই যুদ্ধ একটা স্বর্গের দুয়ার। তোমার জন্য এ দুয়ার আপনা আপনি খুলে গেছে। এমন সুবর্ণ সুযোগ খুব কম সংখ্যক ভাগ্যবানরাই পেয়ে থাকে। সুতরাং তুমি যদি আপন ধর্মের দাবী অনুসারে এই যুদ্ধ না কর তাহলে আপন ধর্ম ও যশ নষ্ট করে পাপ সঞ্চয় করবে। বরং অনাগত কালের সকল মানুষ তোমার সীমাহীন নিন্দা করতে থাকবে। এই নিন্দা ও অপমান মানুষের জন্য মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্টতর।" (২ ঃ ৩২–৩৪)

"সকল মহারথী বুঝবে যে, তুমি ভয় পেয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করে চলে গেছ। যাদের দৃষ্টিতে আজ তুমি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র, তারা তোমাকে

অযোগ্য মনে করতে আরম্ভ করবে। এমনিভাবে তোমার শক্তি সামর্থের নিন্দা করে তোমার অহিতাকাংখী দুশমনেরা এমন অনেক কথাই বলবে, যা বলা উচিৎ নয়। তাহলে এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হবে! তুমি মরলে স্বর্গে যাবে। আর জয়লাভ করলে দুনিয়ার রাজত্ব ভোগ করতে পারবে। কাজেই যুদ্ধের সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়াও।" (২ ঃ ৩৫ – ৩৭)

"এছাড়া তুমি যদি নিজের ধর্মের দিকেও তাকাও তাহলেও এ সময় তোমার ভীরুতা প্রদর্শন করা উচিৎ নয়। কেননা ধর্মের বিচারে ন্যায় সঙ্গত যুদ্ধের চেয়ে কল্যাণকর আর কিছু হতে পারেনা।"

(গীতায় এই একটি মাত্র কথা আমাদের চোখে পড়েছে যা যুদ্ধের বৃহত্তর নৈতিক লক্ষ্যের ইংগিত দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 'ন্যায় সঙ্গত যুদ্ধের' কোন ব্যাখ্যা গীতায় করা হয়নি। ন্যায় সঙ্গত যুদ্ধের অর্থ যদি শুধু এই হয় যে, একটি রাজপরিবারের দু'টি শাখা যেখানে সিংহাসনের দাবীদার এবং রাজতান্ত্রিক রীতি ও বিধি অনুসারে যেখানে একটি বিশেষ শাখার সিংহাসন লাভের অধিকার রয়েছে, সেক্ষেত্রে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মাধ্যমে সিংহাসন লাভই যদি ন্যায় সঙ্গত যুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে এ উক্তির কোন নৈতিক মান অবশিষ্ট থাকে না। কেননা এ ধরণের ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ তো রাজপরিবার সমূহে হয়েই থাকে। সিংহাসন ও রাজমুকুটের জন্য নিজের ভাইদের সাথে লড়াই করা এবং আপন রাজকীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হাজার হাজার মানুষের জীবন উৎসর্গ করানো কোন পবিত্র ও নৈতিকতা সম্পন্ন কাজ, এমন ধারণা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো পোষণ করেনি–লেখক)। (২ ঃ ৩১)

"আমি লোকদের বিনাশকারী এবং বর্দ্ধিত কাল। মানুষের সর্বনাশ করতেই আমি এখানে এসেছি। তুমি যদি উপস্থিত না থাক, তবুও সৈন্যদের সারিতে যত বীর পুরুষ দেখা যাচ্ছে, তাদের সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই তুমি উঠে দাঁড়াও, খ্যাতি অর্জন কর এবং শত্রুদেরকে পর্যুদস্ত করে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের স্বাদ ভোগ কর। আমি ওদেরকে আগেই নিপাত করে দিয়েছি।"(১১ঃ৩২–৩৩)

এই যুদ্ধের সৈনিকদেরকে যুদ্ধের উদ্দীপনা যোগাতে সাধারণভাবে যে সব কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে, এ কথাগুলো তা থেকে ভিন্নতর কিছুই নয়। দুনিয়ার সাধারণ মানুষ যেসব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রক্তপাত করে থাকে.

গীতার এ উক্তিগুলোতে তার চেয়ে উচ্চতর কোন উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়নি। সেই ধন সম্পদের লালসা, সেই খ্যাতি ও যশ–লিপ্সা, সেই ক্ষমতা ও গদির মোহ, পরাজয়ের গ্লানি ও অপযশের ভীতি ইত্যাদি এখানেও যুদ্ধের উদ্দীপনা সৃষ্টিতে তৎপর, যেমন তা সাধারণ যুদ্ধবাজ ও স্বার্থপর দুনিয়াদার লোকদের মধ্যে যুদ্ধ, হত্যা ও লুঠতরাজের মোহ সৃষ্টি করে থাকে। এতে কোন মহত্তর শিক্ষা, কোন নৈতিক আদর্শ, কোন শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য এবং মানুষের মধ্যে পাশবিক কামনা ও বাসনার চেয়ে উচ্চতর ও মহত্তর কোন আবেগ উদ্দীপনা জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়নি।

মনুর সমর বিধি [১৮২]

মনুর ধর্মশাস্ত্র হিন্দুদের ধর্মীয় বিধিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সংকলন। প্রায় ১৪ শো বছর ধরে এর নির্দেশাবলী হিন্দু সমাজে ও রাজ্য সমূহে কার্যকর রয়েছে। এর রচয়িতার পরিচয় এবং রচনাকাল প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন।[১৮৩] তবে এটুকু সবাই স্বীকার করে যে, যখন আর্যসভ্যতার প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং হিন্দু সাম্রাজ্যসমূহের পরিচালনার জন্য লিখিত বিধিমালার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখনই এটি রচিত হয়। এ উদ্দেশ্যে মনুশাস্ত্র ছাড়াও আরো বহু শাস্ত্র ও স্মৃতিমালা রচিত হয়েছিল। কিন্তু মনুই সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। কেননা অন্য শাস্ত্রগুলো হয় মনু থেকেই সংগৃহীত, নয় মনুর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বিধিমালায় পরিপূর্ণ বলে হিন্দু শাস্ত্রবিদগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে সাধারণভাবে এরূপ ধারণা প্রকাশ করা হয় যে, "মনু যা বলেন, ঠিকই বলেন" আর "যা কিছু মনুর বিরোধী তা ভ্রান্ত।" সুতরাং আমরা বলতে ভ্রান্ত।" সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মনুশাস্ত্রই হিন্দুধর্মের আইনসমূহ জানার সর্বোত্তম উপায়।

যেহেতু এই সংকলনটি ভারতে আর্যদের নিয়মিত সাম্রাজ্য পতিষ্ঠার পরেই রচিত হয়েছে এবং সভ্যতা ও কৃষ্টির বিকাশ তখন এই পর্যায়ে পৌছেছে যে, আর্য সমাজ আইনানুগত্য শিখে নিয়েছে, তাই আমরা যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনকানুন তাতে দেখতে পাই।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। মনু এ প্রশ্নে তেমন বিস্তারিত আলোচনা করেনি। তবে নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুদ্ধকে কি উদ্দেশ্যে বৈধ রাখা হয়েছে।

"পৃথিবীর যে সমস্ত শাসক একে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করে এবং কোন ক্রমেই মুখ ফিরায় না, তারা মৃত্যুর পর সরাসরি স্বর্গে চলে যায়।" (৭ঃ ৮৯)

"যে রাজার সৈন্যরা সর্বদা যুদ্ধংদেহী থাকে, তাকে সারা দুনিয়ার মানুষ ভয় করে। এরকম রাজার উচিৎ,আপন সদা জাগ্রত সৈন্যদের সাহায্যে সমগ্র বিশ্ববাসীকে পদানত রাখতে চেষ্টা করা।" (৭ঃ ১০৩)

"এভাবে বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণের পর সমস্ত বিরোধীদেরকে হয় আপোশে অনুগত করে নেয়া উচৎ, নচেৎ অন্যান্য কর্মপন্থা –যথা ঘুষ দান, যোগসাজস অথবা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা উচিৎ।" (৭ ঃ ১০৭)

"সাফল্যের এই চারটি পন্থার মধ্য থেকে বুদ্ধিমান লোকেরা সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য সন্ধি, আপোশ ও সামরিক শক্তি প্রয়োগই অধিকতর পছন্দ করেন।" (৭ ঃ ১০৯)

"এভাবে রাজা যখন ধর্মের নির্ধারিত সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করবে, তখন তার উচিৎ অনধিকৃত এলাকাগুলো দখল করার চেষ্টা করা ও অধিকৃত এলাকাগুলো সংরক্ষণ করা।" (৯ ঃ ২৫১)

"(ধর্মানুসারী) রাজার কর্তব্য হলো দেশ জয় করা ও যুদ্ধ থেকে কখনো পিছু না হটা।" (১০ ঃ ১১৯)

এই শ্লোকগুলো থেকে বুঝা যায় যে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রশ্নে মনুর চিন্তাও শ্রীকৃষ্ণের চাইতে তেমন উঁচু দরের নয়। রাজ্য বিস্তার, দেশ জয় এবং প্রতিবেশী দেশ ও জাতি সমূহকে হেয় করার জন্য দ্বিগ্বিজয়ী হওয়ার চেয়ে উচ্চতর কোন নৈতিক লক্ষ্যে তিনিও পৌঁছুতে পারেননি। সাধারণ দুনিয়াদারদের মতই তিনিও ক্ষমতা ও রাজত্ব লাভকেই শক্তিমানের শেষ লক্ষ্যবিন্দু বলে মনে করেন এবং প্রত্যেক শক্তিমান ব্যক্তির প্রতি তার উপদেশ হলো,সে যেন

আপন শক্তিকে সব সময় রাজ্যবিস্তারের কাজে ব্যয় করে। শাসনক্ষমতার অধিকার ও শক্তির প্রয়োগ–ক্ষেত্র সংক্রান্ত এই মতাদর্শ যে কোন উন্নত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মহৎ চিন্তা উদ্ভুত নয়, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। নৈতিকতার দৃষ্টিতে রাজাদের রাজ্য লিপসার চেয়ে মানুষের প্রাণ ও রক্ত, জাতিসমূহের স্বাধীনতা এবং দেশসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তা অনেক বেশী মূল্যবান। কারো লোভ লালসা চরিতার্থ করা কখনো নৈতিকতার দাবী হতে পারে না। নৈতিকতা হলো মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ ও সংস্কারের লক্ষ্যাভিসারী। যুদ্ধের মত ধ্বংসাত্মক কাজের অনুমতি সে কেবল তখনই দিতে পারে যখন মানুষের বস্তুগত,আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনকে আগ্রাসী ও লোভাতুর শক্তিসমূহের হাতে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, মনুই শুধু নয়, কোন হিন্দু দার্শনিকই এই মতাদর্শের নাগাল পাননি। আর যদিওবা কেউ একটু উঁচুতে উঠতে চেষ্টা করেছেন, তিনি মধ্যমপন্থার সীমা ছাড়িয়ে অহিংসবাদের সীমায় পৌছে গেছেন। অথচ এই অহিংসবাদ মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও সংস্কারের পক্ষে রক্তপাতের অবাধ অনুমতির চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়। বরং কার্যত দুটোরই একই পরিণতি। উভয়টিই দেশ ও জাতিসমূহের ধ্বংস এবং দুষ্ট ও অরাজক লোকদের বিজয় ও পরাক্রমের পথ খোলাসা করে।

যুদ্ধের নৈতিক সীমারেখা

অবশ্য যুদ্ধের পদ্ধতিগত দিকে মনু বেশ খানিকটা উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন করেছেন। তিনি সামরিক ক্রিয়াকলাপকে একটা নিয়মের আওতায় আনার জন্য এমন সীমারেখা নির্দেশ করেছেন যা অনেকাংশে ইসলামের নির্ধারিত সীমারেখার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে মনুর এ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী যথাযথবাবে উদ্ধৃত করা হল।

"কোন যোদ্ধারই উচিৎ নয় আপন শত্রুকে গোপন অস্ত্র দ্বারা, বিষাক্ত কিংবা কাঁটাযুক্ত তীর দ্বারা, অথবা আগুনে উত্তপ্ত বর্শা দ্বারা হত্যা করা।"
(৭ঃ ৯০)

"(গাড়ী বা ঘোড়ায়) আরোহনকারী যেন পদাতিককে হত্যা না করে। কোন নারীকে, হাত জোড় করে প্রাণভিক্ষা বা আশ্রয় প্র্যার্থনাকারীকে, যার চুল

খুলে গেছে তাকে, উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, নিজেকে বিজেতার বন্দীরূপে সমর্পণ কারীকে, শায়িতকে, বর্মহীনকে, উলঙ্গকে, নিরস্ত্রকে, যুদ্ধদর্শককে এবং তৃতীয়পক্ষীয় লোকের সাথে যুদ্ধরত শত্রুকে হত্যা করা চলবে না।"

(৭ ঃ ৯১–৯২)

"ভদ্র জনোচিত দায়িত্ব স্মরণ রেখে যার হাতিয়ার ভেঙ্গে গেছে, যে শোকাভিভুত, মারাত্মকভাবে আহত, ভীত অথবা পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীকে হত্যা করো না।" (৭ ঃ ৯৩)

"গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, ছাতা, পোশাক, (পোশাকের সাথে সংলগ্ন গহনা ছাড়া) খাদ্যদ্রব্য, গবাদিপশু, নারী এবং সোনারূপা ব্যাতিত সব রকমের তরল কিংবা কঠিন পদার্থ যে ব্যক্তি লড়াইতে জয় করে তার বৈধ মালিকানা।"

(৭ঃ ৯৬)

"রণাঙ্গণ থেকে লুণ্ঠিত মূল্যবান জিনিসগুলোর একাংশ সৈনিকের রাজার কাছে পেশ করা উচিৎ।...আর যেসব জিনিস ব্যক্তিগতভাবে লুণ্ঠিত হয়নি, তা যেন রাজা সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেন।" (৭ ঃ ৯৭)

"সে যখন শত্রুকে ঘেরাও করবে তখন শিবির স্থাপনের পর শত্রুর দেশকে যেন ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করে। প্রতিপক্ষীয় রাজার রসদপত্র তথা খাদ্য, পানীয় ও জ্বালানী যেন ধ্বংস করে দেয়।" (৭ঃ ১৯৫)

"পুকুর, কুপ ও পরিখাসমূহ সমস্ত ধ্বংস করে দেয়া উচিৎ। দিনরাত শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত ও বিব্রত করা উচিৎ।" (৭ ঃ ১৯৬)

"দেশ জয় করার পর তার উচিৎ দেবতার[১৮৪] ও সৎকর্মশীল ব্রাহ্মণের পুজা করা। বিজেতার উচিৎ জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে দান করা এবং জুলুম ও নির্যাতনের ভয় নেই–এই মর্মে সাধারণ ঘোষণা জারী করা।"

(৭ ঃ ২০১)

"তবে তাদের (বিজিতদের) ক্রিয়াকলাপ ও মনোভাব সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিয়ে সেই দেশে সেখানকার রাজপরিবারেরই কোন ব্যক্তিকে শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করা উচিৎ এবং যথারীতি নির্দেশাবলী জারী করাউচিৎ।[১৮৫]" (৭ ঃ ২০২)

"বিজেতা যেন বিজিতদের আইন কানুন বহাল রাখে এবং নতুন রাজা যেন ওমরাহদেরকে মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে অনুগৃহীত করে।" (৭ ঃ ২০৩)

এ বিধিমালার কোন কোনটি এমন যে, রণাঙ্গনে তা কার্যকর করা মোটেই সম্ভব নয়। যেমন আরোহী কর্তৃক পদাতিককে হত্যা না করা, শত্রুর চুল খুলে গেলে তার উপর আক্রমণ না করা, শত্রুর কাছে বর্ম না থাকলে তাকে অব্যাহতি দেয়া, উলংগ,নিরস্ত্র, শোকাভিভূত কিংবা ভীত সন্ত্রস্তকে হত্যা না করা, শত্রু কোন তৃতীয় পক্ষের সাথে যুদ্ধরত থাকলে তাকে আক্রমণ না করা। এ সব বিধিতে সংস্কার ও সংশোধনের ইচ্ছার চেয়ে নৈতিকতার প্রদর্শনী প্রধান্য লাভ করেছে। এ জন্য এখানে সামরিক প্রয়োজন ও নৈতিক সীমারেখার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়নি। রণাঙ্গণে তুমুল লড়াই চলার সময় এ সব ছোটখাট ব্যাপারে সংযম বজায় রাখা সম্ভব নয় এবং সংযম রাখতে গেলে লড়াই চালানো সম্ভব নয়। অন্য ক্ষেত্রে মনু সামরিক প্রয়োজনকে নৈতিক দায়িত্বানুভুতির ওপর প্রাধান্যও দিয়েছেন। যেমন শত্রুর দেশের সমস্ত সম্পত্তি লুন্ঠন ও ধ্বংস করে গোটা দেশবাসীকে অনাহারে মেরে ফেলা কোন উচ্চতর নৈতিক অনুভূতির পরিচায়ক নয়। তা সত্ত্বেও বলতে হয়,সামগ্রিকভাবে মনুর এ সব নির্দেশ অনেকটা সংস্কারধর্মী ও উন্নত নৈতিক চেতনার সাক্ষর। এগুলো শত্রুতা ও যুদ্ধের সময়ও যোদ্ধাদের মধ্যে যাতে মানবিক অনুভুতি বজায় থাকে তার প্রেরণা যোগায়। এখানে এরূপ একটা উচ্চ মানবিক আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় যে, মানুষের ওপর মানুষ হিসেবেও তার শত্রুর কিছু অধিকার রয়েছে এবং সর্বাবস্থায়ই তা রক্ষা করা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে মনুর নির্দেশাবলী মৌলিকভাবে ইসলামের নিকটবর্তী– যদিও অতটা উন্নত ও ভারসাম্যপূর্ণ নয়।

বিজিতদের সাথে আচরণ

আগেই বলেছি, মনুর শাস্ত্র রচিত হয়েছিল তখন– যখন অনার্য জাতি সমুহের রাজনৈতিক শক্তি বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিলনা। ভারতবর্ষে তাদের হাতে একটি রাজ্যও ছিলনা যে আর্যদের সাথে তাদের যুদ্ধ হওয়ার অবকাশ থাকতে পারে। এ জন্য মনুর শাস্ত্রে আর্য অনার্য যুদ্ধের জন্য আইন–বিধান অনুসন্ধান করা নিরর্থক। সে যুগের যেসব অনার্য সম্প্রদায়গুলোকে বেদে, দাস, দাস্য, রাক্ষস, অসুর, ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে, তারা হয় লোকালয় ত্যাগ করে পাহাড় পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল, নচেৎ পরাজিত হয়ে দেশের অধিবাসীদের অংশে পরিণত হয়েছিল। এ জাতীয় অনার্যদের নাম রাখা

হয়েছিল শূদ্র। সুতরাং মনুর শাস্ত্র থেকে আমরা শুধু জানতে পারি, হিন্দু আইন বিজয়ী হিন্দুকে পরাজিত হিন্দুর সাথে কি আচরণ করার নির্দেশ দেয়। যুদ্ধ সংক্রান্ত মনুর নির্দেশাবলী থেকে পরাজিত অনার্যের সাথে বিজয়ী আর্যের কিরূপ আচরণ করা উচিৎ, তা জানা যায় না। এটা জানার জন্য শুদ্রদের সম্পর্কে মনুর নির্দেশাবলী পর্যালোচনা করে দেখতে হবেঃ

(১) মনু শুদ্রদেরকে স্বভাবগতভাবেই হীন ও নীচ বলে গণ্য করেন। এতে শুদ্রদেরকে কর্মের ভিত্তিতে নয়–জন্মগতভাবেই নিকৃষ্টতম জীব বলে অভিহিত করা হয়েছে। যথাঃ

"ব্রহ্মা আপন মুখ থেকে ব্রাহ্মণকে, হাত থেকে কায়স্থকে, উরু থেকে বৈশ্যকে এবং পা থেকে শুদ্রকে সৃষ্টি করেছেন। (ঋগবেদের ১০ ঃ ৯ ঃ ১২ শ্লোকে এবং ভগবত পুরানের ২ ঃ ৫– ৩৭ শ্লোকেও একথাই বলা হয়েছে।)

"ব্রাহ্মণের নামের প্রথমাংশে পবিত্রতা, কায়স্থের নামের প্রথমাংশে শক্তি, বৈশ্যের নামের প্রথমংাশে সম্পদ ও শুদ্রের নামের প্রথমাংশে দীনতা ও লাঞ্ছনা প্রকাশ পাওয়া উচিৎ।" (২ ঃ ৩১)

"নামের দ্বিতীয়াংশে ব্রাহ্মণের প্রাচুর্য, কায়স্থের নিরাপত্তা, বৈশ্যের সম্পদ এবং শুদ্রের গোলামীর অভিব্যক্তি ঘটা উচিৎ।" (২ঃ৩২)

"দ্বিজেরা তিনটি জাতির অন্তর্ভুক্তঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্য। শুদ্রের মাত্র একটাই জন্ম।" (১০ ঃ ৪)

"হাতি, ঘোড়া, শুদ্র, ঘৃণ্য ম্লেচ্ছ, বাঘ, চিতাবাঘ ও শুকর (জন্মান্তরের) সবচেয়ে নিম্ন স্তর– যা অন্ধকার থেকে জন্ম লাভ করে।" (১২ ঃ ৪৩)

(২) মনু শুদ্রদেরকে জন্মগতভাবেই অপবিত্র ও মানবেতর জাতি মনে করেন এবং ভদ্র ও অভিযাত আর্যদেরকে তাদের থেকে দুরে থাকতে বলেন। যথাঃ

"শুদ্রের মেয়েকে কোন ব্রাহ্মণ নিজের পালঙ্কে বসালে সে ব্রাহ্মণ নরকে যাবে।" (৩ ঃ ১৭)

"যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নারীর পেট থেকে ও শুদ্র পুরুষের বীর্য থেকে জন্ম লাভ করে সে চন্ডাল। (৩ঃ ১৭)

"কোন পরিবার থেকে বহিস্কৃত কোন ব্যক্তি বা চন্ডালের[১৮৬] সাথে এক গাছের ছায়ায় বসা নিষিদ্ধ।" (৪ঃ৭৯)

"যে ব্যক্তি শুদ্রকে ধর্মের শিক্ষা দেবে এবং যে তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে শিক্ষা দেবে সে সেই শুদ্রের সাথেই নরকে যাবে।" (৪ঃ ৮১)

"শুদ্রের সামনে বেদ পড়া অবৈধ।" (৪ঃ ৯৯)

"কোন শুদ্র যদি ইচ্ছাপূর্বক বেদের কথা শোনে, তাহলে তার কানে গলানো রাং ঢেলে দিতে হবে, সে যদি বেদ পড়ে তাহলে তার জিহ্বা কেটে ফেলতে হবে। আর যদি সে বেদকে মুখস্ত করে তাহলে তার দেহকে দু'টুকরো করতে হবে।" (গৌতম ১২ঃ৪–৬)

"শু'দ্রের খাবার খাওয়া চলবেনা।" (৪ঃ ২১১)

শুদ্রের খাবার পেটে থাকতে যে ব্রাহ্মণ মারা যাবে, সে পরবর্তী জন্মে শুকর হয়ে জন্ম লাভ করবে।"

"কোন ব্রাহ্মণের খাওয়ার সময় তাতে যদি শুদ্র হাত লাগায় তাহলে তা খাওয়া বন্ধ করতে হবে।"

"শুদ্রের রান্না করা খাদ্য খাওয়া চলবেনা–চাই তাতে তার হাত লাগুক বা না লাগুক।" (৪ ঃ২১১)

"শুদ্রের খাদ্য আত্মার জ্যোতি নষ্ট করে দেয়।" (৪ঃ ২১৮)

"কোন ব্রাহ্মণ যদি ভুলক্রমে শুদ্রের খাদ্য খেয়ে ফেলে তাহলে তিন দিন পর্যন্ত উপবাস করতে হবে। আর ইচ্ছা করে খেলে পায়খানা প্রস্রাব খেলে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সেরূপ করতে হবে।" (৪ ঃ ৩২২)

"চন্ডালকে স্পর্শ করলে গোসল করা ছাড়া পবিত্র হওয়া যায় না।" (৫ঃ ৮৫)

"শুদ্রের মৃত দেহ লোকালয়ের দক্ষিণ পাশ দিয়ে আর দ্বিজদের লাশ উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব দিক দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" (৫ঃ৯২)

"ব্রাহ্মণের স্বজাতীয় লোক না থাকলেও তার লাশ যেন কোন শূদ্র স্পর্শ না করে। শেষ কৃত্যে শুদ্রের হাত লাগলে স্বর্গে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।" (৫ঃ১০৪)

"শূদ্র পুরুষের ঔরশে বৈশ্য, কায়স্থ,কিংবা ব্রাক্ষ্মণ নারীর যে সন্তান হবে তা হবে শংকর প্রজাতি। তারা হবে খুবই নিম্ন শ্রেণীর জীব।" (১০ঃ১২)

"চন্ডাল ও সোপাশ শ্রেণীর লোকদের আবাস লোকালয়ের বাইরে হতে হবে। স্থায়ী পাত্র তাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। তাদের সম্পত্তি হবে শুধু গাধা ও কুকুর। তাদেরকে কাফনের কাপড় পরতে দেয়া উচিৎ। তাদের খাবার পাত্র ভাঙ্গা হওয়া চাই। তাদের অলংকার যেন লৌহ নির্মিত হয়। তারা যেন সব সময় যাযাবর হয়ে থাকে। পার্থিব ও ধর্মীয় কর্তব্য যে পালন করে সে যেন তাদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখে। তাদের সকলের সম্পর্ক পরস্পরের মধ্যেই সীমিত থাকা উচিৎ। সমমর্যাদা সম্পন্নদের মধ্যেই যেন তারা বিয়ে শাদী করে।"

"শূদ্রদেরকে মাটির পাত্রে করে খাবার দিতে হবে। তবে যে দেবে সে যেন আপন হাতে তাদের হাতে না দেয়। রাতের বেলায় যেন তারা জনবসতিতে ঘুরে না বেড়ায়। দিনের বেলায় কাজ কাম করতে এলে রাজার নির্ধারিত বিশেষ চিহ্নসমূহ যেন তাদের গায়ে থাকে। বেওয়ারিশ লাশ সরানোর কাজ তাদের করতে হবে। যাদেরকে আইন অনুসারে মৃত্যু দন্ড দেয়া হয়েছে, তাদেরকে যেন চন্ডালরাই হত্যা করে। আর নিহত ব্যক্তির কাপড়, বিছানা ও অলংকারও যেন তারা নিয়ে নেয়।" (১০ ঃ ৫১–৫৬)

"ব্রাক্ষ্মণ যেন কখনো শূদ্রের দান গ্রহণ না করে।" তার কাছ থেকে দান নিয়ে যদি উৎসর্গ করে তাহলে পরবর্তী জন্মে চন্ডাল হয়ে জন্ম নেবে।"
(১১ঃ২৪)

"কোন ব্রাক্ষ্মণ যদি শূদ্রের খাওয়া পানি খায়, তাহলে তার তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত কূশ ঘাষ সিদ্ধ করা পানি ছাড়া আর কিছুই খাওয়া চলবে না।"
(১১ঃ৪৯)

"কোন ব্রাক্ষ্মণ যদি শুদ্রের খাওয়া জিনিস খায় তাহলে সে যেন ৭ দিন পর্যন্ত যবের আঁশ ছাড়া আর কিছু না খায়।" (১১ ঃ ১৫৩)

(৩) মনু শুদ্রদেরকে দ্বিজদের দাসত্ব করতে বাধ্য করেন। তার মতে শূদ্রদের জন্মগত ও স্বভাবগত কর্তব্যই হলো দ্বিজদের সেবা করা।

"সর্বশক্তিমান শুদ্রের জন্য একটিই কর্তব্য নির্ধারণ করেছেণঃ দ্বিজদের অকুন্ঠ মনে সেবা করে যাওয়া।"

"ব্রাহ্মণের সেবায় সদা নিয়োজিত থাকা শুদ্রের সবচেয়ে উত্তম কাজ। এ ছাড়া সে যে কাজই করবে, তাতে তার কোন ফায়দাই হবে না।" (১০ ঃ ১২৩)

"রাজা যেন শুদ্র জাতির সকলকে দ্বিজদের সেবা করার হুকুম দেন।" (৮ ঃ ৪৮)

"শুদ্র জাতির প্রতিটি লোক– চাই সে ক্রীতদাস হোক বা না হোক– তাকে ব্রাহ্মণ আপন সেবায় নিয়োজিত করতে পারে। কেননা, স্রষ্টা তাকে ব্রাহ্মণের দাসত্ব করতেই সৃষ্টি করেছেন।" (৮ ঃ ৪১৩)

"শুদ্রকে যদি তার মনিব স্বাধীন করে দেয় তাহলেও সে স্বাধীন হতে পারে না। কেননা জন্মগতভাবেই তাকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তা থেকে সে কিভাবে মুক্ত হবে?" (৮ ঃ ৪১৪)

(৪) মনু শুদ্রকে তার স্ব–অর্জিত সম্পদের মালিকানা অধিকার দিতেও সম্মত নন। যথাঃ

"একজন ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত মনে আপন শুদ্র গোলামের সম্পদ গ্রহণ করতে পারে। কেননা কোন সম্পদই শুদ্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।" (৮ ঃ ৪১৭)

"শুদ্র যদি ধন–সম্পদ উপার্জনের ক্ষমতা রাখে তাহলেও তার উপার্জন করা উচিৎ নয়। কেননা যে গোলাম সম্পদের মালিক হয় সে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেয়।" (১০ ঃ ১২৯)

(৫) উত্তরাধিকার আইনেও মনু দ্বিজদের ও শুদ্রদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি শুদ্রকে উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেছেন। কখনো দ্বিজদের চেয়ে তাকে নিম্ন মর্যাদা দিয়েছেন। যথাঃ

"ব্রাহ্মণের চার স্ত্রী যদি চার জাতের হয় এবং চারটির পেটেই সন্তান জন্মে তাহলে তাদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করা হবে এরূপে ঃ কৃষক, চাকর, সওয়ারীর ঘোড়া, গাড়ী, অলংকার ও বাড়ী ব্রাহ্মণীর ছেলে পাবে। বাদবাকী সম্পদ থেকেও তার উচ্চ মর্যাদার বিচারে তার অংশ বিশেষভাবে বেশী হবে।"

"ব্রাহ্মণ ছেলে অবশিষ্ট সম্পদ থেকে তিন অংশ এবং কায়স্থ স্ত্রীর ছেলে দুই অংশ, বৈশ্য স্ত্রীর ছেলে দেড় অংশ এবং শুদ্র স্ত্রীর ছেলে এক অংশ।"

"অথবা একজন সাধারণ আইনজ্ঞ সমস্ত সম্পত্তিকে দশভাগে ভাগ করে নিম্নরূপ বন্টন করবেঃ ব্রাক্ষ্মণীর ছেলেকে চার অংশ, ক্ষত্রিণীর ছেলেকে তিন অংশ, বৈশ্যাণীর ছেলেকে দুই অংশ এবং শূদ্রাণীর ছেলেকে এক অংশ।"

"ব্রাক্ষ্মণের প্রথম তিন জাতের স্ত্রীদের থেকে ছেলে থাক বা না থাক, শূদ্রাণীর ছেলে কোন অবস্থাতেই এক দশমাংশের বেশী পাবে না।"

"শূদ্র স্ত্রীর গর্ভজাত ব্রাক্ষ্মণ, কায়স্থ কিংবা বৈশ্য পুরুষের ছেলে পিতার উত্তরাধিকার থেকে কিছুই পাবে না। তার বাপ তাকে যা দেবে, সে সেটুকুরই মালিক।"[১৮৭]

"দ্বিজ পুরুষদের যে সন্তান তাদের স্বজাতীয় স্ত্রীদের পেট থেকে জন্মাবে, তারা পরস্পরের পরিত্যক্ত সম্পদ সমানভাবে বন্টন করবে।"

(৯ ঃ ১৪৯–১৫৬)

(৬) ফৌজদারী আইনে মনু শূদ্রের প্রতি চরম কঠোরতা প্রয়োগ করেছেন। তিনি তাদের জান ও ইজ্জতকে আইনের রক্ষা কবচ দিতে সর্বাধিক পরিমাণ কার্পণ্য প্রদর্শন করেছেন। পক্ষান্তরে দ্বিজদের অধিকার নির্দ্ধারণ ও সংরক্ষণে এত বদান্যতা দেখিয়েছেন যে শূদ্রদের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা এক রকম শূণ্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে।

"একজন শূদ্র যদি কোন দ্বিজের সাথে বেয়াদবী করে তাহলে তার জিভ কেটে দিতে হবে। কেননা ব্রাক্ষ্মণ ব্রক্ষ্মার দেহের উর্ধাংশ থেকে জন্ম লাভ করেছে। (৮ঃ ২৭০)

"সে যদি ব্রাক্ষ্মণের নাম এবং তার বংশের নাম নিয়ে অবমাননাকর আচরণ করে তাহলে দশ আংগুল লম্বা লোহার শিক আগুনে পুড়িয়ে লাল করে তার গলায় ঢুকিয়ে দিতে হবে।" (৮ঃ২৭১)

"যদি সে অহংকার বশে ব্রাক্ষ্মণকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দেয় তাহলে রাজার উচিৎ তার কানে ও মুখে জ্বলন্ত তেল ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া।" (৮ঃ২৭২)

"যদি কোন শূদ্র কোন ব্রাক্ষ্মণের সমান্তরালে একই স্থানে বসে বেয়াদবী করে তাহলে তার পশ্চাদভাগে দাগ লাগিয়ে রাজা হয় তাকে দেশান্তরিত করবে, নচেৎ তার পাছা কেটে দেবে।" (৮ঃ ২৮১)

"সে যদি ব্রাহ্মণের ওপর অহঙ্কার বশে থু থু দেয় তাহলে রাজা তার দুই ঠোঁট যেন কেটে দেয়। আর সে যদি ব্রাহ্মণের গায়ে পেশাব করে দেয় তা হলে তার লজ্জাস্থান যেন কেটে দেয়ার নির্দেশ দেয়। যদি সে ব্রাহ্মণের দিকে পায়খানা করে তাহলে তার মলদ্বার যেন কেটে দেয়ার নির্দেশ দেয়।"

"সে যদি ব্রাহ্মণের মাথার চুল কিংবা তার পা অথবা তার দাড়ী বা তার গলা ধরে তাহলে রাজার উচিৎ নির্দ্বিধায় তার হাত কেটে ফেলা।" (৮ ঃ ২৮৩)

"কোন শুদ্র যদি দ্বিজ নারীর সাথে ব্যভিচার করে তাহলে সেই নারী অবিবাহিতা হলে উক্ত শুদ্রের সেই অংশটি কেটে ফেলা হবে-যা দিয়ে সে অপরাধ করেছে। অতপর তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। আর যদি সেই নারী বিবাহিতা হয় তাহলে শুদ্রের সব কিছু এমনকি প্রাণ পর্যন্ত হরণ করাহবে।"

"ব্রাহ্মণ নারীর সাথে ব্যভিচার করার মত অপরাধ যদি কোন বৈশ্য দ্বারা সংঘটিত হয় তাহলে তাকে এক বছরের জেল এবং সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি কায়স্থ এমন কাজ করে তাহলে তাকে এক হাজার পন জরিমানা করা হবে। অথবা গাধার পেশাব দিয়ে তার দাড়ি গোঁফ মুড়িয়ে ফেলা হবে। আর যদি সেই ব্রাহ্মণ নারী অবিবাহিতা হয় তাহলে বৈশ্যকে পাঁচশো এবং কায়স্থকে এক হাজার পণ জরিমানা করা হবে। আর যদি নারীর ইচ্ছায় করে তবে পাঁচশো পণ।" (৮ঃ ৩৭৪-৩৭৮)

"রাজা কখনো কোন ব্রাহ্মণকে হত্যা করতে পারবে না। তা সে যত বড় অপরাধই করুক না কেন। ব্রাহ্মণ অপরাধীকে সে তার সম্পত্তিতে ও ব্যক্তি সত্তায় কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করেই শুধুমাত্র নির্বাসিত করতে পারে। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণকে হত্যা করার চেয়ে বড় গুনাহ আর কিছু নেই। এ জন্য রাজা যেন এমন কাজ করার কথা কল্পনাও না করে।[১৮৮]

(৮ ঃ ৩৮০-৩৮১)

"নীচ জাতের মানুষ যদি স্বেচ্ছায় কোন ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেয় তাহলে রাজার কর্তব্য তাকে বিবিধ রকমের দৃষ্টান্ত মূলক দৈহিক শাস্তি দেয়া।"

"একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করার যে শাস্তি, একজন কায়স্থকে হত্যা করার শাস্তি তার এক চতুর্থাংশ। বৈশ্যকে হত্যা করার শাস্তি তার অষ্টমাংশ।

আর শূদ্র যদি সৎ কর্মশীল হয় তাহলে তাকে হত্যা করার শাস্তি ষোল ভাগের এক ভাগ মাত্র।” (১১ঃ১২৬)

“কোন ব্রাহ্মণ যদি কোন কায়স্থকে অনিচ্ছা পূর্বক হত্যা করে ফেলে তা হলে নিজেকে পাপমুক্ত করার জন্য তার একটা ষাঁড় ও এক হাজার গরু দান করতে হবে অথবা তিন বছর পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করতে হবে। আর যদি সে অনিচ্ছা পূর্বক কোন সৎকর্মশীল বৈশ্যকে হত্যা করে ফেলে তাহলে এক বছর কঠিন তপস্যা করবে অথবা একশোটা গাভী ও একটা ষাঁড় দান করে দেবে। আর যদি শূদ্রকে অনিচ্ছাক্রমে হত্যা করে তাহলে ছয় মাস কঠিন তপস্যা করবে কিংবা দশটা সাদা গাভী এবং একটা ষাঁড় ব্রাহ্মণদেরকে দান করবে।”

“কোন ব্রাহ্মণ যদি কোন বিড়াল, কোন নেউল, কোন ব্যাঙ, কুকুর, পেচা কিংবা কাককে মেরে ফেলে তাহলে শূদ্র হত্যা করলে যেরূপ কাফফারা দিতে হয়, সেরূপ কাফফারা দিতে হবে।” (১১ঃ ১৩২)

এ সব নির্দেশের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। হিন্দু আইন বিজিত জাতিদেরকে কত হেয় মনে করে এবং সমাজে তাদেরকে কত নিম্ন মর্যাদা দেয় তা এসব নির্দেশ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি ইসলামে অমুসলিম নাগরিকদের যে অধিকার দেয়া হয় তা পড়ে দেখলে আকাশ ও পাতালের পার্থক্য দেখা যাবে।

বর্ণ–বৈষম্য

বর্তমান যুগের কয়েকজন হিন্দু লেখক আধুনিক চিন্তাধারা প্রভাবিত হয়ে দাবী করেছেন যে, হিন্দু ধর্মে যে নানা রকমের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে সেটা জন্ম ও জাতিগত ভিত্তিতে নয়–গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে। বাস্তবিক পক্ষে যদি তাই হতো তাহলে আমরা খুবই খুশী হতাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, হিন্দু আইনের মূল গ্রন্থ সমূহ এ দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয় না। সেগুলো পড়লে বরঞ্চ এরূপ ধারণাই জন্মে যে, কর্ম ও গুণাবলীর ভিত্তিতে মর্যাদা নির্ণয় করার ব্যাপারটা হিন্দু ধর্মের কাছে যেন একেবারেই কল্পনাতীত ব্যাপার। এতে শ্রেণী গড়া হয়েছে কর্ম নয় বর্ণের ভিত্তিতে। প্রাথমিক যুগে যাদেরকে দাস ও ভিন্ন নাম দেয়া হয়েছিল এবং পরে যাদেরকে শূদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে তাদের এই নিম্ন মর্যাদা প্রদানের কারণ যে তারা অসৎ কর্মশীল ছিল

তা নয়। বরং তার একমাত্র কারণ ছিল এইযে, তারা অনার্য বংশোদ্ভুত ছিল। উপরে হিন্দু ধর্মের উত্তরাধিকার আইন, ফৌজদারী আইন ও সামাজিক আইনের যে সব বিধি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার ওপর একটা সাধারণ নজর বুলালেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাতে পাঠক দেখতে পাবেন যে, সৎকর্মশীল শুদ্রকেও অসৎ কর্মশীল ব্রাক্ষ্মণের সমান অধিকার দেয়া হয়নি। ব্রাক্ষ্মণের ছেলে যদি শুদ্র স্ত্রীর পেট থেকে জন্মে তাহলে সে সৎকর্মশীল হলেও তাকে তার পিতার ব্রাক্ষ্মণ স্ত্রীর পেট থেকে জাত সন্তানের সমান অধিকার দেয়া হয়নি। শুদ্র পুরুষের সন্তান যদি ব্রাক্ষ্মণ স্ত্রীর পেট থেকে জন্মে তাহলে শুধুমাত্র সেই জন্মের কারণেই সে চন্ডাল হয়ে যাবে। ফলে মনু তার জন্য যে মানবেতর জীবন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তাই তাকে মেনে নিতে হবে। কেন এই মানবেতর জীবন? এটা কি তার কর্মফল? শুদ্রের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করা কি খারাপ কাজ এবং ব্রাক্ষ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করা কি কোন ভালো কাজ? তা যখন নয় তখন একে বর্ণগত ও জাতিগত বৈষম্য ছাড়া আর কি বলা যায়? হিন্দু ধর্মে সামাজিক মর্যাদা ও অমর্যাদা মানুষের ব্যক্তিগত কর্ম ও গুণপনার ওপর নয়, কার পেট ও কার ঔরসে সে জন্ম নিল তার ওপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং মনুও অনেকটা স্পষ্টবাদিতার সাহায্য নিয়েছে। মনু বলেছেঃ

"যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও নীচ জাতের স্ত্রী থেকে জন্ম নেবে সে ভালো কাজ করে সম্রান্ত হতে পারবে।[১৮৯] কিন্তু যার পিতা নীচ জাতের ও মা সম্রান্ত সে নীচ জাতেরই থেকে যাবে।" (১০ঃ ৬৭)

"ভালো গাছ যেমন শুধু ভালো বীজে এবং ভালো জমিতেই জন্মে, তেমনি যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও সম্রান্ত স্ত্রী থেকে জন্ম নেয়, সেই পূর্ণ দ্বিজের মর্যাদা লাভ করতে পারে। (১০ঃ ৬৯)

"স্বয়ং ব্রক্ষ্মা দ্বিজের মত কাজ সম্পাদনকারী শুদ্র এবং শুদ্রের মত কাজ সম্পাদনকরী দ্বিজের মধ্যে তুলনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উভয়ে সমানও নয়, অসমানও নয়। অর্থাৎ তারা মর্যাদায় সমান নয় আবার খারাপ কাজেও অসমাননয়[১৯০]।" (১০ঃ৭৩)

এমন দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাবলীর উপস্থিতিতে কে বলবে যে, হিন্দু ধর্মে মানুষের শ্রেণীভেদ বর্ণভিত্তিক নয় বরং কর্মভিত্তিক?

আধুনিক হিন্দু ঐতিহাসিকগণ এটাও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, শুদ্ররা আসলে দেশীয় অনার্য ছিলনা। তারা ছিল আর্যদেরই নিম্ন শ্রেণীর লোক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাত্বিক বিশ্লেষণে এ দাবীও গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য বর্ণাশ্রম আইন লংঘন হেতু যারা আর্য সমাজ থেকে বহিস্কৃত হতো তাদেরকেও যে শুদ্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হতো, তা সত্য[১৯১]। তবে একথা অনস্বীকার্য যে শুদ্র শ্রেণীটা সাধারণভাবে সেইসব অনার্য সম্প্রদায়সমূহ নিয়ে গঠিত যারা ঘরবাড়ী ছেড়ে পাহাড় পর্বতে আশ্রয় নেয়ার পরিবর্তে আর্য বিজেতাদের দাসত্ব মেনে নিয়েছিল। ভাষাতাত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শুদ্র মুলতঃ ভারতের একটা প্রাচীন গোত্রের নাম। আর্যরা এসে অটক নদীর উপত্যকায় এদেরকে সর্বপ্রথম পরাজিত করেছিল। এর পরে যে সব হিন্দু গোত্র আর্যদের আনুগত্য মেনে নিত তাদেরকে শুদ্র নামে এবং যারা যুদ্ধে লিপ্ত হতো তাদেরকে দাস্য বা ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করা হতো।[১৯২]। ঐতরেয় ব্রাক্ষ্মণে এক জায়গায় বলা হয়েছে, "ব্রাক্ষ্মণ দেবতাদের থেকে উদ্ভুত আর শুদ্র পিশাচ আত্মা থেকে উদ্ভুত[১৯৩]।" এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে , প্রাচীন যুগে যাদেরকে পিশাচ বা পাপাত্মা বলা হতো, শুদ্ররা তাদেরই বংশধর।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসবেত্তাদের প্রায় সকলেই এই মতের সমর্থক। উদাহরণ স্বরূপ আমি তাদের কয়েকজনের মতামত এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

রগোজন লিখেছেন, "এই শ্রেণী বিভাগটা হয়েছে আর্যদের ও দাস্যদের মধ্যে। আর্যদেরকে তো আমরা ভালোভাবেই চিনি। বাকী রইল দাস্যদের কথা। প্রকৃতিগত মিলের জন্যই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হচ্ছি যে, তারা অনার্য জাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর্য বাস্তুত্যাগীরা এদেশে এসে তাদের দেখা পেয়েছিল এবং এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ–সংঘর্ষের পর তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শ্রেণী বিভাগের প্রথম সূচনাটা আমরা এখানেই দেখতে পাই। কেননা বর্তমান যুগে শুদ্র ও দ্বিজেদের মধ্যে যে শ্রেণীভেদ বিদ্যমান, তার সাথে এই শ্রেনীভেদের পুর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। এ ছাড়া শ্রেণীকে আর্যদের ভাষায় "বর্ণ" বলা হয়েছে। এর অর্থ রং। বৈদিক কবিতাগুলোতেও উজ্জল বর্ণের বিজেতা এবং কালো বর্ণের দেশী অধিবাসীদের এই পার্থক্যই বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।দাস্য শব্দটার মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে অনেক বিবর্তন এসেছে। সে দিক থেকে ঐ শব্দটা আমাদের

কাছে একটা সুস্পষ্ট ইতিহাস তুলে ধরে। এটা একটা প্রাচীন আর্য শব্দ। ইরানীরা একে এর মুল অর্থে (জাতি বা গোস্বামী অর্থে) ব্যবহার করতো।···· ভারতে এসে এর অর্থ হয়ে দাঁড়ালো সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের। এর অর্থ হলো শত্রু[১৯৪]। তারপর বৈদিক কল্প কাহিনীর জগতে এসে তার আরো উন্নতি হলো এবং ভূত, প্রেত ও পাপাত্মার অর্থেও ব্যবহৃত হতে থাকলো। অন্ধকার এবং দুর্ভিক্ষের অর্থেও এর ব্যবহার হতে লাগলো। বলাবাহুল্য এ সবের সাথেই সে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে এবং এগুলোকে পরাজিত করে। শব্দের এই বিবর্তন একদিকে যেমন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তি সঙ্গত অপর দিকে তেমনি এটা বেদ সমূহের অর্থকে দুর্বোধ্যও করে তুলেছে। কেননা ইন্দ্র বা অগ্নিকে দাস্যদের দেশান্তরিত কিংবা ধ্বংস করার আবেদন যখন করা হয় অথবা যখন বলা হয় যে, তিনি দাস্যদের শক্তি চুর্ণ করে দিয়েছেন তখন সত্যিকার কোন শত্রুকে বুঝানো হয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেটা কি সাত্বিক শত্রু না কাল্পনিক শত্রু? এ শব্দটির সর্বশেষ পরিবর্তনটি তাৎপর্যবহ। একে শুধু সেবক বা ভৃত্য অর্থে ব্যবহার করা শুরু হলো এবং সামান্য শাব্দিক রূপান্তরের পর দাস্যকে দাসে পরিণত করা হলো। এভাবে এই সর্বশেষ পরিবর্তন থেকে আর্য–বিজয়ের পূর্ণতারই ইংগিত দেয় এবং এই নুতনতর শব্দ শুদ্রের কাছাকাছি গিয়ে দাড়ায়।” সুতরাং এই ধারাক্রম অনুসারে আমরা নিম্নোক্তভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে পরি যে, আর্য–দাস্য–দ্বিজ–শুদ্র।

শুদ্রজাতিকে যে সামরিক শক্তি বলে ভৃত্য শ্রেণীতে পরিণত করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে আরো কিছু প্রমাণ আমরা মনুর আইনশাস্ত্রে পেতে পারি। সেই শাস্ত্রে একজন দ্বিজের জন্য সকল অবস্থাতেই শুদ্রের সাহচর্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে–চাই সে শুদ্র রাজাই হোক না কেন। অতএব একজন শুদ্র রাজা বলতে যে দেশী শাসকই বুঝায় তাতে আর দ্বিমতের অবকাশ নেই।

আর্য ও দাস্য এবং দ্বিজ ও শুদ্র–এ শব্দগুলি যে পরস্পরের বিপরীত পরিভাষা, সেটা একটা প্রমাণিত ব্যাপার। তা সত্ত্বেও দাস্য ও শুদ্র কোন বিশেষ জাতির নাম মনে করা ঠিক নয়। আসলে আর্য নয়–এমন সকল জাতিকেই জাতিকেই দাস্য বা শুদ্র বলা চলে–ঠিক যেমন প্রাচীনকালে যারা রোমক বা গ্রীক নয়, তাদেরকে বর্বর (Barbarians) বলা হতো[১৯৫]।

অধ্যাপক রিপসন লিখেছেন ঃ "জাত বলতে পরবর্তী যুগে যে সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধতা বুঝানো হয়েছে, ঋগবেদের কবিরা সেটা জানতেন না। তবে মানুষের মধ্যে যে বিবিধ শ্রেণী আছে, তা জানতেন। যেমন ধর্মীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ, অভিজাত শ্রেণী রাজন্য বা কায়স্থ, চাষাবাদকারী বৈশ্য এবং সেবক শ্রেণী যথা শূদ্র। প্রথম তিন শ্রেণী এবং চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। প্রথমোক্ত তিন শ্রেণী আর্য আর চতুর্থ শ্রেণী পরাধীন দাস্য। তাদের মধ্যে বর্ণের পার্থক্য বিদ্যমান। আর্যরা সামগ্রিকভাবে গৌরবর্ণের আর দাস্য কালো বর্ণের।"[১৯৬]

ডক্টর ব্রিড্‌ল কিথ্ লিখেছেন ঃ "আর্য ও দাসদের মধ্যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো বর্ণের। আর্যবর্ণ ও কালো বর্ণের ভেদাভেদ নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের শ্রেণী বৈষম্যবাদের (Caste System) প্রধান উৎসসমূহের অন্যতম। কালো চামড়া ওয়ালাদেরকে পরাজিত করা আসলে বৈদিক হিন্দুদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি। .... একথা সত্য যে, ঋগবেদে দাসদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করা এবং তাদের কাছ থেকে নতুন ভূমি কেড়ে নেয়ার জন্য নদ-নদী পাড়ি দেয়ার প্রচুর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু আর্যরা যে আদিম অধিবাসীদেরকে একেবারেই নির্মূল করেনি সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। আদিম অধিবাসীদের একাংশ আর্যদের আক্রমণে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল এবং উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের পাহাড় পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। আর বাদবাকী অংশকে দাসে পরিণত করা হয়েছিল।"[১৯৭]

অধ্যাপক হপকিনস লিখেছেন ঃ "শুদ্র দাস ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে সমাজ কাঠামোর অংশ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, শুদ্ররা মূলত বিজিত জাতিরই লোক ছিল। এথেন্সে যেমন 'কারিয়ন' শব্দটি দাসের সমার্থক হয়ে গিয়েছিল, তেমনিভাবে শুদ্র শব্দটিও দাসের সমার্থক হয়ে গেছে। তবুও শুদ্ররা সমাজ জীবনের বাইরে অবস্থান করতো না। বরং ঘরোয়া জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং কতিপয় পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতেও যোগ দিত।"[১৯৮]

অধ্যাপক হপকিন্‌স আরো লিখেছেন ঃ "গৌতম (১২ ঃ ২) আর্য নারীর সাথে শুদ্র পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্পর্কে যেসব আইনের উল্লেখ করেছে, তাকে যখন 'ইপিস্তম্ভ' ধর্মশাস্ত্রের সাথে তুলনা করে দেখা হয়

তখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আর্যরা জাতিগতভাবেই কালো রং–এর মানুষদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ও বৈশিষ্ট সম্পন্ন।''' মিঃকিতিকার স্বীয় গ্রন্থ "ভারতবর্ষে শ্রেণী বৈষম্যের ইতিহাস"–এর ৮২ পৃষ্ঠায় নিতান্ত অসতর্কতার সাথেই মত দিয়েছেন যে "আর্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে কোন জাতিগত বৈষম্য অনুভূত হতো না।" একথা সত্য যে, আর্য সমাজ থেকে যারা বহিস্কৃত হতো তারা আর আর্য নামে অভিহিত হতো না। কিন্তু কোন শুদ্রকে কখনো আর্যনামে অভিহিত করা হয়নি। আর্য জাতি ঋগবেদের আমল থেকে সব সময়ই বর্ণ ও জাতিগত ভেদনীতি অনুসরণ করে এসেছে[১৯৯]।"

এই উদ্ধৃতিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হিন্দু আইনে যাদেরকে শুদ্র বলা হয়েছে তারা মূলতঃ পরাভূত অনার্য জাতি। কাজেই তদের জন্য হিন্দু আইন শাস্ত্রে যে সব বিধির উল্লেখ রয়েছে, তা শুধুমাত্র পরাজিত ও পরাভূত হয়ে যারা হিন্দু সরকারের আনুগত্য মেনে নেয়, তাদের সাথে হিন্দু ধর্মের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিৎ, সেটাই প্রকাশ করে।

২–ইহুদী ধর্ম

হিন্দু ধর্মের যুদ্ধ আইন খুঁজে বের করতে যতটা বেগ পেতে হয়, ইহুদী ধর্মের যুদ্ধ আইনের সন্ধান পেতে ততটা বেগ পেতে হয় না। একটিমাত্র গ্রন্থ তাওরাতের পাতা উল্টালেই এর আইন ও বিধিমালা জানা যায় এবং এতে ইহুদীবাদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে পড়ে। একথা সত্য যে, শেষ যুগের ইহুদী মনীষীগণ ইহুদী শরীয়াতের আইনকানুন প্রণয়নের জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন আকীবা বিন ইউসুফের মিশনাহ ও মাদরাশ, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মিশনাহ ও গুমারা একত্রিত করে লেখা হয় তালমুদ। ১১শ শতাব্দীতে ইসহাক আল–ফাসী লেখেন হালাখুছ। ১২শ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা হয় মুসা মায়মুনীর মিশনাহ তওরাত। ১৪শ শতাব্দীতে ইয়াকুব বিন আশহারের তুর এবং ১৬শ শতাব্দীতে ইউসুফ কারুর শোলখান। কিন্তু এই সব গ্রন্থ আমাদের লক্ষ্য অর্জনের তেমন সহায়ক নয়। কেননা ইহুদীদের সকল সম্প্রদায়ের নিকট সম্মিলিতভাবে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ এর একটিও নয়। তাই ইহুদী ধর্মের ভিত্তি হিসেবে এর কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহুদীরা এসব গ্রন্থের প্রতি অনেক সময় বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছে এবং সামগ্রিকভাবে তারা তাওরাত ব্যতীত অন্য কিছু মানতে রাজী নয়।

১৯০৬ সালে ইণ্ডিয়ানা পলস–এ মার্কিন ইহুদী ধর্ম নেতাদের যে সম্মেলন হয় তাতে খুটিনাটি ব্যাপারে ধর্মীয় বিধির আওতা সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। বলাবাহুল্য উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ইহুদী ধর্মীয় আইনের খুটিনাটি বিধিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং আমরা যুদ্ধ আইনের ব্যাপারে ঐ সমস্ত গ্রন্থ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তাওরাতের মধ্যেই আলোচনা সীমিত রাখবো।

প্রসঙ্গতঃ একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা যে আলোচনা করবো, তা যে তাওরাত হযরত মুসা (আঃ)–এর ওপর নাজিল হয়েছিল, সে তাওরাত সম্পর্কে নয় বরং বর্তমানে 'ওল্ডটেস্টামেন্ট' নামে যে তাওরাত পৃথিবীতে বিদ্যমান, সেটি সম্পর্কে। আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ওল্ডটেষ্টামেন্ট পঞ্চগ্রন্থ (Pentateuch) আসল তাওরাত নয়। আসল তাওরাত পৃথিবী থেকে সম্পুর্ণরূপে উধাও হয়ে গেছে। স্বয়ং ওল্ডটেষ্টামেন্ট থেকেও এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম শেষ জীবনে হযরত ইয়াশু আলাইহিস সালামের সাহায্যে মুল তাওরাত গ্রন্থ সংকলন করে একটি সিন্দুকে রেখে দেন (ইস্তিসনা ৩১ ঃ ২৪–২৭) তাঁর ইন্তেকালের পর খৃষ্টপূর্ব যষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট বুখতে নাছার বাইতুল মুকাদ্দাসে অগ্নি সংযোগ করলে সেই পবিত্র গ্রন্থ ভস্তিভুত হয়। এর আড়াইশো বছর পর হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলের বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাহায্যে এবং আসমানী অহীর নির্দেশ অনুসারে পুনরায় তাওরাত সংকলন করেন। কিন্তু এই মূল কপিটিও সংরক্ষিত হয়নি। সম্রাট আলেকজাণ্ডারে বিশ্বজোড়া বিজয়াভিযান যখন গ্রীক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক জ্ঞান–বিজ্ঞান এবং সাহিত্যও মধ্যপ্রাচ্যে পৌছিয়েছিল তখন খৃঃ পুঃ ২৮০ সালে তাওরাতের গ্রন্থাবলীও গ্রীক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। সেই থেকে মুল ইবরানী কপিটিও পরিত্যক্ত এবং গ্রীক অনুবাদটিই প্রচলিত হয়ে পড়ে। এ জন্য আজ যে তাওরাত আমরা দেখতে পাই তা হযরত মূসার মূল তাওরাত যে নয়, সেটা সুনিশ্চিত। তবে তার মানে এ নয় যে, বর্তমান তাওরাতে আসল তাওরাতের কোন অংশই নেই বা এ তাওরাত সম্পূর্ণরূপে জাল। এতে মুল তাওরাতের সাথে অনেক বাইরের কথা মিশ্রিত হয়ে গেছে এবং কিছুকথা বাদ পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তাওরাত একটু গভীরভাবে পড়লেই বুঝা যায় যে, এতে আল্লাহর কালামের সাথে ইহুদী আলেমদের তফসীর, বনী ইসরাইলের জাতীয় ইতিহাস, ইসরাইলী ফকিহদের আইনগত ইজতেহাদ এবং আরো অনেক জিনিস মিলে মিশে

একাকার হয়ে গেছে। এসব থেকে আল্লাহর কালামকে বেছে বের করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে এ সঙ্গে এ কথাও সুস্পষ্ট যে, কুরআনের মত তাওরাত ইসলামেরই শিক্ষা বহন করে এনেছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মতই ইসলামের নবী ছিলেন। বনী ইসরাইল শুরুতে ইসলামেরই অনুসারী ছিল। কিন্তু পরে তারা মুল ধর্মে নিজেদের খেয়াল মত অনেক কিছু কাটছাঁট করে 'ইহুদীবাদ' নামে নিজেদের নতুন ধর্মমত তৈরী করে নিয়েছে। সুতরাং এখানে আমরা যে জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সেটা সেই মনগড়া ধর্ম ইহুদীবাদ– হযরত মূসার আনীত ইসলাম নয়। এবারে দেখা যাক, যুদ্ধ সম্পর্কে ইহুদী ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী কি?

যুদ্ধের উদ্দেশ্য

তাওরাতে যুদ্ধের উল্লেখ আছে প্রচুর এবং স্থানে স্থানে যুদ্ধের নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর ইস্তিসনা ২য় অধ্যায় এবং আদাদ ৩৩শ অধ্যায়ে উল্লেখিত উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোথাও যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। আদাদে বলা হয়েছেঃ

"মাওয়াবের ময়দানে ইয়ারুন নদীর কিনারে মহান প্রভু মুসাকে সম্বোধন করে বললেনঃ তুমি বনী ইসরাইলকে ডাক এবং বল যে, তোমরা ইয়ারুন পার হয়ে কেনান ভূ–খণ্ডে প্রবেশ কর। অতঃপর সেখানকার অধিবাসীদেরকে তাড়িয়ে দাও, তাদের মূর্তিগুলো ধ্বংস করে দাও তাদের উচ্চ বাড়ীগুলোকে বিধবস্ত করে দাও এবং সেখানে নিজেরা বসতি স্থাপন কর। কেননা ঐ ভূখণ্ড আমি তোমাদের দিয়েছি। তোমরাই তার মালিক।" (৩৩ঃ ৫০ ৫৪)

অন্যত্র আছেঃ

"তোমরা ওঠ, রওনা হও। ইরানু নদীর কিনারে চলে যাও। দেখ, আমি হাসবুনের রাজা উমুরী সাইহুনকে তার ভুমি সমেত তোমার করতলগত করে দিয়েছি। কাজেই তার উত্তরাধিকার নিতে শুরু কর এবং যুদ্ধে তার মোকাবিলা কর।"(৩ঃ২৪)

" কিন্তু হাসবুনের রাজা সাইহুন আমাদেরকে তার রাজ্যের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে দেয়নি। কেননা তোমার প্রভু তার মেজাজ কড়া করে দিয়েছেন এবং হৃদয় কঠিন করে দিয়েছেন, যাতে তাকে তোমার হাতে দিতে

পারেন, যেমন আজ সে তোমার হাতেই আছে। অতপর মহাপ্রভু আমাকে বললেন, দেখ আমি সাইহুনকে তার রাজ্য সহ তোমার অধিকারে দিয়ে দিতে আরম্ভ করেছি। তুমি উত্তরাধিকার নিতে আরম্ভ কর, যাতে তার ভুমির মালিক হয়ে যেতে পার। তখন সাইহুন ও তার গোটা জাতি আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে এল। মহাপ্রভু তাই তাকে আমাদের কাছে ..র্পণ করে দিলেন এবং আমরা তৎক্ষণাৎ তাকে, তার পুত্রদেরকে এবং তার সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিলাম। আমরা তখনই তার সমস্ত নগরীগুলো অধিকার করলাম এবং পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুদেরকে নিজ নিজ শহরে হত্যা করলাম। চুতষ্পদ জন্তু গূলোকে এবং শহর থেকে লুণ্ঠিত অন্যান্য সম্পদ গুলোকে কেবল নিজেদের জন্য রেখে দিলাম। বাদবাকী এর সবই ধ্বংস করে দিলাম।" (২ ঃ ৩০–৩৫)

"তখন আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম, বসনের পথে যাত্রা করলাম। বসনের রাজা আওজ ও আয়ীতে সমগ্র জাতিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের মোকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। সেই সময় মহাপ্রভূ আমাকে বললেন, ওকে ভয় করো না। কেননা আমি ওকে এবং ওর গোটা জাতিকে তার রাজ্যসহ তোমার অধিকার ভুক্ত করে দেব। তুমি হাসবুনে অবস্থানকারী আমুরীয়দের রাজা সাইহুনের সাথে যে আচরণ করেছ ওর সাথেও সেই আচরণ কর। শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভু বসনের রাজা আওজকে তা সমগ্র জাতি সমেত আমাদের অধিকারভুক্ত করে দিলেন। আমরা তাদেরকে মেরে সাবাড় করে ফেললাম এবং তার সবগুলো শহর তখনই দখল করে নিলাম। আমরা তাদের প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুকে প্রত্যেক শহরে হাসবুনের রাজা সাইহুন ও তার জাতির লোকদের মতই হত্যা করলাম। কিন্তু শুধুমাত্র গৃহপালিত পশু , শহরগুলো ও মালপত্র আমরা নিজেদের জন্য রেখে দিলাম।" (৩ ঃ ১–৭)

এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাওরাতের যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজ্য জয় ছাড়া আর কিছু নয়। একটি দেশের অধিবাসীদেরকে শুধু তরবারীর জোরে পরাভূত করা এবং 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতির ভিত্তিতে তাদের ধন সম্পত্তি এবং প্রাণ আপন দখলে নিয়ে নেয়া তাওরাতের দৃষ্টিতে বৈধ। তার মতে বনী ইসরাইলকে যে রাজত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন, এভাবে বল প্রয়োগে অধিকার করাই তার মর্মার্থ। কুরআনের ভাষায়ঃ

إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (٢١ : ١٠٥)۔

"পৃথিবীর মালিক হবে আমার সৎকর্মশীল বান্দাগণ।" (৭ ঃ ৭)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٧ : ١٢٨)

"নিশ্চয় পৃথিবীটা আল্লাহর। তাঁর বান্দাদের যাকে খুশী তিনি এর অধিকারী করেন। শেষ সাফল্য কেবল পরহেজগারদের জন্য" (৭ঃ১৫)

এখানে অধিকার ও ক্ষমতা প্রত্যার্পনের যে ধারণা কুরআন পেশ করছে, তা থেকে তাওরাতের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। তাওরাতে পৃথিবীর মালিকানা কেবল বনী ইসরাইলকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআন একে কোন বিশেষ বংশধরের নয়,ন্যায়বান সৎকর্মশীলদের অধিকার মনে করে। তাওরাতের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অধিকার ও ক্ষমতা লাভের উপায় হচ্ছে এক জাতি অন্য জাতির ঘরবাড়ী, ধন সম্পদ, জান মাল সব কিছুর মালিক শুধু শক্তির বলে হবে এবং পুরানো অধিবাসীদেরকে খতম করে নিজেরা বসতি স্থাপন করবে। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ তাকে তার সততার ভিত্তিতে আপন খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাকে আপন ভূমির সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করেছেন, যেন সে জুলুম নির্যাতন খতম করে তদস্থলে ন্যায় নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। তাওরাতে ভুমির কর্তৃত্ব লাভের জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআনে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, অমুক দেশ তোমাদের জাতীয় ভূ–খণ্ড। কাজেই যুদ্ধ করে তা জয় কর। কাজেই তাওরাতের ভূমি কর্তৃত্ব নিছক দেশ জয় ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহর পথে জিহাদ সংক্রান্ত ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহুদীবাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিছক ভুমি ও সম্পদ লাভ এবং ভিন্ন জাতির ওপর বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিস্তার ছাড়া আর কিছু নয়।

ইহুদীবাদের সমর পদ্ধতি

যুদ্ধের সীমা ও নিয়ম নীতি সম্পর্কে তাওরাতে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে ইহুদী ধর্মে শত্রুদের সাথে কি রকম আচরণ শিক্ষা দেয়, সে

সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। এজন্য নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ লক্ষণীয়ঃ

"যখন তুমি কোন শহরের নিকট তার সাথে যুদ্ধ করতে আসবে তখন প্রথমে তার সাথে সন্ধি করার চেষ্টা কর। প্রতিপক্ষ যদি প্রস্তাব মেনে নেয় এবং তোমার জন্য দরজা খুলে দেয়, তাহলে সেই শহরের সকল মানুষ তোমার অনুগত হয়ে যাবে। তোমাকে কর দেবে ও তোমার সেবা করবে। আর যদি সন্ধি প্রস্তাব না মানে বরং যুদ্ধ করে,তাহলে তাকে ঘিরে ফেল। অতঃপর যখন প্রভু ঐ শহরে তোমার কর্তত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন তখন সেখানকার প্রতিটি পুরুষকে হত্যা কর। কিন্তু নারী, শিশু ও সওয়ারী জন্তু ঐ শহরে যত পাওয়া যাবে তা সব নিজের জন্য নিয়ে নাও এবং তুমি নিজের শত্রুদের এই সব সম্পত্তি খাও।" (২০ঃ১০–১৪১)

"যখন তোমরা কোন শহরকে দখল করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদীন ধরে ঘেরাও করে রাখবে, তখন তীর নিক্ষেপ করে সেখানকার গাছপালা নষ্ট করো না। কেননা হয়তো তুমি সেই গাছের ফল খেতে পারবে। সুতরাং তুমি ঘেরাও এর কাজে ব্যবহারের জন্য গাছপালাগুলো কেট না। কেননা জ্যান্ত গাছ মানুষের জীবনের মত মুল্যবান।"(১৯–২০)

"কিন্তু যেসব ভূ–খণ্ড আল্লাহ তোমাদের অধিকারভুক্ত ঘোষণা করেছেন সেখানে কোন প্রাণীকে জীবন্ত ছেড়ে দিওনা –হত্যা কর।" (২০ঃ১৬–১৭)

"যুদ্ধমান জাতি যখন পরাভূত হবে তখন তাদেরকে খুন কর। তাদেরকে প্রতিশ্রুতিও দিওনা, তাদের কৃপাও করো না। তোমরা তাদের বধ্যভুমি ধ্বংস কর, তাদের মুর্তি গুলো মিসমার করে দাও। তাদের ঘনবাগান কেটে ফেল এবং তাদের পাথরের মূর্তি গুলো জ্বালিয়ে দাও।" (৭ঃ২–৫)

"যে সব জাতি তোমাদের করতলগত হবে, তারা উঁচু পাহাড়, টিলা ও সবুজ গাছের নীচে যেখানে যেখানে বাস করে এবং নিজেদের উপাসনাদি করে, তাকে ধ্বংক করে দাও। তাদের বধ্যভুমিগুলোকে ধ্বংস কর, তাদের ঘরের খুঁটিগুলো চুর্ণ করে দাও, তাদের ঘন বাগানে আগুন লাগাও, তাদের দেবতাদের নাম মুছে দাও।" (২ঃ২)

" আজকের এই দিনে তোমাকে আমি যা নির্দেশ দেব তুমি তা মনে রেখ। আমি আমুরী, কেনানী, হিত্তি, ফারজি, হাভি ও ইয়াবুসীদেরকে তোমার

সামনে থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি। সাবধান; এমন যেন না হয় যে, যে ভূখণ্ডে তুমি যাচ্ছ তার অধিবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে নিলে আর সেই চুক্তি তোমার জন্য গলার ফাঁস হলো। বরং তুমি তাদের বধ্যভূমি মিসমার করে দাও, তাদের মূর্তিগুলো চূর্ণ করে দাও।" (৩৪ ঃ ১১-১২)

"অতপর মহাপ্রভু মুসাকে বললেন, মাদায়েনবাসীর নিকট থেকে বনী ইসরাইলের প্রতিশোধ গ্রহণ কর। আর তুমি এরপর স্বজাতির লোকদের সাথে মিলিত হবে। তখন মুসা বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এক লাখ বনী ইসরাইলীর মধ্যে প্রতি গোত্র থেকে এক হাজার উপস্থিত হলো। এভাবে যারা লড়াইর জন্য প্রস্তুত হলো তাদের সংখ্যা দাঁড়ালো ১২ হাজার। অতপর তারা মাদায়েনবাসীর সাথে যেভাবে মহাপ্রভু মুসাকে বলেছিলেন সেভাবে যুদ্ধ করলো এবং সকল পুরুষকে হত্যা করলো। বনী ইসরাইল মাদায়েনের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করলো এবং তাদের জীবজন্তু ও মালপত্র সবই লূণ্ঠন করলো। তারা যে সব শহরে বসবাস করতো তার সব কটিতে দুর্গগুলিকে জ্বালিয়ে দিল এবং সমস্ত ধন সম্পদ ও বন্দী মানুষ ও পশুকে নিয়ে গেল। সেই সব বন্দী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও লুটের সম্পদ তারা মুসা ও আল ইয়াজাবের নিকট ও বনী ইসরাইলের নিকট শিবিরে মাওয়াবের ময়দানে, ইয়ারুহের সম্মুখস্ত ইয়ারুনের কিনারে নিয়ে এল।... আর তখন মুসা সেনাপতিদের ওপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তোমরা কি সমস্ত নারীদের জ্যান্ত রেখেছ? এক্ষণে শিশুদের মধ্যে যারা ছেলে এবং নারীদের মধ্যে যারা পুরুষ সাহচর্যের সাথে পরিচিত তাদের সকলকে হত্যা কর। কেবল যেসব মেয়ে পুরুষ সাহচর্যের সাথে পরিচিত নয় তাদের নিজেদের জন্য রেখে দাও"। (৩১ঃ১-১৮)

"এবং তারা শহরের সমস্ত অধিবাসীকে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি গরু, কি ভেড়া, কি গাধা সকলকে এক সঙ্গে তরবারীর আঘাতে কেটে ফেললো। অতঃপর তারা গোটা শহরকে সমস্ত সহায় সম্পদ সমেত জ্বালিয়ে দিল। কেবল টাকা এবং সোনা, পিতল ও লোহার পাত্রগুলোকে মহাপ্রভুর ভান্ডারে জমা করলো।" (৬ ঃ ২১ .২৫)

"এবং তারা 'আই' এর রাজাকে জ্যান্ত গ্রেফতার করলো এবং তাকে হযরত ইয়াশুর আলাইহিস সালামের নিকট নিয়ে এল। আই এর জনগণ

তাদের পেছনে ধাওয়া করলে তারা 'আই' এর ১২ হাজার অধিবাসীর সকল স্ত্রী পুরুষকে হত্যা করলো। ইয়াশু স্বয়ং যে হাতে বর্শা নিয়েছিলেন, আই এর একটি লোকও জীবিত থাকতে হস্ত সংযত করেন নি। ইসরাইলীরা উক্ত শহরের শুধু মাত্র জীবজন্তু ও মালপত্র লুণ্ঠন করে। ইয়াশুর নিকট আগত আল্লাহর নির্দেশেই তারা এ সব করে" (৮ ঃ ২৩–২৮)

এই উক্তিগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইহুদী ধর্মে শত্রুদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণী হলো, আল্লাহ যাদেরকে বনী ইসরাইলের উক্তরাধিকার হিসেবে দেননি। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, আল্লাহ যাদেরকে তাদের উত্তরাধিকার ভুক্ত করেছেন। এই দু'শ্রেনীর সাথে তাদের আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। প্রথম শ্রেণীর শত্রুদের ব্যাপারে তার নীতি হলো, প্রথমে তাদেরকে সন্ধির প্রস্তাব দিতে হবে। তারা যদি সে প্রস্তাব মেনে নেয় এবং নিজেদের রাজ্য বনী ইসরাইলের নিকট সমর্পণ করে তাহলে তাদেরকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের নিকট থেকে কর আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি তারা সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত না হয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং বিজয় লাভের পর তাদের সমস্ত পুরুষকে হত্যা করতে হবে, নারী ও শিশুদেরকে দাসদাসী করতে হবে এবং সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। যুদ্ধ চলাকালে বাগান, ফসলের মাঠ ও বৃক্ষলতাদি নষ্ট করা নিষিদ্ধ। তবে সেটা একটা অপরাধ মূলক কাজ বলে নয়। বরং বিজয় লাভের পর বিজেতার তাতে কোন লাভ হবে না–এজন্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শত্রুদের সে সমস্ত মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তার নির্দেশ হলো এ ধরণের লোকদের সাথে যেন কোন সন্ধি বা চুক্তি না করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে নির্বিবাদে যুদ্ধ শুরু করে দিতে হবে, তাদের বসতিকে ধ্বংস করে দিতে হবে, তাদের ক্ষেতখামার, দালান কোঠা, ফসলের মাঠ, উপাসনালয় সব মিসমার করে দিতে হবে। তাদের নারী, পুরুষ, শিশু এমন কি জীব জানোয়ার পর্যন্ত খতম করে দিতে হবে এবং পৃথিবী থেকে তাদের নাম চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত জাতিদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা চাই। সে সব জাতির সামনে আদৌ এমন কোন শর্ত রাখাই হয়নি যা পূরন করলে জীবন ভিক্ষা দেয়াযেতেপারে।

ইহুদীবাদের এ দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট শিক্ষার ওপর মন্তব্য করার কিছুই নেই। ফিলিস্তিনের বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রটি এর জীবন্ত প্রমাণ, যা একই উত্তরাধিকার মতবাদের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে সেখানে আরবদের সাথে তাওরাতের শিক্ষা অনুসারেই আচরণ করা হচ্ছে।

৩–বৌদ্ধ ধর্ম

যুদ্ধের বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে যাদের সাথে ইসলামের মতবিরোধ নেই–মতবিরোধ কেবল তার পদ্ধতিগত ও নৈতিক দিক দিয়ে, সেই ধর্ম কয়টি নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা হলো। এবারে যে ধর্ম কয়টি আদৌ যুদ্ধকেই বৈধ মনে করে না এবং ইসলাম সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দিয়েছে বলেই তার সাথে তাদের বিরোধ, সেই ধর্ম কয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। এ জাতীয় ধর্ম মতের মধ্যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে প্রথমে আসে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসঙ্গ।

বৌদ্ধ ধর্মের উৎস

যুদ্ধ সম্পর্কে বৌদ্ধ ধর্ম কি মত পোষণ করে সেটা নির্ণয় করার পূর্বে একথা বুঝে নেয়া দরকার যে, বর্তমানে আমাদের কাছে এমন কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই যার সাহায্যে নিশ্চিতভাবে বুদ্ধদেবের আসল শিক্ষাটা জানা যেতে পারে। বুদ্ধদেব নিজে কোন বই লিখে যাননি। তিনি তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের আকিদা–বিশ্বাস ও বিধি –নিষেধের এমন কোন সংকলনও তৈরী করান নি যা দ্বারা তাঁর নিজের ভাষায় তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া যায়। তাঁর কোন শিষ্য বা অনুচরও যে তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা তাঁর মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেননি, তাও ইতিহাস থেকে প্রমাণিত। কোন কোন বর্ণনা থেকে অবশ্য এতটুকু জানা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর পর রাজগিরীতে একটা বড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের দু'একজন বিশিষ্ট শিষ্য সেখানে বুদ্ধের শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ ঐ বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে, সেই ভাষণ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ঐ সম্মেলন সত্যিই অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিনা, তা ইতিহাস দ্বারা পুরোপুরিভাবে প্রমাণিত হয় না। 'মহাপরিনির্বান সূত্র' নামক যে গ্রন্থখানি বুদ্ধদেবের জীবন ও তাঁর পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম তা ঐ

সম্মেলনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।২০০ এর পরে আসে বর্তমানে যে গ্রন্থ কয়খানি এই ধর্মকে জানবার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিদ্যমান তার কথা। এগুলো সম্পূর্ণতঃ বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অনেক পরের লেখা। তাঁর মৃত্যুর পর পূর্ণ এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়। তারপর বৈশালীতে এই ধর্মের স্থায়ী কমিটির এক বৈঠক হয়। সেখানে বহু আলাপ–আলোচনা ও তর্ক–বিতর্কের পর এর মূলনীতি, আকিদা ও নির্দেশাবলী প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে 'দীপ দুমাসা' নামক গ্রন্থের লেখক থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভিক্ষুরা আসল ধর্মের মূলনীতিসমূহ পাল্টে দেয়ার চেষ্টা করে, এর আকিদা–বিশ্বাস ও বিধি–নিষেধ অনেক কিছু রদবদল করে এবং মূল সুত্রগুলো পরিবর্তন করে নতুন সুত্র রচনা করে।২০১ সেই যুগেই বৌদ্ধ ধর্মকে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় এবং এ প্রচেষ্টা এক নাগাড়ে চারশো বছর ধরে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। কিন্তু শেষের দিকে এই ধর্ম পুনরায় বিকৃতির শিকার হয়। ফলে তার মুলনীতি পর্যন্ত বদলে যায়। প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মে আল্লাহর অস্তিত্ব মেনে নেয়া হয়– যা সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে মহত ও শ্রেষ্ঠ এবং যার সাত্ত্বিক প্রকাশ ঘটেছে বুদ্ধদেবের মাধ্যমে। প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মে বেহেশ্‌ত ও দোজখের কোন ধারণা বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু এখন সৎকর্মের পুরস্কার বেহেশ্‌ত এবং খারাপ কাজের পরিণতি দোজখ –এ কথা মেনে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মে বৈরাগ্যবাদী জীবন যাপনের নিয়ম কানুনে প্রচন্ড কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু এখন তা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে রদবদল করে অপেক্ষাকৃত শিথিল করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের এই সর্বশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের রাজা কনিষ্টের আমলে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তার অধীন কাশ্মীরে যে কাউন্সিল বসেছিল তাতে এই রদবদল সহ বৌদ্ধ ধর্মের নয়া আইন–কানুন তৈরী করা হয়।২০২ এই নয়া আইন–কানুনকে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু বুদ্ধের অনুসারীদের বৃহত্তম অংশ মেনে নেয়।

সুতরাং একথা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশুদ্ধ অর্থে "ধর্ম গ্রন্থ" বলতে যা বুঝায়, সে জিনিস বৌদ্ধধর্মে নেই। ফলে কোন বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলার জো নেই যে, বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা কি ছিল। খুব বেশী নির্ভর করতে হলে তা করা যায় কনিষ্কের আমলে শেষ বিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া তিনখানা গ্রন্থের ওপর। তা হলোঃ

(১) বিনয় পিটকঃবৈরাগ্যবাদী জীবন–যাপনের বিধিমালা। খৃঃ পুঃ ৩৫০ থেকে আরম্ভ করে প্রায় খৃঃ পুঃ ২৫০ অব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এটি রচিত ও সংকলিত হয়েছে। তবে এর লেখকের সন্ধান পাওয়া যায় না।

(২) সুত্ত পিটকঃ এতে মুক্তিলাভের উপায় ও বৌদ্ধধর্মের চরিত্রদর্শন সম্পর্কে বুদ্ধদেবের অধিকাংশ বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইতিহাসে এই গ্রন্থেরও রচয়িতা ও রচনাকাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

(৩) অভিধর্ম্ম পিটকঃ এতে প্রধানত বৌদ্ধধর্মের চরিত্রদর্শন ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থখানা সম্পর্কে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, এখানা খৃঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল[২০৩] (এই তিনখানা গ্রন্থকে একত্রে ত্রিপিটক বলা হয়)

বলাবাহুল্য এই ত্রিপিটক থেকে আমরা যে বুদ্ধদেবের পরিচয় পাই, তার শিক্ষা ও আদর্শ নিয়েই এখানে আলোচনা করবো। নচেত যে বুদ্ধদেব সত্যিকারভাবে কি শিক্ষা দিতেন তা আমাদের জানা নেই, সেই বুদ্ধদেব ও তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করার কোন অবকাশই নেই।

অহিংস নীতি

বৌদ্ধধর্মের প্রধান পরিচয় এই যে, এটা মূলতঃ একটা অহিংসবাদী ধর্ম। প্রত্যেক প্রাণীকেই এ ধর্মে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং মানুষ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র কীটাণুকীট পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীরই জীবন এধর্মে অ–হননীয়। বুদ্ধের দশটি প্রধান নির্দেশের পয়লা কঠোর নির্দেশটি হচ্ছেঃ "কোন জীবকে হত্যা করো না" যে ভিক্ষু কোন জীবকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করবে সে বৌদ্ধধর্মের বিধানে অমার্জনীয় অপরাধকারী বলে বিবেচিত হবে।[২০৪] এমনিক এ ধর্মে ভিক্ষুদেরকে বর্ষার তিন মাসে আপন আশ্রম থেকে বাইরে বেরুতে পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মাটির ওপর চলাফেরা করলে পোকামাকড় পিষ্ট হয়ে মরে যেতে পারে।[২০৫] এমন কঠোর অহিংস নীতির উপস্থিতিতে যুদ্ধের অনুমতির প্রশ্নই উঠতে পারে না। প্রাণ যখন তার কাছে এত বেশী সম্মানিত তখন তার পক্ষে এমন একটা কাজকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখাই স্বাভাবিক যাতে কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় নয় মানুষ মরে এবং একজন দুজন নয়– হাজার হাজার লাখ লাখ আদম–সন্তানকে হত্যা করা হয়।

এজন্যই বৌদ্ধধর্ম একজন ভিক্ষুকে রণাঙ্গনে গিয়ে রক্তপাতের বীভৎস দৃশ্য আবলোকন করতেও নিষেধ করেছে। পকিত্তি ধর্মের ৩৮তম ধারায় বলা হয়েছেঃ "যে ভিক্ষু কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ চাড়াই একটি যুদ্ধংদেহী সৈনিককে দেখতে যাবে সে অপরাধী হবে।" ৪৯তম ও ৫০তম ধারায় বলা হয়েছেঃ "যদি ভিক্ষুর সৈন্যদের কাছে যাওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে তবে সে দুই বা তিন রাত পর্যন্ত সেখানে থাকতে পারবে। এর চেয়ে বেশী থাকলে পাপ হবে।" "আর যদি সে সেখানে দুই তিন রাত অবস্থানকালে রণাঙ্গনের রণশয্যা অথবা সৈন্য গণনা কিংবা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো দেখে তাহলে তাও অপরাধের শামিল হবে।"[২০৬]

বুদ্ধের দর্শন

এই নির্দেশাবলী থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে বুদ্ধের নীতি ও দর্শন স্পষ্ট জানা যায়। কিন্তু এই নীতি ভালো না মন্দ তা বুঝবার জন্য কেবল এই সংক্ষিপ্ত নির্দেশসমূহ জানাই যথেষ্ট নয়, বরং সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনটাই হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন, যার একটা অংশ এই অহিংসবাদ। বুদ্ধদেব মানুষকে যে বিশেষ পথে চালিত করতে এবং যে বিশেষ কাঠামোতে তার জীবনকে গড়ে তুলতে চান অহিংসা তার একটা উপায় বা পন্থা মাত্র। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে, বুদ্ধদেবের সেই পথটা কি, যার দিকে মানুষকে তিনি চালিত করতে চান আর সেই কাঠামোটাই বা কি যা তিনি মানুষের জীবনে স্থাপন করতে চান। আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে যে, মানব জীবনের কি লক্ষ্যইবা তিনি নির্ধারণ করেছেন। এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি বাস্তব কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন। এইসব প্রশ্নের সমাধান না করে অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য ও মানবজীবনের ওপর তার গভীর প্রভাব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

বুদ্ধদেব মানব জীবনকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন তা দুনিয়ার অন্য সব মনীষী, ধর্ম প্রবর্তক ও সংস্কারকের দৃষ্টিকোন থেকে সর্ম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দুনিয়ায় মানুষ কি জন্য জন্মেছে এবং তার জীবনের উদ্দেশ্য কি,তা বুঝতে বুদ্ধদেব মোটেই চেষ্টা করেন নি। এ জন্য স্বাভাবিকভাবেই তার ধর্মমত এ প্রশ্ন নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামায়নি যে, এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাপনের পদ্ধতি কি হওয়া উচিত। কিভাবে তার জীবন যাপন তার নিজের জন্য ও অন্যদের জন্য সত্যিকার কল্যাণের কারণ হতে পারে। তিনি তার সমগ্র

মনোযোগ একটি মাত্র প্রশ্নের সমাধানে ব্যয় করেছেন। তা হচ্ছে, মানুষের জীবনে পরিবর্তন ও বিপ্লব কেন আসে? শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু, কষ্ট, আনন্দ, বিপদ ,সুখ ইত্যাদির কারন কি? এ সব রকমারি পরিবর্তন থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? মানুষের গোটা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে তার কাছে এই একটি প্রশ্নই মনোযোগ দেয়ার যোগ্য বলে মনে হয়েছে। এ ছাড়া অন্য সমস্ত নীতিগত, বাস্তব, আকিদাগত ও চরিত্রগত সমস্যা থেকে তিনি চোখ বুঁজে বসে থেকেছেন।

এই মৌলিক প্রশ্নটি নিয়ে কয়েক বছর ধরে ধ্যান ও সাধনা করার পর তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জীবনটাই মূলত একটা বিপদ যা একান্ত অবাঞ্ছিতভাবে মানুষের ঘাড়ে চড়াও হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ওপর যত পরিবর্তন আসে তার সব ঐ বিপদেরই বিভিন্ন মূর্তিতে আত্ম প্রাকাশের নামান্তর। তার পৃথিবীতে আসার কোন উদ্দেশ্য নেই। তার জন্ম একেবারেই নিরর্থক ও বৃথা। তার যদি আদৌ কোন কাজ থেকে থাকে, তবে তা হচ্ছে কেবল বিপদ মুসিবত সহ্য করা ও কষ্ট করা। এ জন্য এই পৃথিবী তার বসবাসের জায়গা নয়। এখানে তার জন্য প্রকৃত পক্ষে কোন আনন্দ ফুর্তি নেই। কেননা প্রত্যেক আনন্দের পেছনে একটা বিষাদ, প্রত্যেক লাভের পশ্চাতে একটা লোকসান এবং প্রত্যেক জন্মের পেছনে একটি মৃত্যু অবধারিত। (লক্ষণীয় যে, এই শিক্ষাটি কুরআনের শিক্ষা "প্রত্যেক বিপদের শেষে শান্তি রয়েছে" এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এ দুই বিপরীত শিক্ষার প্রভাবও সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। কুরআনের শিক্ষা মানুষকে শত নৈরাশ্যের মধ্যেও নির্জীব হতে দেয়না। আর বুদ্ধের শিক্ষা শান্তির মধ্যেও পরবর্তী অশান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নির্জীব করে দেয়। অনুবাদক) আর এ সবই এক চিরন্তন বিবর্তন ধারার আওতাধীন এবং সেই বিবর্তন ধারাও স্বয়ং এক বিপদ স্বরূপ।

প্রশ্ন হলো, মানুষ এমন বিপদে কেন পড়লো। এর জবাব বুদ্ধ এরূপ দেন যে, মানুষের কামনা–বাসনা, চেতনা ও অনুভুতিই তাকে জীবন রূপ বিপদে নিক্ষেপ করেছে। মানবাত্মার এই কামনা ও অনুভুতির জন্যই দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বারবার মানুষ দুনিয়ায় আসে। এরই জন্য সে বারবার এক দেহ থেকে আর এক দেহে, এক জীবন থেকে আর এক জীবনে স্থানান্তরিত হতে থাকে। যতক্ষণ কামনার ঐ জাল তার গলা থেকে না বের

হয় ততক্ষণ সে বারংবার করার ও বারংবার জীবিত হওয়ার বিপদ থেকে কোন ক্রমেই মুক্তি পেতে পারে না।

তাহলে এই জীবন রূপ বিপদ থেকে সে কিভাবে পরিত্রাণ পাবে? বুদ্ধদেব মাত্র একটি শব্দ "নির্বান' থেকে এ প্রশ্নের সমাধান পেয়েছেন। তিনি বলেন, জীবনটাই যখন এক মুর্তিমান বিপদ এবং কামনা এই বিপদের মূল কারণ তখন মানুষের জন্য প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি কেবলমাত্র নাস্তি,বিলয় ও বিলুপ্তির মধ্যেই নিহিত। প্রকৃত শান্তি লাভ হতে পারে কেবল মাত্র কামনা, বাসনা এবং চেতনা অনুভুতিকে নির্মূল করার মাধ্যমেই। মানুষের দুনিয়ার সাথে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করা কর্তব্য। কোন জিনিসের প্রতি ভালোবাসা, কোন জিনিসের আকাংখা এবং কোন স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা মোট কথা দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতিই কোন মোহ রাখা চলবেনা। তার সমস্ত আবেগ অনুভুতি ও কামনা বাসনাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে যেন এই দুনিয়ার সাথে তার আর কোন সম্পর্কই না থাকে। আর সম্পর্ক না থাকলে এখানে তার আর পুনরায় আসারও প্রয়োজন হবে না। এভাবে সে অস্তিত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে "নাস্তিত্ব" বা চুড়ান্ত বিলুপ্তির 'অন্তহীন দিগন্তে বিলীন হয়ে যাবে। এটাই হলো নির্বান এবং বুদ্ধের মতে এটাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।[২০৭]

এরপর চতুর্থ প্রশ্ন হলো, নির্বানের লক্ষ্যে পৌছার উপায় কি?[২০৮] এখানে এসে বৌদ্ধ ধর্ম বাস্তব রূপ ধারণ করে। নির্বান হাসিল করার জন্য সে ৮টি কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছে[২০৯] যথাঃ

(১) বিশুদ্ধ আকিদাহ্-বিশ্বাস অর্থাৎ বিপদ-আপদের কারণ, বিপদ দূর করার উপায় এবং বিপদ দূর করার কর্মপন্থা-এই চারটি তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

(২) বিশুদ্ধ ইচ্ছা ও সংকল্প অর্থাৎ যাবতীয় স্বাদ-গন্ধ বর্জনের সংকল্প এবং অন্যকে কষ্ট দেয়া ও জীব হত্যা থেকে পূর্ণ সংযম অবলম্বন।

(৩) বাক-শক্তির ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার অর্থাৎ গালিগালাজ, রূঢ় কথা, নিন্দা করা ও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা।

(৪) ন্যায়সঙ্গত চালচলন অর্থাৎ ব্যভিচার, আত্মহত্যা ও আত্মসাৎ করা থেকে বিরত থাকা।

(৫) ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক জীবন অর্থাৎ বৈধ পন্থায় জীবিকা উপার্জন।

(৬) ন্যায় সঙ্গত চেষ্টা–সাধনা অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি অনুসারে কাজ করা।

(৭) স্মৃতি শক্তির সঠিক ব্যবহার অর্থাৎ নিজের অতীত কাজ স্মরণ করা।

(৮) সঠিক চিন্তা অর্থাৎ আনন্দ স্ফুর্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নির্বানের ব্যাপারে ধ্যান করা।[২১০]

এই আটটি কর্মপন্থা বাস্তবায়নের জন্য গৌতমবুদ্ধ দশটি নৈতিক নির্দেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে পাঁচটির ওপর বেশী জোর দেয়া হয়েছে এবং পাঁচটির ওপর অপেক্ষাকৃত কম জোর দেয়া হয়েছে। নির্দেশগুলি এইঃ (১) কাউকে হত্যা করোনা, (২) চুরি করোনা, (৩) ব্যভিচার করোনা, (৪) মিথ্যা বলোনা, (৫) মাদক দ্রব্য সেবন করোনা, (৬) নির্দ্ধারিত সময় ছাড়া পানাহার করোনা, (৭) খেলাধূলা ও গান বাজনা করোনা, (৮) ফুল, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করোনা, (৯) নরম বিছানায় শুয়োনা এবং (১০) সোনা রূপা কাছে রেখোনা।[২১১]

উপরোক্ত ৮টি কর্মপন্থা ও ১০ টি নির্দেশ বৌদ্ধ ধর্মের সমগ্র নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি। বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদেরকে সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে যতগুলো নির্দেশ দিয়েছেন তার গোড়ার কথা হলো, আত্মবিলুপ্তি ও 'বৈরাগ্য'। যেহেতু এর জীবন লক্ষ্য হলো নির্বান এবং তা আত্মবিলুপ্তি ছাড়া অর্জিত হতে পারেনা, এ জন্য সে মানুষের সত্তাকে বিলীন করার জন্য অত্যন্ত কঠিন সাধনার ব্যবস্থা করেছে। যেমন মাথার চুল ও দাড়ি গোঁফ টেনে ছেঁড়া যাতে সৌন্দর্যের অহংকার বিনষ্ট হয়। সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকা, কাঁটা ও পেরেকের বিছানায় শোয়া, সব সময় একই পার্শ্বে শোয়া, শরীরে মাটি লাগিয়ে রাখা এবং অনুরূপ কঠোর দৈহিক যাতনামূলক কাজ যা আত্মাকে নির্জীব ও আবেগ অনুভূতিকে বিনষ্ট করে দেয়।[২১২] এ ছাড়া জীবন যাপনের সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপারেও বুদ্ধ অনুরূপ কঠোর বিধি দিয়েছেন। এখানে সে সবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া কঠিন। তবে দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

চারটি জিনিস কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে যথাঃ (১) নারী পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক।২১৩ (২) চুরি এমন কি একটি ঘাসও নয়। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে জীব হত্যা–এমন কি কীটপতঙ্গও নয়। (৪) কোন অতিন্দ্রিয় অবস্থার সাথে নিজের সংশ্রব স্থাপন।২১৪

ধর্মীয় জীবন অবলম্বন করার পর মানুষের নতুন কাপড় পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার পরিবর্তে কবর থেকে মৃতের কাফন বের করে তা দিয়ে জামা বানিয়ে নিতে বলা হয়েছে।২১৫ এ রকমের জামা এক সময়ে তিনটের বেশী হতে পারবে না।

জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একটা কাঠের থালা নিয়ে নীরবে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা করতে বলা হয়েছে। এই ভিক্ষার জীবিকাই বৌদ্ধ ধর্মে সবচেয়ে পবিত্র জীবিকা।২১৬

থাকার জন্য কোন ঘরবাড়ী বানানো চলবে না। জঙ্গলে ও গাছের ছায়ায় থাকতে হবে। অসুখ হলে কোন ঔষধ ব্যবহার জরা চলবে না। নিজের পেশাবই ভালো ঔষধ।২১৭

নিজের শরীর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দরকার নেই। উর্ধপক্ষে ১৫ দিন পর একবার গোসল করা যেতে পারে।২১৮ নিজের কাছে মোটেই টাকা পয়সা রাখতে নেই। ব্যবসায়, লেনদেন, বেচাকেনা এবং সোনা–রূপার ব্যবহার করতে হয় এমন কোন কাজই করা চলবেনা।২১৯ ভালো বিছানারও দরকার নেই। একটা মোটা কম্বল থাকলেই চলবে এবং ঐ একটি কম্বল অন্ততঃ ৬ বছর চালাতে হবে।২২০

বৌদ্ধ ধর্মের আসল দুর্বলতা

এই হলো বৌদ্ধ ধর্মের সমগ্র নৈতিক জীবন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসার। অহিংসা এরই একটি অংশ বিশেষ। সন্দেহ নেই, এতে কয়েকটি উত্তম মানের চারিত্রিক বিধানও রয়েছে। বুদ্ধ যে সংযম ও চারিত্রিক মাহাত্ম্য শিক্ষা দিয়েছেন তা স্বীকার না করলে এক চরম অবিচার হবে বলে আমি মনে করি। তিনি নিজের মহৎ জীবনেও এর পূর্ণাংগ বাস্তব নমুনা পেশ করেছেন। কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যাপারে কতিপয় চমৎকার বিধান থাকা সত্ত্বেও মৌলিক বিধানের ব্যাপারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর গোটা জীবন দর্শনই ভ্রান্ত। এর ভিত্তি

একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানব জীবন সম্পর্কে এর দৃষ্টিভঙ্গিটাই ভূল। তিনি একটি ভূল স্থান থেকে মানুষ ও তার জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। একটি ভূল স্থানকে মানুষের জীবনের লক্ষ্যরূপে নির্দ্ধারণ করেছেন এবং সেই লক্ষ্যে পৌছার জন্য যে পথ তিনি বাছাই করেছেন তাও ভুলপথ। আসলে বুদ্ধদেব দুনিয়ার বিবর্তন ও বিপ্লব এবং ঘটনা ও দুর্ঘটনাবলী দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার প্রকৃত কারণ বুঝতে চেষ্টা করেননি। তার গভীরে নেমে বাস্তবতার সন্ধান করেননি। বীরত্বের সাথে তার মোকাবিলা করে কোন উন্নততর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার সংকল্প গ্রহণ করেননি। এর পরিবর্তে তিনি জীবন ও তার ঘটনাবলীর প্রতি একটা ভাসা ভাসা দৃষ্টি দেন এবং এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানুষের জীবনটাই বৃথা, গোটা বিশ্বজগত নিরর্থক, এতে পরিবর্তন ও বিবর্তনের যে ধারা চলছে, তার কোন কারণ বা লক্ষ্য নেই। এ সবের উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে কষ্ট দেয়া। মানুষকে বুদ্ধি, বিবেক, আবেগ, অনুভুতি, উপলব্ধি, কামনা, বাসনা ও অন্য যতগুলো দৈহিক শক্তি দেয়া হয়েছে, তা কেবল তাকে দুঃখকষ্টে জর্জরিত করার জন্য– এ ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। দুনিয়ার ধনসম্পদ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সরকার, শিল্প ও বাণিজ্য মোটকথা সবকিছুই নিরর্থক ও নিস্ফল। এ সবই হলো সম্পর্ক সম্বন্ধের জাল– যা মানুষকে বার বার পার্থিব জীবনের দিকে টেনে নিয়ে আসে এবং জন্ম –জন্মান্তরের এক অন্তহীন ধারাবাহিকতায় লিপ্ত রাখে। অতএব এ দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক সম্বন্ধ ছিন্ন করা ছাড়া মানুষের আর কোন কাজ নেই। আর নিজের সত্তাকেও তার কষ্ট দিয়ে দিয়ে এমনভাবে নির্জীব করে দিতে হবে যে সে যেন অস্তিত্ব ও জীবনের শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে নাস্তি ও বিলুপ্তির দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়।

সুতরাং এ কথা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিপদ ও দুর্যোগে ভয় পেয়ে দুনিয়ার জীবনই ত্যাগ করে, তার সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়ে কেবল নিজের মুক্তির ধ্যানে মগ্ন হয় এবং সেই বিধান বা মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এমন পথ অবলম্বন করে যা সামাজিকতার বাহির দিয়েই যায়, সে ব্যক্তির কাছ থেকে কখনোই এমন আশা করা যায় না যে, সে নিজের পরিবার–পরিজন, সমাজ , জাতি ও দেশের জন্য এবং বৃহত্তর অঙ্গনে মানব জাতির কল্যাণের জন্য কোন সাহসিক প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাবে। তার কাছ থেকে আশা করা যায় না যে, সে নিজের মন

মগজের শক্তি সামর্থ এবং নিজের বস্তুগত ও আত্মিক উপায়–উপকরণকে দৃঢ়তার সাথে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির কাজে লাগাবে এবং জুলুম, আগ্রাসন, হাঙ্গামা, নৈরাজ্য, অহংকার, হঠকারিতা, গোমরাহী ও বিভ্রান্তি প্রভৃতি বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বীরের মত সংগ্রাম করে পৃথিবীতে ন্যায়নীতি, সুবিচার, শান্তি, নিরাপত্তা, সত্য ও সততার পতাকা উড্ডীন করবে এবং প্রাকৃতিক কারণে মানুষের ওপর যেসব বিপদ ও দুর্যোগ আসে, তার মোকাবেলা করবে। এই সাধ্যসাধনা, কর্মতৎপরতা, বীরোচিত পদচারনা, রণাঙ্গনের বিপদ নির্ভীকতার সাথে মোকাবিলা করা এবং রাজনীতি ও শাসনকার্যের গুরুদায়িত্ব বহন কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব যে পৃথিবীকে কর্মস্থান বলে মনে করে, যার সামনে জীবনের একটা সুমহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে, যে নিজেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এক উচ্চতর সত্তার সামনে নিজেকে দায়ী ও জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে, যার বিশ্বাস আছে যে, এই পৃথিবীতে সে যত ভাল কাজ করবে পারলৌকিক জীবনে সে ততই বেশী পুরুস্কার লাভ করবে। যে অভাগা প্রথম থেকেই নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ, নিজের কাজের ফলাফলের ব্যাপারে হতাশ, পরিবেশ প্রতিবেশের সমস্যাবলী দেখে ভগ্নোৎসাহ এবং ভয়ে, ত্রাসে, হতাশায় ও বিলুপ্তির আবর্তে আশ্রয় নেয়াকেই শ্রেয় মনে করে, সেই কাপুরুষ, দুর্বলচিত্ত ও সংকল্পহীন ব্যক্তির কাছ থেকে সামাজিকতার বিশাল দায়িত্ব পালন এবং যুদ্ধ, রাজনীতি ও শাসন কার্যের ঝুঁকিপূর্ণ তৎপরতায় অংশ গ্রহণের আশা কিভাবে করা যেতে পারে! সেতো অনেক আগেই পার্থিব জীবনের সমস্ত ঝামেলা ত্যাগ করে চিরন্তন মৃত্যুকে আপন জীবনের লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করে নিয়েছে। কাজেই হাতিয়ার নিয়ে কর্মময় জীবনে প্রবেশ করে এর ব্যবস্থাপনায় নিজের সময় নষ্ট করার জন্য সে কি দায়ে ঠেকেছে? যে দুনিয়ার জীবনকে সে নিষ্ফল এবং যার গোটা ব্যবস্থাকে সে অর্থহীন মনে করে তার জন্য মাথা ঘামাতে যাবে কেন।[২২১]

সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম যে অহিংসায় বিশ্বাসী তার কারণ যুদ্ধ ও রক্তপাত ত্যাগ করে পার্থিব জীবনের সমস্ত দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছা নয়, বরং তার প্রকৃত কারণ এই যে, সে দুনিয়া ও তার কার্যকলাপের সাথে আদৌ কোন সংশ্রব রাখতে চায়না এজন্য স্বভাবতই সে যুদ্ধ এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী। সে অহিংসবাদ গ্রহণ করেছে এই জন্য যে, বৈরাগ্যবাদী জীবনে তরবারীর কোন

ভূমিকা নেই। একজন বৌদ্ধ সন্যাসীর জীবনের যা লক্ষ্য তা অর্জন করতে তরবারী তাকে সহায়তা করেনা।

বুদ্ধের অনুসারীদের জীবনে অহিংসার প্রভাব

বৌদ্ধ ধর্মের এই নীতির ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, সে পৃথিবীতে কোন শক্তিশালী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। অন্য একটি সভ্যতাকে পরাভূত করে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করবে–এমন ক্ষমতাই তার কখনো হয়নি। যেসব দেশে এই ধর্ম পৌছেছে, সেখানকার অনুসারীদের চরিত্রে একটা নেতিবাচক পরিবর্তন আনার কাজে সে অবশ্যই সফল হয়েছে। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক ধারা পরিবর্তন করে একটা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সে সফল হয়নি, তার চেষ্টাও সে চালায়নি। একথা সত্য যে, পৃথিবীতে এ ধর্মটি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যে এ ধর্ম এত অগ্রগতি লাভ করেছে যে, অন্য কোন ধর্ম তার সমকক্ষ হতে পারেনি। মানবজাতি এ ধর্মকে এত বেশী গ্রহণ করেছে যে, আজও এর অনুসারীদের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য সকল ধর্মের চেয়ে বেশী। কিন্তু ইতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্তও মেলে না যে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে কোন জাতির জীবনে কোন বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিংবা পৃথিবীতে সে কোন বিরাট অবদান বা কীর্তি রেখেছে। আমরা বরঞ্চ দেখতে পাই যেখানেই সে কোন শক্তিমান সভ্যতা মোকাবিলা করেছে সেখানেই তাকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। ভারত বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি এবং এদেশ দীর্ঘদিন যাবত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী থেকেছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রায় সারা ভারত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও তিন চতুর্থাংশেরও বেশী জনসংখ্যা বৌদ্ধ ধর্ম মেনে চলতো। চতুর্থ শতাব্দীতে যখন ফাহিয়েন ভারতে আসেন তখনো এদেশে বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু এরপর যখন ভ্রাক্ষণ্যবাদের পুনরাবির্ভাব ঘটলো তখন মাত্র তিন শতাব্দীর মধ্যেই সে ব্রাক্ষণ্যবাদকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। এ দেশ থেকে তার নাম এমনভাবে মুছেগেল যে, আজ ৬৫ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র এক কোটির মতো বৌদ্ধ নজরে পড়ে।[২২২] অনুরূপভাবে অশোকের প্রভাবে আফগানিস্তানেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কাবুলের রাজা মিনান্দ্র(বা মিনাঙ্গা) স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।[২২৩] কিন্তু যখন ইসলামের মহাশক্তিশালী সভ্যতার সাথে তার

মুকাবেলা হলো তখন সে এক মুহূর্তের জন্যও টিকতে পারলো না। চীনে সে যেটুকু টেকসই হতে পেরেছে তা কেবল তাওবাদ (Taoism) এর সহযোগিতার কারণে। নচেৎ কনফুশিয়াশের ধর্ম তাকে প্রায় খতমই করে দিতেবসেছিল।[২২৪] জাপানেও শানচু ধর্মের সাথে অনেক আপোশের পর সে টিকতে পেরেছে। এমনকি তার মোকাবিলায় নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সে নিজের মূল আকীদা বিশ্বাসে পর্যন্ত রদবদল ঘটাতে বাধ্য হয়েছে।[২২৫] আর শ্রীলংকা, বর্মী ও তিব্বত প্রভৃতি দেশে তো কোন ভিন্নতর সভ্যতাই ছিলনা যে বৌদ্ধ ধর্মের গতিরোধ করতে আসবে। তাই সেখানে সে অতি সহজেই বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, বৌদ্ধ ধর্ম ঐসব দেশে কোন যুগেই কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পত্তন করেনি। সেখানকার মানুষ আগেও যেমন নির্জীব ওনিষ্কর্মা ছিল, বৌদ্ধমত গ্রহণের পরও তেমনি রয়েছে।

তাছাড়া এও অনস্বীকার্য যে, বৌদ্ধ ধর্ম কোথাও সরকারের বিরোধিতা করার কিংবা সমাজের অধঃপতিত ও বিকৃত ব্যবস্থাকে সংস্কার করার সৎ সাহস দেখাতে পারেনি। বুদ্ধদেবের গোটা দর্শনে রাজনীতির কোন প্রবেশাধিকারই নেই। তিনি শাসনক্ষমতায় অংশ গ্রহণ কিংবা তাকে বদলানোর পরিবর্তে সর্বাবস্থায় তার প্রতি শর্তহীন অনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন, চাই সে সরকার জালেম ও স্বৈরাচারী হোক, ন্যায় বিচারক ও সদাচারী হোক।[২২৬] শুধু এখানেই শেষ নয়, বৌদ্ধ ধর্ম পৈশাচিক শক্তির সামনে নতি স্বীকারের এবং জুলুমের সামনে সহনশীলতার এমন শিক্ষা দিয়েছে যে, তার কোন অনুসারী যতবড় জুলুমের শিকার হোক না কেন, প্রতিবাদ করতে পারবে না। তার কথা হলো মানুষের ওপর পার্থিব জীবনে যত বিপদ আসে তার সবই পূর্ব জন্মের পাপের ফল। সুতরাং কোন ব্যক্তির ওপর কোন শত্রু নির্যাতন চালালে তার মনে করতে হবে যে, এই জুলুমকারীর কোন দোষ নেই, বরং দোষ আমার। আমি পূর্ব জন্মে হয়তো এমন কোন অপরাধ করেছিলাম, যার শাস্তি এখন পাচ্ছি।[২২৭] এই ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস বুদ্ধের অনুসারীদের মধ্যে আত্ম-সম্মানবোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিয়ে এমন এক নেতিবাচক চরিত্র গড়ে তোলে যার ফলে তারা যে কোন অবমাননাকর জুলুম ও নির্যাতনকে হাসি মুখে সহ্য করে নেয়।

এ কথা বলাই বাহূল্য যে, একটি একনায়ক সরকারের নিকট এর চেয়ে আনন্দদায়ক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। এ রকম ধর্ম যে কোন

সরকারের জন্য বিপজ্জনক তো নয়ই, বরঞ্চ অধিকতর স্থীতিশীলতার কারণ। এমন ধরনের আকিদার ওপর যারা বিশ্বাস রাখে তাদেরকে অতি সহজেই যে কোন রকমের অন্যায় বিধি ও কালাকানুনের অনুগত বানানো সম্ভব। তাদেরকে যত খুশী ঘুষ, ট্যাক্স ইত্যাদি দ্বারা পোষণা করা চলে। তাদের জান–মাল ও ইজ্জত আবরুর ওপর অনায়াসে যে কোন রকমের আক্রমণ চালানো যেতে পারে। তাদেরকে জালেম শাসকদের পৈশাচিক আকাংখা ও কামনা চরিতার্থ করার জন্য সব রকমে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ জন্যই বৌদ্ধ ধর্মকে সরকারের সাথে বুঝা পড়ায় নামতে কদাচিৎ দেখা গেছে। বেশীর ভাগ দেশেই সরকার তাদের বিরোধিতা না করে তাদের সমর্থন ও সহযোগীতা করেছে। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের শুরুতেই মগধের রাজা বিম্বিসার তা গ্রহণ করেন এবং ঐ ধর্মের সমর্থনে একটি রাজকীয় ফরমান জারী করেন[২২৮]। তারপর তার পুত্র অজাতশত্রুও প্রথম দিকে বুদ্ধ বিরোধী থাকলেও পরে বুদ্ধের ভক্ত ও তার ধর্মের সমর্থক হন। কোশলের রাজা অগ্নিদত্ত স্বয়ং তাকে তার দেশে আসার দাওয়াত দেন। তিনি তার ধর্মও গ্রহণ করেন এবং তার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যে শাক্য বংশের একটি মেয়ে বিয়ে করেন।[২২৯] এছাড়াও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সৌরাসিসের রাজা অবন্তীপুত্র এবং অপর এক রাজা ইলিয়াও বুদ্ধের অনুসারী ও সমর্থক হন।[২৩০] এরপর খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সমস্ত রাষ্ট্রীয় উপায় উপকরণ ব্যবহার করে তিনি শুধু ভারতের সর্বত্রই নয়, দুর বিদেশেও এই ধর্মের বিস্তার ঘটান। অতঃপর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কনিস্ক এ ধর্মের প্রধান সমর্থকে পরিণত হন। অতঃপর খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে রাজা প্রথম বিক্রমাদিত্য নিজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী হয়েও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন। ৭ম শতকে অপর এক রাজা হর্যবর্ধন এ ধর্মের প্রবল সমর্থক হন। তিনি এই ধর্মের এত সাহায্য করেন যে ব্রাহ্মণ্যবাদের ভক্তরা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকাতে আরম্ভ করে।[২৩১] ভারতের বাইরে তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় কুবলাইখান এই ধর্মের প্রচার ও প্রসার কল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি রাজনৈতিক কারণে তার দেশের জন্য এই ধর্মকে বিশেষ উপকারী বলে মনে করতেন।[২৩২] চীনে রাজা মাংটি স্বয়ং বুদ্ধের প্রচারকদের দাওয়াত দেন এবং নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করেন।[২৩৩] তাঁর পরও অধিকাংশ

রাজা তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখেন। অন্যান্য দেশের অবস্থাও অনুরূপ। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে সে সব তথ্য জানা যেতে পারে।

সুতরাং বৌদ্ধধর্ম যে পৃথিবীতে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে এবং শত শত বছরের হাজারো পরিবর্তন সত্ত্বেও তা যে অধিকাংশ দেশে টিকে থাকতে পেরেছে, তার কারণ সে কোন শক্তিশালী সভ্যতার অধিকারী ছিল তা নয় কিংবা তার জীবনীশক্তি মজবুত ছিল তাও নয়। বরং তার প্রকৃত কারণ ছিল এই যে, এই ধর্মটি স্বৈরাচারী শাসনের সামনে সব সময়ই মাথা নত করতো। সে কখনো জুলুমের প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়নি এবং মানবজাতিকে হঠকারী শাসকদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করার কথা কখনো চিন্তাও করেনি। এ জন্য সকল সরকার তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং এ ধরণের ধর্মানুসারীদের উপস্থিতিকে নিজের পরাক্রম ও আধিপত্য বিস্তারের সহায়ক মনে করেছে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই বুঝা যায় যে, যুদ্ধের ব্যাপারে ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য। ইসলামের মতে পৃথিবীতে মানুষ একটি মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে এবং এই পার্থিব জীবনকে সর্বোত্তম পন্থায় কাজে লাগানোর মধ্যেই তার মুক্তি নিহিত। এ জন্য ইসলাম মানুষকে নিজের ও অন্যান্য মানব সম্প্রদায়ের নৈতিক ও বস্তুগত কল্যাণ এবং পার্থিব জীবনের নিখুত পরিচালনার জন্য যে কর্মপন্থাটি প্রয়োজন, তা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নেই। এ জন্য পার্থিব জীবন ও তার সাথে সম্পৃক্ত সব কিছুর সংশ্রব বর্জন করার মধ্যেই তার মুক্তি নিহিত। এ জন্য সে মানুষকে এমন কোন বাস্তব ও কর্মগত চেষ্টা সাধনা কিংবা মানসিক ধ্যান ধারণা বা আগ্রহ পোষনের অনুমতি দেয়না যার দরুণ কোন পার্থিব জিনিসের সাথে তার সম্পর্ক ও সংশ্রব থাকতে পারে। এখন সুস্থ ও সচেতন বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই বুঝে নিতে সক্ষম যে, মানবতার জন্য ইসলামের জিহাদ বেশী কল্যাণকর না বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসবাদ বেশী উপকারী।

৪– খৃষ্ট ধর্ম

দ্বিতীয় যে ধর্মটি যুদ্ধের প্রশ্নে ইসলামের সাথে মৌলিক মতবিরোধ পোষণ করে সেটি হচ্ছে খৃষ্ট ধর্ম।[২৩৪] ইহুদী ধর্মের ন্যায় এ ধর্মটি সম্পর্কেও

আমাদের জানার একটিই মাত্র মাধ্যম-একটি মাত্র গ্রন্থ। সমগ্র খৃষ্ট জগত এগ্রন্থটিকে নিজের ধর্মের মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিয়েছে। এটি হচ্ছে ইনজিল। তবে মুল বিষয় আলোচনার পূর্বে আমি একথা জানিয়ে দিতে চাই যে, বর্তমানে এ গ্রন্থটি যে অবস্থায় আছে তাতে বর্তমান খৃষ্টবাদের আকীদা বিশ্বাসের সন্ধানই সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে হযরত ঈসার নীতি ও শিক্ষা কি ছিল তা থেকে তা জানার কোনো উপায় নেই। খৃষ্টবাদ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা শুরু করার আগে ইনজিল ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট আসমানী পুস্তিকা গুলির ঐতিহাসিক মর্যাদা সম্পর্কে কিছুটা তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

খৃষ্টবাদের উৎস

বর্তমানে ইনজিল বা বাইবেল বলতে আমরা যা বুঝি তা মুলতঃ চারটি প্রধান গ্রন্থের সমষ্টিঃ মতি, মারকাস, লুক, যোহন। কিন্তু এগুলোর কোনটাই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নয়। পবিত্র কুরআনে যেমন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাজিলকৃত সমস্ত আয়াত ও সূরা একত্রে পাওয়া যায়, তেমনিভাবে হযরত ঈসার ওপর নাজিলকৃত অহী সমুহ আমরা একত্রে পাইনা। তাছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম স্বীয় নবী জীবনে বিভিন্ন জায়গায় যে সব উপদেশ দিয়েছেন তাও স্বয়ং তাঁর ভাষায় কোথাও পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থাবলী-যা আজ আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত তা আল্লাহর কালামও নয়, হযরত ঈসার কালামও নয়। বরং আসলে তা হযরত ঈসার (আঃ) শিষ্যদের বরং তস্য শিষ্যদের লিখিত গ্রন্থ। তারা নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে হযরত ঈসার (আঃ) জীবনেতিহাস ও তাঁর বাণীসমুহ এতে সংকলিত করেছেন।

কিন্তু এই গ্রন্থ সমুহের ভিত্তি এত অজ্ঞাত যে এগুলোর ওপর খুব একটা নির্ভর করা যায়না। প্রথম গ্রন্থ খানা হযরত ঈসার (আঃ) শিষ্য মতির নামে পরিচিত বটে। কিন্তু এটা যে মতির লেখা নয় তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। মতির আসল গ্রন্থ লোজিয়া Logia এখন উধাও হয়ে গেছে। আসলে মতির নামে যে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে তার লেখকের নাম জানা যায়না। তিনি অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়াও লোজিয়া থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। স্বয়ং মতির নাম এর এক স্থানে একজন অপরিচিত লোকের মত উল্লেখ করা হয়েছে। যথা

মতি নবম অধ্যায় নবম আয়াতের দ্রষ্টব্যঃ "ইয়াসু সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে মতি নামক এক ব্যক্তিকে শুল্ক কেন্দ্রে দেখতে পেলেন।" মতি যদি এই গ্রন্থের লেখক হতেন তাহলে তিনি নিজের নাম এভাবে উল্লেখ করতেন না। মতির বাইবেল পড়ে দেখলে মনে হয়, তা প্রধানতঃ মারকাস গ্রন্থ থেকে সংকলিত। কেননা এর ১০৬৮টি আয়াতের মধ্যে ৪৭০টি অবিকল মারকাসের বাইবেলে রয়েছে। অথচ এর লেখক যদি মতি হতেন এবং হযরত ঈসার (আঃ) শিষ্য হতেন, তাহলে হযরত ঈসার (আঃ) শিষ্যও নয়, তাঁর সাথে কখনো সাক্ষাৎও করেনি–এমন ব্যক্তির লেখা বই থেকে তার তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হতোনা। খৃষ্টীয় মনীষীদের ধারণা, এই গ্রন্থটি ৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হযরত ঈসার (আঃ) ৪১ বছর পর লেখা হয়েছে। আবার অনেকের মতে এটি ৯০ খৃষ্টাব্দের রচনা।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি মারকাসের লিখিত বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয়। তবে এটা প্রমানিত হয় যে, তিনি কখনো হযরত ঈসার (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেননি, তাঁর শিষ্যও হননি।[২৩৫] তিনি আসলে সেন্ট পিটার নামক শিষ্যের শিষ্য এবং তার কাছ থেকে যা শুনতেন তাই তিনি গ্রীক ভাষায় লিখে নিতেন। এ জন্য খৃষ্টীয় গ্রন্থকারগণ সাধারণভাবে তাকে 'সেন্ট পিটারের' ব্যাখ্যাতা বলে অভিহিত করে থাকেন। সাধারণ ধারণা, এ গ্রন্থখানি ৬৩ থেকে ৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময় লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় পুস্তকখানা লুকের। তবে লুক যে কখনো হযরত ঈসাকে (আঃ) দেখেননি এবং তাঁর কথাও শোনেননি, সেটা সকলেই স্বীকার করেন। তিনি ছিলেন সেন্টপলের শিষ্য এবং তার সাথেই তিনি থাকতেন। তাঁর পুস্তকে তিনি সেন্টপলের বক্তব্যই তুলে ধরেছেন। সেন্টপল নিজেও লুকের বাইবেলকে নিজের বাইবেল বলতেন। অথচ এই সেন্টপলও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের সাহচর্য পাননি। তিনি হযরত ঈসার ক্রুশের ঘটনার ৬০ বছর পর খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, লুক ও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের মধ্যে বর্ণনার একটি স্তর সম্পুর্ণরূপে অনুপস্থিত। তিনি হযরত ঈসার বাণী কার কাছ থেকে পেলেন তা অজ্ঞাত। লুকের বাইবেলের রচনা কালও এখনো নির্ণয় করা যায়নি। কারও মতে ৫৭ খৃষ্টাব্দে, কারো মতে ৭৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু হারিং, ম্যাকগিফটিং ও পোমারের ন্যায় পন্ডিতগণের অভিমত এই যে, এই পুস্তকটি ৮০ খৃষ্টাব্দের আগে লেখা হয়নি।

চতুর্থ গ্রন্থটি যোহনের বাইবেল নামে অভিহিত। কিন্তু সাম্প্রতিকতম তত্ত্বানুসন্ধান থেকে জানা গেছে যে, এটি হযরত ঈসার খ্যাতনামা শিষ্য যোহন রচিত নয়। বরং যোহন নামে অন্য কোন অজ্ঞাত লোকের লেখা। এ পুস্তক হযরত ঈসার অনেক পর নববই খৃষ্টাব্দে অথবা তারও পরের রচনা। হ্যারিং এই সময়কালকে ১১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং স্পষ্টতঃ এ চারখানা পুস্তকের কোন একটিও হযরত ঈসা পর্যন্ত পৌছে না। আর এগুলোর ওপর নির্ভর করে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না হযরত ঈসা (আঃ) কি বলেছেন বা কি বলেন নি।[২৩৬] আরো একটু গভীর তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে এর প্রামান্যতা আরো বেশী সন্দেহজনক হয়ে পড়ে।

প্রথমত চারখানা পুস্তকের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এমনকি হযরত ঈসার নীতি ও আদর্শের যা সর্বপ্রধান ভিত্তি সেই পর্বতোপরি উপদেশ পর্যন্ত মতি, মারকাস ও লুক তিনজন তিনটি সম্পুর্ণ পরস্পর বিরোধী পন্থায় বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ চারখাঁনা পুস্তকের প্রত্যেকটিতেই লেখকের নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও মনোভাব সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। মনে হয় যেন মতির প্রতিপক্ষ একজন ইহুদী এবং সে তার বিতর্কে বিজয় লাভ করতে উদগ্রীব। মারকাসের প্রতিপক্ষ যেন একজন রোমক এবং তাকে তিনি ইসরাইলী ইতিবৃত্ত শোনাতে চান। আর লুক যেন সেন্ট পলের উকিল এবং অন্যান্য শিষ্যদের বিরুদ্ধে তার দাবী সমর্থন করতে চান। আর যোহন যেন খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষের দিকে খৃষ্টানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া দার্শনিক সুফিবাদী তত্ত্বকথা দ্বারা প্রভাবিত। এ ভাবে বাইবেল চতুষ্টয়ে তত্ত্বগত মতভেদ শাব্দিক বিরোধের চেয়েও বেশী হয়ে গেছে।

তৃতীয়তঃ বাইবেল চুতুষ্টয় গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়েছে। অথচ হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সকল শিষ্যের ভাষা ছিল সুরিয়ানী। এ ভাবে ভাষার পরিবর্তন হেতু চিন্তাধারা ও বক্তব্য বিষয়ের পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক।

চতুর্থতঃ ইঞ্জিল সমুহকে লিপিবদ্ধ করার কোন চেষ্টাই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের আগে করা হয়নি। ১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, লেখার চেয়ে মৌখিক বর্ণনা অধিকতর ফলদায়ক। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা জাগ্রত হলো। কিন্তু সেই সময়কার লিখিত

পুস্তকগুলোকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না। নিউ টেষ্টামেন্টের প্রথম প্রামান্য পান্ডুলিপিটি ৩৯৭ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কর্টোজেনা কাউন্সিলে মঞ্জুর হয়।

পঞ্চমতঃ ইঞ্জিল চতুষ্টয়ের যে প্রাচীনতম কপি লিপিটি বর্তমানে দুনিয়াতে বিদ্যমান, তা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের। দ্বিতীয় লিপিটি পঞ্চম শতাব্দীর। আর তৃতীয় যে অসম্পুর্ণ লিপিটি রোমের পোপের লাইব্রেরীতে আছে, তাও চতুর্থ শতাব্দীর চেয়ে বেশী প্রাচীন নয়। সুতরাং প্রথম তিন শতাব্দীতে যে বাইবেল প্রচলিত ছিল তার সাথে বর্তমান বাইবেল কতখানি সংগতিপুর্ণ তা বলা সহজ নয়।

ষষ্ঠতঃ বাইবেলকে কখনো কুরআনের মত মুখস্থ করার চেষ্টা করা হয় নি। প্রথম দিকে এর প্রচার প্রসার সম্পুর্ণরূপে মর্মগত বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল ছিল। অর্থাৎ এর শব্দ নয় বরং বিষয়বস্তু প্রচার করা হতো। এতে স্মৃতির ত্রুটি বিচ্যুতি এবং বর্ণনাকারদের নিজস্ব ধ্যান ধারণা প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। পরে যখন লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয় তখন তা নির্ভরশীল ছিল লিপিকারদের কৃপার ওপর। লিপিকরণের সময় যে জিনিস নিজের আকিদা বিশ্বাসের পরিপন্থী মনে হয় তা বাদ দেয়া এবং যা বাদ পড়েছে তা ঢুকিয়ে দেয়া খুবই সহজ কাজ।[২৩৭]

উল্লিখিত কারণ সমুহের দরুন কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারেনা যে, বর্তমান বাইবেল চতুষ্টয়ে হযরত ঈসার প্রকৃত শিক্ষা কতখানি আছে। সুতরাং খৃষ্টবাদ সম্পর্কে আমাদের চলতি আলোচনা হযরত ঈসার প্রচারিত আদর্শকে কেন্দ্র করে নয়, বরং বর্তামান যুগের খৃষ্টজগত যে খৃষ্টবাদে বিশ্বাসী তাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত।

"প্রেমের" আদর্শ

বাইবেল পড়লে বুঝা যায় যে, খৃষ্টবাদ যুদ্ধের ঘোর বিরোধী, চাই তা সত্যের জন্য হোক কিংবা বাতিলের জন্য হোক। হযরত ঈসার দৃষ্টিতে ধর্মের প্রধানতম নির্দেশ হলো, "আল্লাহকে ভালোবাসার পর প্রতিবেশীকে ভালবাসতে হবে।" (মতি২২ঃ ৩৯) ভালোবাসার সাথে এটাও অপরিহার্য যে "তুমি নিজের ভাইএর ওপর রাগ করোনা।" (মতি ৫ঃ ২২) কিন্তু শুধু ভালোবাসার এবং রাগ না করার উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়নি, বরং স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দেয়া হয়েছে যে, জুলুম ও দুস্কর্মের মোকাবিলায় মাথা

নত করে দাও এবং অন্যদের রক্ষা করাতো দুরের কথা, নিজের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্যও সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর আদর্শের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হলো পর্বতোপরি উপদেশ–যা গোটা খৃষ্টীয় নৈতিকতার ভিত্তি রূপে পরিচিত। এতে তিনি বলেনঃ

"তোমরা আগে শুনেছ চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা দুষ্ট লোকদের মোকাবিলা করোনা। বরং যে ব্যাক্তি তোমার ডান গালে চড় মারবে তাকে তুমি বাম গালও এগিয়ে দাও। কেউ তোমার জামা নিতে চাইলে তাকে জুব্বাটাও দিয়ে দাও। যে তোমাকে এক ক্রোশ পথ বিনা পারিশ্রমিকে নিয়ে যেতে চায় তার সাথে তুমি দুক্রোশ চলে যাও। তোমরা আগে শুনেছ, প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি এবং শত্রুর সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। কিন্তু আমি বলছি, শত্রুর সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখ, যে তোমাকে অভিশাপ দেয় তার জন্য কল্যান কামনা কর, যে তোমাকে ঘৃণা করে তার সাথে সদ্ব্যবহার কর, যে তোমাকে অপমান করে ও কষ্ট দেয় তার জন্য দোয়া কর।" (মতিঃ৫ঃ ৩৮–৪৪)

"আমি তোমাদের সকলকে বলি, শত্রুকে ভালোবাস, যে তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে তার উপকার কর, যে তোমাকে অভিশাপ দেয় তার জন্য কল্যাণ কামনা কর। যে তোমার অবমাননা করে তার জন্য প্রার্থনা কর। যে তোমার এক গালে চড় মারে তার সামনে অপর গালটিও বাড়িয়ে দাও। যে তোমার জামা নেয়, তাকে জুব্বা নিতেও নিষেধ করোনা। অন্যদের কাছ থেকে তুমি যেমন ব্যবহার আশা কর তুমি নিজেও তেমনি ব্যবহার কর। কেবল যে তোমাকে ভালোবাসে তাকেই যদি ভালোবাস তাহলে তোমার মহত্ত্ব কি ভাবে প্রকাশ পাবে? একজন পাপীও তাকে যে ভালোবাসে সেও তাকে ভালোবেসে থাকে। (লুক ৬ঃ ২৭–৩২)

বস্তুতঃ এটাই হলো খৃষ্টবাদের প্রধানতম মূলনীতি আর এর মর্ম কি তা তার ভাষা থেকেই পরিস্কার। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি খাটি খৃষ্টান এবং "আসমানী পিতার মত পুর্ণাঙ্গ" হতে চায় (মতি ৫ঃ ৪৮) আর যার উদ্দেশ্য মহান প্রভুর পুত্র হওয়া (লুক ৬ঃ ৩৫) তার কোনো অবস্থাতেই শক্তির দ্বারা জুলুম ও অবিচারের মোকাবিলা করা উচিত নয় বরং নৈরাজ্যবাদী ও দুষ্ট লোকদের সামনে নিজের অধিকার আপনা থেকেই ত্যাগ করা উচিত।

খৃষ্টধর্মের নৈতিক দর্শন

উপরোক্ত নীতি কতখানি ভালো বা মন্দ, তা খৃষ্টবাদের মুল প্রাণশক্তিকে উপলব্দি না করা পর্যন্ত অনুধাবন করা সম্ভব নয়। খৃষ্টধর্ম আমাদের কাছে যে আকারে পৌছেছে, তা দেখে বুঝা যায় যে, এটা আসলে সন্যাস, বৈরাগ্য ও ত্যাগের ধর্ম। এতে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য কোন পথ নির্দেশ এবং শরীয়ত কিংবা আইন–বিধি তৈরী করা হয়নি। মানুষের জন্য তার নিজের, পরিবারের, জাতির, বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর ও তার স্রষ্টার প্রতি কি কি করণীয় রয়েছে এবং তা সম্পন্ন করার সঠিক কর্মপন্থা কি, সে সম্পর্কে এই ধর্ম সম্পুর্ণ নীরব। আল্লাহতায়ালা মানুষকে যে বস্তুগত উপায় উপকরণ এবং মানসিক ও দৈহিক শক্তি ও ক্ষমতাদান করেছেন তা কি কাজে লাগানো দরকার এবং কিভাবে লাগাতে হবে খৃষ্টবাদ সে সম্পর্কেও কোন পথ নির্দেশ দেয় না। বাস্তব জীবনে এসব সমস্যা নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামানোর প্রয়োজনবোধ করে না। তার সমগ্র মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে একটি মাত্র প্রশ্নের প্রতিঃ মানুষ কিভাবে "আসমানী সাম্রাজ্যে" প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে? এই একটি মাত্র প্রশ্ন সমগ্র খৃষ্টীয় নৈতিকতার ভিত্তি। হযরত ঈসা (আঃ) যে আদর্শ পেশ করেছেন তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতিকে ঐ লক্ষে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা।

কিন্তু "আসমানী সাম্রাজ্য" খৃষ্টধর্মের দৃষ্টিতে পার্থিব সাম্রাজ্যের বিকাশ প্রাপ্ত অবস্থার নাম নয়। সে এই দুটির মধ্যে বীজ ও ফলের সম্পর্ক স্বীকার করে না। সে এ উভয়টির মধ্যে পূর্ণ বৈপরীত্য ও পরস্পর বিরোধিতায় বিশ্বাসী। তার মতে পার্থিব সাম্রাজ্য ও আসমানী সাম্রাজ্য সম্পুর্ণ আলাদা আলাদা জিনিস। আগুন আর পানি যেমন একত্রিত হতে পারে না এ দুটিও তেমনি একত্রিত হতে পারে না। এই দুটো জিনিসকে পরস্পর বিরোধী মনে করার স্বাভাবিক ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, আসমানী সাম্রাজ্য লাভের পথও খৃষ্টধর্মের মতে পার্থিব সাম্রাজ্য লাভের পথ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যে জিনিস পার্থিব সাম্রাজ্যের উপকরণের অন্তর্ভুক্ত, তা আসমানী সাম্রাজ্যের উপকরণ বহির্ভুত। শুধু বহির্ভুতই নয়, এই জাতীয় উপকরণের উপস্থিতিই তার আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশের অন্তরায়। এজন্যই খৃষ্টধর্ম প্রতি পদে পদে মানুষকে উপদেশ দেয় যে, সে যদি আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে চায় তবে পার্থিব সাম্রাজ্যের উপকরণাদি যেন সর্ব প্রযত্নে এড়িয়ে চলে। আর যদি এড়িয়ে চলতে

না পারে তার আসমানী সাম্রাজ্যের আশা রাখা বাতুলতা মাত্র। এই মুলনীতির ভিত্তিতেই সে মানবজীবনের সকল বিভাগে বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা দেয় এবং সমাজ ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষকে একেবারেই সংসার বিরাগী করে দিতে চায়। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে হযরত ঈসার (আঃ) কয়েকটি নির্দেশ উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট হবেঃ

"যদি কেউ আমার কাছে আসে এবং সে নিজের বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই ও বোনকে এমনকি নিজের প্রাণকে পর্যন্ত ঘৃণা করতে না পারে তাহলে সে আমার শিষ্য হতে পারবে না।" (লুক ১৪ঃ ২৬)

"তোমরা কি মনে কর, পৃথিবীতে আমি আপোস করতে এসেছি? আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, না, তা নয়। আমি এসেছি বিচ্ছেদ ঘটাতে। কেননা এখন থেকে এক ঘরের পাঁচজন মানুষ পরস্পরের বিরোধিতা করবে,—পিতা পুত্রের সাথে, পুত্র পিতার সাথে, মা কন্যার সাথে, কন্যা মার সাথে, শ্বাশুড়ী বৌ–এর সাথে, বৌ শ্বাশুড়ীর সাথে।" (লুক ১২ঃ ৫১–৫৩)

"তোমরা বিনামুল্যে পেয়েছ, বিনামুল্যেই দিয়ে দাও। থলিতে সোনারূপা পিতল কিছুই রেখনা। সফরের জন্য ব্যাগও নিওনা, জামা, জুতো, লাঠিও নিওনা।" (মথি ১০ঃ৮–১০)

"হে ছোট দল! ভয় পেয়না। কেননা তোমাদের পিতা তোমাদেরকে সাম্রাজ্য দানের জন্য মনোনীত করেছেন। নিজেদের সমস্ত মালপত্র বেচে দান করে দাও। অতঃপর নিজেদের জন্য এমন মানিব্যাগ কর যা কখনো পুরানো হয় না। অর্থাৎ আসমান এমন ভান্ডার যা কখনো শুণ্য হয় না।

(লুক১২, ৩২,৩৩)

"তুমি যদি পূর্ণতা লাভ করতে চাও তবে যাও, নিজের সমস্ত মালপত্র বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দাও এবং আমার অনুগত হও। তাহলে তুমি আকাশে ভান্ডার পাবে।[২৩৮]" (মথি ১৯ঃ২১)

"আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, ধনী ব্যক্তির পক্ষে আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমি আবার বলছি, সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে উট চলে যাওয়াও ধনীর বেহেশতে যাওয়া অপেক্ষা সহজতর।"

(মথি ১৯ঃ ২৩–২৪)

“পৃথিবীতে নিজের জন্য সম্পদ পুঞ্জিভূত করো না। কেননা এখানে পোকায় খায় ও জং ধরে।…সম্পদ আকাশে পুঞ্জীভূত কর।” (মতি ১৬ঃ ১৯)

“যদি তোমরা মানুষের অপরাধ ক্ষমা কর তাহলে তোমাদের আসমানী পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর যদি মানুষের ত্রুটি ক্ষমা না কর তাহলে তোমাদের পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন না।” (লুক ৬ঃ ১৪–১৫)

“আমি তোমাদের বলি, নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ কর। কি খাবো কি পান করবো এবং কি পরবো–এই ভাবনায় পড়ো না। খাদ্যের চেয়ে কি প্রাণ এবং পোশাকের চেয়ে কি দেহ ভাল নয়? আকাশের পাখিদের দেখ, তারা ফসলও বোনেনা সম্পদও জমা করেনা, তথাপি তোমাদের আসমানী পিতা তাদেরকে খাওয়ান। তোমাদের মর্যাদা কি তাদের চাইতে বেশী নয়? তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, চিন্তা ভাবনা করে নিজের আয়ূ এক ঘন্টাও বাড়াতে পারে? তোমরা পোশাকের জন্য কেন চিন্তা কর? জংগলের শোশণ গাছ দেখ কিভাবে তার বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। তারা পরিশ্রমও করেনা, সুতা কাটেনা। তবু আমি তোমাদেরকে বলছি, হযরত সোলায়মান (আঃ) তার বিপুল ধন ঐশ্বর্য সত্ত্বেও শোশন গাছের মত পোশাক পরতে পারেননি। যে গাছ আজ জঙ্গলে রয়েছে এবং কাল চুলোয় যাবে, তাকে যখন আল্লাহ এমন পোশাক পরাণ তখন হে দুর্বলচিত্ত লোকেরা! তোমাদেরকেও অবশ্যই পরাবেন। কাজেই চিন্তিত হয়ে বলো না, কি খাবো কি পরবো।?” (মতি ৬ঃ ২৫–৩১)

এইসব উক্তি থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টধর্ম যে পন্থায় মানব জাতির প্রশিক্ষণ করতে চায় তার ভিত্তি সমাজ ও সভ্যতা থেকে পরিপুর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সবাই জানে, পারিবারিক সম্পর্কই সমাজ জীবনের ভিত্তি। সমাজের সাথে মানুষের প্রাথমিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমেই। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারাই সৃষ্টি হয় সমাজ কাঠামোর। প্রকৃতপক্ষে মানুষের চরিত্র গঠনের জন্য পরিবারই হলো সর্বোত্তম প্রশিক্ষণাগার। কিন্তু বাইবেলের “যিশুর” প্রথম আঘাতই পড়ে এই পরিবারের ওপর। যে জিনিসটি সমাজের সাথে মানুষের যোগসূত্র স্থাপন করে তাকেই তিনি কেটে দেন। পার্থিব জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে যে জিনিসটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তা হচ্ছে পেট ভরার ও দেহ ঢাকার চিন্তা। কিন্তু যিশু

সেই উদ্বুদ্ধকারী শক্তিটাকেই শেষ করে দিতে চান। তিনি চান, মানুষ দুনিয়াতে মহাশুণ্যের পাখী এবং জঙ্গলের শোশণ গাছের মত জীবন যাপন করুক। মানুষের সুখ শান্তি এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ধন–সম্পদ অর্জন করা অপরিহার্য। কিন্তু 'যিশুর' মতে আসল উন্নতি ও আসমানী সাম্রাজ্যের স্বার্থে তা বর্জন করা প্রয়োজন। রাজনীতি, শাসন, শাস্তি ও প্রতিশোধের ওপর পৃথিবীতে শান্তি শৃখংলা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল। কিন্তু 'যিশু' বলেন, আসমানী পিতা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না–যে পর্যন্ত না এই গোটা শাসন ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাটা শিকেয় তোলা হয়। মোট কথা, যিশুর মতে সংসার ধর্ম ত্যাগ করার নামই ধর্ম। যে ব্যক্তি দুনিয়া ও তার উপকরনাদি ত্যাগ করেনা, সামাজিক বন্ধন সমুহ ছিন্ন করেনা, পার্থিব কাজ কারবার বন্ধ করেনা এবং পূর্ণ সন্যাস ও বৈরাগ্যের জীবন যাপন করেনা তার জন্য আসমানী সাম্রাজ্যে কোন স্থান নেই। মানুষ একই সময় এই উভয় সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ইহকাল ও পরকাল উভয়টি একসংগে পাওয়া সম্ভব নয়। যিশুর কথা হলো, "তোমরা একই সময় আল্লাহর ও ধন–সম্পদের সেবা করতে পারনা।" এ দুটো পরস্পর বিরোধী জিনিস। তাই যে ব্যক্তি একটির প্রত্যাশী হবে, তাকে অপরটির আশা ত্যাগ করতে হবে।

যিশুর এই শিক্ষাকে খোদ খৃষ্টান পন্ডিতগণ কিভাবে পেশ করেছেন, তা রেভারেন্ড ডোমিলো লিখিত বাইবেলের তফসির গ্রন্থের কয়েকটি উক্তি থেকে সুস্পষ্ট। এই তাফসীর গ্রন্থটি ৪০ জনেরও বেশী খৃষ্টান পন্ডিতের সাহায্যে তৈরী করা হয়েছে। একে বাইবেলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তফসীর মনে করা হয়। এর ভূমিকায় যিশুর আদর্শ নামে একটা স্বতন্ত্র নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। সেই নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ "যিশু মানুষের চরিত্র গঠনের জন্য একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন যা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মনোনীত পদ্ধতি থেকে অনেকাংশে ভিন্নতর। আত্মসম্ভ্রমের পরিবর্তে বিনয়,আপন অধিকারের প্রশ্নে অটল থাকার পরিবর্তে দুষ্টের সামনে নতি স্বীকার, প্রাচুর্য লাভের পরিবর্তে অল্পে তুষ্টি, মহত্ব, ধৈর্য, সহানুভূতি, বিপদে খুশী থাকা, বেদনায় আনন্দ লাভ। এ সবই বিশ্ববাসীর প্রতি খৃষ্টবাদের অবদান।---- তবে একজন খৃষ্টানের চরিত্রের সবচেয়ে প্রশস্ত সংজ্ঞা বোধ হয় এই যে, সে একরোখা মানুষ হয়ে থাকে। সে এক পা পার্থিব জীবনে আর এক পা ধর্মে রাখতে পারেনা। সে একই সময় আল্লাহর ও পার্থিব সহায় সম্পদের সেবা করতে পারে না।--যিশুর মতে

মানুষকে দুনিয়ার সেবকে পরিণত হতে বাধ্য করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপকরণ হচ্ছে সম্পদ। সুতরাং একজন সাচ্চা খৃষ্টান হওয়ার জন্য সবচেয়ে জরুরী ও প্রথম শর্ত হলো, ধন–সম্পদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।"২৩৯

খৃষ্টীয় নৈতিকতার মৌলিক গলদ

এখন এটা পরিস্কার ভাবে জানা গেল যে, খৃষ্ট ধর্মে মানব প্রেম, ক্ষমা ও বিনয়ের যে আদর্শ পেশ করা হয়েছে, তা মুলতঃ এক ধরনের বৈরাগ্যবাদী নৈতিকতারই অংশ বিশেষ। যেহেতু সে পারলৌকিক মুক্তির পথ পার্থিব কল্যাণের পথ থেকে আলাদা ভাবে বেছে নিয়েছে, তাই সে পার্থিব কাজ কারবার দুনিয়াদারদের হাতে সঁপে দেয়। আর নিজে ধার্মিক লোকদের নিয়ে সে সংসার বিরাগী হয়ে আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। এরূপ ধর্মে যুদ্ধ না থাকার অর্থ এ নয় যে, সে পার্থিব কার্যকলাপের দায়–দায়িত্ব ও ঝুকি গ্রহণ করে ও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন বোধ করে না। বরং এর প্রকৃত অর্থ এই যে, তার যখন পার্থির কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কই নেই তখন স্বভাবতই যুদ্ধ ও রক্তপাতেও তার প্রয়োজন নেই। সে একথা বলেনা যে, ফিৎনা –ফাসাদ বা বিশৃংখলা ও অরাজকতা দূর করার জন্য তরবারির প্রয়োজন নেই। বরং তার কথা এই যে, বিশৃংখলা ও অরাজকতা দুর করারই প্রয়োজন নেই। সে একথা বলে না যে, যুদ্ধ না করেও দুস্কর্ম প্রতিহত করা যায়। তার কথা হলো, দুস্কর্ম প্রতিহত করার চিন্তাই নিরর্থক। তার সাথে লড়াই করার পরিবর্তে তার সামনে মাথা নত করে দেয়াই ভালো। সে এ কথা বলে না যে, জুলুম ও আগ্রাসনের মোকাবিলায় সত্যের ও অধিকারের সংরক্ষণ রক্তপাত ছাড়াই সম্ভব। বরং তার কথা হলো, অধিকারের সংরক্ষণেরই দরকার নেই। কোন জালেম যদি তোমার অধিকার ছিনিয়ে নিতে আসে তবে তাকে নিতে দাও। খৃষ্টবাদএকথা বলেনা যে, অপরাধীদের দৈহিক নির্যাতন ছাড়া অপর কোন শাস্তি দাও এবং শক্তি প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় হত্যাকারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহন করা বরং সে বলে শাস্তি বা দণ্ড দানের আদৌ প্রয়োজন নেই। কেউ সাত বার কেন, সত্তরবারও যদি অপরাধ করে তবু তাকে ক্ষমা করতে থাক। এক কথায় বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, অন্যায় ও অপরাধ্ প্রবণতা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করা, মানব সমাজে ন্যায়নীতি ও সুবিচার মূলক কর্তব্য প্রতিষ্ঠা করা এবং

মানবতাকে জুলুম ও অরাজকতার আধিপত্য থেকে মুক্ত করা এ সবই খৃষ্টবাদের দায়িত্ব বহির্ভুত। নিজের জন্য সে পরাধীনতা, দাসত্ব, লাঞ্চনা ও নির্যাতনের জীবন বেছে নিয়েছে। সুতরাং সে যদি যুদ্ধ বিরোধী হয়ে থাকে এবং ন্যায় ও অন্যায় নির্বিচারে যুদ্ধ মাত্রকেই খারাপ মনে করে তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অমন জীবনের জন্য এটাই অধিকতর সঙ্গত ও সামঞ্জস্য পূর্ণনীতি।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এহেন চরম বিনয় ও নতি স্বীকারের নীতি কি মানব জাতির জন্য একটা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন আইনে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা রাখে? এর জবাব খৃষ্টবাদ নিজেই দিয়েছে। যখন প্রমানিত হলো যে, যুদ্ধ এড়িয়ে চলার নির্দেশ কোন স্বতন্ত্র আইন নয় বরং বৈরাগ্যবাদ ও সন্যাসবাদের এক বৃহত্তর আইনের ধারা বিশেষ। তখন এটা স্বভাবতঃই বলা চলে যে, বৈরাগ্য ও সন্যাসের পুরো আইনটা যখন চালু হবে কেবল তখনই যুদ্ধ বর্জনের বিধিও চালু হবে। খৃষ্টধর্ম নিজেও একথা বলে না যে, তোমরা দুনিয়ার কার্যকলাপে জড়িত হলেও যুদ্ধ বর্জনের নীতি অব্যাহত রাখ। খৃষ্টবাদের দৃষ্টিতেও এরূপ যুদ্ধ বর্জনের নীতি কেবল তখনই কার্যকর হবে যখন মানুষ সমাজ ও সভ্যতার গোটা কর্মকাণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যাবে। পার্থিব জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডেও অংশ গ্রহণ করা হবে,আবার তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ যুদ্ধকে সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে হবে, এটা সম্ভব নয়। হযরত ঈসাও তা চাননি। এখন একে যদি একটা বিশ্বজনীন আইনে পরিণত করা হয় তাহলে অনিবার্য ভাবেই সমগ্র মানব জাতিকে সভ্য ও সমাজবদ্ধ জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড বর্জন করতে হবে। মানুষের জীবনের লক্ষ্য যদি আসমানী সাম্রাজ্য হয় এবং এও যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, পার্থিব জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড সেই সাম্রাজ্যে প্রবেশের অন্তরায় তাহলে সেই লক্ষ্যে পৌছার জন্য ঐ অন্তরায় থেকে নিজেকে বাচানো সমগ্র মানব জাতির পক্ষেই অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং বৈরাগ্য ও সন্যাস অবলম্বন করার জন্য কঠোর তপস্যায় মগ্ন হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা যে সম্ভব নয়, তা সুস্পষ্ট। সারা দুনিয়ার মানুষ একযোগে একই সময় সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিতে পারে না। জীবনের অর্থনৈতিক ও জৈবিক প্রয়োজন ও চাহিদার কথা ভুলে গিয়ে নিছক "আকাশের পাখী" ও "জঙ্গলের শোশন গাছের" মত জীবন যাপন করতে পারে না। ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি ও অন্য সমস্ত কাজকর্ম ত্যাগ

করে বেকারত্ব ও নিষ্ক্রিয়তা ডেকে আনতে পারে ন। সরকারী কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে খানকায় চলে যেতে পারেনা। আর যদি তারা এমন কাজ করেও বসে তাহলে আল্লাহতা'আলা অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন তা আর বহাল থাকতে পারেনা। বরং সত্যকথা এই যে, তার বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। এটা মানব সমাজের এমন একটা অবস্থা যার কেবল কল্পনাই করা যায়, বাস্তবে তার উপস্থিতি সম্ভব নয়। আর আল্লাহ না করুন, এ যদি কোথাও সম্ভব হয়েও পড়ে তাহলে তা কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান মানুষের কাছে বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত হতে পারে না। সুতরাং খৃষ্টবাদের নৈতিক বিধান সমগ্র মানব জাতির জন্য চিরন্তর ও বিশ্বজনীন ব্যবস্থা একথা মোটই যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা বিশ্বজনীনতাকে সারা দুনিয়ার মানুষ সর্বাবস্থায় কার্যকর করতে পারে এমন হওয়া চাই।

এ আইন কোন একটি জাতির পক্ষেও কার্যোপযোগী নয়। কোন জাতি যদি সামগ্রিকভাবে এর আনুগত্য কবুল করে এবং আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশের জন্য এর সমস্ত নির্দেশাবলী মেনে নেয়, তাহলে সে জাতিকে সর্বপ্রথম সমস্ত সরকারী কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিতে হবে, তার পুলিশ ও সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিতে হবে এবং সীমান্ত ও দুর্গসমুহের পাহারা ত্যাগ করতে হবে। তারপর যখন তার কোন প্রতিবেশী দেশ সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে বসবে, তখন খৃষ্টীয় আদর্শ অনুসারে এই ভদ্র জাতিটি হানাদারদের মোকাবিলা করবেনা বরং এক গালের পর আরেক গাল এবং জামার পর জুব্বাটিও তাদের এগিয়ে দেবে। এরপর সেই জাতি তার ধন সম্পদ, বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো ও দোকানসমুহ এমনকি নিজের ঘরের মালপত্র ত্যাগ করবে। কেননা "ধনবান আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায় না।" সমস্ত ব্যবসায়ী লোকেরা নিজ কায়কারবার ত্যাগ করে উপাসনালয়ে গিয়ে বসবে। কেননা বাইবেলে বলা হয়েছে যে, "তোমরা আল্লাহর ও ধন দৌলতের সেবা এক সাথে করতে পারনা।" হযরত ঈসার নির্দেশ রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের প্রাণ সম্পর্কে চিন্তা কর না। শেষ পর্যন্ত তার জন্য একটিমাত্র জীবিকার মাধ্যম অবশিষ্ট থাকে। সেটি হলো চাষাবাদ করে নিজের খাবারজন্য ফসল জম্মানো। কিন্তু আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য তাকে এটাও বর্জন করতে হবে। কেননা যীশু বলেছেন, আকাশের পাখীগুলোর দিকে তাকাও। তারা চাষও করে না ফসলও ফলায় না। তবুও তোমাদের আসমানী পিতা তাদেরকে খাদ্য দেন। এভাবে সেই জাতি

আপন সরকার, জমিজমা, ধনসম্পদ, শিল্পবাণিজ্য, মোটকথা নিজের যথাসর্বস্ব বহিরাগত হানাদারদের হাতে সঁপে দেবে এবং সমগ্র জাতি তাদের গোলামে পরিণত হবে। তা ছাড়া তারা যদি বিনা মজুরীতে এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যায়" তবে এরা "দুই ক্রোশ" যাবে। তারা জুলুম করলে এরা তাদের জন্য দোয়া করবে; তারা এদের জন্য অভিসম্পাত করবে আর এরা তাদের কল্যাণ কামনা করবে। তারা এদের ইজ্জৎ আবরুর ওপর আক্রমণ চালাবে আর এরা নীরবে তা সহ্য করবে। খৃষ্টবাদের দৃষ্টিতে এটাই হবে নৈতিকতার চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা এবং এ স্তরে উন্নীত হবার পর মানুষকে আসমানী সাম্রাজ্যে পৌছা থেকে কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু সুস্থ বিবেক বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এটা হচ্ছে যে কোন জাতির অধঃপতনের সর্বনিম্নস্তর এবং এ স্তরে পৌছার চেষ্টাকে একজন বুদ্ধিমান মানুষ আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। আমি বুঝতে পারি না যে, সেই আসমানী সাম্রাজ্যটা কি ধরণের যা এহেন অকর্মণ্য লোকদের দিয়ে পূর্ণ করতে চাওয়া হয়? সে যাই হোক, এটা সুনিশ্চিত সত্য যে, পার্থিব জীবনের প্রশ্নে দুনিয়ার কোন জাতি খৃষ্টীয় নৈতিক বিধানকে নিজেদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে পারেন না। কেননা নিজের অস্তিত্বের রক্ষণাবেক্ষণ ও নৈতিক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত তার স্বভাব প্রকৃতি তাকে এ আইনের প্রতিটি ধারা লংঘন করতে বাধ্য করবে। আর করার পর সেই আইনের ওপর ঈমান বা বিশ্বাস রাখা যে অর্থহীন তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় একটা পন্থা ভেবে দেখার অবকাশ আছে। তা হলো, এ বিধানকে পুরো একটা জাতির জন্য সার্বিক জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ না করে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট মনে করে নেয়া যেতে পারে। হযরত ঈসার (আঃ) বাণীসমূহ থেকেও এটাই ফুটে ওঠে। এটা যে কার্যোপযোগী পন্থা, তাতে সন্দেহ নেই। মানব সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী যদি তার বিভিন্ন প্রয়োজন পুরণ করতে থাকে,–কেউ ব্যবসায় বাণিজ্য করে, কেউ কারিগরী ও শিল্পের পেশায় নিয়োজিত হয়, কেউ চাষাবাদ করে, কেউ রাজনীতি করে– এভাবে সমাজ ও সভ্যতার চাকা ঘূর্ণায়মান থাকে, তাহলে সমাজ তার একটা ক্ষুদ্র অংশকে 'শূন্যের পাখী' ও 'অরণ্যের শোশন বৃক্ষের' মত নিষ্কর্ম জীবন যাপন করতে দিতেও পারে। এ ভাবে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক লোকের পক্ষে খৃষ্টীয় নৈতিকতার সেই সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব, একমাত্র সন্যাস,

বৈরাগ্যবাদ ও কঠোর তপস্যার মাধ্যমেই যার সাক্ষাত লাভ ঘটতে পারে। কিন্তু একদিকে এই বৈরাগ্যের বিধানকে একমাত্র মুক্তির পথ মেনে নেয়া এবং অপর দিকে এই বিধানকে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে সীমিত করার সোজাসুজি অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমরা মুক্তি বা আসমানী সাম্রাজ্যের ওপর সন্যাসী ও যাজকদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার মেনে নিচ্ছি। এর স্পষ্ট অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই ক্ষুদ্র "সাম্রাজ্যের" সংকীর্ণ পরিসরে মানব জাতির বৃহত্তম অংশের স্থান সংকুলান সম্ভব নয়। সমাজ ও সভ্যতার যারা চালক, রাষ্ট্র ও রাজনীতির যারা নায়ক, দেশ ও জাতির অস্তিত্ব ও সীমান্ত রক্ষার সংগ্রামের যারা অধিনায়ক এবং বিবিধ মানবিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্ন রকমের কারবারে নিয়োজিত, তাদের জন্য ঐ সাম্রাজ্যের দ্বার রুদ্ধ। কেননা খৃষ্টানদের গোড়ার কথা হচ্ছে মানুষ একই সঙ্গে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জগতের কাজ করতে পারে না। পার্থিব জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে যিশুর প্রদর্শিত ধর্মের পথে চলতে না পারলে আসমানী সাম্রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে না। এভাবে একটি মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করে আর বাদবাকী সমগ্র মানব জাতি তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এমন কি পার্থিব জীবন যারা সততা ও পবিত্রতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে তাদেরও সেখানে স্থান হয় না। যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে বিক্রয় লব্ধ অর্থ দান করে না দেয়, সে চাই হত্যা, ব্যভিচার, চুরি ও মিথ্যা বলা ইত্যাদি অসৎ কর্ম থেকে যতই বিরত থাক,"আসমানী সাম্রাজ্যে" প্রবেশ করতে পারবে না।

এ মতবাদকে সঠিক বলে মেনে নেয়ার অর্থ দাঁড়ায় আবার প্রথম মতবাদে ফিরে যাওয়া। যদি একথা স্বীকার করা হয় যে, "আসমানী সাম্রাজ্যে"র লক্ষ্যে পৌছার জন্য খৃষ্টীয় নৈতিক আইন অনুসরন করা একান্ত প্রয়োজন এবং তা না করলে ঐ লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয়,তাহলে অনিবার্যভাবেই এ কথাও মানতে হবে যে, খৃষ্টীয় আইন বিধান মানব জাতির জন্য একটা বিশ্বজনীন বিধান। কেননা মুক্তি প্রত্যেক মানুষেরই কাম্য। আর কোন পথকে মুক্তির একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করার আহবান জানানো কর্তব্য। কিন্তু এই আইনকে সকল মানুষের গ্রহণ ও অনুসরণ করার যে যুক্তি ও বাস্তবতা– উভয়ের নিরিখেই অসম্ভব, সে কথা আমি আগেই বলেছি। সুতরাং চূড়ান্ত কথাটি এই দাঁড়াচ্ছে যে, খৃষ্টবাদের রচিত আইন যেমন চিরন্তন ও বিশ্বজনীন আইন নয় তেমনি তা

সঠিক এবং একমাত্র মুক্তির পথও নয়। বিশ্বজনীন, কালজয়ী এবং একমাত্র মুক্তির উপায় বলা যেতে পারে শুধু সেই আইনকে, যার অনুসরণ একজন শাসকের পক্ষে শাসক থেকেই,কৃষকের পক্ষে কৃষি কাজে লিপ্ত থেকেই এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়েই করা সম্ভব। সে আইনকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কোন মানুষকে যেন অনতিক্রম্য বাধা, অসহনীয় বিপদ ও অস্বাভাবিক কষ্টের সম্মুখীন না হতে হয়। যে আইন এমন নয়, তা সত্য ও সোজা পথ হতে পারেনা, মুক্তির একমাত্র উপায়ও হতে পারে না। প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্য আইন বলেও তাকে স্বীকার করা যায় না।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বয়ং খৃষ্টানরাও জটিলতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আর পেরেছেন বলেই নতুন মতবাদ তৈরী করেছেন যে, মুক্তির জন্য খৃষ্টধর্ম পুরোপুরি মেনে চলার প্রয়োজন নেই। কেননা যীশু নিজেই ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাঁদের সবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন। কাজেই যীশুর প্রতি যারা বিশ্বাস রাখে তাদের মুক্তিদাতা যীশু নিজেই। কিন্তু এ মতবাদ যে কত দুর্বল তা বুঝিয়ে বলা একরকম নিষ্প্রয়োজন। এই প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ যদি ঠিক হয় তাহলে তার মানে দাঁড়ায় এই যে, মানুষ হত্যা, ব্যভিচার, চুরি, প্রতিবেশীকে উৎপীড়ন, অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জন ও তা গুদামজাত করা ইত্যাকার অপরাধ করেও স্বচ্ছন্দে "আসমানী সাম্রাজ্যে" প্রবেশ করতে পারে– কেবল যীশুর ওপর ঈমান থাকলেই হয়। এমতাবস্থায় যীশুর সমস্ত নৈতিক উপদেশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এসমস্ত অপরাধ করে কেউ "আসমানী সাম্রাজ্যে" প্রবেশ করতে পারবে না। এই মর্মে যীশু নিজে যে কথা বলেছেন তাও বৃথা হয়ে যায়। যীশুর উপদেশ যদি সত্য হয় তাহলে প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ সত্য হতে পারে না। আর প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ সত্য হলে তাঁর উপদেশগুলো বাতিল বলে গণ্য হতে বাধ্য। দুই বিপরীত মতবাদ একই সাথে চলতে পারে না এবং একই ধর্মের অংশও হতে পারে না।

যাহোক খৃষ্টীয় নৈতিক বিধান যে একমাত্র মুক্তিপথ বলে বিবেচিত হতে পারে না– শুধু সেটুকু বলেই আমরা ক্ষান্ত হতে পারি না। আমাদের আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে বলতে হয় যে, খৃষ্টীয় নৈতিক বিধান তার বর্তমান আকার আকৃতিতে সম্পূর্ণ স্বভাব বিরুদ্ধ। ওটা আসলে চারিত্রিক ও নৈতিক

মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার ফল। এতে অত্যন্ত সংগতি হীনভাবে কতিপয় নৈতিক গুণকে বিনা প্রয়োজনে অচল করে দিয়ে মনুষ্যত্বকে স্থবির ও পংগু করে দেয়া হয়েছে। মানবীয় চরিত্রের যে গুণগুলোকে সে বড় করে তুলে ধরেছে সেগুলোর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। বিনয়, নম্রতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য ইত্যাদি যে মহৎ গুণ, তা'কে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু শুধু মাত্র এই গুণগুলোর ভিত্তিতে মানুষের জীবন গড়া ঠিক নয়। হাঁ, যদি দুনিয়া থেকে অন্যায় ও দুষ্কৃতি একেবারে লোপ পেত, পৃথিবীতে যদি মানুষের পরিবর্তে ফেরেশতারা এসে বসবাস করতে আরম্ভ করতো এবং শয়তান যদি তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে অন্য কোন গ্রহে চলে যেত, তাহলে শক্তি প্রয়োগ ব্যতিরেকে আপন অধিকার, সম্ভ্রম ও অস্তিত্ব রক্ষা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো। কিন্তু পৃথিবীতে যখন ভালোর পাশা-পাশি মন্দও বিদ্যমান, ফেরেশতা সুলভ সুপ্রবৃত্তি সমূহকে পরাভূত করতে পাশবিক প্রবৃত্তিসমূহ সদা তৎপর, তখন সৎ প্রবৃত্তিকে অসহায় ছেড়ে দেয়া এবং তাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর দেয়া উপকরণসমূহকে কাজে না লাগানো শুধু যে আত্মহত্যার শামিল তা নয় বরং অন্যায় ও অসত্যকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করারও শামিল। আসলে জালেমদেরকে জুলুম করার সুযোগ ইচ্ছাকৃতভাবে দেওয়া এবং বিপর্যয় ও অরাজকতা সৃষ্টি কারীদেরকে অরাজকতা সৃষ্টির স্বাধীনতা দেয়া আদৌ সৎ কাজ নয়। একে আমরা দুর্বলতা বলতে পারি, কাপুরুষতা ও ভীরুতা বলতে পারি, কিন্তু সৎকাজ বা পূণ্যের কাজ বলতে পারি না, গঠনমূলক বা সংশোধনমূলক কাজ বলতে পারি না। আসলে পুণ্যের কাজ বলতে সংশোধনমূলক কাজকেই বুঝায়। ক্রোধ ও প্রেম, শাসন ও সোহাগ–উভয়ের সমন্বয়েই এ ধরনের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। অসৎ চরিত্রের সংশোধন যদি ক্ষমা, ধৈর্য, স্নেহ ও দয়া দ্বারা সম্ভব হয় তবে তা দিয়েই সংশোধন করতে হবে, আর যদি এইসব ভালোবাসার হাতিয়ার ব্যর্থ হয় তাহলে শাস্তি, প্রতিশোধ, দমন ও শাসনের হাতিয়ার কাজে লাগাতে হবে। কেননা সংশোধনই মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পন্থা অপরিহার্য্য ও সহায়ক তা যতটা প্রয়োজন প্রয়োগ করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এতে পন্থা ও পদ্ধতির ভেদাভেদ ও বাছবিচার যেমন করা চলে না, তেমনি একটি নির্দিষ্ট পন্থার ওপর এতটা অটল হওয়া ও জিদ ধরাও বুদ্ধিসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত নয় যাতে সংশোধনের উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়ই না, অধিকন্তু বিকৃতি আরো বেড়ে যায়

খৃষ্টধর্মের মতে ধর্মের প্রধানতম মূলনীতি হলো 'মানব প্রেম'। এ ছাড়া মানুষের অন্য সমস্ত আবেগ, অনুভূতি ও চারিত্রিক গুন বৈশিষ্ট্য বাতিল ও বৃথা। সেগুলিকে উচ্ছেদ করা ও নির্মূল করাই হলো ধর্মের উন্নতি ও বিকাশের একমাত্র উপায়। কিন্তু এই মতবাদ মূলত একটা ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভুত। এই মতবাদ যারা রচনা করেছে তারা একটি মস্ত বড় সত্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে সত্যটি এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে কোন জিনিস বৃথা সৃষ্টি করেননি। তারা মনে করেছে যে, মানুষের মধ্যে কাম,ক্রোধ, আত্মপ্রীতি ইত্যাকার প্রবৃত্তি সমূহ বিনা প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ধারণা যে, মানুষের জীবনে বীরত্ব, আত্মসম্ভ্রম, দূরদর্শিতা, রাষ্ট্রনায়ক সুলভ যোগ্যতা, ন্যায়বিচার ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মানুষের মধ্যে যতগুলো শক্তি বা ক্ষমতা, প্রবৃত্তি বা আবেগ অনূভুতি আছে, সবেরই একটা না একটা চাহিদার ক্ষেত্র রয়েছে। মানুষের দেহের কোন অঙ্গ এমন কি একটি লোমও যেমন উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন নয়, তেমনিভাবে মানুষের কোন মানসিক ও দৈহিক শক্তি, কোন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন যোগ্যতা ও ক্ষমতা এবং কোন রিপূ বা প্রবৃত্তিও অর্থহীন নয়। বিশ্ব স্রষ্টা এর কোনটিই উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। এই শক্তি সমূহ যদি ভুল পথে আত্মপ্রকাশ করে এবং ভুল কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে তার মানে এ নয় যে, ঐ শক্তিগুলোই খারাপ। বরং তার কারণ এই যে, মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের সঠিক ব্যবহার ক্ষেত্র চেনেনি এবং তার বুদ্ধি বিবেক এতটা বিকাশ–বৃদ্ধি ও প্রখরতা অর্জন করেনি যে তা তাকে ঐ শক্তি সমূহের সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি শিখাবে। উদাহরণ স্বরূপ, কাম বা যৌন আবেগ এমন একটি প্রবৃত্তি, যার বশীভূত হয়েই সম্ভবতঃ মানুষ সবচেয়ে বেশী পাপ করছে। কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা চলেনা যে, ঐ আবেগ বা প্রবৃত্তিটা একেবারে নষ্ট করে দেয়া উচিত। কেননা ওর ওপরই মানুষের প্রজাতিক অস্তিত্ব নির্ভরশীল। লোভ বা মোহ এমন একটা প্রবৃত্তি যা মানুষকে স্বার্থের দাস বানিয়ে ফেলে এবং জঘন্যতম পাপ কাজে প্ররোচিত করে। কিন্তু তাই বলে ওটা নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেয়া চলেনা। কেননা এই জিনিসটাই কাজের প্রকৃত উদ্বুদ্ধকারী শক্তি। ক্রোধও একটা খারাপ প্রবৃত্তি। এর কারণে পৃথিবীতে বহু দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অন্যায় অত্যাচার হয়েছে। তা বলে একথা বলা ঠিক হবেনা যে, ক্রোধ একেবারেই খারাপ এবং এতে মোটেই কোন কল্যান বা উপকারিতা নেই। বরং প্রকৃতপক্ষে এটাই পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার নিয়ামক। এটা না

থাকলে অন্যায়কারী ও জালেমরা পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব রাখতো না। কুপ্রবৃত্তি সমূহের মত সৎ প্রবৃত্তিগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। ঐগুলি একদিকে যেমন বহু কল্যাণ ও উপকারের আকর, অপরদিকে তেমনি বহু অন্যায় ও অনর্থের উৎস। বীরত্ব যদি সীমা ছাড়িয়ে যায় তাহলে তা হঠকারিতা ও নির্বুদ্ধিতার পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। দুরদর্শিতা ও পরিণামদর্শিতা একটা ভালো গুণ। কিন্তু অতিরিক্ত হলে তা কাপুরুষতার শমিল হয়ে দাড়ায়। দয়া যদি তার স্বাভাবিক সীমার মধ্যে না থাকে, তাহলে অপরাধ ও পাপাচারের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। "দানশীলতা যদি সীমা অতিক্রম করে যায় তাহলে তা হয়ে দাঁড়ায় অপব্যয়। অনুরূপভাবে মিতব্যয়িতার যদি বাড়াবাড়ি হয় তাহলে তা কার্পণ্যের রূপ ধারণ করে। প্রেম ও ভালোবাসা যদি যুক্তির চৌহদ্দি ডিংগিয়ে যায় তাহলে তা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। সৌজন্য ও সহৃদয়তায় যদি স্থান কাল পাত্রের বাছবিচার না থাকে তাহলে তা অপরাধীদের নির্ভীক ও দুঃসাহসী করে তোলে। ধৈর্য ও সহনশীলতা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলে তা বেয়াদবী, অশিষ্টতা ও জুলুমের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। বিনয় ও নম্রতার বাড়াবাড়ি হলে আত্মসম্ভ্রম ও আত্মসম্মান বোধ বিনষ্ট হয়ে যায়। মোট কথা মানব সত্তাকে কতগুলো শক্তি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তার.সবেরই ভালো ও মন্দ দুটো দিক রয়েছে। এর একটি দিক দেখেই তাকে ভালো বা মন্দ বলে রায় দেয়া যায় না। তার গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কেও কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সম্ভব নয়। আমরা এমন কথা বলতে পারিনা যে, মানুষের জন্য কেবল হাত, পা, মাথা ও হৃদয়ই প্রয়োজন। চোখ, নাক, পাকস্থলী ইত্যাদির কোন দরকার নেই। একথা বলতে পারিনা যে কেবল শ্রবণ শক্তি এবং অনুভুতি শক্তি থাকলেই চলে, দৃষ্টি শক্তি ও ধ্যানশক্তির প্রয়োজন নেই। একথাও বলার অবকাশ নেই যে, কেবলমাত্র বোধ শক্তি হলেই চলে, স্মৃতিশক্তি এবং বাছবিচারের ক্ষমতা থাকার দরকার নেই। অনুরূপ ভাবে এমন কথা বলারও কোন যৌক্তিকতা নেই যে, মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র স্নেহ, ভালোবাসা, ক্ষমা, বিনয় এবং নম্রতার প্রয়োজন, ক্রোধ, হিংসা বীরত্ব, আত্মসম্মান, খোদা প্রীতি,অভিমান ও আভিজাত্যবোধ ইত্যাদির কোন দরকার নেই। পাকস্থলীর প্রয়োজন যদি যকৃৎ দিয়ে না মেটে, হৃদয়ের কাজ যদি মস্তিষ্ক দ্বারা না হয়, তাহলে ক্রোধ ও প্রতিশোধের দ্বারা যে কাজ করা হয় তা ভালোবাসা ও প্রেম প্রীতি দ্বারা হতে পারেনা। শাসন ও শাস্তি বিধানের দ্বারা যে কল্যাণ অর্জিত হয়, ক্ষমা দ্বারা সে কল্যাণ সাধিত হয় না। একথা যেমন সত্য যে, সমস্ত

দৈহিক শক্তির সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থিতির ওপর দৈহিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল এবং বিবেক বুদ্ধির সুস্থতা ও সুষ্ঠু ক্রিয়াশীলতা যেমন মানসিক শক্তি সমূহের সমন্বিত কর্মতৎপরতার ওপর। রিপু ও প্রবৃত্তি সমূহ যদি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সক্রিয় না থাকে, প্রকৃতি প্রদত্ত যাবতীয় বৃত্তি সমূহ যদি নিজ নিজ সীমার মধ্যে কাজ করার সুযোগ না পায় তাহলে চরিত্রের পূর্ণতা এবং নৈতিকতার পুর্ণোৎকর্ষ সাধিত হতে পারেনা। একটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্মের কাজ সেই মধ্যম পন্থা ও সমন্বিত কর্মতৎপরতাকে বহাল করা ছাড়া এবং কড়াকড়ির জবাবে ঔদাসিন্যের পরিচয় দেয়া আর যাই হোক, ধর্মের বাঞ্ছিত ভূমিকা নয়।

খৃষ্টবাদ এই মহা সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্যই সে মানুষকে সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়েছে। আর সে কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, নিজেকে চূড়ান্তভাবে নিয়তির হাতে সঁপে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়াই মানুষের কর্তব্য। অথচ এটা চারিত্রিক উৎকর্ষেরও কোন উন্নত স্তর নয়। মানবতার সেবাও নয়। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এটা মানবতার প্রতি মস্ত জুলুম। এই জীবন পদ্ধতি অবলম্বনকারী একদিকে আল্লাহ তার জন্য যে সব বৈধ সুখ ও আনন্দের ব্যবস্থা করেছেন তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। অপর দিকে নিজের সত্তাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে মানব সমাজকে তার সেবা থেকে বঞ্চিত করে দেয়। খৃষ্টবাদ পার্থিব রাজত্বকে অপার্থিব তথা আসমানী রাজত্ব থেকে আলাদা করে দিয়েছে। স্রষ্টা ও ধন সম্পদকে দুটো পরস্পর বিরোধী শক্তিরূপে অভিহিত করেছে। প্রকৃত ধার্মিকদেরকে সে ধন সম্পদ বর্জন করে স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হবার উপদেশ দিয়েছে। এর স্বাভাবিক ফল শুধু এটাই হওয়ার কথা যে, ভদ্র, সৎ, খোদাভীরু, বিশ্বস্ত ও ধার্মিক লোকেরা দুনিয়াদারী ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যাবে আর দুনিয়ার যাবতীয় কজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা চলে যাবে সমাজের সেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদের হাতে যাদের মধ্যে খোদাভীরুতা ও ঈমানদারীর নাম চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে স্বৈরাচারী ও জালেম স্বভাবের লোকেরা। অর্থ গৃধ্নু, ও অসৎ লোকদের হাতে চলে যাবে ব্যবসায় বাণিজ্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। কারিগরী ও শিল্প কারখানার অধিকারী হবে প্রতারক ও ধোকাবাজের দল। মোটকথা অসৎ ও পাপিষ্ঠ লোকেরা গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করে ছাড়বে। যে সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তিগণ সমাজকে সঠিক পথে চালাতে সক্ষম, তারা যখন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে তখন নিশ্চিত এবং অনিবার্য

ভাবেই খারাপ ও চরিত্রহীন লোকেরা সমস্ত কায়-কারবারে পুরোভাগে চলে আসবে। কর্মক্ষেত্রের দায়দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করে যে নেককার ও পূণ্যবানের গোষ্ঠী বদমায়েশদের জন্য ময়দান খালী করে দিয়েছে, তাদের ঐ সব চরিত্রহীন লোকের অন্যায় ও অসৎ কার্যাবলীর অন্ততঃ অর্ধেক দায়িত্ব বহন করতে হবে।

খৃষ্টীয় দর্শনের গূঢ় রহস্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা দিবা লোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, খৃষ্ট ধর্মে যুদ্ধ, রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব না থাকা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার লক্ষণ নয় বরং তার ত্রুটি ও অপূর্ণতার লক্ষণ। খৃষ্ট ধর্ম (আসলে কেমন ছিল আল্লাহ জানেন) যে আকারে বর্তমানে চালু রয়েছে, তা এত ত্রুটি বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ যে, পৃথিবীর কোন জাতিই তার নির্দেশিত নীতি ও বিধি সমূহ অনুসরণ করে চলতে সক্ষম নয়।

তবে খৃষ্টবাদ ও তার ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যায়ন করলে আর একটা গূঢ় রহস্য উদঘাটিত হয়। খৃষ্টধর্মের নীতিমালা ও উপদেশ সমূহ পড়ে তাতে গুটি কয় স্থুল আকিদা ও নৈতিক মূলনীতি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এর না আছে কোন শরিয়ত, না আছে কোন স্বতন্ত্র নৈতিক ও চারিত্রিক বিধি-নিষেধ, আর না আছে অধিকার, কর্তব্য ও সামাজিক আচার পদ্ধতি সংক্রান্ত কোন নির্দেশ। এমন কি ইবাদাত উপাসনারও কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। এমন ধর্ম যে স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত হতে পারেনা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আকিদা বিশ্বাস ও চারিত্রিক মূলনীতি সমূহ শেখার পর একটি অনুসারীদের জন্য জীবনে আরো বহু দিক বিভাগ সম্পর্কে নির্দেশ লাভের প্রয়োজন থাকে। এ সব নির্দেশ যে ধর্মে থাকে না, তার একটা পৃথক ধর্মীয় ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা থাকে না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে কি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সত্যিই এমন একটি অসম্পূর্ণ ধর্মকে স্বতন্ত্র ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? এমন একটা ধর্ম সমগ্র মানব জাতি তো দূরের কথা কোন একটি জাতির জন্যও যে সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় অনুসরনীয় জীবন ব্যবস্থা হতে পারেনা, তা কি হযরত ঈসা বুঝতেই পারেন নি। খৃষ্ট ধর্মের অনুসারীরা অন্ততঃ সেই রকমই মনে করেন। কিন্তু আমরা যখন খৃষ্ট ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে প্রবৃত্ত হই এবং যে পরিবেশে ও যে

উদ্দেশ্যে এই ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা যখন অনুসন্ধান করি তখন এ জবাব সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের পাই।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, খৃষ্ট ধর্ম স্বয়ং কোন পৃথক ধর্ম ছিলনা। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরিয়তের পুর্ণতা সাধন এবং বনী ইসরাইলের চরিত্র সংসোধনের নিমিত্তেই এ ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। হযরত মূসার (আঃ) শরীয়ত যে সময় নাজিল হয়, তখন বনী ইসরাইল ছিল মানসিক ভাবে অত্যন্ত অপরিপক্ক—বলতে গেলে তাদের শৈশবাবস্থা। তাদের মধ্যে কোন গভীর নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা ছিলনা। এজন্য হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে একটি সরল আকিদা ও সহজ নৈতিক বিধান দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছিলেন। সেই বিধানে নৈতিক গুণপণা, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা ও ঈমানী প্রাণশক্তির নিদারুণ অভাব ছিল।— কয়েক শতাব্দী ধরে বনী ইসরাইল ঐ শরীয়ত নিয়ে কোন রকমে চলতে লাগলো। পরবর্তী সময়ে যখন তাদের কার্যকলাপের সামাজিক পরিধি প্রশস্ততর হতে লাগলো তখন শরিয়তের সেই কার্যকলাপের সামাজিক পরিধি প্রশস্ততর হতে লাগলো তখন শরিয়তের সেই অসম্পূর্ণতার বিষময় ফল ফলতে আরম্ভ করলো।[২৪০] ক্রমে ক্রমে বনী ইসরাইলের নৈতিক অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটতে লাগলো এবং সেই সাথে তদের শক্তিও ক্ষীণ হতে লাগলো। প্রথমে তাদের সমাজ হলো শতধা বিচ্ছিন্ন। অতঃপর বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের মধ্যে শুরু হলো সংঘাত। সবশেষে তাদের ওপর গোলামীর অভিশাপ নাজিল হয়ে তাদের নৈতিক ও বৈষয়িক অধঃপতনকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দিল। হযরত ঈসার জন্মের ৩৮ বছর আগে আসূরীয়রা তাদেরকে পদানত করে। তারা এবং তাদের পর বাবেলীয়রা দুশো বছর তাদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখে। অতঃপর খৃঃ পূর্ব ৫৩৮ অব্দে তারা ইরানী সাম্রাজ্যের অধীনতা গ্রহণ করলো এবং সেটাও দুশো বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকলো। এরপর আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকরা তাদের পদানত করলো খৃঃ পূঃ ৩৩৪ থেকে ৩২৩ অব্দ পর্যন্ত। আলোকজাভারের পর তারা পদানত হলো মিসরের টলেমীয় শাসকদের (Ptolemies)। এভাবে একশ বছর পর্যন্ত বনী ইসরাইল গ্রীকদের তাবেদার হয়ে রইল। খৃঃ পূঃ ১৯৮ অব্দে অপর একটি গ্রীক রাজবংশ স্লুকোডিয়া (Scloucaedea) তাদের ওপর আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলো এবং বলপূর্বক তাদেরকে পৌত্তলিকতায় দীক্ষিত করলো। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ইহুদীদের মধ্যে একটু স্বাধিকার চেতনা জাগ্রত হলো এবং তারা খৃঃ পূঃ ১১৪ অব্দে বিদ্রোহ করে একটি স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠিত করলো। এই রাষ্ট্রটি ৮০ বছর টিকে ছিল। কিন্তু তাদের চরিত্র এমনভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, একটা ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তা গড়ার ক্ষমতা তাদের লোপ পেয়েছিল। তাদের মধ্যে এমন বিভেদ দেখা দিল যে, একটি গোষ্ঠী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রোমকদেরকে নিজ দেশে ডেকে আনল। হযরত ঈসার (আঃ) জন্মের ৬০ বছর আগে রোমকরা প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করে। হযরত ঈসা (আঃ) যখন নবী হয়ে আসেন তখন গোটা জাতি ছিল রোমকদের দাসত্বের কঠিন অক্টোপাশে আবদ্ধ। এভাবে ৭।৮ শো বছর ধরে বাবেলীয় ও আসুরীয় নক্ষত্র পুজারী, ইরানের অগ্নি উপাসক এবং গ্রীক ও রোমের পৌত্তলিক শাসকদের গোলামী করতে করতে এই জাতিটির নৈতিকতা, শিষ্টাচার, মানবতা ও ধর্মানুবর্তিতার নাম চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল।

খোদ বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্টে ইহুদীদের এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৭ম শতকে জেরুজালেমের সম্রাট মানেসা (Manessah) বাবেলীয়দের প্রভাবাধীন পবিত্র শহরে যেসব বিভ্রান্তিকর রীতিনীতি চালু করে, তা বাইবেলে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ

"তার পিতা খারকিয়া যেসব উচ্চ ভবনকে ধসিয়ে দিয়েছিল সেগুলিকে সে পূননির্মাণ করলো এবং বা'লের জন্য বধ্যভুমি বানালো। ইসরাইলের সম্রাট আখিয়াবের ন্যায় সে এসিরাত তৈরী করলো এবং আসমানের সমস্ত নক্ষত্ররাজির পূজা করলো। মহাপ্রভু যে ঘর সম্পর্কে বলেছিলেন, আমি জেরুজালেমে নিজের নাম সুরক্ষিত করবো, সেই ঘরকে সে জবাইখানা বানালো। সে আসমানের সমস্ত নক্ষত্ররাজির জন্য মহাপ্রভুর ঘরের উভয় প্রাঙ্গণকে জবাইখানায় পরিণত করলো। সে নিজের পুত্রকে আগুনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করালো, সময়ের শুভাশুভ নিয়ে কুসংস্কারে লিপ্ত হলো, যাদু টোনা চালালো এবং দেবদেবী ও দৈত্যদানবের সাথে সখ্যতা করলো। সে এসিরাতের মূর্তিকে অবিকল সেই ঘরে স্থাপন করলো যে, এই ঘরকে এবং জেরুসালেমকে আমি বনী ইসরাইলের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে বাছাই করেছি এবং ইসরাইলের আমি শাশ্বত কাল পর্যন্ত এতে নিজের নাম সুরক্ষিত করবো।"

সে সময়কার নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নবীবর হযরত হোসি' আলাইহিস সালাম নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেনঃ

"এই দেশের অধিবাসীদের সাথে মহাপ্রভুর একটা বিরোধ রয়েছে। কেননা দেশে না আছে সততা, না আছে সহানুভূতি, না আছে খোদাভীতি। গালিগালাজ, মিথ্যা,খুন, চুরি এবং ব্যভিচার ছাড়া দেশে আর কিছুই হয় না। এমন বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে যে কেবল খুনই খুন হয়ে চলেছে। এ জন্য এ দেশ একদিন অনুতাপ করবে এবং অরণ্যের জন্তু ও শূন্যের পাখী সমেত এ দেশের সকল অধিবাসী দুর্বল ও দেউলে হয়ে যাবে।" (৪ঃ ১–৩)

খৃঃ পূঃ ৭৪০–৭০১ সালে হযরত ইয়াসইয়াহ আলাইহিস সালাম বলেনঃ

"সকল মাথা অসুস্থ এবং মন একেবারেই শিথিল। মাথার তালু থেকে নিয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত এর কোথাও সুস্থতার লক্ষণ নেই–আছে কেবল জখম, আঘাত ও পচা ঘা। তোমাদের দেশ উজাড় হয়ে গেছে, তোমাদের জন বসতি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, তোমাদের ভুখন্ডকে তোমাদের সামনে বসেই বিদেশীরা গ্রাস করে নিচ্ছে। ফলে সমগ্র দেশ বিরান হয়ে গেছে। যেন বিদেশীরা তাকে উজাড় করে দিয়েছে।" (১ঃ ৫–৭)

"সেই সতী দেশটি কেমন ছিনাল হয়ে গেল। দেশটি ছিল ইনসাফ ও সততায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এখন সেখানে খুনীরা বাস করে। তোমার মাথা মলিন হয়ে গেছে। তোমাদের শরাবে পানি মিশে গেছে। তোমাদের নরহত্যাকারী সরদাররা ডাকাতদের দলভুক্ত। প্রত্যেকেই চায় ঘুষ ও ইনাম। এতিমদের সাথে তারা ন্যায় বিচার করে না। বিধবাদের ফরিয়াদ তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনা।" (১ঃ ২১ –২৩)

"তাদের উৎসবের মাহফিল গুলোতে বাদ্য ও মদের হিড়িক লেগে থাকে। অথচ মহাপ্রভুর কাজ সম্পর্কে তারা চিন্তা করে না এবং তার হাতের কারিগরী লক্ষ্য করে না। এজন্য আমার জাতি পরাধীনতার শিকার হয়েছে। কেননা তারা অজ্ঞ। এই জাতির সম্ভ্রান্ত লোকগুলো ক্ষুধায় এবং সাধারণ মানুষ পিপাসায় শুকিয়ে মরছে। এজন্য দোজখ প্রশস্ত হয়ে গেছে অস্বাভাবিকভাবে এবং আপন মুখ ব্যাদান করে দিয়েছে। তাদের সমস্ত অহংকারী, ঐশ্বর্যশালী ও জনসাধারণ তাতে পতিত হবে।" (৫ ঃ ১২–১৪)

"মদপানে যারা প্রবল এবং নেশাকর জিনিস সমূহ তৈরীতে যারা সিদ্ধহস্ত, ঘুষ খেয়ে যারা খারাপ লোকদেরকে ভালো লোক বলে সাক্ষ্য দেয় এবং ভালো লোকদের অধিকার ছিনিয়ে দেয়, তাদের জন্য পরিতাপ। আগুন যেরূপ

ভুষিকে জ্বলিয়ে দেয় এবং জ্বলন্ত ভুষি যেরূপ তলিয়ে যায় তেমনিভাবে তাদের মূল ধ্বসে যাবে এবং তারা ধূলার মত উড়ে যাবে। কেননা তারা মহাপ্রভুর শরিয়তকে বাতিল মনে করেছে এবং ইসরাইলের পবিত্র প্রভুর বাণীকে অগ্রাহ্য করেছে।"(৫ঃ২২–২৪)

একই সময়ের অপর এক নবী হযরত মিকাহ (আঃ) বলেনঃ

"হে ইয়াকুবের বংশধরের গোত্রপতিগণ! হে বনীইসরাইলের বিচারপতিগণ! তোমরা সত্য ও ন্যায়ের দুশমন এবং অন্যায়ের বন্ধু। তোমরা লোকদের চামড়া খুলে হাড়ের ওপর থেকে টেনে নাও, তাদের হাড় চূর্ণ কর এবং তা টুকরো টুকরো কর।" (৩ঃ ২–৩)

"তোমরা ইনসাফের দুশমন। সত্যকে তোমরা বিকৃত কর। আমার কথা শোনো। তোমরা সাইহুনকে রক্তপাত দ্বারা এবং জেরুসালেমকে বেইনসাফী দ্বারা নির্মাণ কর। তার নেতা ঘুষ নিয়ে বিচার করে এবং তার জ্যোতিষী মজুরী নিয়ে শিক্ষা দেয় এবং তার ভবিষ্যদ্বক্তা টাকা নিয়ে ভবিষ্যত বলে।"

(৩ঃ ৯–১১)

বনীইসরাইলী নবীদের এসব উক্তি থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সে সময়ে ইহুদীদের মধ্য থেকে শরীয়তের প্রাণ তথা ঈমান, সততা, সত্যবাদিতা, ইনসাফ, ন্যায়নীতি এবং চারিত্রিক সততা উধাও হয়ে গিয়েছিল। হারামখুরি, লোভলালসা, জুলুম, অবিচার, বেহায়াপনা ও ব্যভিচার সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাদের শাসক ছিল জালেম। তাদের ধর্মীয় নেতা ছিল লোক দেখানো সাধু। তাদের গোত্রপতি ছিল আত্মসাৎকারী এবং জনগণ সামগ্রিকভাবে গুণাহগার হয়ে গিয়েছিল। তারা শরীয়তের কেবল কথা এবং বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদিকেই আসল শরীয়ত মনে করতো এবং প্রত্যেক খোদায়ী শরীয়তের মূল লক্ষ্য যা হয়ে থাকে তা ভূলে গিয়েছিল। এই খোলস প্রীতি ও নৈতিক অধপতন রোধের জন্য হযরত ঈসার আগেও বনীইসরাইলের নবীরা চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তারা ওয়াজ নসিহত করে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, আল্লাহ কেবল কুরবাণী ও দো'আতে সন্তুষ্ট হন না। বরং সততা, সত্যবাদিতা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সদাচরণেই সন্তুষ্ট হন। তাঁর অনুগ্রহ লাভ করার জন্য মানুষকে দয়া করা, ক্ষমা করা ও ভালোবাসা আবশ্যক। বাইবেলে পরবর্তী নবীদের এজাতীয় উপদেশ আমরা অনেক দেখতে পাই। হযরত ইয়াসইয়াহ (আঃ) বলেনঃ

"মহাপ্রভু বলেনঃ তোমরা কত বেশী কুরবাণী কর তা দিয়ে আমার কি দরকার? আমি তো মেষ সমুহের দগ্ধীভূত কুরবাণী এবং মোটা বাছুর সমূহের চর্বিতেই তৃপ্ত। আমি বলদ, ভেড়া ও ছাগলের রক্ত চাই না।... এখন আমার সামনে মিথ্যা মানতের জিনিস আর এনো না। ধুপধুনাকে আমি ঘৃণা করি। নতুন চন্দ্রোদয় ও শনিবার ও ঈদ উৎসবের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। কেননা ঈদ ও অধর্ম একত্রে চলবে তা আমি সহ্য করতে পারি না। তোমাদের নবচন্দ্রোদয় ও ঈদোৎসবের প্রতি আমি বিরক্ত। এসব আমার জন্য আপদ সরূপ। আমি এসবের ভার বহন করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমরা যখন প্রার্থনার হাত প্রসারিত করবে, আমি তা শুনবো না। কেননা তোমাদের হাত তো রক্তে রঞ্জিত। হাত ধুয়ে পবিত্র কর এবং খারাপ কাজগুলোকে আমার সামনে থেকে দূরে নিক্ষেপ কর। ব্যভিচার বর্জন কর। ভালো কাজ শেখ। ইনসাফের অনুসারী হও। মজলুমদের সাহায্য কর। ইয়াতিম ও বিধবাদের সাহায্য কর। তোমরা যদি রাজী হও এবং ফরমাবরদার হও তাহলে ভালো ফল খেতে পারবে। আর যদি খোদাদ্রোহী হও তাহলে তরবারীর আঘাতে মরবে।" (১ ঃ ১১–২০)

অন্য এক জায়গায় হযরত ইয়াসইয়াহ (আঃ) ইবাদাত ও সৎকর্মের আধ্যাত্মিক মর্ম ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিম্নরূপ উপদেশ প্রদান করেনঃ

"তোমরা কেবল ঝগড়া,কলহ এবং হিংস্রতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রোজা রাখ। এ ধরনের রোজা বাঞ্ছিত নয়। এ কি আমার পছন্দনীয় রোজা? সারা দিন নিষ্প্রয়োজনে দৈহিক কষ্ট ভোগ করা এবং নিজের মাথাকে ঝাউ এর মত আনত করা এবং মাদুর ও ছাই–এর মত বিছিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে যে রোজা রাখা হয়, তাকে কি তোমরা রোজা এবং আল্লাহর প্রিয় দিন বলবে? আমি যে রোজা চাই তা তোমরা রোজা এবং আল্লাহর প্রিয় দিন বলবে? আমি যে রোজা চাই তা কি এই নয় যে, জুলুমের জিঞ্জির ভেঙ্গে ফেলা হোক, মজলুমদের স্বাধীনতা দেয়া হোক, সব রকমের গোলামীর বন্ধন ছিন্নকরা হোক? ভুখাকে খাবার খাওয়ানো, নিরাশ্রয় মিসকিনকে আশ্রয় দেয়া, উলঙ্গকে পোশাক পরানো এবং সমগোত্রীয়দের থেকে আত্মগোপন করে না থাকা –এ সবই কি প্রকৃত রোজা নয়?... তোমার মন যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হয় এবং দুঃখিত মনকে যদি তুমি তৃপ্ত কর তাহলে তোমার আলো অন্ধকারে ফুটে উঠবে এবং তোমার অন্ধকার দুপুরের আলোর মত চমকে উঠবে।" (৫৮ ঃ ৪–১০)

অপর এক নবী হজরত মিকাহ (আঃ) এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার সংস্কার সাধন করতে গিয়ে বলেনঃ "আমি কি নিয়ে মহাপ্রভূর নিকট যাব? কি ভাবে মহা প্রভূকে সিজদা করবো? দগ্ধীভূত কুরবানী এবং এক বছরের বাছুর নিয়ে কি তার কাছে যাব! মহাপ্রভু কি হাজার হাজার ভেড়া অথবা দশ হাজার তেলের নহর পেয়ে খুশী হবেন? --- না, হে মানুষ! তিনি তোমাকে পূণ্য ও সততার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তুমি শুধু ইনসাফ করবে, সদয় আচরণ করাকে ভালবাসবে এবং নিজের প্রভুর কাছে নতি স্বীকার করবে। এছাড়া তিনি তোমার কাছে আর কিছুই চান না।" (৬ঃ ৬-৮)

সাতশো বছর পর্যন্ত এই সব উপদেশ বিতরণ করা হয়েছে কিন্তু কেউ তাতে কান দেয়নি। ফলে বনী ইসরাইলের অবস্থা ক্রমেই অধপতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। তাদের মধ্যে যে নৈতিক ও চারিত্রিক দোষ শিকড় গেড়ে বসেছিল তা দূর করার জন্য একজন অধিকতর শক্তিশালী সংস্কারকের প্রয়োজন ছিল। এ জন্য আল্লাহ তা'লা হযরত ঈসা আলাইহিস-সালামকে প্রেরণ করেন। তিনি হযরত ইয়াসইয়াহ (আ) ও মিকাহের (আ) শিক্ষাকে নতুন উদ্দীপনা ও নতুন প্রাণস্পন্দনের সাথে পেশ করেন। অন্যান্য পূর্বতন নবীর মত তাঁর শিক্ষাও হরত মুসার আনীত শরিয়তকে রহিত করা এবং তার স্থলে নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আসেনি। বরং এ উদ্দশ্য ছিল শুধু হযরত মুসার আনীত শরিয়তের যে অভাব ও অপূর্ণতা থেকে গিয়েছিল তা পূর্ণ করা এবং ইহুদী জাতিকে প্রয়োজনীয় চারিত্রিক সুষমামণ্ডিত করা। সে সময় ইহুদী জাতির চরিত্রে সততা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা, অল্পে তুষ্টি, খোদাভীতি, দয়া, বিনয় ও ত্যাগের মত গুণাবলীর অভাব ঘটেছিল। তারা মাত্রাতিরিক্ত ধনলিপ্সু, দুনিয়া পুজারী স্বার্থপর ও নীচ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা ও ন্যায়পরায়ণতা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। অথচ এগুলোই হলো মনুষ্যত্বের প্রাণ। এজন্য হযরত ঈসা (আ) এইসব ত্রুটি সংশোধনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি হযরত মুসার (আ) মুল শরিয়তকে অক্ষুণ্ন রেখে তাতে সময়ের চাহিদা অনুসারে নতুন নীতিমালা সংযোজন করেন মাত্র।[২৪১] সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, যিশুর ধর্ম কোন স্বতন্ত্র ধর্ম নয় বরং প্রকৃতপক্ষে ইহুদী ধর্মেরই একটা অংশ-আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলা যায় তারই পরিশিষ্ট।

ইঞ্জিলে বর্ণিত খোদ্ হযরত ঈসার উক্তিও এই মতের সমর্থক। তিনি বলেনঃ

" মনে করো না যে, আমি তাওরাত বা অন্যান্য নবীদের গ্রন্থ রহিত করতে এসেছি। রহিত করতে নয়,–সম্পূর্ণ করতে এসেছি। কেননা আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি। যতক্ষণ আকাশ ও পৃথিবী অটল থাকবে ততক্ষণ তাওরাতের একটা উক্তিও অপূর্ণ থাকবে না। যে ব্যক্তি এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নির্দেশমালার কোন একটিও লংঘন করবে এবং অন্য লোকদেরকে লংঘন করতে নির্দেশ দেবে সে আসমানী সাম্রাজ্যে সবচেয়ে নীচাশয় ও ছোটলোক বলে অভিহিত হবে। কিন্তু যে এগুলি কার্যে পরিণত করবে এবং অন্যদেরকেও তা শিখাবে, সে আসমানী সাম্রাজ্যে সবচেয়ে বড় ও মর্যাদাশালী বলে খ্যাত হবে। অতএব, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, তোমাদের সততা যদি জ্ঞানী ও ফকীহদের সততার চেয়ে বেশী না হয় তাহলে তোমরা আসমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।" (মতি ৫ঃ১৭–২০, লুক ১৬ঃ১৭)

অন্য এক জায়গায় তিনি স্বীয় অনুসারীদের নির্দেশ দেনঃ "ফকীহ এবং পন্ডিতগণ মুসার গদীতে বসেছে। সুতরাং তারা যা উপদেশ দেয় তা মেনে চলতে থাক ও কার্যে পরিণত করতে থাক, তবে তাদের মত কাজ করো না। কেননা, তারা যা বলে তা করে না। তারা অত্যন্ত ভারী বোঝা অন্যদের ঘাড়ে চাপায়, কিন্তু নিজেরা তা আঙ্গুল দিয়েও নাড়তে চায় না।" (মতি ২৩ঃ১–৪)

যোহন স্বীয় বাইবেলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেনঃ

" শরীয়ত এসেছে হযরত মুসার মাধ্যমে, আর মহত্ব ও ন্যায়–নীতি এসেছে হযরত ঈসার মাধ্যমে।" (১ঃ১৭)

এ সব উক্তি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, খৃষ্ট ধর্মে হযরত মুসা আনীত ধর্মের আইনগত বিধানটা পুরোপুরিভাবেই বর্তমান। কেবল তাতে অতিরিক্ত মহত্ব ও ন্যায়–নীতির সংযোজন ঘটানো হয়েছে।

খৃষ্টধর্মে বিধান নেই কেন?

সুতরাং তাওরাতে যুদ্ধ, সন্ধি, রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ও অপরাধ দমনের যে সমস্ত বিধি রয়েছে, খৃষ্টধর্মে তার সবই যে হুবহু বিদ্যমান তা বলাই

বাহুল্য। খৃষ্টধর্ম তার একটি শব্দও অস্বীকার করেনি। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) এই সমস্ত বিধি কার্যকর করেন নি। কারণ যে সময়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ও ধর্ম প্রচার করেন সে সময়ে ঐ সব বিধি কার্যকর করার কোন সুযোগই ছিলনা।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা যখন নবীরূপে আবির্ভূত হন তখন তাঁর জাতি সাত আট শো বছরের পুরানো পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ ছিল। তার জন্মের ৬০ বছর আগে রোমক সৈন্যরা প্যালেষ্টাইন আক্রমন করে এবং দেশটির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র দেশের ওপর তারা আপন কর্তৃত্ব সংহত করে নেয় এবং সমগ্র জাতি তাদের দাসত্ব বরণ করে নেয়। তাঁর মাতৃভূমি ইহুদিয়া ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে রোমক শাসকদের প্রত্যক্ষ শাসনের আওতায় এসে যায়। তখন এইসব শাসনকর্তাকে বলা হতো প্রোকিউরেটর (Procurator) হযরত ঈসা যখন নবী হিসেবে দাওয়াতী কাজ শূরু করেন তখন জেরুসালেমের প্রোকিউরেটর ছিল পান্টিয়াস পিলেট (Pontius Pilate) নামক একজন হৃদয়হীন জালেম ব্যক্তি। এই ধর্মহীন প্রভুদের গোলামী করতে করতে ইহুদীদের মানসিক অবস্থার এমন অধঃপতন ঘটে যে, তারা সত্যের ডাক শুনতেও প্রস্তুত ছিল না। হযরত ঈসার চোখের সামনেই গেলিলের শাসক হিরোদিস শুধুমাত্র একজন নর্তকীকে খুশী করার জন্য হযরত ইয়াহ্ইয়ার (John the Baptist) মত নবীকে হত্যা করায়। খোদ হযরত ঈসার মর্যাদাও তাদের চোখে তেমন বেশী ছিল না। এমনকি শেষ মুহূর্তে বনী ইসরাইল একজন ডাকাতের (ব্রাববা) প্রাণকে হযরত ঈসার প্রাণের চেয়ে মূল্যবান মনে করেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে দাওয়াতের শুরুতেই যুদ্ধের ডংকা বাজানো এবং লড়াই করে একটা সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হযরত ঈসার পক্ষে কি করে সম্ভব ছিল? তিনি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে, ইহুদীদের মধ্য থেকে ইসলামী প্রাণশক্তি উধাও হয়ে গেছে, তাদের চরিত্রে কোন দৃঢ়তা নেই এবং তাদের জাতীয় সত্তা নির্জীব হয়ে গেছে। এজন্য তাঁর সর্বপ্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজের জাতিকে নৈতিক অধঃপতন থেকে উদ্ধার করা এবং যেটুকু চারিত্রিক মহত্ব না থাকলে কোন জাতি পৃথিবীতে স্বাধীন সত্তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে ও স্বাধীন সত্তা টিকিয়ে রাখতে পারে না সেই চারিত্রিক মহত্ব তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা। এ জন্য প্রথম দিকে তিনি জাতীয় চরিত্র গঠনের কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন এবং এ

কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য সরকারের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টিত থাকতেন। কেননা প্রথমেই যদি সরকারের সাথে মোকাবিলা শুরু হতো তাহলে আসল সংস্কারমূলক কাজটিই অসম্পূর্ণ থেকে যেত এবং তা অসম্পূর্ণ থাকার ফলে সরকারের সাথে মোকাবিলায়ও ব্যর্থ হতো। তাই তিনি সরকারের সাথে মোকাবিলা সর্ব প্রযত্নে এড়িয়ে চলতেন। ইহুদী আলেমদের শিষ্যরা যখন তাঁকে গ্রেফতার করিয়ে দেয়ার জন্য ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে যে, রোমক শাসকদেরকে আমরা কর দেব কিনা। তখন তিনি দ্ব্যর্থ বোধক জবাব দেনঃ "সিজারের যা প্রাপ্য তা সিজারকে দাও, খোদার যা প্রাপ্য তা খোদাকে দাও।" (লুক ২০/২২)

তিনি নির্দেশ দেন যে, দুষ্ট লোকের সাথে লড়াই করতে যেওনা। যে তোমার ওপর জুলুম করে তাকে আশীর্বাদ কর, তার জন্য কল্যাণ কামনা কর। যে তোমাকে বিনা মজুরীতে শ্রম খাটায় তার সাথে তুমি এক ক্রোশের পরিবর্তে দুই ক্রোশ যাও। যে তোমার জামা কেড়ে নেয় তাকে জুব্বা–চাপকানও দিয়ে দাও। যে তোমার এক গালে থাপ্পর মারে তার সামনে অন্য গালটাও এগিয়ে দাও। প্রাথমিক অবস্থায় এসব নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল, সরকারের সাথে কোন সংঘর্ষ না বাঁধানো এবং জনগণের মধ্যে কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ও শক্তি সৃষ্টি করা। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ক্রমে তার জাতিকে দৃঢ়তা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নির্ভীকতা শিক্ষা দেন, তাদেরকে কঠিন বিপদ ও কষ্টের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করেন এবং তাদের মন থেকে মৃত্যু–ভীতি ও শাসক ভীতি দূর করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেনঃ

" তোমাদেরকে যখন রাজাদের সামনে পেশ করা হবে এবং নির্যাতন করা হবে তখন ধৈর্য ধারণ করো এবং আপন নীতিতে অবিচল থেকো।"
(মারকাসঃ১৩)

তিনি মানুষের মন থেকে প্রাণের মায়া দূর করার চেষ্টা করেন এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার শিক্ষা দেন। তিনি বলেনঃ

" যে ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাতে চাইবে, সেই প্রাণ হারাবে। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করবে প্রকৃতপক্ষে তার প্রাণই হবে অমর।" (লুকঃ৯–২৪)

হযরত ঈসা (আঃ) সরকার ও সরকারী দান–দক্ষিণার ওপর নির্ভর না করে আল্লাহর ওপর এবং আল্লাহ যে সকল প্রাণীর জীবিকা নির্বাহকারী এই

কথার ওপর নির্ভর করার ও আস্থা রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। এ শিক্ষা দিয়ে তিনি একটি পরাধীন জাতির সবচেয়ে মারাত্মক দুর্বলতা দুর করতে চেয়েছেন, যা তাকে অন্য একটি শাসক জাতির গোলামীতে আবদ্ধ করে রাখে। তিনি বলেছেনঃ

" বড় হয়ে তোমরা যেমন নিজ সন্তানদেরকে ভালো ভালো জিনিস দিয়ে থাক, তেমনি তোমদের স্বর্গের পিতাও অবশ্যই তা দেবেন।" (লুক ১১ঃ১৩)

তিনি মানুষের মন থেকে শাসক–ভীতি দূর করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাদেরেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যারা কেবল দেহকে হত্যা করেতে পারে রুহ বা আত্মাকে হত্যা করতে পারে না, তাদেরকে ভয় করার প্রয়োজন নেই। আসলে ভয় করা দরকার শুধু আল্লাহকে যিনি দেহ ও আত্মা উভয়কেই ধ্বংস করতে পারেন।" (লুক ১২ঃ৪–৫)

শত শত বছর ধরে বিজাতির গোলামীতে লিপ্ত একটি জাতির মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি করার জন্য এ জাতীয় সদুপদেশের প্রয়োজন ছিল। প্রথম দিকে হযরত ঈসা (আঃ) তাদের মধ্যেই আপন উপদেশাবলীকে সীমিত রেখেছিলেন। এই স্তর অতিক্রম করার পর শেষের দিকে তিনি জিহাদ ও সশস্ত্র সংগ্রামের বিষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কখনো তিনি নিজের শত্রুদেরকে হত্যা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

" আমার যে সব দুশমন তাদের ওপর আমার শাসন মেনে নিতে চায়নি তাদেরকে আমার সামনে এনে হত্যা কর।"

তিনি নিজের অনুসারীদেরকে তরবারী সাথে নিয়ে চলাফেরা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। লুক লিখেছেনঃ

" তিনি বলেন, এখন যার কাছে কৌটা থাকবে সে কৌটা নিক আর ব্যাগ থাকলে তাও নিক, আর যার কাছে এর কোনটা নেই সে আপন পোশাক বিক্রি করে তরবারী কিনুক।---- তিনি বলেন, হে প্রভু! দেখুন এখানে দুটো তরবারী আছে। তিনি বলেন, যথেষ্ট আছে।" (২২ঃ ৩৬–৩৮)

কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) স্বজাতির হেদায়াত ও নেতৃত্ব দানের জন্য মাত্র আড়াই থেকে তিন বছর সময় পান। একটি জাতিকে সামগ্রিকভাবে জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করার জন্য এ সময়টি যথেষ্ট ছিলনা। এ সময়ে তাঁর

অনুসারীদের সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি পায়নি যে, তাদেরকে নিয়ে তিনি রোমকদের মোকাবিলায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। তাছাড়া তাঁর অনুসারীদের চারিত্রিক অনুশীলনও এতটা পূর্ণ ও পরিপক্ক হয়নি যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ন্যায় সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে সব রকমের বিপদের মোকাবিলা করবেন। ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়ে হিজরত করবেন এবং বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবেন। এমনকি প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ও তার সত্যতা ঘোষণা করার পর্যন্ত সাহস তাদের ছিলনা। অন্যদের কথা থাক হযরত ঈসার যিনি সবচেয়ে প্রিয় ও আস্থাভাজন শিষ্য ছিলেন, সেই পিটারসের অবস্থাই এমন শোচনীয় ছিল যে, তাকে গ্রেফতার করার সময় যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমিও কি যিশুর অনুসারী? তখন তিনি " দুবার মোরগের ডাক দিতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে তিনবার যিশুকে অস্বীকার করলেন।" (মারকাস ১৪ঃ৩) অপর একজন শিষ্য ইহুদা ইস্ক্রিয়ুতী ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার লোভে হযরত ঈসাকে ধরিয়ে দেয়। (মতি ২৬ঃ ১৪-১৬) আর তাঁকে গ্রেফতার করার পর তাঁর সমস্ত শিষ্য তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। (মতি ২৬ঃ৫৬) সবচেয়ে প্রিয় ও আস্থাভাজন শিষ্যদের যখন এই অবস্থা, তখন এমন অনির্ভর সৈন্যদের নিয়ে তিনি জিহাদ করার সাহস কিভাবে করতে পারতেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাহাবীদেরকে ট্রেনিং দানের যেরূপ পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি যদি তা পেতেন তাহলে হয়তো হযরত তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যেরূপ জিহাদী প্রেরণা উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন, হযরত ঈসাও (আঃ)তার অনুসারীদের মধ্যে সেরূপ জিহাদী প্রেরণা উজ্জীবিত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর হঠকারী জাতি তাঁকে নবুয়ত লাভের পর পূর্ণ তিনটি বছর সহ্য করেনি। তিনি যে তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য কিছু কাজ করবেন সে সময়ই তারা তাঁকে দেয়নি। এত অল্প সময়ে হযরত ঈসা (আঃ) যেটুকু কাজ করেছিলেন তার চেয়ে বেশী করা সম্ভবই ছিলনা। স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা জীবনের প্রাথমিক তিন বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে জিহাদ বা সশস্ত্র সংগ্রামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কেবলমাত্র ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থিরতা, খোদাভীতি, খোদা নির্ভরতা, আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র শুদ্ধির শিক্ষাই সেখানে বেশী। হযরত ঈসার নবী-জীবনেও অবিকল এ গুলিই বিদ্যমান।

খৃষ্টবাদ ও হযরত মূসা (আঃ) আনীত শরীয়তের পারস্পারিক সম্পর্ক

উল্লিখিত তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে হযরত ঈসার শিক্ষা ও আদর্শ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তা প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত। এক অংশে তিনি হযরত মূসার শরীয়তকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং তাতে প্রয়োজনীয় সংযোজন করেছেন। হযরত মূসার শরীয়তে দয়া, অনুকম্পা, নম্রতা এবং স্নেহ জাতীয় উপাদানের কিছু ঘাটতি ছিল হযরত ঈসা সেই ঘাটতি পূর্ণ করেন। হযরত মূসার শরীয়তে নমনীয়তা একেবারেই ছিল না। তার শিক্ষায় বৃহত্তর মানবীয় লৌকিকতা ও সৌভ্রাতৃত্বের ধারণা তেমন স্পষ্ট ছিল না। হযরত ঈসা এই অসম্পূর্ণতা দূর করেন এবং বনী ইসরাইলকে নির্দেশ দেন সমস্ত মানব সন্তানকে সমানভাবে ভালোবাসতে। হযরত মূসার শরীয়তে মানুষের কেবল কর্তব্য ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। সৌজন্যবোধ বা নৈতিক মহত্বের দিক তাতে স্থান পায়নি। হযরত ঈসা এই দিকটার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন এবং দানশীলতা, পাস্পরিক সহানুভুতি,অন্যের জন্য আপন স্বার্থ ত্যাগ এবং দয়া ও অনুকম্পা ইত্যাকার গুণ বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা দেন। হযরত ঈসার শিক্ষার এই অংশ আলাদা কোন আইন নয়–বরং হযরত মূসার শরীয়তেরই উপসংহার এবং জরুরী পরিশিষ্ট মাত্র।

দ্বিতীয় অংশে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সমসাময়িক যুগের বনী ইসরাইলের বিশিষ্ট নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে চরিত্র শোধনের চেষ্টা করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, ইহুদীদের মধ্যে ধনসম্পদের লোভ ও পার্থিব স্বার্থের মোহ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। হযরত ঈসা তার মোকাবিলায় সন্তোষ, খোদা নির্ভরতা ও পার্থিব সম্পদকে তুচ্ছ জেনে অবহেলা করার উপদেশ দেন। ইহুদীদের চরিত্রে নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তার প্রকাশ ঘটেছিল খুব বেশী। হযরত ঈসা (আঃ) এই ত্রুটি দুর করার জন্য ক্ষমা ও দয়ার শিক্ষা দেন। ইহুদীরা সীমাতিরিক্ত কার্পণ্য, নীচাশয়তা ও সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিত। হযরত ঈসা এর সংশোধনের জন্য দানশীলতা, ঔদার্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেন। ইহুদী বিদ্বান ও সমাজপতিরা আত্মম্ভরী, প্রবৃত্তি পুজারী ও অহংকারী ছিল। হযরত ঈসা তাদেরকে বিনয়, নম্রতা, খোদাভীরুতা ও সংযমের শিক্ষা দিয়ে মধ্যমপন্থী বানানোর চেষ্টা করেন। ইহুদী জাতি রোমক শাসনের অধীন দুর্বল, অসহায় ও পরাধীন ছিল।

হযরত ঈসা তাদের মুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য একদিকে তাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে নিষেধ করেন। জুলুম ও অবিচার সহ্য করার শিক্ষা দেন। অধিকার সংরক্ষণে শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরত রাখেন এবং অন্যদিকে তাদের মধ্যে যুদ্ধের আভ্যন্তরিন ও নৈতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য ধৈর্য, সংকল্পের দৃঢ়তা ও নির্ভিকতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। হযরত ঈসার আবির্ভাবের সময় বনী ইসরাইলের মধ্যে যে বিশেষ অবস্থা বিরাজমান ছিল, হযরত ঈসার শিক্ষার এই দ্বিতীয় অংশটুকু শুধুমাত্র সেই বিশেষ অবস্থার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। একে তাঁর কোন শাশ্বত ও বিশ্বজনীন বিধানের রূপ দেয়ার পরিকল্পনা ছিল না। বিশেষতঃ 'দুষ্টের প্রতিরোধ করো না', 'যে তোমার এক গালে চড় দিয়েছে তার সামনে অপর গালটি এগিয়ে দাও', 'যে তোমার জামা ছিনিয়ে নেয় তাকে আচকানও দিয়ে দাও', এ জাতীয় চরম বিনয় ও অহিংসার শিক্ষাগুলো পরাধীনতা ও অসহায়তার এক বিশেষ অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। একে কোন স্বাধীন জাতির স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংগীভূত করার উদ্দেশ্যও ছিল না, তার যৌক্তিকতা এবং বৈধতাও ছিল না।

শরীয়ত ও খৃষ্টবাদের সম্পর্কচ্ছেদ

কিন্তু হযরত ঈসার তিরোধানের মাত্র কয়েকটি বছর পরই যে সব মুলনীতি ও বিধানের ওপর ভিত্তি করে তিনি সংস্কার ও চরিত্র শুদ্ধির আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সহসা তার বিলোপ ঘটানো হলো। হযরত ঈসার মৌল শিক্ষা ও আদর্শকে এমনভাবে পরিবর্তন করা হলো যে, দুনিয়ায় তার নাম নিশানা পর্যন্ত রইল না। বিকৃতকরণ ও পরিবর্তনের এই কাজের মূল উদগাতা ছিলেন সেন্টপল। তার নিয়ত বা উদ্দেশ্য ও মনোভাব সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। যদিও তিনি হযরত ঈসার পৃথিবীতে অবস্থানকালে এবং তাঁর অন্তর্ধানের পরও ছয় বছর পর্যন্ত তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনের কঠোর বিরোধী ছিলেন। তথাপি এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, ঐ সময়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত তিনি যীশুর সাচ্চা অনুগামী ও সেবকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তিনি হযরত ঈসার সঙ্গ লাভ করেন নি, তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও প্রশিক্ষণে থেকে তিনি যে হযরত ঈসার শিক্ষার প্রকৃত মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করবেন সে সুযোগ পাননি। হযরত ঈসার সাহচর্য্যে ও প্রশিক্ষণে যারা থাকতেন সেই 'হাওয়ারী'দের তুলনায় হযরত ঈসার শিক্ষা অধিকতর ভালোভাবে বুঝবার সামর্থ তাঁর ছিল না। কাজেই

সেন্টপল যখন পিটারসের ন্যায় 'হাওয়ারী'দের মতের বিরুদ্ধে হযরত ঈসার ধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাকে নিজের উদ্ভাবিত নয়া ভিত্তি সমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য অসৎ ছিল একথা না বললেও অন্ততঃ মুর্খতা ও অজ্ঞতা বশত তিনি যে সুস্পষ্ট বিকৃতকরণের কাজ সম্পন্ন করেছেন তা দিবালোকের মত স্পষ্ট।[২৪২]

সেন্টপল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আনীত বিধানের মূলনীতিতে যে বিকৃতি সাধন করেন তার পয়লা বিকৃতিটি ছিল এই যে, তিনি হযরত ঈসার শিক্ষা ও দাওয়াতকে সমগ্র মানব জাতির জন্য একটা সাধারণ দাওয়াতের রূপ দেন। অথচ মূলত সেটি ছিল কেবলমাত্র বনী ইসরাইলের জন্য। হযরত ঈসা যখন নিজের নবী জীবনে 'হাওয়ারী' (সহচর) দেরকে প্রচার ও দাওয়াতের কাজে পাঠান তখন স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে দেন যেঃ

" অন্য কোন জাতির কাছে যেও না। সামেরীদের শহরেও প্রবেশ করোনা। বরং ইসরাইলের পথহারা মেষদের কাছেই যেয়ো।" স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সমগ্র নবী জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও কোন অ–ইসরাইলী জাতিকে দাওয়াত দেননি এবং তার দলের সদস্য করেন নি। সেন্টপলের আবির্ভাবের পূর্বে হযরত ঈসার হাওয়ারীগণও ইসরাইলীদেরকেই দাওয়াত দিচ্ছিলেন। প্রচারকরাও ছিলেন ইসরাইলী এবং যাদেরকে দাওয়াত দেয়া হতো তারাও ইসরাইলী ছিল। তখন পর্যন্ত যিশুর আন্দোলন ইহুদী ধর্মের একটি সংস্কার মূলক আন্দোলন বলেই গণ্য হতো।[২৪৩] হাওারীদের কাছে এটা সর্ব স্বীকৃত ব্যাপার ছিল যে, ইঞ্জিলের আহবান কেবল হযরত মূসার শরীয়তের অনুসারীদেরউদ্দেশ্যেইনিবেদিত।[২৪৪] ৪৯ খৃষ্টাব্দে হযরত ঈসার অনুসারীদের যে সম্মেলন জেরুসালেমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে একটি বিরাট গ্রুপ এই মতেরই সমর্থক ছিল।[২৪৫] কিন্তু সেন্টপল হযরত ঈসার দাওয়াতের প্রকৃত দাবী কি, তাও দেখলেন না, তার সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করলেন না এবং হাওয়ারীদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেন না। এই সবের বিরুদ্ধে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হযরত ঈসার দাওয়াত সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। আর নিজের এই সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য প্রচার করেন যে, হযরত ঈসা ক্রুশে আরোহণ করার পূর্বে নিজের শিষ্যদের কাছে এসে নির্দেশ দেন যে, " তোমরা সকল জাতির কাছে যাও এবং সকলকে শিষ্য কর।"[২৪৬]

(মথি ২৮ঃ১৯)

কিন্তু এখানে একটা সমস্যা দেখা দেয়। অ–ইসরাইলী জাতিগুলোকে হযরত মুসার বিধানের অনুগত ও অনুসারী করায় বেশ অসুবিধা ছিল। ইসরাইলীদের বহু আচার–অনুষ্ঠান এমন ছিল যা অন্যান্য জাতি অপছন্দ করতো। এ জন্য তখনই এ প্রশ্ন উঠেছিল যে, অ–ইসরাইলী জাতিদেরকে যখন খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দেয়া হবে তখন তাদেরকে হযরত মূসার শরীয়তের আনুগত্য করার তাগিদ দেয়া হবে কি না? এ প্রশ্নে হযরত ঈসার জবাব অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তিনি বলেই দিয়েছেন যে, " আকাশ ও পৃথিবী টলতে পারে কিন্তু তাওরাতের একটি বিন্দুও টলতে পারে না।" তিনি আরো বলেছেন যে, " আমি তাওরাতকে বাতিল করতে আসিনি। –এসেছি পূর্ণ করতে।"

আসমানী সাম্রাজ্যে একমাত্র যে ব্যক্তি তাওরাতের নির্দেশ মেনে চলে সেই প্রবেশ করতে পারবে।" এরূপ স্পষ্টোক্তির উপস্থিতিতে খৃষ্টধর্মকে হযরত মুসার শরীয়ত থেকে পৃথক করে দেখানো কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেন্টপল তা সত্বেও ঘোষণা করলেন যে, যে কোন অ–ইসরাইলী খৃষ্টান হতে পারে– চাই সে শরীয়ত অনুযায়ী আমল করুক বা না করুক।[২৪৭] এর ফলে সেই সব অ–ইসরাইলী অংশীবাদী–যারা হযরত মূসার শরীয়তকে অংশতঃ কিংবা সম্পূর্ণতঃ অস্বীকার করেছিল, তাদেরকেও ঈসায়ী ধর্মে ভর্তি করে নেয়াহলো।

এই পরিবর্তন ও বিকৃতকরণে ব্যাপকভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। (কর্মপুস্তক, অধ্যায় ২১) এমনকি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পর্যন্ত এর কঠোর বিরোধিতা করেন। কিন্তু পল সেন্ট পিটারস ও সেন্ট বারনাবাসের ন্যায় নিষ্ঠাবান ও মর্যাদা সম্পন্ন 'হাওয়ারীকে' ভন্ড তপস্বী ও গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করেন (গেলিথো ১৩ঃ২) এবং প্রকাশ্যে হযরত মূসার শরীয়তের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেন। তিনি গেলিথোকে উদ্দেশ্য করে এক বিধিতে লেখেনঃ

> " আমরা একথা জেনেই যিশুর ওপর ঈমান এনেছি যে, কোন ব্যক্তি শরীয়তের বিধান অনুসারে কাজ করে মুক্তি পায় না– মুক্তি পায় কেবল যিশুর ওপর ঈমান এনেই। ·······শরীয়তের কাজ করে কেউ ত্রাণ পাওয়ার যোগ্য ও সঠিক পথের অনুসারী বলে গণ্য হবে না। শরীয়ত মেনেই যদি যথার্থ সত্য পালন করা হতো তাহলে যিশুর মৃত্যুর কোন অর্থ হতো না।" (২ঃ১৬–২১)

"যারা শরীয়তের কাজ করেই তরিয়ে যাবে বলে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে তারা সব অভিশপ্ত।.........শরীয়তের বলে কেউ আল্লার নিকট সৎ ও ন্যায় পরায়ণ বলে বিবেচিত হয় না। কেননা লিখিত আছে যে, সত্যপন্থী কেবল ঈমানের বলে বেঁচে থাকবে। অথচ ঈমানের সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই।...... যিশু আমাদের জন্য অভিশপ্ত হয়ে এবং আমাদেরকে খরিদ করে শরীয়তের অভিশাপ থেকে আমাদের রক্ষা করলেন।" (৩ঃ১০–১৩)

"শরীয়ত ঈমান (যিশুর শিক্ষা) পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের শিক্ষক হয়েছে যেন আমরা ঈমানের বলে সৎ ও সত্যপন্থী বলে গণ্য হতে পারি। কিন্তু যখন ঈমান এল তখন আমাদের আর শিক্ষকের প্রয়োজন রইল না।" (৩ঃ২৪–২৫)

"যিশু আমাদেরকে যথার্থভাবে স্বাধীন করার জন্যই শরীয়তের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করেছেন। সুতরাং দৃঢ় থাক এবং পুনরায় শরীয়তের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয়ো না। তোমরা যারা শরীয়তের ওছিলায় সৎ হতে চাও তারা যিশু থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়ে গেছ। আমরা আত্মা ও ঈমানের মাধ্যমে সততার আশা পূর্ণ হবার জন্য অপেক্ষমান।" (৫ঃ১–৫)

এভাবে খৃষ্টবাদ শরীয়ত থেকে আলাদা হয়ে গেল। সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি এবং সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় আইন কানুন রহিত হলো। বাকী রইল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার একটা অসম্পূর্ণ সংকলন। এ সংকলন আসলে শরীয়তেরই পরিশিষ্ট এবং তা রচিত হয়েছিল একটি বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থা শুধরানোর জন্য। অথচ তাকেই করা হলো চিরন্তন ও বিশ্বজনীন ব্যবস্থা।

খৃষ্টানদের চরিত্র ও নৈতিকতার ওপর ধর্ম ও আইনের বিচ্ছিন্নতার প্রভাব

সেন্ট পলের অনুসারীগণ এই অসম্পূর্ণ ধর্মকে–যাকে আসলে যীশুর নয় বরং সেন্ট পলের নিজস্ব ধর্ম বলাই শ্রেয়–বনী ইসরাইল ব্যতীত রোম ও গ্রীসের অন্যান্য স্বাধীন জাতিগুলোর মধ্যে বিস্তার করতে শুরু করে। কিন্তু শরীয়ত বা আইনানুগ ব্যবস্থা বর্জিত নিছক একটি নৈতিক আদর্শতা মূলতঃ

কেবল একটি গোলাম ও অধপতিত জাতির জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, স্বাধীন সার্বভৌম জাতি সমূহের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম ছিল না। সাধারণ মানব সমাজের জন্য বিভিন্ন অবস্থায় ফলদায়ক ও হিতকরী সাব্যস্ত হবার মত কোন পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দেশ তাতে ছিল না। তাতে ছিল শুধু কতিপয় চরমভাবাপন্ন নৈতিক উপদেশ। আর এটা জানা কথাই যে, এ ধরণের শুধু কতিপয় নৈতিক উপদেশ মেনে চলে কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না। কাজেই এর অনিবার্য পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, প্রথম আড়াই তিনশো বছর পর্যন্ত খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণ সর্বপ্রকার জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হতে লাগলো। কেননা তাদেরকে জুলুম নির্যাতন নীরবে সহ্য করার নীতিই কেবল শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। এর পরবর্তী পর্যায়ের জন্য কোন পথ নির্দেশ তাদের কাছে ছিল না। এর পর যখন কোন চেষ্টা তদবীর ছাড়াই নিছক ঘটনাক্রমে তারা সরকার পরিচালনার সুযোগ লাভ করলো, তখন সেন্ট পল নিয়ন্ত্রিত খৃষ্টবাদের সেই দুস্কর গন্ডীর মধ্যে জীবন যাপন করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। সে জন্য তারা খৃষ্টবাদের সমস্ত নৈতিক বিধিনিষেধ লংঘন করে জুলুম ও অত্যাচারের চুড়ান্ত করে দিল।

প্রথম দিকে তো তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয় এক গালের সঙ্গে আরেক গাল এগিয়ে দেয়ার এবং এ কথা বলা হয় যে, দুশ্চরিত্র লোকদের মোকাবিলা না করাই যীশুর চিরন্তন নীতি। তাই তাদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল এবং তাদের প্রভাব বেড়ে গেল তখনও তাদের মধ্যে জুলুম প্রতিরোধ ও আপন অধিকার সংরক্ষনের উদ্দীপনা জাগ্রত হয়নি। ৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন গ্রীস, রোম, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে খৃষ্টানদের সংখ্যা কয়েক হাজারের চেয়েও বেশী হয়ে গেছে তখন নিরো (কুখ্যাত নির্যাতক রোম সম্রাট) তাদের বিরুদ্ধে রোমকে পোড়ানোর অভিযোগ তোলে এবং তার নির্দেশে নিজেকে খৃষ্টান বলে দাবী করে এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর কাউকে শূলে চড়ানো হয়, কাউকে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেয়া হয় এবং বহু সংখ্যক ঈসায়ী নারী পুরুষ ও শিশুকে রোমের কুখ্যাত আখড়ায় লোমহর্ষক পাশবিক খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ৭০ খৃষ্টাব্দে তিতুসের নেতৃত্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের ওপর আক্রমন চালানো হয়। তখন ৯৭ হাজার লোককে গ্রেফতার করে দাসদাসীতে পরিণত করা হয়। এগারো হাজার লোককে অনাহারে ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে মারা হয়। হাজার হাজার লোককে ধরে রোমের বিভিন্ন

আখড়ায় ও সার্কাসে বন্য জন্তুর কিংবা অসিচালকদের অসিচালনার শিকারে পরিণত করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়।[২৪৮]

নিরোর পর মার্কোস আরিলিয়োস , সেন্টিমোস, সেবিরোস, ডেলিসিওস ও ডালেরিয়ান খৃষ্টবাদ ও তার অনুসারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালায়। সর্বশেষে ডায়ো ক্লেটিয়ান তো জুলুমের চূড়ান্ত করে দেয়। সে গীর্জা ধ্বংস করা, ইঞ্জিল সমূহ পুড়িয়ে ফেলা এবং গীর্জা সমূহের যাবতীয় ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ জারী করে। ৩০৩ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট নিজেই নিকোমেডিয়ার কেন্দ্রীয় গীর্জা ধ্বংস করে দেয় এবং পবিত্র গ্রন্থ সমূহ জ্বলিয়ে দেয়। ৩০৪ খৃষ্টাব্দে সে নির্দেশ জারী করে যে, যে ব্যক্তি খৃষ্টধর্মের ওপর থাকার জন্য জিদ করবে তাকে হত্যা করা হোক। এর পর নির্যাতন আরো বেড়ে যায়। যারা খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতো তাদের দেহ কেটে তাতে লবণ ও টক লাগিয়ে দেয়া হতো, তারপর টুকরো টুকরো করে তাদের গোশত কাটা হতো। কখনো কখনো তাদেরকে গীর্জার মধ্যে আটকে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হতো এবং আরো বেশী আনন্দ উপভোগ করার জন্য এক একজন ঈসায়ীকে পাকড়াও করে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দেয়া হতো কিংবা তাদের দেহে লোহার পেরেক ফুটানো হতো। অথচ এ সময় সারা দেশেই ছিল খৃষ্টানদের সংখ্যাধিক্য। সাম্রাজ্যের ছোট বড় বহু পদে খৃষ্টানরা সমাসীন ছিল। এমনকি স্বয়ং সম্রাটের প্রাসাদেও খৃষ্টানদের একটি বিরাট দল থাকতো[২৪৯] কিন্তু খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদেরকে তখনো বলা হতো যে, সংখ্যা ও শক্তির এত আধিক্য সত্ত্বেও দুরাচারের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়া এবং এক গালের সাথে আরেক গাল এগিয়ে দেয়ার নীতিই অবশ্য পালনীয়–যদিও তা ইসরাইলীদের চরম অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় প্রবর্তিত হয়েছিল। এ জন্য সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাক, মিসর, আফ্রিকা, স্পেন, গল, সিসিলি, ইটালী, এলিরিয়া, এশিয়া মাইনর–মোটকথা কোথাও কোন খৃষ্টান এই সব জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করেনি। সমগ্র খৃষ্টান জাতি এহেন অমানুষিকতা ও জুলুমকে চরম আত্মঘাতী নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে নীরবে বরদাশত করে। অথচ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে জিহাদের শিক্ষা দেওয়ার পর সংখ্যায় মাত্র আড়াইশো তিনশো হতেই তারা সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, যে জাতির মধ্যে এরূপ জিহাদী

বিদ্যমান তারা সংখ্যায় যত কমই হোক এবং যত সহায় সম্বলহীনই হোক তাদের দাবিয়ে রাখা যায় না।

এতো গেলো খৃষ্টবাদের এক প্রান্তিকতা। এর পর যখন সম্রাট কনষ্টান্টাইন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্ম কার্যত রাষ্টীয় ধর্মে পরিণত হয় তখন তা এক লাফে আর এক প্রান্তে উপনীত হয়ে চরম অবস্থার সৃষ্টি করে। প্রথমোক্ত চরম অবস্থা দেখা দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, সেন্ট পল নিয়ন্ত্রিত খৃষ্টবাদের রাজনীতি ও সমাজনীতির সাথে কোন সংশ্রব ছিল না। তার অনুসারীরা আপন ধর্ম পালন করতে গিয়ে চরম অসহায় ও বিনীতের জীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু যখন ঘটনাক্রমে তাদের ওপর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়লো তখন তারা প্রথমটার চেয়েও মারাত্মক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হলো। যেহেতু সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে খৃষ্ট ধর্ম তাদের কোন পথনির্দেশ দেয়নি, তাই তারা সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজ কর্ম আল্লার আইনের পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া আইন অনুসারে চালাতে আরম্ভ করলো। সকলেই জানে যে, রাষ্ট্রীয় কায়কারবারে যুদ্ধ ও সন্ধি, ক্ষমা ও প্রতিশোধ, কুটনীতি ও দমন নীতি সবই বর্তমান থাকে। কিন্তু মুসার শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন খৃষ্টীয় বিধানে এ সব অপরিহার্য রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের কোনটির জন্যই কোন বিধি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না। খৃষ্টীয় বিধান জীবনের সকল কায়কারবারের জন্য একটি মাত্র বিধান দিয়েছিল। সেটা হলো, 'দুরাচারের দুস্কর্মের প্রতিরোধ করোনা এবং জামা ছিনতাইকারীকে আচকান দিয়ে দাও।' কিন্তু এহেন চরম বিনয়নীতির সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে থেকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ সম্পন্ন করা খৃষ্টানদের জন্য সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল। এ জন্য তারা উক্ত ক্ষুদ্র গন্ডীর বাইরে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আর গন্ডীর বাইরে চলে আসার পর তারা আপন প্রবৃত্তির খেয়াল খুশী মত চলার ব্যাপারে একেবারেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। বাস্তব জগতে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারে এমন কোন খোদায়ী বিধান তাদের কাছে ছিলনা। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, খৃষ্টানগণ পৃথিবীতে অরাজকতা ও দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়ালো এবং জুলুম ও অত্যাচারের এমন ষ্টীম রোলার চালালো যা আজও বন্ধ হয়নি।

কনষ্টান্টাইনের আমলে সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী ছিল পৌত্তলিক। তাই সে তাদের ওপর তেমন বেশী জুলুম চালাতে সাহসী হয়নি। সে শুধু মন্দির সমূহের দরজা ও ছাদ ধ্বংস করে, মূর্তি সমূহের বস্ত্র ও অলংকারাদি

খুলে ফেলে এবং ঐ মুর্তিগোলো মন্দির থেকে বের করে দিয়েই ক্ষান্ত থাকে।[২৫০] কিন্তু বছর কয়েক পরে যখন রাষ্ট্রের ওপর গীর্জার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা পৌত্তলিকতাকে সমূলে উৎখাত করতে কৃত সংকল্প হয়। তারা ধর্মীয় আইনের নিম্নলিখিত দুটো মূলনীতি নির্ধারণ করে। এ দুটোর মাধ্যমে ভিন্ন ধর্ম সমূহকে বল প্রয়োগে উৎখাত করার বৈধতা সম্পর্কে বহু বিধি রচিত হয়।

১। ম্যাজিষ্ট্রেট যে সব পাপ কাজ থেকে নিষেধ না করে বা তাতে শাস্তি না দেয়, সে সব পাপ কাজের দায় দায়িত্বের তিনি নিজেও অংশীদার।

২। কল্পিত দেবদেবী ও প্রেতাত্মার প্রতিমা পূজা করা মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার বিরুদ্ধে এক জঘন্য অপরাধ বিশেষ।

এই দুটো মূলনীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম রোমান সিনেট আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, " রোমকদের ধর্ম জুপিটারের পূজা নয়, যিশুর পূজা।" এর পর মুর্তিপূজা এবং মুর্তি সমূহকে অর্চনা করা ও তাদের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া ইত্যাদি কঠোরভাবে বেআইনি ও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। আর যারা এসব কাজে লিপ্ত হবে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। সম্রাট থিয়োডোসিয়াস যীশু ব্যতীত অন্য যে কোন সত্তা বা বস্তুর উপাসনাকে–চাই তা গোপনে বা প্রকাশ্যে যে ভাবেই করা হোক না কেন– রাষ্ট্রদ্রোহের পর্যায়ভুক্ত ও মৃত্যুদন্ডের যোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করে ফরমান জারী করেন। সেই সাথে তিনি মন্দির সমূহ ভাংগা, মন্দিরের জায়গা বাজেয়াপ্ত করা এবং উপাসনার উপকরণ সমূহ ধ্বংস করার নির্দেশও জারী করেন। তার নির্দেশ অনুসারে সর্ব প্রথম কেন্দ্রীয় রাজধানীতে বল প্রয়োগে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করা হয়। তার পর উচ্ছেদ করা হয় প্রদেশ সমূহে। গল নামক প্রদেশে তুরসের বিশপ ধর্মপরায়ন যাজকদের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মন্দির, উপাসনালয়, মুর্তি ও পবিত্র কথিত বৃক্ষ সমূহকে সমূলে ধ্বংস করেন। সিরিয়ায় বিশিষ্ট খৃষ্টান যাজক ও ফামিয়া অঞ্চলের বিশপ মার্সেলাস (MARCELLUS) জুপিটারের বিশাল মন্দির ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন এবং একটি দল গঠন করে সেই দলকে নিয়ে তার এলাকার পৌত্তলিকদের মন্দিরগুলোকে মিছমার করে বেড়াতেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় মিসরের আর্চ বিশপ থিয়োফিলাস (Theophilus) গ্রীস কারুশিল্পের অনুপম স্বাক্ষর

সেরাপিসের মন্দিরকে ধ্বংস কর দেয়। এই মন্দিরে বাতলিমুস রাজবংশের স্থাপিত শ্রেষ্ঠতম লাইব্রেরীটিও তিনি ভস্মিভূত করেন।[২৫১] তিনি সেরাপিসের মূর্তিকে টুকরো টুকরো করেন। তার বাহুগুলোকে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছেন, যাতে তার ভক্তরা দুঃখ পায়। সবশেষে তার টুকরোগুলোকে হাজার হাজার লোকের সামনে জ্বালিয়ে দেন। এমনিভাবে রোম সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশেও "ধর্মান্ধদের একটা বিরাট বাহিনী" কোন আইনানুগ ক্ষমতা ও অধিকার ছাড়াই এবং কোন নিয়ম শৃংখলা ব্যতিরেকেই নিরীহ জনগনের ওপর আক্রমণ চালাতো এবং প্রাচীন কারুশিল্পের চমৎকার নমুনা সমূহকে ধ্বংস করতো।[২৫২]

এইসব জুলুম নির্যাতনের ফল দাঁড়ালো এই যে, পৌত্তলিক প্রজারা আদৌ পছন্দ করতো না এমন একটি ধর্মকে নিছক তরবারীর ভয়ে গ্রহণ করে নিল। এভাবে নিষ্ঠাহীন ও অবিশ্বাসী পুজারীতে গীর্জা ভরে গেল। ৩৮ বছরের মধ্যে রোমের বিশাল সাম্রাজ্য থেকে পৌত্তলিকতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ইউরোপ, আফ্রিকা ও দূর প্রাচ্যে তরবারির জোরে খৃষ্ট ধর্ম ছড়িয়ে পড়লো।

এর পর থেকে খৃষ্টান–অখৃষ্টান এবং স্বয়ং খৃষ্টানদের মধ্যে যে সব যুদ্ধ বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতেও মানবতা ও নৈতিকতার মূলনীতি সমূহ এমন নিষ্ঠুরভাবে লংঘিত হয়েছে এবং এমন অমানুষিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে যার লোমহর্ষক বর্ণনায় ইতিহাসের পাতা মারাত্মকভাবে কলংকিত। সমস্ত অখৃষ্টীয় আকিদা– বিশ্বাস ও মতবাদ উৎখাত করার জন্য শক্তি প্রয়োগের যে সব বর্বরোচিত পদ্ধতি খৃষ্ট ধর্মের অনুসারীরা বৈধ করে নিয়েছিল, রোমের পোপদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইনকুইজিশন (Inquisition) আদালত সমূহ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এসব আদালতে নাস্তিকতা, খোদাদ্রোহিতা, ইহুদী ধর্ম পালন, ইসলাম গ্রহণ ও বহু বিবাহের ন্যায় " অপরাধ সমূহে"র শাস্তি বিধানের জন্য যে সব ফৌজদারী আইন চালু ছিল, তন্মধ্যে মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা, জিহবা কেটে দেয়া এবং মানুষের কবর খুড়ে হাড় গোড় বের করে ফেলে দেয়া অন্যতম। একমাত্র স্পেনে এই ধর্মীয় আদালতের রায়ের বলে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার লোককে বিভিন্ন পন্থায় হত্যা করা হয়। এর মধ্যে ৩২ হাজার লোককে জীবন্ত পুড়িযে মারা হয়। এ ছাড়া মেক্সিকো, কর্ডোভা, সিসিলি, সার্ডিনিয়া, নেপলস ও কালান্ডারস অঞ্চল সমূহের ধর্মীয়

আদালত সমূহ অ–খৃষ্টীয় ধর্মমত পোষনের জন্য অন্তত দেড় লাখ লোককে হত্যা করায়।[২৫৩]

এই হলো সেন্টপল রচিত খৃষ্টধর্মের ত্রুটিপুর্ণ শিক্ষার দ্বিতীয় কুফল। প্রথম কুফলের কথা পূর্বেই বলেছি যে, খৃষ্টানরা এই বিকৃত ধর্মমতের অনুসরণ করতে গিয়ে সীমাতিরিক্ত বিনয়ী, উদার ও নম্র হয়ে পড়ে এবং প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকা সত্বেও জুলুম–অত্যাচার সহ্য করে তিনশো বছর পর্যন্ত নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা অব্যাহত রাখে। এর দ্বিতীয় কুফল হলো, যুগের পরিবর্তনে তারা যখন ক্ষমতা ও শাসনদন্ড লাভ করলো তখন তাদেরকে খৃষ্টবাদের সংকীর্ণ গন্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। অতঃপর এখানে তারা ধর্মীয় অনুশাসন ও পথ নির্দেশ না পেয়ে মানুষের ওপর চরম জুলুম চালায় এবং প্রবৃত্তির খেয়াল–খুশী মত যা ইচ্ছা তাই করে। আর তৃতীয় ও সর্বশেষ কুফল হলো, ধর্মের নামে জুলুম, নির্যাতন ও মুর্খতা প্রসূত গোঁড়ামি যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন তাদের খোদ্ ধর্মের ওপরই বিতৃষ্ণা জন্মে গেল এবং তারা সারা পৃথিবীতে ধর্মহীনতার প্রসার ঘটানোর জন্য উদ্যোগীহলো।

খৃষ্টীয় শাসকদের জুলুম নির্যাতনের প্রসঙ্গ উঠলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, মুসলিম শাসকরা কি এই কলংক থেকে মুক্ত? সত্য বটে, কোন কোন মুসলিম সম্রাটও জুলুম নির্যাতনের দায়ে দোষী। মুসলমানদের কোন কোন যুদ্ধেও হিংস্র পন্থা অবলম্বন করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ধর্মের নামে ধর্মবিরোধী যুদ্ধ করার কলংক থেকেও মুসলমানরা মুক্ত নয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্ব ইসলামের ওপর বর্তায় না। কেননা ইসলাম মানুষের যাবতীয় স্বাভাবিক প্রয়োজন পুরণ করার উপযুক্ত স্বয়ং–সম্পূর্ণ আইন রচনা করে দিয়েছে। সে আইনে এমন কোন অস্বাভাবিক বাধ্যবাধকতা নেই–যা মেনে চলা সম্ভবই নয়। আবার এমন লাগামহীন স্বাধীনতাও নেই যে, মানুষ যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবে। এজন্য ইসলামের অনুসারীদের দ্বারা যেসব অশোভন ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়েছে তা শুধুমাত্র আইন লংঘনের পর্যায়ভুক্ত। আইনের ওপর এসব কার্যকলাপের কোন দায়িত্ব আরোপিত হয় না। পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্ম তার অনুসারীদের বাস্তব জীবনের জন্য আদৌ কোন আইন তৈরী করে দেয়নি। দুর্বল হলে শক্তি কিভাবে অর্জন করতে হবে। ক্ষমতা পেলে তাকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে। অন্য

জাতিসমূহের সাথে সন্ধি হ'লে তা কি কি মূলনীতির ভিত্তিতে হবে। যুদ্ধ হলে কি কি উদ্দেশ্যে তা হবে। রণাঙ্গনে গিয়ে শত্রুর সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে। শত্রুর ওপর জয়লাভ করলে তার সাথে কি আচরণ করতে হবে। ভিন্ন ধর্ম–বিশ্বাসীদের সুবিধা কতখানি দেয়া যাবে, তাদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করলে কতখানি করতে হবে–এসব প্রশ্নের কোন জবাবই খৃষ্টধর্ম দেয়নি। এজন্য খৃষ্টধর্মের অনুসারীরা প্রথমে ধর্মের চৌহদ্দীতে থেকে এবং তারপর তা থেকে বেরিয়ে যত গুণাহ্ করেছে, তাতে খৃষ্টবাদ নিজেই খানিকটা দায়ী। কেননা সে তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়নি। খৃষ্টবাদ ইসলামের ন্যায় এ জবাব দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না যে, তার অনুসারীরা তার ঘোষিত ও নির্দেশিত নীতি ও নির্দেশ মেনে চলেনি, কাজেই তাদের গুণাহের জন্য সে দায়ী নয়। খৃষ্টবাদকে দুটো পথের একটা অনুসরণ করতেই হবে। হয় তাকে রাষ্ট্র পরিচালনা ও দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণকারী সমস্ত খৃষ্টানকে দোষী ও গুণাহগার সাব্যস্ত করতে হবে–চাই তারা ন্যায়ভাবে তা পরিচালনা করে থাকুক কিংবা অন্যায়ভাবে। নচেত তাদেরকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিষ্পাপ ঘোষণা করতে হবে–চাই তারা তা ন্যায়ভাবে অথবা অন্যায়ভাবে–যেভাবেই পরিচালনা করে থাকুক না কেন। এই দুইয়ের মাঝখানে কোন তৃতীয় পথ তার জন্য খোলা নেই। কিন্তু ঐ দুটো পথই যে অযৌক্তিক ও অন্যায় তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

৫– ধর্ম চতুষ্টয়ের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

আমি এখানে যুদ্ধ সম্পর্কে দুনিয়ার চারটি প্রধান ধর্মের মতামত বর্ণনা করেছি। এতে চরম নমনীয়তা ও চরম কঠোরতা–এই দুই ধরনের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান। প্রথমোক্ত দুটো ধর্ম যুদ্ধকে বৈধ মনে করে। সে বৈধতা এমনই লাগামহীন যে, মানুষ যে কোনো উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা করুক না কেন সে তার অনুমতি দেয়। উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তার ন্যায়–অন্যায় ভেদাভেদ নেই। এ ধর্ম দুটি মানুষের সামনে উন্নত জীবন লক্ষ্য পেশ করে না। তাকে কোন উন্নত নৈতিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেনা। বরং নিছক পাশবিক প্রকৃতির ভিত্তিতে তাকে অধিকার দিয়ে দেয় সে যখন যেভাবে ইচ্ছা, যে উদ্দেশ্যে ইচ্ছা, তার স্বগোত্রীয় মানুষের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং যা খুশী তাদের নিকট থেকে হস্তগত করতে পারে। এ ধর্ম দুটি সভ্যতার

দিকে যদি কিছু অগ্রগতি লাভ করেও থাকে তবে তা শুধু এইটুকু যে, অন্যের ওপর কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং কিভাবে করা সমিচীন হবে না তার কতিপয় নীতি নির্ধারন করে দিয়েছে। সেই সাথে উভয় ধর্ম মানব জাতিকে ভৌগোলিক, বংশীয় ও বর্ণগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভক্ত করেছে এবং একটি বিশেষ বংশের লোকদেরকে এমন কতিপয় সুযোগ সুবিধা দিয়েছে–যা থেকে তার অবশিষ্ট সমগোত্রীয়রা সকলেই বঞ্চিত। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ধর্ম দুটি মনে করে যে, মানুষ মানুষকে হত্যা করবে–এতটা স্বাধীনতা দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু এই অনুভূতি তাদেরকে অন্য একটি চরম বিন্দুতে নিয়ে যায়। তারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বভাব–পদ্ধতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ মানুষের জীবনে সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তার মধ্যে যে বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছেন, এই ধর্ম দুটি তার একাংশকে একেবারেই নির্মূল ও ধ্বংস করে দিতে চায়। এর ফল হয় এই যে, যারা এ ধর্ম দুটির অনুশাসন মেনে চলে তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম অধপতিত, পরাজিত ও লাঞ্ছিত জীবন যাপন কারতে বাধ্য হয়। আর যারা আজন্ম স্বভাবের তাগিদে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য হয় কিন্তু অন্যদিকে তাদেরকে নিয়ম মতো মানবীয় কর্তব্য পালন করে যেতে হয়, তারা কর্মজীবনের কোন বিভাগেই পথ নির্দেশ লাভ করে না। তাই বাধ্য হয়ে তারা আপন ধ্যান ধারণা ও আবেগ অনুভূতির অনুসরণ করে। পথভ্রষ্টের মতো এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে।

দুই চরমপন্থা–চরম নমনীয়তা ও চরম কঠোরতার মাঝখানে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ উদ্ভাবন করেছে। সে মানুষের স্বভাব প্রকৃতির দাবী, তার যথার্থ মানবিক প্রয়োজন সমূহ এবং সর্বোপরি মানবতার সংশোধনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে যুদ্ধকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। এক, যে যুদ্ধ সম্পদ ও ভূমি লাভ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ এবং প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার ও বস্তুগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পরিচালিত হয়। দুই, যে যুদ্ধ সত্যের সমর্থন ও সংরক্ষণের এবং জুলুম ও শোষণ প্রতিহত করার জন্য পরিচালিত হয়। প্রথম যুদ্ধটিকে সে ফিৎনা ফাসাদ তথা অরাজকতা ও দাঙ্গা–হাঙ্গামার সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করে। একে সে জঘন্যতম পাপাচার বলে ঘোষণা করে এবং এ থেকে মানুষকে দূরে থাকতে বলে। দ্বিতীয় যুদ্ধটি যদি নির্ভেজাল

সত্যের জন্য করা হয় এবং তাতে যদি কোন ব্যক্তি স্বার্থ ও লোভ–লালসা জড়িত না থাকে তবে তা জিহাদ ফি–সাবীলিল্লাহ, তথা সর্বোত্তম ইবাদত, পবিত্রতম ও মহত্তম কাজ এবং এমন এক মূল্যবান সেবাধর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়, যার চেয়ে উত্তম মানবসেবা আর কিছু হতে পারে না। অতঃপর এই শ্রেষ্ঠতম ইবাদাতের জন্য সে সীমা নির্দেশ করেছে, বিধি–নিষেধ আরোপ করেছে, কিরূপ অবস্থায় এটা করা চলবে, কিরূপ অবস্থায় চলবেনা তা বিশ্লেষণ করেছে, এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কিরূপ হওয়া উচিত তা বলে দিয়েছে এবং পদ্ধতি কি তাও সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছে। যেন আল্লাহর নামে শয়তানের কাজ শুরু হয়ে না যায় এবং মানুষ প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে পথভ্রষ্ট না হয়ে যায়।

এটা একটা পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান। ইসলাম ছাড়া আর কোথাও এমন পূর্ণাঙ্গ বিধান নেই। অন্যান্য ধর্মে কোথাও কর্মপদ্ধতি দেয়া হলেও হয়তো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিধারণ করা হয়নি, কোথাও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়তো নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়নি। কোথাও হয়তো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে কিন্তু তা ইসলামের ন্যায় মহৎ ও উন্নত নয়। অতএব, এটা আজ অকাট্য সত্য যে, যুদ্ধকে পুরোপুরিভাবে তার স্বাভাবিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত করা এবং তাকে পাশবিক রক্তপাত ও সংঘর্ষ থেকে ন্যায়, সুসভ্য ও রুচিসম্মত প্রতিরোধের পর্যায়ে উন্নীত করা এবং অত্যাচার থেকে ন্যায় বিচারের ও পাপ থেকে পুণ্যে পরিণত করার চেষ্টা যদি কেউ করে থাকে তবে সে ইসলাম ছাড়া আর কেউ নয়। এই বিধানকে মেনে নিয়ে বিশ্ববাসী জালেম ও মজলুম হওয়ার অভিশাপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক সভ্যতায় যুদ্ধ

আধুনিক সভ্যতা কি উদ্দেশ্যে ও কোন্ ধরনের আইন কানুনের ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং মানবতা ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে সেই উদ্দেশ্য ও আইন-কানুন কিরূপ মর্যাদার অধিকারী, বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেটাই পর্যালোচনা করতে চাই। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা গুলোকে দেখে যে কোন ব্যক্তি হয়তো বলতে পারে, এটা সত্য যে ইসলাম সমসাময়িক সভ্যতায় একটা মূল্যবান সংস্কার কার্য সম্পাদন করেছিল এবং যুদ্ধের এমন উন্নত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতি মানুষকে শিখিয়েছিল যা তৎকালীন বিশ্বের সকল ধর্ম ও কৃষ্টির কাছে অপরিচিত ছিল। কিন্তু এখন শত শত বছরের উন্নতি-প্রগতির প্রভাবে মানুষের যুদ্ধ সংক্রান্ত চিন্তাধারায় যে পরিপক্কতা এসেছে এবং সেজন্য যে সুসভ্য যুদ্ধ-আইনসমূহের উদ্ভব হয়েছে, তার সাথে সেই আদিম যুগের আইন-কানুন ও চিন্তাধারার কি সম্পর্ক? তখন তো মানুষের চিন্তাশক্তি নেহাত শিশু অবস্থায় ছিল। সুতরাং আর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এতে ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতাকে পাশাপাশি রেখে দেখতে হবে যে, যুদ্ধ সম্পর্কে কার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি অধিকতর সুষ্ঠু, নির্ভুল ও মজবুত।

এই তুলনামুলক পর্যালোচনা শুরু করার পূর্বে আমাদের স্থির করে নিতে হবে যে, যুদ্ধ সম্পর্কে পাশ্চাত্য সভ্যতার আসল আইন জানবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করতে হবে এবং কোন্ উৎসের নিকট তার সন্ধান নিতে হবে। কোন বিষয়ে একটি মানব সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি কি, তা সাধারনতঃ তিনটি জিনিস থেকে জানা যায়ঃ ধর্ম, সাহিত্য ও সামাজিক আচার পদ্ধতি। আধুনিক সভ্যতা ধর্মকে জনসাধারণের ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করেছে এবং বর্তমান যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কার্যকলাপের ওপর ধর্মের কোনই নিয়ন্ত্রন রাখেনি। কাজেই তা নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। এরপর আসে সাহিত্যের কথা। পাশ্চাত্যে যুদ্ধ সম্পর্কে লেখা বিপুল পরিমান সাহিত্য সম্ভার রয়েছে। পাশ্চাত্যের আইন ও

নীতিশাস্ত্রকারগণও যুদ্ধ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন এবং এর সকল দিক পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু এসব মনীষীর রচনাসমূহ সামাজিক চিন্তাধারার বিকাশ ও পুনর্গঠনে যত প্রভাবই বিস্তার করুক এবং সমাজের আইন কানুন প্রণয়নে তাদের ধ্যান–ধারণা যত বড় অবদানই রাখুক, তারা এমন কোন ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী নন যার ভিত্তিতে তাদেরকে মানব সমাজের জন্য আইন রচনার বৈধ কর্তৃত্বের মালিক বলে অভিহিত করা চলে। বস্তুতঃ পৃথিবীর কোন বড় গ্রন্থকারের কোন কথা তার জাতির জন্য আইনের মর্যাদা লাভ করেনি। তার কোন কথায় প্রভাবিত হয়ে তার জাতি কিছু সংখ্যক আইন রচনা করে নেবে এটা সম্ভব। কিন্তু সেই আইনসমূহ অমুক গ্রন্থকারের উক্তি বলে জনগণের জন্য অবশ্য পালনীয় হতে পারে না––অবশ্য পালনীয় হতে পারে শুধু এ জন্য যে, খোদ জনগণ তার উক্তি বা উক্তিসমূহকে নিজেদের জন্য আইনরূপে গ্রহণ করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ সংক্রান্ত পাশ্চাত্য লেখকদের বিপুল রচনাসম্ভারও আমাদের জন্য ফলদায়ক নয়। এরপর থেকে যাচ্ছে তৃতীয় উৎসটি––যা থেকে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সমরপদ্ধতি জানতে পারি। এ উৎসটি হলো পশ্চিমা জাতিসমূহের পারস্পরিক আচরণ–পদ্ধতি। এই আচরণ–পদ্ধতি দু'রকমের। একটি লিখিত,যাকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। দ্বিতীয়টি অলিখিত, যা আন্তরাষ্ট্রীয় আচার–ব্যবহার, লেনদেন ও বাস্তব রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। এই দুই ধরনের আইনের মধ্যে কোন্‌টির ওপর নির্ভর করতে হবে, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ওপর কোন্‌টি অধিক কর্তৃত্বশালী––এসব প্রশ্নের জবাবে স্বয়ং পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মধ্যেই মতানৈক্য রয়েছে। এসব প্রশ্নের সমাধান আজও হয়নি। কিন্তু আমাদের এই নীতিগত বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্যাবলীর বিভিন্ন দিক স্বাভাবিক ভাবেই উপরোক্ত দুই ধরনের আইনের আওতায় বিভক্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধের নৈতিক দিক সম্পূর্ণরূপে চলে গেছে অলিখিত আইনের আওতায়। আর বাস্তব দিক এসে গেছে লিখিত আইনের কর্তৃত্বাধীনে। এজন্য আমরা অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি বাদ দিয়ে উভয় আইনের নৈতিক ও বাস্তব দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

১––যুদ্ধের নৈতিক দিক

যুদ্ধ সমস্যার তত্ত্বানুসন্ধানে এ যাবত আমরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে এসেছি, সে হিসেবে যুদ্ধের নৈতিক দিকটা প্রথমে আলোচনা করতে হয়।

সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে, পাশ্চাত্য সভ্যতা যুদ্ধকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? তার নৈতিক বিধানে যুদ্ধের অবস্থান কোথায়? যুদ্ধকে সে কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে বৈধ এবং কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে অবৈধ মনে করে? এ ক্ষেত্রে তার যদি কোন উচ্চতর ও পবিত্রতর লক্ষ্য থেকে থাকে তবে সেটা কি? আর যদি তা না থাকে তবে নৈতিকতা ও সভ্যতার জগতে তার অবস্থান কোথায়? এসব প্রশ্নের সমাধান করার পরই সমরপদ্ধতি সংক্রান্ত আইন শুদ্ধ না অশুদ্ধ, ভুল না নির্ভুল, সে ব্যপারে আলোচনা হতে পারে।

উপরোক্ত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে পাশ্চাত্যের লিখিত আইন সম্পূর্ণ নীরব। প্রাথমিক যুগে নৈতিকতার প্রশ্ন আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে একটি সংশ্লিষ্ট (Relevant) প্রশ্ন বলে বিবেচিত হতো। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায় আন্তর্জাতিক আইনের প্রথম রচয়িতা গ্রোটিয়াস (Grotiws) তাঁর 'ডিজিউর বেলিয়াক পেসিস' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের ন্যায় ও অন্যায় উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক আইনে এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর, অসংলগ্ন ও আলোচনা বহির্ভুত বলে রায় দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক লরেন্স "আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতি" নামক গন্থে লিখেছেনঃ

"আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন নৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। এ গুলো সম্পর্কে সে কোন বক্তব্য রাখেনা, এ সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। তার দৃষ্টিতে যুদ্ধ ন্যায় সঙ্গত হোক বা না হোক, বৈধ হোক কিংবা অবৈধ হোক–সর্বাবস্থায়ই তা দু'পক্ষের সম্পর্ককে বিবিধ পদ্ধতিতে ও বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে দেয়। এ দিক থেকে আইনের একমাত্র কাজ হলো সম্পর্কের উক্ত পরিবর্তনের সীমা ও আইনানুগ অবস্থাগুলো স্পষ্ট করে দেয়া। আন্তর্জাতিক আইন আমাদেরকে শুধু জানাবে, কিভাবে যুদ্ধমান জাতিদের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, সামরিক লোকেরা পরস্পরের প্রতি এবং নিরপেক্ষ লোকদের প্রতি কিরূপ দায়িত্ব বহন করে ও তাদের নিকট কি অধিকার তাদের প্রাপ্য হয়। নৈতিক প্রশ্ন সমূহ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন এবং তা যতই বিবেচ্য হোক ও মনযোগ আকর্ষণ করুক না কেন, আন্তর্জাতিক আইনের পুস্তকে তা তেমনি অবান্তর যেমন–অসংলগ্ন ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্কের নৈতিক দিক।" [২৫৪] জনৈক জার্মান আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ এলজ বাচার (Eltzbacher) লিখেছেনঃ

"আন্তর্জাতিক আইন সামরিক কার্যকলাপের ওপর সর্বদাই কেবল সেই ধরণের বিধি নিষেধ আরোপ করে যা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এড়িয়ে মেনে চলা সম্ভব। আন্তর্জাতিক আইন শুধু এ টুকু পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছে যে, যথা সম্ভব প্রতিপক্ষের নিস্প্রয়োজন অনিষ্ট সাধন থেকে বিরত থাকা উচিত। অর্থাৎ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সাধনে কোন রকম সাহায্য করেনা অথবা যুদ্ধের যেটুকু লাভ হয় তার তুলনায় অতিরিক্ত মনে হয় এমন ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।"

অধ্যাপক নিপল্ড লিখেছেন ঃ "যুদ্ধে কোন পাপ সংঘটিত হলো কিনা সেটা আন্তর্জাতিক আইনের ভাববার বিষয় নয়---সেটা নৈতিকতার প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক আইন বৈধ ও অবৈধ যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা। কেননা আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে যুদ্ধ সব সময়ই আইনের প্রতিপক্ষ ও পরিপন্থী।" ২৫৫

এ উদ্ধৃতি থেকে বুঝা গেল যে, লিখিত আইন তথা আন্তর্জাতিক আইনে বৈধ ও অবৈধ এবং ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। পাশ্চাত্য সভ্যতা কি কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধকে বৈধ মনে করে এবং কি কি উদ্দেশ্যে অবৈধ মনে করে, তাও এ আইন থেকে জানা সম্ভব নয়। তবে ডক্টর লাই বলেছেনঃ "একটা অলিখিত আন্তর্জাতিক আইন আছে এবং সেটাই আসল আইন।" কাজেই পাশ্চাত্যের সবচেয়ে অগ্রসর সভ্য জাতিগুলোর যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্মপন্থা কিরূপ, তা আমাদের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। যে সব জাতির কার্যকলাপ আধুনিক সভ্যতার মানদন্ড, যাদের প্রতিটি চলনে বলনে সভ্যতার বিনির্মাণ হয় এবং যাদের কথা ও কাজ ছাড়া অন্য কিছুকে আধুনিক সভ্যতা নামের যোগ্যই মনে করা হয়না, তারা যখন পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে এবং কি ধরনের যুদ্ধকে তাদের ভাষায় সত্য ও ন্যায়ের যুদ্ধ বলা হয়, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। এ জন্য উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সভ্য ও (পাশ্চাত্যের ভাষায়) অসভ্য জাতি সমূহের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ছোট ছোট যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না। কেননা সে সব সংঘর্ষকে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বা নমূনা বলতে পারিনা। ও সব ছোট খাট যুদ্ধ বাদ দিয়ে আমরা কেবল বিংশ শতাব্দীর সেই মহা যুদ্ধের পর্যালোচনা করতে চাই যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিশানবাহী সব কয়টি দেশ যোগদান করেছিল। ২৫৬

অন্য এক কথায় বলা যায়, যার কার্যনির্বাহী কমিটিতে আধুনিক বিশ্বের সব কটি সুসভ্য দেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এই মহাযুদ্ধের কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ করলেই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখে বৈধ যুদ্ধের পার্থক্যের নৈতিক মানদন্ড কি তা জানতে পারি।

প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ

১৯১৪–১৮ সালের মহাযুদ্ধ মূলত ইউরোপের ছয়টি বড় বড় দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। পরে অবশ্য অন্যান্য ছোট ছোট জাতিও তাতে জড়িয়ে পড়ে। এর একটা পক্ষ ছিল জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া। অপর পক্ষ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইটালী। এই দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী জোট যে কয়টি জাতি নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে তীব্র পুরানো শত্রুতা বিরাজমান ছিল। ইংল্যান্ড ছিল ফ্রান্সের প্রাচীন শত্রু। ১৮৯৯ সালে তাদের মধ্যে সুদান সমস্যা নিয়ে যুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যেও ছিল প্রবল প্রতিহিংসা। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত রাশিয়া ভারত বর্ষে আক্রমণ চালাতে পারে এই আশংকায় বৃটিশ সাম্রাজ্য সর্বক্ষণ যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে প্রহর গুনতো। ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে তিউনিস সমস্যা নিয়ে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে শত্রুতা ছিল। এ জন্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত ইটালী জার্মানীর সাথে মৈত্রী বহাল রেখেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের মধ্যে কতিপয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ঘনিষ্টতা জন্মে। ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং অপর জোটের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অপর দিকে জার্মানী ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের মিত্র ছিল। ইটালীর সাথে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তার মৈত্রী সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। রাশিয়াও ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ইটালীর বন্ধু ছিল। এমনকি যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত জার ও সিজারের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অন্য কয়েকটি স্বার্থ এই বন্ধুত্বকে শত্রুতায় রূপান্তরিত করে। যে অষ্ট্রিয়া দীর্ঘ দিন পর্যন্ত জার্মানীর শত্রু ছিল, সেই অষ্ট্রিয়ার সাথে কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে জার্মানীকে আপন বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলো।

জাতি সমূহের জোটবদ্ধতা

এই বিশেষ স্বার্থ কি ছিল? সকলেই যখন খৃষ্টান, তখন ধর্মীয় বিরোধের প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে না। দেশরক্ষারও প্রশ্ন ছিল না। কেননা কেউ কারো ওপর হামলা চালায় নি। অধিকারেরও সমস্যা দেখা দেয়নি। কেননা প্রত্যেকেই নিজ

নিজ জাতীয় অধিকার নির্বিঘ্নে ভোগ করছিল। তাহলে কিসের জন্য তারা পরস্পরের রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ হলো? ইতিহাস পড়লে জানা যায়, প্রত্যেক জাতি নিজের ন্যায্য প্রাপ্যের চেয়ে কিছু বেশী সুবিধা ভোগ করেতে চেয়ে ছিল এবং প্রত্যেক জোটেরই আকাংক্ষা ছিল, অপর জোটকে পরাজিত কিংবা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তার সুবিধাগুলো নিজেই করায়ত্ব করবে। একমাত্র এটাই ছিল যুদ্ধেরকারণ।

তাদের মধ্যে প্রথম শত্রুতার বীজ বপিত হয় ১৮৭০ সালে যখন জার্মানী ফ্রান্সের কাছ থেকে এলিস ও লোরিন অঞ্চল দু'টি ছিনিয়ে নেয়। যদিও এলিসের সমগ্র অধিবাসীই ছিল জার্মান বংশোদ্ভুত এবং লোরিনের জনসংখ্যারও একটি বিরাট অংশ ভাষার দিক থেকে জার্মান ছিল তবুও ফ্রান্স তার ভুখন্ড জার্মানী কর্তৃক কেড়ে নেয়ায় ক্ষুদ্ধ হয় এবং একে নিজের জাতীয় ক্ষতি বলে গ্রহণ করে। তখন থেকেই ফরাসী রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় জার্মানীকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ঐ দুটো প্রদেশ পুনরায় দখল করা।

এরপর জার্মানীর শিল্প ও বাণিজ্যের অভাবনীয় উন্নতি শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে শেষ অবধি সে পৃথিবীর এক বিরাট শিল্প বাণিজ্য সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সে ভেবে দেখলো, নৌ–বাণিজ্যের সকল উপায় উপকরণ বৃটেনের করতলগত এবং তার এই আধিপত্য এক বিরাট নৌবহর গঠন করা ছাড়া খতম করা সম্ভব নয়। এ জন্য সে দ্রুত নিজের নৌ–শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চালাতে আরম্ভ করে। এই ঘনায়মান বিপদটি অনুধাবন করতে ইংল্যান্ডের একটুও বেগ পেতে হলো না। প্রথমে সে জার্মানীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা চালালো। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মিঃ চেম্বারলেন, লর্ড লেন্সডাউন ও অন্যান্য বৃটিশ কুটনীতিকগণ তার সাথে ঘন ঘন দেন দরবার চালাতে থাকে। কিন্তু জার্মানী বৃটেনের নৌ ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলনা। সে নিজেই বিশ্ব বানিজ্যে শ্রেষ্ঠতম আসন লাভ করবে এই ছিল তার স্বপ্ন। এ জন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর বন্ধুত্ব সম্ভবপর হলো না। বিশ্ব রাজনীতিতে আকস্মিকভাবে এক বিপ্লব দেখা দিল। ১৯০৪ সালে শত শত বছরের দুশমন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যখন মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলো তখন ঐ বিপ্লবের প্রথম প্রকাশ ঘটলো। ফ্রান্স মিসরে বৃটিশ দখলদারীর স্বীকৃত দিল। বৃটেনও মরক্কোতে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন সমর্থন করলো। ধীরে ধীরে

উভয় দেশ ভবিষ্যতের জন্য আপন আপন স্বার্থের ব্যাপারে এক গভীর আঁতাত গড়ে তুললো।

এরপর ১৯০৭ সালে রাশিয়াও ঐ আতাঁতের অন্তর্ভুক্ত হলো। তার ছিল দুটো বড় বড় স্বার্থ। দানিয়েল ও বাসফোরাস উপত্যকা দখল করার জন্য সে পূর্ণ দেড়শো বছর ধরে চেষ্টা করে আসছিল। এবার সেই সাধ সে পূর্ণ করতে চাইছিল। দ্বিতীয়তঃ সে বলকান উপদ্বীপ দখল করে এজিয়ান সাগর ও ভুমধ্য সাগরে প্রবেশের পথ পেতে চাইছিল। এই উভয় স্বার্থের ব্যাপারে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া তার বিরোধী ছিল। জার্মানীর উদ্দেশ্য ছিল বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণ করে নিজের প্রাচ্য বাণিজ্যের পথ খোলাসা করা। এ জন্য সে চাইছিল তুরস্ক ও বলকান রুশ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকুক। অপর দিকে অষ্ট্রিয়ার আপন রাষ্ট্রসীমা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লোভ চরিতার্থ করার জন্য বলকান উপদ্বীপ দখল করে এজিয়ান ও এড্রিয়াটিকের বন্দরগুলোর বুকে সুবিধা ভোগ করার অন্য কোন বিকল্প ছিলনা। এ জন্য সে ১৯০৮ সালে বাসুনিয়া ও হরজিগভিনাকে যথারীতি আপন রাষ্ট্রীয় সীমার সাথে সংযুক্ত করে নেয়। ১৯০৭ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড রাশিয়ার রাজনৈতিক স্বার্থের বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু সে যখন বুঝতে পারলো তখন সে তার যুগ যুগ কালের শত্রুর প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল এবং তাকে আশ্বস্ত করলো যে, উপযুক্ত সময়ে সে তাকে বাসফোরাস ও দানিয়াল দখল করতে সাহায্য করবে।

ক্রমে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত দুটো বিরাট জোট গড়ে উঠলো। একটি জোটে ছিল ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও রাশিয়া। অপর জোটে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া। প্রথমোক্ত দেশগুলোর ঐক্যসুত্র ছিল আপন আপন রাজ্যসীমা সম্প্রসারন করা এবং আপন বাণিজ্যিক প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার প্রতিকুল শক্তিকে প্রতিহত করার দুর্দম বাসনা। আর অপর জোটটির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল আপন আপন রাজ্যের সম্প্রসারণ ও বিশ্বের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনে। এই জোট বন্ধনে ইটালী তখনো পুরোপুরি শরীক হয়নি। বাহ্যত সে জার্মানীর সাথে একটা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে কিভাবে জার্মান মিত্রকে ছেড়ে ফরাসী শত্রুকে বুকে টেনে নিল? সে এক আজব কাহিনী। ইটালী পাঁচটি দেশের সাথেই এমনভাবে সম্পর্ক ও চুক্তি বজায় রেখেছিল যে, তিউনিসের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যদি ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়

তাহলে যেন জার্মানীর কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারে। আর যখন অষ্ট্রিয়ার কতিপয় এলাকা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য (যার ওপর অনেক দিন ধরে ইটালীর শ্যেন দৃষ্টি ছিল) যুদ্ধ করার প্রয়োজন হবে তখন যেন মিত্র শক্তির সাহায্য লাভ করতে পারে। মহাযুদ্ধের সূচনাপর্বে সে যখন দেখলো যে, ইংল্যান্ডের বিশাল নৌশক্তি ফ্রান্সের সাথে ঐক্যবদ্ধ এবং সে বুঝতে পারলো যে, অতবড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে ফ্রান্সের কাছ থেকে তিউনিস দখল করার ব্যাপারে জার্মানী তার কোন কাজে আসবে না তখন সে হঠাৎ মিত্র শক্তির দলে ভিড়ে পড়লো এবং সাধুবেশ ধারণ করে বলতে লাগলো, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়াকে আমরা অন্যায়ের পক্ষপাতী মনে করি, কাজেই তার পক্ষ সমর্থন করতে পারি না।

যুদ্ধের সূচনা

১৯১৪ সালের জুন মাসে যখন অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ জনৈক সার্ভিয় সন্ত্রাসবাদীর হাতে প্রাণ দিলেন, তখন বিগত ৪৪ বছর ধরে যে নারকীয় বীভৎসতা বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত হচ্ছিল, তা সহসা আগ্নেয়গিরির মতো প্রচন্ড জোরে বিস্ফোরিত হলো। অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়ারূপ পথের কাঁটাকে সরানোর সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেল। কেননা বলকানের দিকে অগ্রসর হবার পথে সার্ভিয়াই ছিল বাধা। জার্মানীও নিজের বাণিজ্যিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সার্ভিয়াকে পদানত করা প্রয়োজন মনে করতো। তাই সেও অষ্ট্রিয়াকে সমর্থন করতে লাগলো। অপরদিকে রাশিয়া সার্ভিয়াকে নিজের "ছোট ভাই" মনে করতো এবং বলকানে তার সমস্ত আশা ভরসা তারই ওপর নির্ভরশীল ছিল। তা ছাড়া সে নিশ্চিত বুঝতে পারলো যে, অষ্ট্রিয়া যদি সার্ভিয়াকে পদানত করতে সক্ষম হয় তাহলে বলকানে তার আধিপত্য বিস্তারকে কোন প্রকারেই ঠেকানো যাবে না। এ জন্য সে তার ছোট ভাই এর পক্ষ নিল। ওদিকে ফ্রান্স ভেবে দেখলো যে, রাশিয়া ও সার্ভিয়াকে পরাজিত করতে পারলে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার শক্তি এত বেড়ে যাবে, এলসিস ও লোরিণকে ফেরত পাওয়া তো দূরের কথা, প্যারিস দখলে রাখাই কঠিন হয়ে যাবে। এ জন্য সেও রাশিয়াকে সমর্থন করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। এরূপ মিত্রজোট গঠিত হওয়ার পর ইংল্যান্ডের পক্ষে আর আলাদা থাকা সম্ভব ছিলনা। এই "সত্যপন্থী" দেশটি এমন কতগুলো নৈতিক দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে রেখেছিল যেগুলো পালন করার জন্য জার্মানীর ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ থেকে তার একচ্ছত্র নৌ আধিপত্য

ও বাণিজ্যিক প্রাধান্যকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এ জন্য সেও অস্ত্র ধারণ করলো। এভাবে পৃথিবীতে সভ্য জাতি সমূহের এমন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো যার সামনে পূর্ববর্তী অসভ্য জাতিগুলোর যুদ্ধ বিগ্রহ ম্লান হয়ে গেল।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক জাতি দাবী করেছিল যে, সে তার পবিত্র অধিকার সংরক্ষনের জন্য যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছে। শুধু নিজেদের অধিকার রক্ষা করাও নয়––বরং দুনিয়ার অন্যান্য দুর্বল জাতিদেরকে তাদের বহু আকাংখিত 'স্বাধীনতা' আদায় করিয়ে দেয়া এবং অত্যাচারী ও হঠকারী শক্তিগুলোকে অবদমিত করে পৃথিবীতে সত্য, ইনসাফ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করাই তাদের লক্ষ্য বলে তারা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে ও যুদ্ধাবসানের পর এই 'সত্যপন্থীরা" যেভাবে দেশ ও জাতিসমুহের সাথে লেন দেন করে এবং সাম্রাজ্য ও অঞ্চল সমূহের ভাগবাটোয়ারা যেরূপ ব্যাপক ভিত্তিতে করে, তা দেখেই বুঝা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় 'ন্যায় ও সত্য" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য কি।

১৯১৭ সালে অষ্ট্রিয়া–হাঙ্গেরীর সম্রাট কার্ল তার সঙ্গীদের থেকে পৃথক হয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর সাথে পৃথক সন্ধি করার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বার্বোনের যুবরাজ সিক্সটের (PRINCE SIXTE OF BOURON) মাধ্যমে মিত্র শক্তির সাথে আলাপ–আলোচনা শুরু করেন। এই আলাপ আলোচনার পূর্ণ বিবরণ যুবরাজ স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা পরে AUSTRIA'S PEACE OFFER 'অষ্ট্রিয়ার শান্তি প্রস্তাব' নামে প্রকাশিত হয়। আলাপ–আলোচনার এই বিবরণ পাঠ করলে বিশ্বের দেশ ও জাতি সমূহকে নিয়ে কি ধরনের বিকিকিনির কারবার চলেছিল তা জানা যায়। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ইটালীকে এই আশ্বাস দিয়ে যুদ্ধে ভিড়িয়েছিল যে, অষ্ট্রিয়ার দক্ষিণাঞ্চল তাকে দেয়া হবে। এই বাটোয়ারার কারণে ইটালী অষ্ট্রিয়ার সাথে পৃথক সন্ধি করার বিরোধিতা করে। ফ্রান্স বিশেষভাবে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল। সেজন্য সে সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ইটালীকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করলো। কিন্তু ইটালী এর বিরুদ্ধে এমন বেঁকে বসলো যে, মিত্র শক্তির সদস্যরা পর্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠলো যে, ইটালী

'সত্য' পক্ষ ছেড়ে 'বাতিল' (অর্থাৎ জার্মানী) পক্ষ গ্রহণ করে না বসে। সে সময় লন্ডনে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এম, পল কামবুঁ। যুবরাজ সিক্সটের সাথে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেনঃ

"ইটালীর লোভ এত বেশী যে, সে তজ্জন্য যে কোন অপকর্ম করে বসতে পারে।"২৫৭

অপর এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেনঃ

"ইটালী বারবার ঘোষণা করেছে যে, শুধুমাত্র অষ্ট্রিয়া থেকে যে কয়টি এলাকা সে দখল করতে উদগ্রীব, সেগুলো দখল করার উদ্দেশ্যেই সে যুদ্ধে নেমেছে।"২৫৮

পল কামবুঁর ভাই এম ঝুল কামবুঁ যিনি প্রথমে বার্লিনে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন––এই আলাপ–আলোচনার বিরোধিতা করে যুক্তি দেখান যেঃ

"অষ্ট্রিয়ার সাথে যদি সন্ধি করা হয় তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে, সন্ধিপত্রে সই করার ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই ইটালী জার্মানীর সাথে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধহবে।"২৫৯

অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

"ইটালী আমাদের কোন কাজে আসবেনা। সে শুধু একটা আশাই পোষণ করছে। যুদ্ধের পর তার অন্য সকল মিত্র যখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়বে তখন সে অর্থনৈতিক সংগ্রামে অন্যদেরকে পেছনে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করবে।"২৬০

এ উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, "সত্য ও ন্যায়ের পূজারী"দের উদ্দেশ্য কি ছিল। আর যারা একত্রে মিলিত হয়ে "সত্য ও ন্যায়ের" জন্য যুদ্ধ করছিল তাদের পরস্পর সম্পর্কে পরস্পরের মতামতই বা কি ছিল। শেষ পর্যন্ত যখন এটা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, ইটালী কোনক্রমেই নিজ এলাকা সম্প্রসারণের ইচ্ছা ত্যাগ করে অষ্ট্রিয়ার সাথে সন্ধি করতে প্রস্তুত নয় তখন তার "সত্য সেবী" মিত্ররা অষ্ট্রিয়াকে বললো, তুমি ইটালীর ইপ্সিত ভুখন্ডসমূহ তাকে দিয়ে দাও। তার বদলে আমরা সিলিশিয়া ও বোয়েরিয়া অঞ্চল জার্মানীর কাছ থেকে ছিনিয়ে তোমাকে দিয়ে দেব। এটা সবার জানা যে, এই দুটো এলাকাতেই নির্ভেজাল জার্মান বংশোদ্ভুত লোকের বাস এবং তা জার্মানীর জাতীয় ভু–

খন্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু "সত্যসেবী" মিত্রশক্তি ঐ এলাকা এমনভাবে অষ্ট্রিয়াকে দিতে চাইল যেন তা তাদের নিজস্ব ভুখন্ড। মজার ব্যাপার এই যে, অষ্ট্রিয়াও আপন বন্ধু জার্মানীর ভু-খন্ড বলে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়নি---অস্বীকৃতি জানিয়েছে শুধু এই অজুহাতে যে, তা বর্তমানে ফ্রান্সের দখলে নেই এবং তা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে দিতে সক্ষম কি সক্ষম নয়, সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। অতঃপর অষ্ট্রিয়ার ক্ষতি পূরণের জন্য অন্যান্য কতিপয় ভু--খন্ড নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হলো। প্রথমে ত্রিপোলীর ওপর দৃষ্টি দেয়া হলো। কিন্তু ইটালী তা ছাড়তে রাজী হলো না। কেননা সে প্রাচীন রোম সামাজ্য পুনঃপ্রতষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিল। সে জন্য কার্থেজের সমগ্র উত্তরাধিকার তার প্রয়োজন ছিল। অতপর ইরিত্রিয়া ও সোমালীল্যান্ডের কথা ভাবা হলো। ইটালী এই দুটো ভুখন্ডের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিল না। আর অষ্ট্রিয়াও তা গ্রহণে সম্মত ছিল। কিন্তু নানা কারণে এ লেন--দেনও সফল হলো না। ইটালীর লোভের পরিণতিতে মিত্রশক্তির সাথে অষ্ট্রিয়ার চুক্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল। ২৬১

গোপন চুক্তি

যুদ্ধ চলাকালে মিত্র রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে যে গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেটা এই 'বিকিকিনির' একটি ভিন্ন অধ্যায়। যুদ্ধ চলাকালে রাশিয়ায় যদি বিপ্লব সংঘটিত না হতো তাহলে আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তির এই লোমহর্ষক পরিকল্পনা হয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যেত। ১৯১৭ সালে যখন জারের সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলো এবং বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করলো তখন তারা পুঁজিবাদীদের মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য জার সরকারের গুপ্তভান্ডার থেকে উদ্ধার করা গোপন চুক্তিসমূহ ফাঁস করে দিল। ফলে এই 'সভ্য' জাতিগুলির জঘন্য কুটনীতি সহসা সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়লো। এই সব গোপন চুক্তিতে এমন একটি ধারাও ছিল না যাতে শত্রুপক্ষীয় দেশের কোন না কোন অঞ্চল অথবা তাদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের কোন না কোন উৎসকে 'সত্যসেবী' বলে কথিত বিজয়ী দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি।

প্রথমে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, এলসিস ও লোরিনকে ফ্রান্সের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হবে। অথচ এই উভয় অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী জার্মান

বংশোদ্ভুত। ভৌগলিক দিক দিয়ে এই এলাকা দুটির সম্পর্ক ফ্রান্সের চেয়ে জার্মানীর সাথেই অধিকতর ঘনিষ্ঠ। কিন্তু যেহেতু ঐ এলাকাদ্বয় ১৮৭০ সালের পূর্বে ফ্রান্সের সাথে সংযুক্ত ছিল কেবলমাত্র এই যুক্তির ভিত্তিতেই তা ফ্রান্সকে দেয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত করা হয় যে, রাইন নদীর পশ্চিম তীরে জার্মানীর যত ভু–খন্ড রয়েছে–সমস্ত ফ্রান্সকে দেয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত ফ্রান্স ও রাশিয়া তাদের মিত্র বৃটেনকেও জানতে দেয়নি। যুদ্ধাবসানে যখন সন্ধি বৈঠকে গণিমাতের মালের ভাগবাটোয়ারা শুরু হল কেবল তখন এটা জানা যায়। তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, মরক্কো এ যাবত ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল, তাকে ফ্রান্সের অধিকৃত ভু–খন্ড বলে স্বীকৃতি দেয়া হবে। আফ্রিকাস্থ জার্মানীর সমস্ত অধিকৃত এলাকাও ফ্রান্সের প্রাপ্য হবে এবং তুরস্কের অংশ থেকে তাকে উল্লেখযোগ্য ভু–খন্ড দেয়া হবে।

ফ্রান্সকে এরূপ অংশ দেয়ার পর ইটালীকেও তৃপ্ত করার প্রযোজন দেখা দেয়। কেননা সে নিছক 'সত্যের' তাগিদে 'বাতিল' সঙ্গ ত্যাগ করে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তার জন্য ট্রিটনিনো, তিরিস্তা ও দক্ষিণ তিরোল অঞ্চল নির্ধারিত হলো। এড্রিয়াটিক সাগরের সমস্ত উপকুল ও দ্বীপাঞ্চলও তার ভাগে পড়লো। তুরস্কের অধিকৃত অঞ্চল থেকেও তাকে বেশ খানিকটা জায়গা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো।

রাশিয়ার জার সরকার 'সত্যের' সবচেয়ে বড় সেবক ছিল। সুতরাং তার 'সত্য সেবার' উপযুক্ত প্রতিদান তাকে কেমন করে না দিয়ে পারা যায়? তার সাথে প্রথম আপোশ রফা হলো পোল্যান্ডকে নিয়ে। এই আপোশের মোদ্দা কথা এই যে, পোলিশ জাতির স্বাধীনতার আকাংক্ষা নস্যাৎ করার জন্য রাশিয়ার যে কোন সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় ব্যঁবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকার করা হলো। অথচ যুদ্ধের শুরুতে এই পোল্যান্ডকেই স্বাধীনতার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। আর যুদ্ধাবসানের পর কেবল বলশেভিকদের পীড়াপীড়ির দরুণ পুনরায় ফ্রান্স অতপর বৃটিশ তার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করলো। দ্বিতীয় চুক্তিনামা ছিল কনষ্টান্টিনোপল সংক্রান্ত। যুদ্ধ শুরুর ছয় মাস আগে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই রাশিয়ার রাজকীয় সংসদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন দানিয়াল ও বাসফোরাস এলাকা দখল করতে আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। অতপর যখন মহাযুদ্ধ শুরু হলো, তখন রাশিয়া সর্বপ্রথম তার এই "নৈতিক দায়িত্ব " পালন করার তাগিদ অনুভব করলো।

১৯১৫ সালের গোপন চুক্তিনামায় সে আপন মিত্রদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলো যে, যুদ্ধের গণিমাত হিসেবে দানিয়াল ও বাসফোরাস প্রণালী, কনষ্টান্টিনোপল ও এশিয়া মাইনরের পূর্বাংশ তাকে দেয়া হবে। ১৯২২ সালে জনৈক রুশ ঐতিহাসিক ব্যরণ কারফু (Barron S. A. Karff) লিখেছেনঃ

" এই গোপন চুক্তির আলোকে সমগ্র ওসমানী সাম্রাজ্য, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর যুদ্ধের গণিমাত সাব্যস্ত হয় এবং তা বিজয়ী মিত্র দেশসমূহের মধ্যে বন্টন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই ভাগ–বাটোয়ারায় কনষ্টান্টিনোপল, দানিয়াল ও বাসফোরাস প্রণালী রাশিয়াকে দেয়া হয়।"

এরপর বাকী রইল 'সত্যসেবী"দের মোড়ল বৃটেনের কথা। সে কিন্তু নিজের জন্য জার্মানীর আফ্রিকা ও এশিয়াস্থ উপনিবেশগুলোকে যথেষ্ট মনে করতে পারেলো না। সে যথাযোগ্য সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এক নতুন ক্ষেত্র তৈরী করলো। তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পাঁচ মাস পর ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে বৃটেন ফ্রান্সের সাথে একটা প্রাথমিক গোপন চুক্তি সম্পাদন করে। এতে আরব বিশ্বকে দুটো অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। একটা সিরীয় এলাকা, অপরটি ইরাকী এলাকা। প্রথমোক্ত এলাকাকে ফরাসী প্রভাবাধীন বলে স্বীকার করা হয়। আর দ্বিতীয় এলাকার ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আরবদের সহযোগীতা ছাড়া এই বাটোয়ারাকে কার্যে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে নিজেরদের মাতৃভুমির এরূপ বাটোয়ারার কথা জেনে–শুনে শত্রুর সহায়তা করা আরবদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এজন্য তাদের সাথে এরূপ শঠতার আশ্রয় নেয়া হলো যে, বাটোয়ারার প্রাথমিক চুক্তি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হলো। অতপর আরব নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করে তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হলো যে, তারা যদি মিত্র শক্তির সাথে মিলিত হয়ে আরব জগতের সর্বত্র তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় তাহলে তার বিনিময়ে একমাত্র দক্ষিণ ইরাক ও লেবাননের উপকুলবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমস্ত আরব দেশের সমবায়ে একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই স্বাধীনতার রঙ্গীন স্বপ্ন আরবদের মধ্যে সহসা এক নতুন প্রেরনার জন্ম দেয়। ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে (অর্থাৎ বৃটেন ও ফ্রান্সের গোপন চুক্তির ৯ মাস পর) আরবরা স্যার হেনরী ম্যাকমোহনের মাধ্যমে মিত্র পক্ষের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং চুক্তি অনুসারে অতঃপর সমগ্র আরব বিশ্ব মিত্র পক্ষের সহযোগিতে পরিণত

হয়। এই সহযোগিতার বিনিময়ে তাদেরকে একটি কাগজে প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো যে, যুদ্ধ শেষে আরব দেশসমুহ নিয়ে একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই চুক্তির পরই ১৯১৬ সালের জুন মাসে মক্কা শরীফ তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ক্রমে ইরাক, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কয়েক মাসের মধ্যেই এটা নিশ্চিত হয়ে উঠলো যে, আরব জগতে আর তুর্কী সাম্রাজ্য টিকতে পারবে না এবং বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই। তাই ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে উভয় সাম্রাজ্যের (ফ্রান্স ও বৃটেন) মধ্যে পুনরায় আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। অতপর সাইক্‌স পিকো চুক্তি নামে আর একটি গোপন চুক্তি সম্পাদিত হলো। এ চুক্তিতে স্থির করা হলো যে, ইরাক পুরাপুরি বৃটেনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সমগ্র সিরিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত থাকবে। প্যালেষ্টাইন হবে একটা আন্তর্জাতিক এলাকা এবং হাইফার সমগ্র এলাকাটি পোতাশ্রয়াসহ বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আর ইরাক ও সিরিয়া উপকুলের মধ্যবর্তী এলাকায় যে সব দেশ অবস্থিত তাদেরকে দুটো গ্রুপে বিভক্ত করা হবে। একটা হবে বৃটিশ প্রভাবাধীন, অপরটি ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রাণাধীন। এই চুক্তিতে ইংরেজ প্রতিনিধি স্যার মার্ক সাইক্‌স্ ইরাকের মোসুলকে ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কেননা ইতিপূর্বে ১৯১৫ সালের একটা গোপন চুক্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, আরমেনিয়া, পূর্বকুর্দিস্তান, মোসুল সীমান্ত সংলগ্ন তুর্কী ভূ–খন্ডসমূহ রাশিয়াকে দেয়া হবে। কিন্তু বৃটিশ রাজনীতির অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, তার সীমান্তের সাথে রুশ সীমান্ত মিলিত হোক তা সে চায় না। তাই সে রুশ প্রতিবেশীত্বের সম্ভাব্য রাজনৈতিক কুফল থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে বৃটিশ ও রুশ এলাকার মাঝখানে একটা ফরাসী এলাকাকে আড় করে দেয়ার ব্যবস্থা করা সঙ্গত মনে করলো। কিন্তু তেল সমৃদ্ধ মোসুলের ওপর বৃটিশ আগেই থাবা বিস্তার করে রেখেছিল। তাই রাশিয়ার বিপদ সরে যেতেই ফ্রান্সের বন্ধুত্বের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শেষ পর্যন্ত সে মোসুলকে করতলগত করেই ছাড়লো।

যুদ্ধের পর দেশ বন্টন

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল, পাশ্চাত্যের স্বকথিত "সত্যসেবী" জাতিগুলো কি ধরনের উদ্দেশ্য পরিকল্পনা নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। এবার আমরা দেখবো যুদ্ধের পর তারা কিরূপ 'সত্যনিষ্ঠার' পরিচয় দিতে পেরেছে।

যুদ্ধের শেষের দিকে দুটো ঘটনা ঘটে যা ১৯১৫ ও ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে গোপন চুক্তিসমূহের মধ্য দিয়ে যে মানচিত্র তৈরী হয়েছিল তাতে বেশ কিছুটা রদবদল ঘটায়। এর একটি ঘটনা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাসমরে যোগদান এবং অপরটি রাশিয়ার বিপ্লব। আমেরিকার পুরানো নীতি ছিল ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে মাথা গলাবে না। কিন্তু সে নীতি বিসর্জন দিয়ে সে যুদ্ধে যোগদান করে শুধু এ জন্য যে, নিজের বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্য সে শান্তি চায়। তার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল এই যে, যুদ্ধের পর গণিমাত বন্টনে যেন এমন কোন অবিচার না হতে পারে যা আর একটি যুদ্ধের কারণ হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে রাশিয়া যে রাজতান্ত্রিক সরকারের অধীন যুদ্ধে যোগদান করেছিল ১৯১৭ সালের শেষের দিকে তার ক্ষমতাচ্যুতির পর সেখানে বলশেভিক দল ক্ষমতা লাভ করে। এই নতুন সরকার ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর স্বার্থের জন্য জার্মানীর চেয়েও ক্ষতিকর ছিল। এ জন্য যুদ্ধের গণীমাতে রাশিয়ার জন্য যে অংশ নির্ধারিত হয়েছিল তা বাতিল করা হলো। এই "সত্যনিষ্ঠ" মিত্রপক্ষ আবার একটা নতুন মানচিত্র বানাতে বাধ্য হলো। বলাবাহুল্য এ মানচিত্রে আমেরিকার শান্তিকামী মনোভাবের যথাযথ গুরুত্ব দিতে হয়েছিল।

আগে বলেছি যে, ১৯১৭ সালের গোপন চুক্তিতে ফ্রান্স রাশিয়ার সাথে সলাপরামর্শ করে স্থির করেছিল যে, রাইন নদীর পশ্চিম তীরবর্তী সমস্ত ভু-খন্ড জার্মানীর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফ্রান্সকে দেয়া হবে। এই সময়ে যুবরাজ সিক্সটে যখন ফরাসী প্রেসিডেন্ট এম, পুয়াংকারার সামনে রাইন এলাকাকে নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত করার প্রস্তাব উথাপন করেন তখন "সত্যনিষ্ঠ" ফ্রান্সের মহামান্য প্রেসিডেন্ট ঈষৎ হেসে বলেনঃ

"মনের কথা সব সময় প্রকাশ করতে হবে– এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। আসলে আপনি যে রকম ভাবছেন আমিও তাই ভাবছি।।" ২৬২

এ ভাবে ১৮৭০ সালে জার্মানী তার সাথে যে আচরণ করেছিল, ফ্রান্স যুদ্ধের সময়ই জার্মানীর সাথে সেই আচরণন করতে কৃত সংকল্প হয়। কিন্তু ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জানতেন যে, রাইনের উর্বর এলাকার ফ্রান্সের সাথে সংযুক্তি বৃটেন ও আমেরিকা উভয়ের নীতি বিরুদ্ধ, এ জন্য যুদ্ধের সময় ফ্রান্স নিজের এই ইচ্ছা গোপন রাখে। যুদ্ধ শেষে সে যখন সন্ধি সম্মেলনে উক্ত দাবী পেশ করে তখন ইংল্যান্ড ও আমেরিকা উভয়ে উক্ত দাবীর প্রবল বিরোধিতা

করে। সন্ধি সম্মেলনে এ নিয়ে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ও তীব্র বাদানুবাদ হয়। ফ্রান্সের শত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ইংল্যান্ড ও আমেরিকা ফ্রান্সের সাথে উক্ত এলাকার চিরস্থায়ী সংযুক্তিতে সম্মত হয়নি। অবশেষে তৎকালীন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ে ক্লেমেনশো প্রস্তাব রাখেন যে, জার্মানীর ওপর যুদ্ধের যে জরিমানা আরোপ করা হচ্ছে তার জামানত হিসেবে রাইন অঞ্চল ১৫ বছরের জন্য ফরাসী দখলে দেয়া হোক। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য প্রথমে বহু ফরাসী রাজনীতিকই বুঝতে পারেন নি। ফরাসী প্রতিনিধি পরিষদের মার্শাল ফোশ, এম ঝাল কামবুঁ এবং এম আর দিউ প্রমুখ কুটনীতিকগণ এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু ক্লেমেনশো দাঁড়িয়ে বললেন যে, ১৫ বছর সময় নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য এই যে, জার্মানীর কাছ থেকে তার উৎকৃষ্টতম ভুখন্ড ছিনিয়ে নিয়ে তার ওপর এতবড় জরিমানা আরোপ করা হবে যে, সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা দিতেই পারবেনা এবং আমরা ১৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাইন এলাকা চিরতরে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভু–খন্ডের অঙ্গীভুত করে নেব। এতে পরিষদ শান্ত হলো। মসিয়ে ক্লমেনশোর এই ভাষণের একটি অংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এতে তার "সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার" স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। তিনি ফরাসী প্রেসিডেন্ট মঁসিয়ে পুয়াংকারাকে সম্বোধন করে বলেনঃ

"মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। ১৫ বছরের মধ্যে জার্মানী কিছুতেই চুক্তির সকল ধারা বাস্তবায়িত করতে পারবেনা। আমি নিশ্চিত যে, ১৫ বছর পর আপনি যদি আমার কবরে আসেন তবে অবশ্যই আমাকে সুসংবাদ দেবেন যে, আমরা রাইন এলাকায় এখনো অবস্থান করছি এবং ভবিষ্যতেও করবো।"

ক্লেমেনশোর ধুর্তামী সফল হলো। ফ্রান্স তার মিত্রদের কাছ থেকে উক্ত প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়ে নিল। তার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য জার্মানীকে সিলিশিয়ার কয়লা সম্পদ থেকেও বঞ্চিত করা হয়, যাতে সে কোনক্রমেই ১৫ বছরের মধ্যে জরিমানা পরিশোধ করতে না পারে–যা তার ওপর ভার্সাই চুক্তিতে চাপানো হয়েছিল। সেই সাথে ফ্রান্স নতুন দেশ পোল্যান্ডের মানচিত্র এমনভাবে তৈরী করায় যে, পূর্ব প্রুশিয়া প্রূশিয়া সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এতে করে এমন একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে জার্মানী মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে উদ্ধার পাওয়া মাত্রই সর্বপ্রথম

পোল্যান্ডের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ছাড়া ঐ জটিলতার সুরাহা করতে পারবেনা।২৬৩

পুনরায় ১৯২২ সালে ফ্রান্স যখন অনুভব করলো যে, এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও জার্মানী ১৫ বছরের মধ্যে রাইন মুক্ত করে নিতে সক্ষম হবে তখন সে জার্মানীর ওপর আর একটা আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিল। মন্ত্রী সভার অর্থনৈতিক কমিটির সভাপতি মঁসিয়ে দারাইককে রোহার অঞ্চল দখল করা লাভজনক হবে কিনা, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। তিনি দীর্ঘ সময়ব্যাপী চিন্তা গবেষণা করার পর মন্ত্রী সভার সামনে একটি গোপন রিপোর্ট পেশ করেন। এতে তিনি সুপারিশ করেন যে, রোহার এলাকা অস্থায়ী ভাবে দখল করে নেয়া উচিত। এই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৩ সালে ফ্রান্স রোহারে সৈন্য প্রেরণ করে। যে অঞ্চলটির ওপর জার্মানীর গোটা শিল্প এলাকার প্রাণস্পন্দন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করতো তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হলো। মঁসিয়ে দারাইক যে যুক্তির ভিত্তিতে এই সুপারিশ করেছিলেন তা তার নিজেদের ভাষায় শোনা উচিত। তিনি লিখেছিলেনঃ

"১৯১৩ সালে সমগ্র জার্মানীর খনি গুলোতে ১৯১ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপন্ন হয়েছিল। তন্মধ্যে ১১৫ মিলিয়ন টন পাওয়া গিয়েছিল শুধু রোহার থেকে। ১০ মিলিয়ন টন গ্যাস তৈরী করার জন্য এবং ৪৫ মিলিয়ন টন অন্যান্য খনিজদ্রব্য উদ্ধারের কাজে ব্যবহৃত হয়। জার্মানীতে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের মোট পরিমাণ ছিল ৩২ মিলিয়ন টন। তন্মধ্যে ২৫ মিলিয়ন টন কেবল রোহারেই উৎপন্ন হতো। এছাড়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নির্যাস সংগ্রহ করার ফলে রোহারের কারখানাসমূহ থেকে ৫ লাখ টন এমানিয়া সালফেট ও ৪লাখ টন রাল উৎপন্ন হয়। রং তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এই দুটি দ্রব্য থেকেই উৎপন্ন হয়। রং তৈরীর কারখানাও বেশীর ভাগ জার্মানীতেই অবস্থিত। এগুলো এত উৎকৃষ্ট মানের কারখানা যে, সমগ্র পৃথিবীতে এর তুলনা নেই। আতর জাতীয় সুগন্ধী দ্রব্যাদি, ওষুধ, রং, রাল ও রালজাত যাবতীয় দ্রব্যাদি এবং এমোনিয়াম সালফেট জার্মান শিল্প পণ্যের অন্যতম প্রধান অংগ। এ সব কয়টিই কয়লার ওপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের পর এইসব অপরিহার্য জিনিসের জন্য কয়লা লাভের একমাত্র উৎস অবশিষ্ট রয়েছে রোহারে। কেননা যুদ্ধে বার্ষিক ১৮ মিলিয়ান টন কয়লার উৎস সার এলাকা তার হাতছাড়া হয়েছে। এখন রোহার ছাড়া এমন কোন এলাকা নেই যেখান থেকে জার্মানী কয়লা পেতে

পারে। কয়লা ছাড়া অন্যান্য ধাতুর অবস্থাও তথৈবচ। যুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে ১৯ মিলিয়ন টন লোহা উৎপন্ন হতো। এর মধ্যে ৯ মিলিয়ন টন উৎপন্ন হতো কেবল রোহার থেকে। অবশিষ্ট ১০ মিলিয়ান টন উৎপন্ন হতো লোরিন ও সিলিশিয়া থেকে। এই উভয় অঞ্চলই তার হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

এই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রোহার দখল করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর প্রাচুর্যের উপকরণ কেড়ে নিয়ে তাকে ভাতে মারা। ফ্রান্সের শুধু ঐসব উপকরণ হস্তগত করাই উদ্দেশ্য ছিল না। সেই সাথে সে চাইছিল, জার্মানী যুদ্ধের জরিমানা দেয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলুক এবং সেই সুবাদে রাইনের পশ্চিম তীরে তার দখল স্থায়ী হোক।

অপরদিকে ইটালীর ভূমি লিপসা চরিতার্থ করার জন্য তাকে তিরিস্তা ও ট্রানটিনো এলাকা দিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়নি বরং সংখ্যাগুরু জার্মান অধ্যুসিত এলাকা দক্ষিণ তিরোলও তার স্থায়ী দখলে দিয়ে দেয়া হয়। এড্রিয়াটিকের উপকূল ও দ্বীপসমূহ নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে তখনো বাকী। এগুলো গোপন চুক্তির মাধ্যমে যদিও ইটালীকে দেয়া হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধশেষে সার্ভিয়ার একটি নতুন শক্তিরূপে আবির্ভাব হওয়ায় উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হলো। ফলে এড্রিয়াটিকের বন্টন এমনভাবে সম্পন্ন করা হলো যে, তাতে ইটালীর উদ্দেশ্যও সফল হয় না, যুগোশ্লাভিয়ারও না। ফলে উভয় দেশের মধ্যে প্রতিহিংসার বারুদ পুঞ্জিভূত হতে আরম্ভ করেছে। কখন যুদ্ধের আকারে এর বিস্ফোরণ ঘটে তা বলা যায় না।

ইউরোপকে এরূপ ভারসাম্যহীন ভাবে বিভক্ত করার যে বিপদজনক পরিণতি দেখা দিতে পারে তা সে সময় যারা দুনিয়ার ভাগ্যবিধাতা ছিল তারা উপলব্ধি করেছিল। ১৯১৯ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃলয়েড জর্জ সন্ধি কনফারেন্সের কাছে দেয়া এক স্মারক লিপিতে লক্ষ লক্ষ জার্মান নাগরিককে অন্যান্য দেশের নিয়ন্ত্রণে সমর্পণ করার বিরুদ্ধে যে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন তাতে এই উপলব্ধিই প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, এই পদক্ষেপ ইউরোপকে পুনরায় যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেবে। স্মারকলিপিটির নিম্নলিখিত অংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়ঃ

"ইউরোপের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র সাধারণ জনগণ প্রচলিত জীবন পদ্ধতির প্রতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল

দিক দিয়েই বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। সবচেয়ে বড় যে বিপদাশংকা আমি অনুভব করছি তা হলো, জার্মানী আপন ভাগ্যোদ্ধারের জন্য বলশেভিকদের সাথে গাঁটছড়া বেধে বসে কিনা! তরবারীর জোরে যারা সমগ্র বিশ্বকে জয় করে বলশেভিকজমের পদানত করার স্বপ্ন দেখছে, সেই বিপ্লবী উন্মাদদের হাতে জার্মানরা আপন সহায়সম্পদ, বুদ্ধিবৃত্তি ও অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তি সঁপে না দিলেই হয়।"২৬৪

মিঃ লয়েড জর্জ কোন অসহায় সাংবাদিক ছিলেন না। সে সময় যে সন্ধি কনফারেন্স বসেছিল, তিনি ছিলেন তার চতুঃসদস্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে ইউরোপকে ঐ রকম অসমভাবে বিভক্ত হতে নাও দিতে পারতেন। কেননা তিনি তার সম্ভাব্য খারাপ পরিণতি দিব্য চোখেই দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু লোভ–লালসা অথবা তথাকথিত 'সত্যনিষ্ঠা' বা 'সত্যপ্রীতি' যার তাগিদে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন– তাদেরকে আরেকটি যুদ্ধের কারণ ঘটাতে পারে এমন সব কাজ করতেও মারাত্মকভাবে প্ররোচিত করেছিল।

এ ইতিবৃত্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইউরোপে সভ্যতার ধারক বাহকরা কি ধরণের সত্য প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। এবার দেখা যাক, এশিয়ায় 'সত্যের সাধকগণ' যুদ্ধে জয় লাভের পর কি পদক্ষেপ নিয়েছিল। আরব বিশ্বের বিভক্তির প্রশ্নে ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে যে সমঝোতা হয়, সে বিবরণ ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে। সমঝোতা অনুসারে যুদ্ধ চলাকালেই বৃটেন ও ফ্রান্স ইরাক, সিরয়া ও প্যালেষ্টাইনকে ভাগাভাগি করে নেয়। কিন্তু যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরবদেরকে আশ্বাস দেয়া হচ্ছিল যে, আরবদেরকে তুরস্কের স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য এবং তাদের একটা সতন্ত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য এ যুদ্ধ পরিচালিত হবে। ১৯১৭ সালের ১১ই মার্চ যখন জেনারেল টিনলে মাত্ (Maud) সসৈন্যে বাগদাদ প্রবেশ করেন তখন তিনি আরবদের নামে একটি সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তাতে বলা হয়ঃ

"আমরা আপনাদের শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করিনি। আমরা আপনাদের শত্রু নই, আমরা আপনাদের ত্রাণকর্তা হয়ে আপনাদেরকে স্বাধীন করতে এসেছি। বাগদাদের অধিবাসীরা জেনে রাখুন আমরা আপনাদের দেশ শাসন করতে আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের ওলামা ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের দীর্ঘ দিনের আশা পূর্ণ করা। আপনাদের দেশ পুনরায় স্বাধীনতা ও

সার্বভৌমত্ব লাভ করুক এবং এখানে আপনাদের পবিত্র শরীয়ত ও জাতীয় ঐতিহ্য ভিত্তিক আইন কানুন ও শাসনতন্ত্র চালু হোক এটাই আমাদের কামনা।”

যুদ্ধ শেষে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকেও পুনরায় একটা যৌথ ঘোষণা পত্র আরব দেশ সমূহে প্রচার করা হয়। তাতে জোর গলায় দাবী করা হয় যেঃ

“বর্তমান যুদ্ধ কেবলমাত্র জার্মানীর সম্প্রসারণবাদী অভিলাষ থেকে বিশ্ববাসীকে বাঁচানোর জন্য পরিচালিত হয়েছে। ২৬৫ এ যুদ্ধকে প্রাচ্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করার কারণ শুধু এই যে, যে সব দেশ দীর্ঘদিন ধরে তুর্কীদের জুলুম নিপীড়নে পিষ্ট হয়ে আসছে, ফ্রান্স ও বৃটেন তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে ইচ্ছুক। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ সব দেশে নির্ভেজাল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে তা পুরোপুরিভাবে মুক্ত থাকবে।”

এ সব ঘোষণা দেয়া সত্তেও আরবরা যখন দেখলো সিরিয়ার উপকূলে ফরাসী সৈন্যরা উপস্থিত ও কর্তৃত্বশীল, অপরদিকে ইরাক এবং প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ ও স্বৈরাচারী শাসনের থাবা বিস্তৃত, তখন তারা বুঝতে পারলো, বাস্তবিক পক্ষে তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে এবং তুর্কী ও আরবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের ভূ–খন্ড আত্মসাৎ করার জন্যই চক্রান্ত করা হয়েছে। এ জন্য আরবরা ইরাক, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। সিরিয়ার আমীর ফয়সল ইবনে হোসাইনের নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হয়। ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধে গণিমত বন্টন নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়। সাইকস পিকোর চুক্তিতে মসুল অঞ্চল ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তেল আধিক্য দেখে বৃটেন লোভ সামলাতে পারলো না। সে মসুল দখল করে বসলো। অনুরূপভাবে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, প্যালেষ্টাইন একটা আন্তর্জাতিক এলাকা হিসেবে থাকবে। কেবল হাইফাতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মিসরের গোলযোগের কারণে বৃটেন ভারতবর্ষ অভিমুখী নৌপথ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে সুয়েজ খালের অপর প্রান্তেও আপন কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করতে বাধ্য হলো। সম্ভব হলে হাইফা থেকে বসরা পর্যন্ত নিজের জন্য অন্য একটা পথও তৈরী করা উচিত বলে মনে

করলো। একই কারণে সে প্যালেষ্টাইনের ওপরও নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিল। অপরদিকে সিরিয়ার ওপরও ফরাসী প্রভাব ও আধিপত্য বৃটেনের মনঃপুত ছিল না। সে আপন স্বার্থের তাগিদে অনুভব করলো যে, সিরিয়ায় তার নিজের প্রভাবাধীন কোন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শ্রেয়। এসব নিয়ে প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত উভয় মিত্র দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এবং লুটের সম্পদের বন্টন সম্পর্কে তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু উভয় সাম্রাজ্যবাদী প্রভু যখন দেখলো যে, তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দিন দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তখন নিজেদের সম্মিলিত স্বার্থে আরবদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে সানরিমো নামক স্থানে তারা এই মর্মে আপোশ রফা করে যে, ইরাক ও প্যালেষ্টাইন বৃটেনের কর্তৃত্বে থাকবে আর সিরিয়া পুরাপুরিই থাকবে ফ্রান্সের অধিকারে। ডাকাতরা কারো বাড়ী লুট করার পর লুণ্ঠিত সম্পদ যেরূপ ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়, এ ভাগবাটোয়ারা তা থেকে মোটেই পৃথক ধরনের ছিল না। কিন্তু ইউরোপের সভ্যতা গর্বিত ডাকাতরা একেও 'সত্য' ও 'ন্যায়নীতি'র লেভেল পরাতে চেষ্টা করে। বিশ্ববাসীর চোখে ধূলো দেয়ার জন্য তারা প্রচার করে যে, ঐ তিনটি দেশ তাদেরকে লীগ অব নেশনসের পক্ষ থেকে ওছি হিসেবে দেয়া হয়েছে। অথচ একটি স্বাধীন জাতিকে ছাগল ভেড়ার মত অন্য একটি দেশের কর্তৃত্ব সমর্পণ করার অধিকার কোন লীগ অব নেশনসেরই নেই। তবুও এটা বাস্তব সত্য যে, তখনও পর্যন্ত লীগ অব নেশনসের কোন বৈঠকই বসেনি এবং ওছি সম্পর্কেও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ওছির ক্ষমতা সম্পর্কে মিত্রপক্ষের সুপ্রিম কাউন্সিল ১৯২০ সালের ২৫শে এপ্রিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অথচ লীগ অব নেশনসের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯২০ সালের ১৫ই নভেম্বর জেনেভায়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ওছির ক্ষমতাবলে দেশ কয়টির দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ এ নয় যে, লীগ অব নেশন্স বৃটেন ও ফ্রান্সকে অনুগ্রহ–পূর্বক উক্ত অনুন্নত দেশ কয়টির অভিভাবকত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেছে। এর প্রকৃত অর্থ এই যে, বৃটেন ও ফ্রান্স প্রথমে নিজেরাই উক্ত দেশ কয়টি দখল করে নেয়। তারপর লীগ অব নেশনসের জন্মের আগেই তার পক্ষ থেকে নিজেদের নামে ওছিত্ব গ্রহণের আবেদনের খসড়া তৈরী করে। পরে যখন তাদের পরিকল্পনা অনুসারে লীগ সৃষ্টি হয় তখন তাকে দিয়ে সেই আবেদনে সই করিয়ে নেয়।

সে যাই হোক, সিদ্ধান্ত অনুসারে সিরিয়া ফ্রান্সের মালিকানাভুক্ত হলো। তারপরই জেনারেল গোর্দ এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার জাতীয় সরকারের উপর আক্রমণ চালালো। যে আরবদেরকে চার বছর আগে বন্ধুরূপে সম্ভাষণ করা হয়েছিল, যাদের সাহায্যে তুর্কীদেরকে পরাজিত করে দেশ জয় করা হয়েছিল, যাদেরকে মাত্র দুবছর আগে পর্যন্ত আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে আমরা শুধু তোমাদেরকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করছি, যাদেরকে যুদ্ধের পরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, তোমাদের দেশে তোমাদের জাতীয় সরকারই গঠিত হবে, সেই আরবদেরকেই অস্ত্রের বলে পদানত করা হলো এবং আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করা হলো।

ইরাকবাসী বৃটিশ ওছিশাসনের নাম শুনতেই গর্জে উঠেছিল। তাদেরকে ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করা হলো। তুর্কিরা নাকি 'জালেম' ছিল। কেন্তু সেই তুর্কীরা ইরাকে ১৪ হাজারের বেশী সৈন্য কখনো রাখেনি। 'ত্রাণকর্তা' বৃটেন সেখানে প্রায় একলাখ সৈন্য সমাবেশ করলো। তুর্কীরা যত জালেমই থাক, বছরে দুশোর বেশী আরবকে তারা কখনো হত্যা করেনি। অথচ 'ন্যায়নিষ্ঠ' কথিত বৃটেন সেখানে ১৯২০ সালের এক গ্রীষ্মকালেই দশ হাজার আরবকে হত্যা করলো অথচ এই আরবদের কাছ থেকেই এই বলে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল যে, "আমরা তোমাদের শত্রু হয়ে আসিনি। তোমাদেরকে স্বাধীনতা দিতে এসেছি।" এভাবে আরবদের স্বাধীনতা আন্দোলন নস্যাৎ করার পর বৃটেন সিদ্ধান্ত নিল, ইরাকে প্রত্যক্ষ শাসনের পরিবর্তে 'জাতীয়' লেবেল আঁটা একটা পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে। এ সিদ্ধান্তের পিছনে দুটো কারণ ছিল। প্রথমতঃ বৃটেন তার প্রতিশ্রুতির বাহ্যিক পবিত্রতা রক্ষা করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ইরাকে প্রতি বছর দশ কোটি পাউন্ড ব্যয় হতে দেখে বৃটিশ জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ সরকার তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালের বসন্তকালে ঘোষণা করা হলো যে, ইরাকবাসী নিজেদের রাজা নির্বাচন করতে পরবে। কিন্তু বাস্তবে কোন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলো না। বরং ইরাকবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিরিয়ার সিংহাসন চ্যুত রাজা ফায়সল ইবনে হোসাইনকে ইরাকের রাজা হিসাবে মনোনীত করা হলো। তাও করা হলো এই শর্তে যে, তিনি বৃটেনের প্রভাবাধীনে আপন দায়িত্ব পালন করবেন। ইরাকবাসীর অসন্তোষ বিদ্রোহের রূপ নিতে পারে-এই আশংকায় প্রভাবশালী জননেতা তালেব পাশাকে গ্রেফতার করে শ্রীলংকার কারাগারে

আটক রাখা হয়। অথচ এই তালেব পাশা যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকারকে অনেক মূল্যবান সাহায্য দান করেন। ইরাকের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে অংকুরেই বিনষ্ট করার জন্য ১৯২২ সালের ২৩ শে আগষ্ট এমন অবস্থায় ফায়সালের অভিষেক ঘোষণা করা হয়, যখন প্রকৃত পক্ষে 'সিংহাসন' প্রস্তুতই ছিলনা। মদের পিপা সাজিয়ে একটা অস্থায়ী 'সিংহাসন' তৈরী করে নেয়াহয়েছিল।

ইরাকবাসীর 'ত্রাণকর্তা' বৃটেন ফায়সালকে এভাবে ইরাকের পুতুল রাজা বানিয়ে রাজকীয় সিংহাসনের মূল্য দাবী করলো। সে ইরাককে এমন একটা চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করলো– যে চুক্তি অনুসারে দেশটি পরাক্ষভাবে পুরোপুরি বৃটিশ ক্ষমতা ও প্রভাবের অধীনে এসে যায় এবং তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা সবসময়ই বৃটেনের হাতে থাকে। এহেন চুক্তি ইরাকবাসী এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে পারতো না। কিন্তু বিশ্বের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য উক্ত চুক্তিতে ইরাকী জনগণের সম্মতি আদায়ের এক অদ্ভুত ফন্দি উদ্ভাবন করা হলো। চুক্তির খসড়া মধ্যরাতে ইরাকী জাতীয় পরিষদে পেশ করা হলো। পরিষদের সদস্যদেরকে বিছানা থেকে তুলে পুলিশের সাহায্যে ডাকানো হলো এবং জোরপূর্বক ভোট আদায় করে ঘোষণা করা হলো যে, ইরাকী পার্লামেন্ট চুক্তি অনুমোদনকরেছে।

তুরস্কের দ্বিতীয় দফা ভাগ–বাটোয়ারা সম্পর্কে রাশিয়ার সাথে ১৯১৫ সালে এক আপোশ রফা হয়। বলশেভিক বিপ্লবের কারণে এই আপোশ বাতিল এবং অন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে রাশিয়ার পরিবর্তে গ্রীসকে তুরস্কের অংশের মালিক স্থির করা হয়। পরিকল্পনা অনুসারে গ্রীস পুর্ব থেকে স্মার্নার (ইজমীর) ওপর আক্রমণ চালালো এবং তুর্কিদেরকে তাদের আসল স্বদেশ ভূমির একটি বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত করা হলো। সেই সঙ্গে বৃটেন, ফ্রান্স ও গ্রীসের সম্মিলিত সৈন্যরা কনষ্টান্টিনোপল শহরটিও অধিকার করে এবং দানিয়াল ও বাসফোরাস প্রণালীর যে এলাকা রাশিয়াকে দেয়ার কথা হয়েছিল তা তুর্কীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। পরে লুজান সম্মেলনে এই দ্বিতীয় ভাগ–বাটোয়ারা বাতিল হয় তবে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির অনুভূতি নিয়ে তা বাতিল করা হয়নি। তুরস্কের প্রচন্ড সামরিক প্রতিরোধের মধ্যে মিত্র শক্তি তুরস্কের ভূমি থেকে বেরিয়ে যেতেবাধ্যহয়।

যুদ্ধের বৈধ উদ্দেশ্য

উপরের আলোচনা থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিশানবাহী জাতিগুলোর সামরিক কর্মকান্ডের একটা বিবরণ পাওয়া গেল। ইউরোপের জনকয়েক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দার্শনিক ও পন্ডিত, যাদের প্রকৃত পক্ষে সমাজের ওপর কোন প্রভাব নেই, তারা ছাড়া সমগ্র বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সাধারণ জনমত নিজ নিজ সরকারের সামরিক পদক্ষেপ সমূহের প্রবল সমর্থক ছিল। এই জনমতের সাহায্যে ও প্রেরণায়ই ঐ সব বড় বড় দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এত বড় যুদ্ধ পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। এজন্য তাদের বাস্তব আচরণ ও কর্মপদ্ধতি দেখে আমরা ন্যায় সঙ্গতভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যুদ্ধ চলাকালে ও যুদ্ধ শেষে 'সত্য', 'ইনসাফ' ও ন্যায়নীতি'র নামে যেসব কাজ করা হয়েছে, সেগুলোই আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার 'সত্য' 'ন্যায়নীতি' ও 'ইনসাফের বাস্তব রূপ। বস্তুতঃ এ রূপ 'সত্য' ও 'ন্যায়সঙ্গত' অধিকারের জন্যই পাশ্চাত্য সভ্যতা অস্ত্রধারণের অনুমতি দেয়।

এই মানদন্ড অনুসারে পাশ্চাত্য সভ্যতা যুদ্ধের যেসব উদ্দেশ্যকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছে তা নিম্নরূপঃ

১– আপন বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ ও উপায়–উপকরণের একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ।

২– শিল্প ও বাণিজ্যের অঙ্গণে অগ্রসরমান শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিকে ধ্বংস করা।

৩– দুরবর্তী অধিকৃত অঞ্চলের পথিমধ্যে অবস্থিত দেশগুলোকে আপন প্রভাবাধীনে নিয়ে আসা।

৪– বিভিন্ন দেশ ও সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ দখল করা ও দুর্বল জাতিসমূহকে গোলামে পরিণত করা।

৫– যে কোন কারণে কোন জাতির সাথে শত্রুতার সৃষ্টি হলে তাকে ধ্বংস করা কিংবা অন্ততঃ তার শক্তি চূর্ণ করা।

এইসব উদ্দেশ্যকে প্রায়শঃ 'পবিত্র অধিকার' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এর ব্যাখ্যা–বিশ্লেষন নিষ্প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যগুলো বৈধ না অবৈধ. পবিত্র না অপবিত্র–সে সম্পর্কে যে কোন মানুষের বিবেক নিজেই রায় দিতে পারে।

আমার এ যুক্তি প্রদান প্রক্রিয়াকে অনেকে অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি বলে ভাবতে পারেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমষ্টিগত কর্মকান্ড ছাড়া আর কোন জিনিসকে পাশ্চাত্য সভ্যতা নামে আখ্যায়িত করা যায়? ধর্ম তো একটা প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য উপকরণ হতে পারতো। কিন্তু ইউরোপীয় জাতিসমূহ যেমন তাদের ধর্মকে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেয় না, তেমনি তাদের ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যাপারের সাথে সংশ্রব রাখা পছন্দ করে না। আইনকেও নির্ভরযোগ্য মনে করা যেত। কিন্তু আগেই বলেছি, আইন যুদ্ধের বৈধ ও অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। এখন এই উভয় বস্তুকে বহিষ্কার করে দেয়ার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তাগত ভিত্তি কার কাছ থেকে জানা যাবে? নীতিশাস্ত্রের পন্ডিতদের কাছ থেকে, না শান্তির অমীয় বাণী প্রচারকারী চিন্তাবিদদের কাছ থেকে? অথবা মুষ্টিমেয় কতিপয় লেখক ও সাংবাদিকের কাছ থেকে–যাদের কলম থেকে মাঝে মধ্যে মানবতা ও মানবিক সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কিছু কিছু চটকদার বুলি ও আনন্দদায়ক ধারণা ঝরে পড়ে? এসব লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'এদের কথায় কি পাশ্চত্যের জনগণ আস্থাশীল? যদি এমন ব্যক্তিত্ব পাশ্চাত্য জগতে অনুসন্ধান করা হয়, যার কথা পশ্চিমা জাতিগুলোর শিরোধার্য অথবা যার চিন্তাধারায় পশ্চিমা জনগণের সকলে কিংবা অধিকাংশ আস্থাশীল, তাহলে তেমন ব্যক্তিত্ব সমগ্র পাশ্চত্য জগতে দু'চারজনও মিলবেনা। সুতরাং এমন একটা সর্বসম্মত আদর্শ বা তত্ত্ব যখন পাশ্চাত্যে বর্তমান নেই তখন আমাদের কাছে পাশ্চাত্যবাসীদের অনুসৃত কর্মপদ্ধতী ছাড়া যুদ্ধ সংক্রান্ত তাদের নৈতিক আদর্শ জানবার আর কি উপায় আছে?

শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবসমূহ

গত কিছুকাল ধরে যুদ্ধ, বিগ্রহের অবসান ঘটানো, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ এবং সামরিক শক্তি সমূহকে চূর্ণ করার কিংবা যথাসাধ্য কমিয়ে ফেলার যে চেষ্টা চলছে, তাকে যুদ্ধ বন্ধের ইউরোপবাসীদের সদুদ্দেশ্য প্রবণতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হবে, এটা এক রকম নিশ্চিত। কিন্তু এই চেষ্টা–সাধনার বাহ্যিক চেহারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করলে দেখা যাবে, এ

সবের পিছনে যে ইচ্ছাটি সক্রিয় তা যুদ্ধ অবসানের নয়, বরং যুদ্ধকে আগের চেয়েও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়ার জন্য।

অস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম পেশ করা হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। এই বছরের আগষ্ট মাসে রাশিয়ার জারের পক্ষ থেকে বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রগুলোকে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে নিম্নরূপ স্মারকলিপি পাঠানো হয়ঃ

"শান্তিও সমঝোতার সংরক্ষণ রাজনীতির প্রধানতম লক্ষ্য বলে মনে করা হয়ে থাকে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই বিশ্বের বড় বড় দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই শান্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তারা নিজেদের সামরিক শক্তি এত বৃদ্ধি করেছে যে, এত বড় সামরিক শক্তি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায় নি। এই সামরিক শক্তিকে ক্রমেই উন্নত করা হচ্ছে এবং এর উন্নয়নের জন্য কোন ত্যাগ স্বীকারেই বিরত থাকা হচ্ছে না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেই মহত্তর লক্ষ্য–শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কোনক্রমেই অর্জিত হচ্ছে না।

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ব্যয় বরাদ্দ সাধারণ জনকল্যাণ ও সমৃদ্ধির উৎসগুলোকে শুকিয়ে দিচ্ছে। জাতিসমূহের শারীরিক ও মানসিক শক্তি, তাদের শ্রম ও পুঁজি–সব কিছু তার প্রকৃত খাতে ব্যয়িত না হয়ে এমন সব কাজে ব্যয়িত হচ্ছে যাতে কোন লাভই হচ্ছে না। কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে কেবল মারণাস্ত্র নির্মাণে। এইসব মারণাস্ত্র বর্তমানে বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের প্রতীক সাব্যস্ত হচ্ছে বটে কিন্তু ভবিষ্যতে নতুন কোন আবিষ্কার–বুদ্ভাবনের ফলে এর গুরুত্ব যে হাওয়া হয়ে যাবে তা এক রকম অবধারিত। এ সবের কারণে জাতীয় সভ্যতা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি–হয় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, নয়তো স্তব্ধ হয়ে গেছে।

অধিকন্তু, প্রতিটি বৃহৎ দেশ যে হারে আপন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে সেই হারেই তাদের আসল লক্ষ্য দূরে সরে যাচ্ছে। অধিকতর সৈন্য প্রসারনের দুরুন অসহনীয় ব্যয়বরাদ্দ অর্থনৈতিক সমস্যাবলীকে কেবল বাড়িয়েই তুলছে। যুদ্ধাস্ত্রের বৃদ্ধির দুরুণ নিরাপত্তাহীনতা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আর এই উভয় কারণে এ যুগের অস্ত্র সজ্জিত সন্ধি একটি মারাত্মক অসহনীয় বোঝায় পরিণত হচ্ছে। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে,এরূপ অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে পৃথিবী যে ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উদগ্রীব এবং যে পরিণতির কথা কল্পনা

করাও মানবীয় চিন্তাশক্তির পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার, কার্যতঃ সেদিকেই সে ধাবিত হবে।”

মজার ব্যাপার এই যে, এই মনোভাব যে দেশটির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল সে নিজেও সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণে সবার অগ্রণী ছিল। যে সময়ে এই ধ্যান–ধারণা ব্যক্ত করা হয়, চারিদিক থেকে একে অভিনন্দিত করা হয় এবং বহু সংখ্যক প্রভাবশালী দেশ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহবানে সাড়া দেয়। পরবর্তী বছরই অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে প্রথম হেগ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের কর্মসুচীর প্রথম ধারাই ছিল এই যে, যত শীঘ্র সম্ভব স্থল ও নৌশক্তির ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু সম্মেলনে আলাপ–আলোচনা শুরু হবার অল্প সময়ের মধ্যেই জানা গেল যে, অস্ত্র সীমিত করণের প্রতি কোন দেশেরই তেমন ঝোঁক নেই। মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ হোল্স সম্মেলনের এই চরিত্র প্রথমেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেনঃ

“সরলতার বশে যদি কেউ অস্ত্র–সীমিত করণের প্রস্তাবের সাফল্যের আশা করে থাকে কিংবা এরূপ বাসনা পোষণ করে থাকে যে, একটা আন্তর্জাতিক আদালত ও আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠিত হবে এবং সেই আদালতের রায় বিশ্বে কার্যকরী করা হবে, তাহলে তাকে অবশ্যই হতাশ হতেহবে।”২৬৬

বাস্তবে হলোও তাই। সম্মেলনে প্রথমে তো নিরস্ত্রীকরণ বা অস্ত্রসীমিত করনের প্রস্তাব বিবেচনাই করতে চাইল না। পরে যখন ঐ প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য পীড়াপীড়ি করা হলো তখন প্রত্যেক প্রভাবশালী দেশ তার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে আরম্ভ করলো। অবশেষে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার মাধ্যমে সমস্যাটির দায় এড়ানো হলো। প্রস্তাবের ভাষা নিম্নরুপঃ

“এই সম্মেলন মনে করে, বর্তমান অবস্থায় সামরিক ব্যয়–বরাদ্ধ বিশ্ববাসীর ওপর একটা বিরাট বোঝা স্বরূপ। কাজেই তাকে সীমিত করা মানব জাতির নৈতিক ও বৈষয়িক কল্যাণের জন্য একান্তভাবে বাঞ্ছিত।”

এই “মনে করা” ও “একান্তভাবে বাঞ্ছিত” হওয়া একেবারেই গুরুত্বহীন ও মূল্যহীন ছিল। তার প্রমাণ এই যে, প্রথম হেগ সম্মেলন থেকে দ্বিতীয় হেগ সম্মেলন পর্যন্ত কোন একটি দেশও এই ‘নসিহতকে’ আমল দেয়নি। অধিকন্তু

সামরিক শক্তি গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে ক্রমেই বেড়ে গেছে। ১৯০৭ সালে যখন দ্বিতীয় হেগ সম্মেলন বসে, তখন তার আলোচ্য সূচীতে নিরস্ত্রীকরনের উল্লেখ ছিল না। বরং স্পষ্ট করে তাতে বলা হয়েছিল যে, "স্থল ও নৌ-শক্তি সীমিতকরণ সংক্রান্ত কোন বিষয় আলোচিত হবে না।" তা সত্ত্বেও নানা কারণে প্রথম হেগ সম্মেলনের প্রস্তাবটির পুনরাবৃত্তি করা সংগত মনে করা হয় এবং তার সাথে এই কথাটিও জুড়ে দেয়া হয় যেঃ

"আর যেহেতু প্রথম সম্মেলনের পর থেকে প্রায় প্রত্যেক দেশের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই এই সম্মেলন এরূপ মনোভাব ব্যক্ত করছে যে, প্রভাবশালী দেশ সমূহের এই বিষয়টি পুনরায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা বিশেষভাবেবাঞ্ছনীয়।"

বস্তুতঃ এই প্রস্তাবের লক্ষ্য শুধু এতটুকুই ছিল যে, প্রভাবশালী দেশগুলো নিরস্ত্রীকরনের বিষয়টি কেবল "বিবেচনা" করুক। কার্যতঃ প্রভাবশালী দেশগুলো খুবই "গুরুত্বের" সাথে "বিবেচনা" করেছিল এবং সেই বিচার-বিবেচনার ফলে তারা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, সামরিক ও জঙ্গী প্রস্তুতি আরো বাড়িয়ে দেয়া দরকার।

মহাযুদ্ধের অল্প কিছুদিন আগে ইউরোপের চিন্তাশীল মহলে পুনরায় এ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় যে, শক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ থামানোর সংগত পদ্ধতি কি হতে পারে? আন্তর্জাতিক আইনে এর কতদূর অবকাশ আছে? কিন্তু এ প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকা কালেই যুদ্ধ শুরু হলো। বিশ্ববাসী আর একটা গুরুতর সমস্যা-বাঁচার সমস্যা-সমাধানে ব্যাপৃত হলো। অবশ্য তখনো যে দু'চারজন কল্পনাবিহারী নির্জন প্রকোষ্ঠে বসে নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র সীমিত করণের প্রস্তাবাদি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং শক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ থামানোর পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ভাবনায় লিপ্তছিল না তা নয়। কিন্তু বাস্তব জগতে প্রতি মুহূর্তে তাদের কল্পনা ও চিন্তার জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তাদের চিন্তাধারা ও বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তো দুরের কথা, তা শোনার ফুরসতও বিশ্ববসীর ছিল না। তবে এর এতটা সুফল অবশ্যই ফলেছিল যে, মার্কিন সরকার সরকারীভাবে এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব ঘাড়ে নিল। ১৯১৭ সালের ২২শে জানুয়ারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন সিনেটের নিকট একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠান। তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ প্রস্তাবটিও ছিলঃ

"সৈন্যদের ব্যবহারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা দরকার, যেন সামরিক শক্তি নিছক শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হয়, আক্রমণ ও স্বার্থান্ধ স্বেচ্ছাচার ও বলপ্রয়োগের হাতিয়ার না হয়।..... প্রত্যেক দেশেই যদি যুদ্ধ সরঞ্জাম নির্মাণ ও সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপক আয়োজন অব্যাহত থাকে তাহলে বিশ্বের জনগণের মনে স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ কখনোই জন্মাতে পারে না। স্থল ও নৌবাহিনী এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। বিশ্বের জাতিসমূহ ও মানবজাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যতের সাথে এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।'

১৯০৭ সালের পর এই দ্বিতীয়বারের মত একটি পাশ্চাত্য রাষ্ট্র নিরস্ত্রী করনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে উথাপন করে। কিন্তু এবারের এ আওয়াজটি আগের চেয়েও নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়ে দেখা দেয়। কেননা যে রাষ্ট্রটি এ প্রস্তাব উথাপন করে সে নিজেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং নিজের কাজের মাধ্যমে নিজের কথার প্রতিবাদ করে।

লীগ অব ন্যাশন্‌স

মহাযুদ্ধ শেষে বিজয়ী দেশ সমূহ প্রেসিডেন্ট উইলসনের পরামর্শক্রমে একটি সমিতি গড়ে তুললো। তার নাম দেয়া হলো লীগ অব নেশন্‌স। এ সমিতির প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলো যুদ্ধ থামানো ও যুদ্ধের কারণ দূর করা। যুদ্ধের কারণ দূর করার উদ্দেশ্যে এই সমিতি একটি আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্টা করলো। সমিতি এই আদালতের মাধ্যমে আন্তরাষ্ট্রীয় বিরোধ মীমাংসার সিদ্ধান্ত নিল। আর যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে একটি সমঝোতা স্থাপণ করলো। সমঝোতাটি হয়েছিল এই মর্মে যে, বিবাদমান দেশসমূহ শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ মীমাংসা করবে। কোন দেশ যদি নিজের স্বার্থের জন্য বলপ্রয়োগ করে তবে সকল দেশ মিলে তাকে সুপথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। এই সমঝোতার ১৬শ ধারায় বলা হয়েছেঃ

"লীগ অব নেশনসের কোন সদস্য যদি এই সমঝোতার ১২, ১৩ ও ১৫ ধারা লংঘন করে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয় তাহলে তার এ কাজটিকে লীগের অন্য সকল সদস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সমর্থক বলে মনে করা হবে। লীগের সদস্যগণ এই সমঝোতার মাধ্যমে অঙ্গীকার করছেন যে, তারা সকলে তৎক্ষনাত উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী দেশের সাথে বিদ্যমান যাবতীয় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং আপন আপন নাগরিকদেরও সেই

দেশের সাথে বিরাজমান সমস্ত লেনদেন বন্ধ করে দেবে। পরন্তু সেই দেশের জনগণ যাতে অন্যান্য সদস্য ও অসদস্য দেশের জনগণের সাথেও বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক না রাখে তার জন্য চেষ্টা চালাবে।"

এরপর ঐ ধারার পরবর্তী অনুচ্ছেদে লীগ অব নেশনসের কার্যকরী পরিষদকে ক্ষমতা দেয়া হয় যে, অপরাধী সরকারকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য আপন সদস্যদের কাছ থেকে যত নৌ ও স্থল সৈন্যের প্রয়োজন মনে হয় তলব করতে পারবে। আর সকল সদস্য দেশের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য বলে স্থির করা হয় যে, তারা যেন তাদের সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে ঐ অপরাধী দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য লীগ অব নেশনসের নিকট সমর্পনকরে।

এই সমঝোতাকে বাহ্যতঃ যুদ্ধ প্রতিরোধের অত্যন্ত কার্যকর ও অব্যর্থ হাতিয়ার বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যে জোটবদ্ধতার জন্য ১৯১৪ সালে মাহযুদ্ধ সংঘটিত হলে, এটা তার চেয়ে অধিকতর মার্জিত ও নিষ্পাপ অথচ অধিকতর মারাত্মক রূপ বলে সাব্যস্ত হয়েছিল। যেহেতু যুদ্ধের সময় পুরানো জোটবদ্ধতার বিষময় কুফল ইউরোপবাসীর চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় এবং তাকেই তারা সকল আপদের কারণ বলে মনে করতে থাকে, তাই পাশ্চাত্য দেশ সমূহ এই পুরানো পদ্ধতি বর্জন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু জোটবদ্ধতা ছাড়া তাদের রানৈতিক স্বার্থোদ্ধারও সম্ভব ছিলনা। কেননা পৃথক পৃথক ভাবে কোন দেশই এতটা প্রভাবশালী হতে পারে না যে, সমগ্র বিশ্ববাসীকে সশস্ত্র করে আপন স্বার্থ উদ্ধার করবে। সমস্বার্থ উদ্ধারের জন্য সর্বাবস্থায়ই বড় বড় দেশের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে বিশ্বের ওপর আপন আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রন বজায় রাখার চেষ্টা করা অপরিহার্য। এ জন্য তারা পুরানো জোটবদ্ধতাকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেয় মাত্র। এতে খোলাখুলি আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষা মূলক ঐক্যজোটের পরিবর্তে শান্তি ও সমঝোতার সাধু পোশাকে একই অপরাধ মূলক গাঁটছড়া বাঁধার মনোভাব বিদ্যমান। যেখানে ক্ষুদ্র দেশগুলোকে পদানত করার প্রয়োজন সেখানে লীগের এ সমঝোতা খুবই সহায়ক। যদি গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে বিবাদ হয় কিংবা পোল্যান্ড ও লিথুনিয়ার মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় তাহলে লীগ অব নেশনসের হোমরা চোমড়া সদস্যরা তাদেরকে এক ধমকেই সোজা করতে পারেন। এ পন্থায় শুধু যে ছোট খাট যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে তাই নয়, বরং এর চেয়ে বড় লাভজনক

ব্যাপার এই যে, লীগ অব নেশনসের নেতৃবৃন্দের প্রভাব প্রতিপত্তিও সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করতে পারে। তারা "খোদায়ী প্রহরী" সেজে বিশ্ব রাজনীতিতে যেমন খুশী রদবদল ঘটানো, জাতি সসূহের শক্তি কমানো বাড়ানো, বাঞ্ছিত দেশসমূহের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষন ও অবাঞ্ছিত দেশ সমূহকে ভীত–সন্ত্রস্ত করার মত মহত কাজ সমূহ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু হোমরা চোমড়া সদস্যরাই যদি লীগের সনদ লংঘন করে বসে তাহলে লীগ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা মৌখিক কৈফিয়ত তলব করারও সাহস দেখাবে না। আর তেমন সাহস দেখালেও কোন ফায়দা হবে না।[২৬৭] ধরে নেয়া যাক, আজ বৃটেন লীগের সনদ লংঘন করে বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধমূলক কাজ করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে লীগের কার্যকরী পরিষদ বিষয়টা বিবেচনা করার জন্য অধিবেশনে মিলিত হলো। সকল সদস্যের সম্মিলিত রায়ের ভিত্তিতে অপরাধীকে শাসানো হলো যে, তুমি এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত হও, নচেত তোমার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু অপরাধী যেহেতু বিশ্বের বৃহত্তম নৌশক্তির অধিকারী, তাই সে এসব হুমকি–ধুমকির পরোয়াই করলো না। বরং যা করছিল তা অপ্রতিহতভাবে করে যেতে লাগলো। অবশেষে লীগ নিরূপায় হয়ে আপন সদস্যদেরকে অনুরোধ করলো যে, আপনারা বৃটেনের সাথে সব রকমের বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করুন এবং নিজেদের সম্মিলিত সামরিক শক্তির মাধ্যমে বৃটেনকে আদেশ পালনে বাধ্য করুন। তখন প্রশ্ন হলো, লীগ অব নেশনসের সদস্য দেশগুলো বৃটেনের মত মহাশক্তিধর ও সমৃদ্ধিশালী দেশের কাছ থেকে যে অগনিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ লাভের প্রত্যাশী, সেই স্বার্থ কি তারা কেবল লীগের নির্দেশে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবে? পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ থেকে অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশের সম্পর্ক কি এক নিমেষেই ছিন্ন হয়ে যাবে? ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় দেশ কি নিজ নিজ স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে কেবল লীগ অব নেশনসের ইচ্ছায় একটা বৃহত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষয়–ক্ষতির ঝুঁকি নিতে সম্মত হবে? বাস্তব রাজনীতির সাথে বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক রাখে– এমন কোন ব্যক্তি এসব প্রশ্নের জবাবে 'হাঁ' বলতে পারে না। আর জবাবে যখন হাঁ বলা সম্ভব নয় তখন স্বীকার করতেই হবে যে, লীগ অব নেশনস বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম নয়। অথচ সত্য কথা এই যে,

বিশ্ব–শান্তির সবচেয়ে বড় বিপদ এই বৃহত শক্তিগুলোর লোভ–লালসা থেকেই উদ্ভুত।

(লেখকের এ উক্তিগুলো যদিও লীগ অব নেশনসকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত, তবুও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে গঠিত বর্তমান জাতিসংঘের ব্যাপারেও হুবহুএই কথা খাটে। আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এই দুই মহাশক্তির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সম্ভাব্য সংঘর্ষের মুখে বিশ্বশান্তি ও তার অসহায় রক্ষক জাতিসংঘ একটি ভাসমান বুদবুদের মতই স্থিতিহীন– অনুবাদক)

এটা নিছক একটি কল্পিত ব্যাপার নয়। গত ৮ বছর (প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লীগ গঠনের পরবর্তী ৮ বছর) এর যথেষ্ট পরীক্ষা–নিরীক্ষা হয়ে গেছে। লীগ অব নেশনস যেদিন গঠিত হয়েছে সেদিন থেকেই আজ পর্যন্ত সে একটি বারও বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে তাদের অন্যায় কার্যকলাপ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করার সৎসাহস দেখাতে পারলো না। দামেস্কে ফ্রান্স প্রকাশ্যে গণহত্যা চালালো, লীগ অব নেশনস তার নীরব দর্শক হয়ে রইল। অথচ লীগের নামেই সিরিয়াকে ফ্রান্সের অছি শাসনে দেয়া হয়েছিল। রীফের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠিকে স্পেন ও ফ্রান্স একত্রে পাইকারীভাবে ধ্বংস করলো। লীগ টু শব্দটিও করলো না। ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার সংকটে লীগ হস্তক্ষেপ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু ইটালীর একটি ধমকেই তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। বৃটেন ইরাকে রক্তবন্যা বইয়ে দিল। কিন্তু লীগ একটু মুখ ঘুরিয়েও জিজ্ঞাসা করলো না যে, তুমি কি করছ? লীগের পরিষদে এ যাবত ক্ষুদ্র বনাম বৃহৎ দেশের মধ্যকার যত বিরোধ আলোচিত হয়েছে, তাতে সর্বদা বৃহৎ শক্তিরই জয় হয়েছে। কখনো এমন দেখা যায়নি যে, একটি দুর্বল দেশ শক্তিমান দেশের সামনে জয়লাভ করেছে। মসুলের ব্যাপারটা বেশী দিনের নয়। তাকে নিছক বৃটেনের অর্থনৈতিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য যেভাবে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইরাকের সাথে যুক্ত করা হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, লীগ অব নেশসন আসলে শক্তিধর দেশ সমূহের একটা গাঁট ছাড়া আর কিছু নয়। বৃহৎ শক্তিবর্গ অধিকতর সুস্পষ্টভাবে আপন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এ গাঁটছড়া তৈরী করেছে। এই গাঁছড়ার শক্তি যেসব জাতির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। তারা নিজেদের অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষার আয়োজনে পাল্টা জোট গঠন করতে চাইছে। বৃহৎ শক্তিবর্গ যখন সম্মিলিত শক্তি নিয়ে

তাদেরকে পদানত করার চেষ্টা করে, তখন এরাও যাতে সম্মিলিত শক্তি নিয়ে তার জবাব দিতে পারে সে জন্যই এই পাল্টা জোট গঠনের আকাংক্ষা পোষণ করা হচ্ছে। যদি এই আকাংক্ষা বাস্তব রূপ নেয়, তাহলে (প্রথম) মহাযুদ্ধের পূর্বে যেরূপ দুটো রাষ্ট্রজোট ছিল, সেরূপ দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রজোট আবার গঠিত হবে। আর তাহলে পৃথিবীতে আবার একটি মহাসমর সংঘটিত হবে– যা হয়তো বা প্রথমটার চেয়েও প্রলয়ংকরী হবে। (লেখকের এ ভবিষ্যদ্বানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাধ্যমে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।–অনুবাদক)

নয়া নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব

গত সাত বছর ধরে ইউরোপ ও আমেরিকায় নিরস্ত্রীকরণ, সমরাস্ত্র সীমিতকরণ ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ করণের প্রশ্নে পুনরায় কতগুলো প্রস্তাব নিয়ে কথাবার্তা চলছে। অনেক সরলমনা লোকওসব কথাবার্তাকে পশ্চিমা জাতিসমূহের সদুদ্দেশ্য–প্রবনতার লক্ষণ বলে মনে করছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এসব আলাপ–আলোচনার সাথে বাস্তবতার সম্পর্ক নেই। যেহেতু পাশ্চাত্যের সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং বিশেষভাবে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনে শান্তি তাদের একান্ত প্রয়োজন, সে জন্য তারা অন্ততঃ পক্ষে মানসিক আশ্বাস লাভের এমন কথাবর্তা শূনতে ভালোবাসে যার সাহায্যে যথার্থ শান্তিলাভ না হলেও অন্ততঃ শান্তির একটা কাল্পনিক আশা জন্মে। নচেত বাস্তব কাজের নিরীখে এসব আশা সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। সত্য বলতে কি, গত সাত, আট বছরে পাশ্চাত্য জগতে যুদ্ধোপকরণের যে বিকাশ–বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা ইতি পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। এমন কি ১৯১৪ সালে যখন সমগ্র ইউরোপ সমর সজ্জায় লিপ্ত ছিল, তখনো এরূপ ছিল না।

মহাযুদ্ধের পর ১৯২১ সালে আমেরিকা এ বিষয়টি প্রথম উথাপন করে। তারই উদ্যোগে ঐ বছর নভেম্বর মাসে ওয়াশিংটনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাহ্যতঃ সামরিক শক্তি সীমিতকরণই ছিল উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমেরিকা, ফ্রান্স; জাপান ও ইটালীর ঐকান্তিক বাসনা ছিল বৃটেনের অতিকায় নৌশক্তিকে খর্ব করা। কেননা এই সমস্ত দেশের জীবন যাত্রা একান্তভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্য নির্ভর। সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গমালার ওপর যতক্ষণ বৃটেনের একক কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকছে, ততক্ষণ কোন দেশ তার বাণিজ্যকে নিরাপদ মনে করতে পারে না। অপরদিকে বৃটেনও

অনুভব করতো যে, নৌশক্তির প্রাধান্য বজায় থাকার ওপরই তার সমৃদ্ধি পুরো মাত্রায় নির্ভরশীল। কাজেই অন্য কোন দেশ তার সমপর্যায় না পৌছুক এটাই ছিল তার কাম্য। ওয়াশিংটন সম্মেলনের আলাপ আলোচনায় এই অন্তর্দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। প্রত্যেক পক্ষ অন্যদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাইত। কিন্তু যখনই তার নিজের ব্যাপারে আলোচনা হতো, তখনই পরিস্কার বলে দিত যে, আমাদের সমর নীতি অন্যদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, ওয়াশিংটন সম্মেলনে পাঁচ বৃহৎ দেশের নৌশক্তির আনুপাতিক অংশ নির্ধারণ করার চেয়ে বেশী কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এর অব্যবহিত পরই অস্ত্র সীমিত করণের উদ্যোগ গ্রহণকারী আমেরিকা নিজেই পাঁচটি নয়া ড্রেডনট তৈরী ও পানামা খালকে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই ওয়াশিংটন সম্মেলনেই ডুবো জাহাজের ব্যাপারেও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ডুবো জাহাজের ভয়ে সবচেয়ে বেশী ভীত ছিল বৃটেন। কেননা তার জীবন জীবিকাই বিদেশ থেকে আমদানী কৃত জিনিসের ওপর সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল। বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজ তারই বেশী। মহাযুদ্ধকালে এই ডুবো জাহাজ সমূহ তার সামুদ্রিক বাণিজ্যকে ধ্বংস করে দিয়ে যেভাবে তার জীবন দুর্বিসহ করে দিয়েছিল, সে কথা বৃটেনের মনে ছিল। এ জন্য সে ওয়াশিংটন সম্মেলনে ডুবো জাহাজ নিষিদ্ধ করানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। অপরদিকে ফ্রান্স ছিল তার কট্টর বিরোধী। কেননা তার নৌশক্তি ছিল দুর্বল। বৃটেনের মোকাবিলায় তার কাছে নিজের নিরাপত্তার সর্বপ্রধান অবলম্বন ছিল ডুবো জাহাজ গুলো। ফরাসী প্রতিনিধি পরিস্কারভাবে বললেন, ডুবো জাহাজ আক্রমণাত্মক হাতিয়ার নয় প্রতিরক্ষামূলক হাতিয়ার। যে সব দেশের নৌশক্তি দুর্বল, তারা ডুবো জাহাজ ব্যবহার না করে পারে না। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা উভয় পক্ষের গ্রহণ যোগ্য একটা ফর্মূলা উদ্ভাবন করলো এবং উভয় পক্ষ মেনেও নিল। ফর্মুলাটি হলো, যুদ্ধ চলাকালে প্রতিপক্ষের বানিজ্যের ক্ষতি করার জন্য ডুবো জাহাজ ব্যবহার করা চলবে না।

বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কেও আরো একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রথমে ১৮৯৯ সালের হেগ সম্মেলনে বিষাক্ত ও শ্বাস রোধকারী গ্যাস ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। বৃটেন তার বিরোধিতা করেছিল। পরে ১৯০৮ সালের দ্বিতীয় হেগ সম্মেলনে তাকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করানো হয়। কিন্তু মার্কিন

যুক্তরাষ্ট শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার বিরোধিতা করে। মহাযুদ্ধে জার্মানী ও তার প্রতিপক্ষগণ বল্গাহীনভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে এইসব গ্যাস ব্যবহার করে। এর ওপর যেটুকু আইনগত বধ্যবাধকতা ছিল তাও সবল দেশের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের দরুন ভেস্তে গেল। এরপর ওয়াশিংটন সম্মেলনে পুরানো বিধিনিষেধ গুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। কিন্তু কোন দেশই তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। সম্মেলনের ফরাসী প্রতিনিধি এম, সারাট (M, sarraut) তাতে সই করার সময় নিম্নরূপ নোট লেখেনঃ

'বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার রোধ করা কার্যত অসম্ভব মনে হচ্ছে।' বৃটেনের পক্ষ থেকে মিঃ বিলফোরও এই ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন বোধ করলেনঃ

"কোন বদমাইশ শত্রু যদি এরুপ গ্যাস ব্যাবহার করে, তবে সে অবস্থায় আত্মরক্ষার খাতিরে যে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন হবে, বর্তমান চুক্তিনামা সেই প্রয়োজন পুরণের পথে অন্তরায় সৃষ্ট করবে না।"

এই মানসিক অস্থিরতার ফলেই এখন পর্যন্ত কোন দেশ এই চুক্তিনামা সরকারীভাবে অনুমোদন করেনি এবং আইনের দিক দিয়ে তা বর্তমানে একটি অর্থহীন দলীল।

ওয়াশিংটন সম্মেলনের পর ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে মিঃ লয়েড জর্জের উদ্যোগে জেনেভায় একটি নিখিল ইউরোপীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল এই মর্মে একটি চুক্তি সম্পাদন করা যে, আগামী দশ বছরের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশ সমূহ পরস্পরের ওপর আক্রমণ চালাবে না বলে অঙ্গীকার করবে এবং সকল দেশ মিলিত হয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ সমূহের পুনর্গঠনে সহায়তা করবে। কিন্তু আমেরিকা এই সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফ্রান্স প্রথমেই ঘোষণা করে দেয় যে, আমরা এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহ মেনে চলার দায়িত্ব নিচ্ছি না। তুরস্ককে তো সম্মেলনে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। রাশিয়াকে ডাকা হয়েছিল শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, বিপ্লবকালে রাশিয়ায় অবস্থিত ইউরোপীয় দেশ সমূহের সম্পদের যে ক্ষয় ক্ষতি হয়, তার ক্ষতি পুরণ দিতে তাকে বাধ্য করতে হবে। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, সম্মেলন ব্যর্থ হলো এবং সামরিক প্রস্তুতির গতি কিছুমাত্র মন্তর হল না।

জেনেভার পর হেগে আর একটা সম্মেলন হয় এবং তাও জেনেভা সম্মেলনের মতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তার পর লন্ডনে আর একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেখানে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে এমন মারাত্মক মতান্তর ঘটে যে, মসিয়ে পুয়াংকারা ক্রুদ্ধ হয়ে সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সোজা প্যারিস চলে যান। রাগের আতিশয্যে তিনি ছবি তোলার জন্যও একটু দাঁড়াননি।

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লীগ অব নেশনস অস্ত্র সীমিত করণ ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ করনের প্রশ্নটি নিয়ে পুনরায় বৈঠকে বসে। লীগের আবেদনক্রমে পরিষদ আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রী করণ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পথ খোলাসা করার জন্য একটা প্রস্তুতি কমিটি নিয়োগ করে। কিভাবে এবং কোন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে এ ধরনের সম্মেলন ডাকা যেতে পারে সেটা নির্ণয় করাই হবে এই কমিটির কাজ। কমিটি দীর্ঘ এক বছরেও স্বীয় দায়িত্বের কোন কুল কিনারা করতে পারলো না। ১৯২৬ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর লীগের সাধারণ পরিষদ কার্যকরী পরিষদকে অনুরোধ করলো প্রস্তুতি কমিটিকে ১৯২৭ সালের মধ্যে স্বীয় কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিতে, যাতে সাধারণ পরিষদের ৮ম সম্মেলনের পূর্বেই আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা সম্ভব হয়। কিন্তু কমিটি সেই সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে পারলো না। আজও পর্যন্ত কমিটির কেবল মিটিং–এর পর মিটিং হচ্ছে। আজও পর্যন্ত এই নিরস্ত্রীকরণ উদ্যোগের কোন ফল লাভ হয়নি। কাজেই এ নিয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা নিরর্থক। (বর্তমানের সল্ট চুক্তিও নিরস্ত্রীকরণের অন্যান্য উদ্যোগ–আয়োজনের অবস্থা সকলেরই জানা আছে। –অনুবাদক) তবে হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, এ উদ্যোগ ইতিপুর্বেকার অনুরুপ অন্যান্য উদ্যোগের মতই বৃথা যাবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের যদি সত্যিই নিরস্ত্রীকরণের আন্তরিক ইচ্ছা থাকতো তাহলে তারা রাশিয়ার নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবেই সায় দিত। কেননা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা একমাত্র ঐ প্রস্তাবসমূহ দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু তাদের কেউ এ প্রস্তাব মানতে রাজী নয়। বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড কিসিংডন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে–

"পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ বিশেষ জাতিসমূহকে গোলযোগ, দাঙ্গা–হাঙ্গামা ও বিপ্লবের আশংকার মুখে ঠেলে দেবে।"

এ উক্তি থেকে মুখের ও মনের পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। মুখে এমন সব কথা বলা হচ্ছে যাতে মনে হয় পাশ্চাত্য জাতিসমূহ যুদ্ধও রক্তপাতকে খুবই অপছন্দ করে, শান্তি ও সমঝোতা চায় এবং ধ্বংসাত্মক কার্য কলাপ পরিত্যাগ করে প্রত্যেকে নিজ নিজ সীমার মধ্যে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করতো চায়। কিন্তু কার্যতঃ এই জাতিগুলোর মধ্যে মারাত্মক শত্রুতার সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের মনে আগ্নেয়গিরীর লাভা সঞ্চিত হচ্ছে। তাদের সেনাবাহিনীর শক্তি ও সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাদের সমরাস্ত্র দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করছে এবং প্রত্যেক জাতি এই চেষ্টায় লিপ্ত যেন সে পরবর্তী যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষের চেয়ে অধিকতর শক্তিমান বলে প্রমাণিত হতে পারে এবং সমস্ত বিরোধী পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজের প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এই প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসা দেখে পাশ্চাত্য জগত সত্যিই শান্তি চায়– এ কথা কে বিশ্বাস করবে? কে বিশ্বাস করবে যে, তারা যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে তওবা করেছে?

১৯১৯ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ স্মারক লিপিতে লিখেছিলেনঃ " লীগ অব নেশন্সের সাফল্যের প্রথম ও প্রধানতম শর্ত এই যে, বৃটেন, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ এবং সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা বন্ধের স্বপক্ষে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে। লীগের সনদে সই করে আগেই যদি এই চুক্তি সম্পাদিত না হয় তবে লীগ একটা প্রহসনে পরিণত হবে।"

এই উক্তি অনুসারে লীগ সত্যিই একটি 'প্রহসনে' পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য দেশে দেশে যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, তা ইতি পুর্বে কখনো ছিল না। পাশ্চাত্য জগত আজ যুদ্ধ বন্ধের জন্য এত সাগ্রহে প্রস্তুত যে, ১৯১৪ সালেও এমন ছিলনা। আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা সৈন্য সংখ্যার সম্প্রসারণ, অত্যাধুনিক ও অতি উন্নতমানের মারনাস্ত্র তৈরী, বিশালকায় যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ, মারাত্মক ধরনের উড়ো জাহাজ তৈরী এবং বিষাক্ত গ্যাস ও সর্বনাশা যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত করে মানব জাতির ধ্বংসের এমন ব্যবস্থা করেছে যার তুলনা গোটা বিশ্ব ইতিহাসে মিলবে না। বাস্তব পরিস্থিতি যখন এরূপ, তখন শান্তি ও সমঝোতার লম্বা লম্বা বুলি আওড়িয়ে এবং সভা–সম্মেলনের ভড়ং দেখিয়ে কাউকে ভুলানো যাবে না।

২–যুদ্ধের বাস্তব দিক

এ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের যুদ্ধের নৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে,যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষের ব্যাপারে পাশ্চাত্য জগত তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির এত উন্নতি ও অগ্রদতি সত্বে আদিম যুগের অসভ্য ও উচ্ছৃংখল জাতিসমূহের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করতে পারেনি। যুদ্ধের উপকরণ ও সাজ–সরঞ্জাম তৈরীতে তারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, সে কথা স্বীকার করা যায় না।.তাদের সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ মানের শৃংখলা, তাদের সৈনিকদের চমৎকার পোশাক, তাদের সেনাপতিদের উৎকৃষ্টতম সমরদক্ষতা, তাদের সমরাস্ত্রের মনমুগ্ধকর সাজ–সজ্জা– এসব দেখে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু এর পেছনে যে প্রেরণা ও তাড়না সক্রিয়, সেটা সেই আদিম অসভ্যতারই তাড়না। সেই আদিম বন্যতা ও হিংস্রতাকে উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রও সাজ–সরঞ্জাম সংযম ও মার্জিত রুচিবোধের বল্গা পরাতে পারেনি। বরং হিংস্রতা ও পাশবিকতা আরো বেশী উগ্র ও মারাত্মক রুপ ধারণ করেছে। আদিম অসভ্যদের সতই এই আধুনিক অসভ্যদেরও না আছে কোন মহত্তর লক্ষ্য, না আছে কোন উন্নততর ও শ্রেষ্ঠতর দৃষ্টিভঙ্গী, আর না আছে এমন কোন নৈতিক উদ্দেশ্য– যার ভিত্তিতে তারা আদিমদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা মহত বলে দাবী করতে পারে। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে একটি অসভ্য উপজাতি যে যে কারণে যুদ্ধ ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ হতো, আজকের কথিত সুসভ্য জাতিগুলোও সেই একই কারণে সম্মান, সম্পদ এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় হত্যা ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। সভ্যতা ও তমদ্দুনের উন্নতি– অগ্রগতিতে নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। উন্নতি যদি কিছু হয়ে থাকে তবে সে শুধু এই যে, আগে এই সব তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা হতো, এখন তার চাইতে দশ হাজার পর্যন্ত আনবিক বোমার হিসাবে দশ লাখ গুণ বেশী ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক শক্তি প্রয়োগ করা হয়।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উদ্দেশ্য যখন পবিত্রতা ও মহত্ব থেকে বঞ্চিত, তখন উদ্দেশ্য সাধনের কর্মপদ্ধতি যত মহত ও পবিত্র হোক না কেন, তার সাহয্যে কোন কাজ বিশুদ্ধ বা নেক কাজে পরিণত হতে পারে না। তবুও চুড়ান্ত বিচারের খাতিরে আমাদের দেখতেই হবে পাশ্চাত্য সভ্যতা কোন্ ধরনের আইনের সাহায্যে সামরিক ক্রিয়া কলাপসমূহকে শৃংখলিত

করেছে এবং সেই সব আইন–কানুন ইসলামী আইন–কানুনের মোকাবিলায় কতটা শক্তিশালী ও কার্যকর পাশ্চাত্যবাসীরা দাবী করে থাকে যে, তারা প্রাচীন যুগের হিংস্র প্রক্রিয়াসমূহ পরিবর্তন করে যুদ্ধের অত্যন্ত মার্জিত, সভ্য ও ভদ্র রীতি প্রবর্তন করেছে। যুদ্ধ আগে হিংস্র–পশুর লোমহর্ষক খেলার পর্যায়ভুক্ত ছিল। আর এখন তা রূপান্তরিত হয়েছে সভ্য সংঘর্ষে ও ভদ্র শক্তি পরীক্ষায়। এ দাবীটা এত জোরে–শোরে করা হয়েছে এবং তার সাথে বাহ্যিক শান–শওকতের এরূপ উপকরণ মিলিত হয়েছে যে, অজ্ঞ বিশ্ববাসী তা শুনে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে বসে। কিন্তু আমরা যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে চাই যে, আসলে এ দাবী কতখানি সত্য।

আন্তর্জাতিক আইনের স্বরূপ

পশ্চিমা জাতি ও দেশসমূহের পারস্পারিক আচরণ, লেন–দেন এবং যুদ্ধ ও সন্ধি যে আইন অনুসারে সম্পন্ন হয়, প্রচলিত ভাষায় তাকেই বলা হয় আন্তর্জাতিক আইন (International Law) আইন বিশারদগণ এর নানা রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে সবচেয়ে প্রশস্ত সংজ্ঞা হলো এইঃ

" পারস্পরিক আচার–আচরনের ক্ষেত্রে সভ্য জাতিগুলো যে, রীতি–প্রথা মেনে চলে তাকেই বলে আন্তর্জাতিক আইন।"

এই রীতি–প্রথাগুলো কোন উর্ধ্বতন কর্তৃত্বশীল শক্তি কর্তৃক রচিত হয়নি যে, তা মেনে চলতে উক্ত জাতিগুলো বাধ্য হবে এবং তাতে কোন রদবদল করতে পারবে না। এইসব রীতিপ্রথা তারা নিজেরাই নিজেদের সুবিধার জন্য তৈরী করেছে। রচয়িতা হিসাবে তারাই একে যেমন ইচ্ছা রূপ দেয়ার ও যেমন খুশী পরিবর্তন বা রদবদল করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে। সুতরাং অধিকতর নির্ভুলভাবে বলতে গেলে কথাটা দাঁড়ায় এরুপ যে, পাশ্চাত্য জাতিগুলো আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলে না বরং আন্তর্জাতিক আইনই পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে অনুসরণ করে। নিজেদের সুবিধার জন্য তারা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করে সেটাই আইন। আর তারা যে কর্মপন্থা বর্জন করে তা আদৌ আইন নয়। যে রীতিনীতি মেনে চলার ব্যাপারে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আজ ঐক্যবদ্ধ, সেগুলোই আজকের আন্তর্জাতিক আইন। তবে তা আগামী কালের জন্যও আইন হবে এমন কোন কথা নেই। কাল যদি তারা এই রীতি–নীতি পরিবর্তন করে নতুন কোন রীতি–নীতি প্রবর্তন করে তবে বর্তমান আইন

বাতিল ও রহিত হয়ে যাবে এবং সেই নতুন রীতি–নীতি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণতহবে।

একারনেই কতিপয় নামজাদা পাশ্চাত্য আইনবিদ এই রীতি–নীতিকে 'আইন' নামে অভিহিত করা ভুল মনে করেন। অষ্টিন তদীয় গ্রন্থ (Province of Jurisprudence determined) "আইন শাস্ত্রের সীমা"তে লিখেছেনঃ

"আন্তর্জাতিক আইনের শক্তি সম্পূর্ণরূপে জনমতের ওপর নির্ভরশীল। তাই একে সঠিক অর্থে আইন বলা চলে না।"

লর্ড স্যালিসবারি বলেনঃ

"এ আইনকে কোন আদালত শক্তি প্রয়োগে কার্যকরী করতে সক্ষম নয়। তাই একে আইন নামে অভিহিত করা বিভ্রান্তিকর।"

১৮৭১ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট একটি মামলার রায় দান প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলেনঃ

"সামুদ্রিক আইনও সকল আন্তর্জাতিক আইনের মত সভ্য দেশসমূহের সার্বিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত হবার কারণে যে এ আইন সরকারীভাবে কার্যকরী হচ্ছে তা নয় বরং একে সাধারণভাবে একটি কার্য–বিধি হিসাবে গ্রহণ করার কারণেই এ আইন সরকারীভাবে কার্যকরী হচ্ছে।"

লর্ড বার্কনহীড স্বীয় পুস্তক 'আন্তর্জাতিক আইন' (International Law) গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আইনের স্থিতি মাত্র তিনটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীলঃ

১– জাতীয় সম্ভ্রমবোধের লালন ও সংরক্ষণ–যা আন্তর্জাতিক জনমতের প্রভাবে জন্ম লাভ করে (অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সময়ের প্রয়োজনের তাকিদে তার অপমৃত্যুও ঘটে)

২– সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্দেশ্য ব্যতীত ছোট ছোট উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বরদাশত করতে প্রস্তুত না হওয়া।

৩– এইসব স্বীকৃত আইনগুলো সকল জাতির সুবিধার্থেই রচিত হয়েছে এবং জাতিগত পর্যায়ে পৃথক পৃথকভাবে এ আইন মেনে চলার ওপরই যে সবার কল্যাণ ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল একথা বিশ্বের সকল জাতির উপলব্ধি করা।

অন্য এক জায়গায় বার্কন হীড লেখেনঃ

"নীতিগতভাবে আন্তর্জাতিক আইনের বিধিসমূহের পেছনে জনমত এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের স্বেচ্ছাপ্রনোদিত আনুগত্য ছাড়া কোন বাধ্যকারী শক্তি সক্রিয় নেই।" এ সব উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, আন্তর্জাতিক আইন নিছক কয়েকটি জাতির প্রচলিত রীতি–নীতি মাত্র, এর কোন আইনগত মূল্য ও মজবুত ভিত্তি নেই।

আন্তর্জাতিক আইনের উপাদান সমূহ

বিভিন্ন উপদানের সমন্বয়ে এ আইনের কাঠামো রচিত হয়েছে। এসব উপাদানের সাংগঠনিক মূল্যকারনও নানা স্তরে বিভক্ত। কতিপয় উপাদান–আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। অন্য কয়েকটি উপাদান কেবল বস্তুগত প্রভাবের অধিকারী এবং অনেক সময় এগুলোর প্রভাব নৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে যায়। পরবর্তী আলোচনা বুঝবার জন্য আন্তর্জাতিক আইনের এইসব উৎসের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১– প্রথম উৎসটি হলো আইন শাস্ত্রবিদদের মতামত। গ্রোটিয়াস থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইনের যত পন্ডিত অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের সকলের ধ্যান–ধারণা বই পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ আইন রচনায় তাদের বিরাট অবদান রয়েছে। কিন্তু তাদের মতামতের আইনানুগ শুধু এতটুকুই যে, জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীতে তাদের নিকট থেকে বেল পরামর্শ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাদের ওপর মোটেই নির্ভর করা হয় না। লরেন্স স্বীয় গ্রন্থ 'প্রিন্সিপল্স অব ইন্টারন্যাশনাল ল'তে লিখেছেনঃ

"বিতর্কিত বিষয়সমূহে পরম সম্মানের সাথে তাদের মতামতের উল্লেখ করা হয় এবং তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা হয়। কিন্তু কোন দিক দিয়েই সেই মতামত চূড়ান্ত নয়।"

বার্কনহীড লিখেছেনঃ

"তারা আইন রচনা করেন না। বরং বাস্তবিক পক্ষে দেশসমূহ কোন্সব আইন ও রীতিনীতি বাস্তবায়িত করে যাচ্ছে তাই বলে মাত্র।"

বিচারপতি গিরে তায়র এক রায়ে বলেনঃ

"এই জাতীয় লেখকদের গ্রন্থাবলী থেকে আদালতে যেসব উদ্ধৃতি দেয়া

হয়, তার উদ্দেশ্য আইন কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা বলা নয়– বরং আইনটি বাস্তবে কিরূপ তার স্বপক্ষে একটা নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য পেশ করা হয়।"

প্রধান বিচারপতি কোকবার্ণ তাঁর এক রায়ে লিখেনঃ

এইসব গ্রন্থকারের মতামত কোন আইন তৈরী করতে পারে না। অবশ্য সভ্য দেশসমূহ স্বেচ্ছায় এগুলো গ্রহণ করে নিলে তা আইনের রূপ নিতে পারে।

এই সব প্রামাণ্য উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞগণ যে বিরাট গ্রন্থাবলী লিখেছেন তা আইন রচনা করার ক্ষমতা রাখে না।

(২) আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ এই আইনের দ্বিতীয় উৎস। এই চুক্তি দুই রকমেরঃ ঘোষণামুলক (Declaratory) ও অঘোষণামূলক (Non-Declaratory)। ঘোষণামুলক চুক্তি বলতে সেইসব চুক্তিকে বুঝায় যাতে সকল দেশ কিংবা অধিকাংশ দেশের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কোন বিশেষ বিধি তৈরী করা হয়। ১৯৮৫ সালের ভিয়েনা চুক্তি, ১৮৫৬ সালের প্যারিস চুক্তি, ১৮৬৪ ও১৯০৬ সালের জেনেভা চুক্তি, ১৮৭১ সালের লন্ডন ঘোষণা ১৮১৯ ও১৯০৭ সালের হেগ চুক্তি, ১৯০৯ সালের লন্ডন ঘোষণা এবং ১৯২২ সালের ওয়াশিংটন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এসব চুক্তিতে যারা সই করে তাদের জন্য এগুলো মেনে চলা বাধ্যতামূলক। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই এ অধিকার আছে যে, যখন ইচ্ছা চুক্তির অন্যান্য অংশীদারকে জানিয়ে চুক্তি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। এ ধরণের চুক্তি দ্বারা কোন আন্তর্জাতিক আইনের জন্ম হয় না। লরেন্স বলেন, এ ধরণের চুক্তি হলেই যে তাকে আইনের মর্যাদা সম্পন্ন হতে হবে, তা বলা যায় না। এর পরে আসে অঘোষিত চুক্তির প্রসঙ্গ। বিপুল সংখ্যক দেশের মধ্যে না হয়ে দুই বা ততোধিক (মুষ্টিমেয় সংখ্যক) দেশের মধ্যে যে সমঝোতা বা আপোষ চুক্তিসম্পাদিত হয়, কিংবা নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব যৌথ ব্যবস্থা গৃহীত হয় সেগুলি এ জাতীয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। লরেন্স বলেনঃ

"এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চুক্তিসমূহ আন্তর্জাতিক আইন কি, তা বলে না। বরং আন্তর্জাতিক আইনে কি নেই তা বলে দেয়।"

আইন প্রণয়নের ব্যাপারে এই উভয় প্রকার আইনের কোন ক্ষমতা নেই। তবে কতিপয় চুক্তি এমন রয়েছে যা আইনের মূলনীতি রচনা করে। উদাহরণ

স্বরূপ হেগ চুক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এই মূলনীতি গুলোও সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের যৌথভাবে গৃহীত আচরণ নীতির ওপর নির্ভরশীল। কোন বড় দেশ কিংবা একাধিক দেশ মিলিত হয়ে এগুলো ভঙ্গ করলে বাকি সব দেশই তা ভঙ্গ করে এবং আইনের প্রতি আর কারো কিছুমাত্র অনুগত্য থাকে না।

(৩) তৃতীয় উৎস আন্তর্জাতিক শালিশী কমিটি, আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Prize courts) ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমূহের সিদ্ধান্ত। আসলে এসব সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন আইন তৈরী হয় না। বরং শুধুমাত্র বর্তমান আইনসমূহকে উপস্থিত ঘটনার ক্ষেত্রে কার্যকরী করা হয়। কাজেই খুব বেশী বললে একে আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বলা যেতে পারে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, অতীতের কতিপয় বিচারপতি সমসাময়িক সমস্যাবলীর সমাধান করতে গিয়ে আইনের কিছু সাধারণ মূলনীতিও রচনা করে দিয়ে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ লর্ড লিষ্ট ভেল, এম পুরতালিস এবং বিচারপতি ষ্টোরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদেরকে আন্তর্জাতিক আইনের সচয়িতাদে মধ্যে গন্য করা হয়। কিন্তু তাদের রচিত মূলনীতিগুলিও দেশ সমূহের স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করা ছাড়া কার্যকর হতে পারে না।

(৪) চতুর্থ উৎস হলো বিভিন্ন সরকার কর্তৃক আপন সেনাবাহিনীকে দেয়া নির্দেশাবলী। এসব নির্দেশ প্রথমে কোন একটি দেশের পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে অন্যান্য দেশও তা পছন্দ করে আপন এলাকায় প্রবর্তন করেছে। এবং ক্রমে ক্রমে তা একটা আন্তর্জাতিক বিধিতে পরিণত হয়েছে। এসব নির্দেশ দ্বারা একটা আইন তৈরী হতে পারে সেকথা অনস্বীকার্য। তবে তা আন্তর্জাতিক কর্তব্যের ভিত্তিতে নয়, বরং বিভিন্ন দেশের নিজস্ব পছন্দ ও মনোনয়নের ভিত্তিতে। প্রত্যেক দেশেরই অধিকার রয়েছে, সে নিজের ইচ্ছা মতো এই আইনকে পাল্টে দিয়ে অন্য আইন চালু করতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইনের স্থিতিশীলতা

উপরের আলোচনায় আন্তর্জাতিক আইনের চারটি উপাদান বিশ্লেষণ করা হলো। এসব উপাদানের সম্মিলিত ও সমন্বয় দ্বারা আন্তর্জাতিক আইন তৈরী হয়। এগুলোর কোনটিই আলাদা আলাদাভাবে এমন আইন প্রণয়ন ক্ষমতার

অধিকারী নয়, যার আনুগত্য করতে বিশ্বের জাতিসমূহকে বাধ্য করা যেতে পারে। পৃথক পৃথকভাবে কোন একটি উপাদানও যখন এই ক্ষমতার অধিকারী নয়, তখন এগুলোর সমন্বয় গঠিত আইনও সে ক্ষমতার মালিক হতে পারে না। কেননা স্তম্ভ দুর্বল হলে তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দালান দুর্বল হতে বাধ্য। এইসব উপাদানের ভিত্তিতে যে আইনের প্রাসাদ তৈরী হয়েছে তার ওপর নজর বুলালেই বুঝা যায় যে, এই নির্মাণ কার্যটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এতে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই দেশসমূহের সম্মতিকে অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়েছে। যে বিধি সকল দেশ বা অধিকাংশ দেশ একমত হয়ে মেনে নেবে সেটাই আন্তর্জাতিক আইন। আর যে বিধি তারা মানবে না, কিংবা কিছুকাল মেনে চলার পর বর্জন করবে, তা আদৌ আইন পদবাচ্য নয়। এভাবে এ আইনটি নিছক আধিপত্যবাদী দেশসমীহের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি ও লোভলালসা চরিতার্থ করার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ঐসব দেশের ধুর্ত, মতলববাজ, স্বার্থান্ধ ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদেরকে উক্ত আইন রচনা করা, যেমন খুশী কাজে লাগানো ও প্রয়োজন মত তাতে রদবদল করার যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আইনটিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের এত অবাধ সুযোগ, দ্বিমত পোষণের এত উদার অবকাশ এবং দায়িত্ব এড়ানোর এত প্রশস্ত সুবিধা রাখা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি দেশ নিজ স্বার্থের অনুকুলে যখন ইচ্ছা তা ভঙ্গ করতে পারে এবং ভঙ্গ করা সত্ত্বেও তা যথাযথভাবে বহাল থাকতে পারে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, আইন নিজেই আইন ভঙ্গ করার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছে।

বস্তুতঃ এই 'মাকড়সার বাসা'(চরম দুর্বল আইনটি) আজ শুধু এ জন্যই টিকে আছে যে, আধিপত্যবাদী বৃহৎ দেশ সমূহ অর্পন স্বার্থে ও প্রয়োজনে একে টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছুক। নচেত তারা যদি এর অবাধ সুযোগ ও উদার অবকাশকে নিজেদের পরস্পর বিরোধী ও রকমারী স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দেয়, তা হলে অন্তর্জাতিক আইনের গগণ চুম্বী প্রাসাদ মুহূর্তের মধ্যে পানির বুদবুদের মত মিলিয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক আইনের যুদ্ধ সংক্রান্ত অংশ

কিন্তু এ আইনের যে অংশটি যুদ্ধ আইন বলে কথিত, তার ভিত্তি সান্ধি আইনের চেয়ে দুর্বল। পাশ্চাত্যের যুদ্ধ আইন আদৌ কোন নৈতিক ভিত্তির

ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার ভিত্তি শুধু নিজের নাগরিকদেরকে পাশবিক ক্রিয়াকান্ড এবং বীভৎস যন্ত্রণা ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য দেশ সমূহের ঐকান্তিক বাসনা ছাড়া আর কিছু নয়। একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই তারা পরস্পর মিলিত হয়ে স্থির করে নিয়েছে যে, আমরা যখন পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করবো তখন অমুক অমুক বিধি মেনে চলবো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯০৭ সালের হেগ সম্মেলনে যুদ্ধবন্দীদের জন্য অসংখ্য সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরূপ ব্যাপক সুযোগ–সুবিধার ব্যাপারে দেশ সমূহ যে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছিল তার কারণ এ নয় যে, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসা দেশ সময়হের সাথে ভালো ব্যবহার করাকে তারা নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতো। এর প্রকৃত কারণ ছিল এই যে, প্রতিটি দেশ প্রত্যাশা করতো তার সৈন্যরা যখন শত্রুর হাতে বন্দী হবে তখন যেন তাদের ওপর প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করা না হয়। আজ যদি কোন দেশ ঐ চুক্তিভঙ্গ এবং যুদ্ধ বন্দীদের সাথে ৬ষ্ঠ শতকের রোম ও ইরানী সাম্রাজ্যের মত আচরণ করে তাহলে প্রতিপক্ষ যত ভদ্র দেশই হোকনা কেন, তার জবাবে সম্ভবতঃ একই রকম পাশবিক আচরণ না করে ছাড়বেনা এবং এ ব্যাপারে কোন চুক্তিকেই সে গ্রাহ্য করবে না। অনুরূপভাবে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ, বিস্ফোরক গোলা ও বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার, সামরিক হাসপাতাল ও শুশ্রূষাকারীদের নিরাপত্তা এবং এই জাতীয় অন্যান্য সামরিক ব্যাপারে যে সব আইন রচিত হয় সেসব আইনের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। এসব বিষয়ে যতগুলো চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর ও কারণ প্রত্যেক দেশের নিজ নিজ সৈন্য ও বেসামরিক অধিবাসীদের জানমাল সুরক্ষিত করার ইচ্ছা। নচেৎ কোন এক পক্ষ এর বিরুদ্ধাচরণ করলেই দ্বিতীয় পক্ষ আর তা মেনে চলতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত থাকে না।

যুদ্ধ আইন সমূহের প্রকৃত স্বরূপ

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা চলে যে, যে বিধিমালাকে "মার্জিত" যুদ্ধ আইন বলা হয়, তা আসলে আইন নয়– চুক্তিমাত্র। চুক্তির অংশীদার সব কয়টি জাতি তা মেনে নিলে তবেই তাকে কার্যকর কর যায়। একটি দেশের পক্ষে এ আইন ততক্ষণ মেনে চলা সম্ভব যতক্ষণ অন্যরা তা মেনে চলে। একটি দেশ বা কতিপয় দেশ এর প্রতি আবধ্যতা প্রদর্শন করলে অন্যান্য দেশও তার আনুগত্য করার দায়িত্ব অনুভব করে না। এমন বিধিমালা'কে কোনক্রমেই

আইন নামে অভিহিত করা যায় না। আইনের সংজ্ঞা হলো এই যে, প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে তা মেনে চলতে বাধ্য, চাই অন্য কেউ তা মানুক বা না মানুক। যে আইনে এক ব্যক্তির আনুগত্য অপর ব্যক্তির অনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল, সেটা আইনই নয়, সেটা চুক্তি। আর চুক্তিতে যত সুন্দর সুন্দর বিধিই থাক না কেন, তা কোন প্রশংসা ও অভিনন্দনের যোগ্য নয়। কেননা তার বিধিমালা চুক্তিবদ্ধদের স্বার্থের ভিত্তিতে প্রণীত হয়–নৈতিক দায়িত্ব বোধের ভিত্তিতে নয়।

এ মত শুধু আমাদের নয় ইউরোপের বড় বড় রাজনীতিক ও আইন শাস্ত্রবিদও এই মত পোষণ করেন। স্যার টমাস বার্কলে (Barclay) তার এক নিবন্ধের উপসংহারে বলেনঃ

"যুদ্ধের প্রক্রিয়াকে সুসংবদ্ধ করার জন্য যে বিধিমালা তৈরী হয়েছে তার ওপর খুব বেশী নির্ভর করা উচিত নয়। কুটনীতির সর্বোৎকৃষ্ট মেধার সাহায্যে প্রণীত 'সর্বোত্তম মানের বিধিমালাও সামরিক প্রয়োজন এবং যুদ্ধকালীন উত্তেজনা ও আক্রোশের বশে লংঘিত হয়ে থাকে এবং এ জাতীয় উত্তেজনা, আক্রোশ ও সামরিক প্রয়োজন যুদ্ধাবস্থায় সব সময়ই মাথা চাড়া দিয়ে উঠে থাকে। তবুও সভ্য জাতি সমূহের মধ্যে হিংস্রতা ও নৃশংসতা প্রতিরোধকারী জনমত বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে, এই বিধি মালায় তা স্পষ্ট বুঝা যায়।"২৬৯

মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে জার্মানীর যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একখানি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। পুস্তক খানির নামছিল যুদ্ধের পথ নির্দেশিকা।' Kriegs Brauchim Land Kriege এর প্রথম দিকের কয়েকটি বাক্য লক্ষণীয়ঃ

" যুদ্ধ আইন আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি করা বিধান বটে। তবে তা কোন অবশ্য পালনীয় বিধান নয়। এটা পরস্পরকে সুযোগ–সুবিধা দানের একটা আপোষচুক্তি এবং সীমাহীন স্বাধীনতাকে সীমিত করার একটা প্রচেষ্টা। এটা হচ্ছে মানবীয় রীতি প্রথা, পারস্পরিক সমঝোতা, সৎ স্বভাব ও কপটতা–এই সবের মিলিত সৃষ্টি। কিন্তু প্রতিশোধের নিশ্চিত আশংকা ছাড়া এর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধকারী আর কোন শক্তি নেই।"২৭০

বস্তুতঃ এই "প্রতিশোধ ভীতি"ই ইউরোপের যুদ্ধ আইন সমূহের একমাত্র রক্ষক ও নিয়ামক, গত মহাযুদ্ধে যখন শক্তিমান দেশ সমূহের অন্ধ প্রতিশোধ

স্পৃহা এই "প্রতিশোধ ভীতি'কে মন থেকে দুর করে দিল এবং প্রতিপক্ষের পাল্টা ব্যবস্থার তোয়াক্কা না করেই কোন কোন দেশ হেগ ও জেনেভা বিধিমালাকে পাইকারীভাবে লংঘন করতে আরম্ভ করলো, তখন "সভ্য যুদ্ধ বিধি'র অনুগত বলে কথিত সব কয়টি বড় বড় দেশ এক নিমিষে কিভাবে আইনের আনুগত্য থেকে নিজেকে অব্যাহতি দিল, তা বিশ্ববাসী চর্মচোখেই দেখে নিল। এক পক্ষ একটি অপকর্ম করতেই অপর পক্ষের জন্য তা 'সৎ কর্মে' পরিণত হলো। এক দেশ আইন লংঘন করলেই অপর দেশের জন্য তা বৈধ হয়ে গেল। যে ইউরোপ নিজেই সাত বছর ধরে হেগ ও জেনেভায় যুদ্ধ আইন তৈরী করেছিল, সেই ইউরোপ একযোগে সেইসব আইনকেই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করলো। এই আইন গুলো যদি সত্যিকার কোন নৈতিক চেতনার ভিত্তিতে তৈরী হতো তাহলে কি এর এমন শোচনীয় দুরবস্থা হতে পারতো?

সামরিক প্রয়োজন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল আইন

এরপর এই আইন সমুহে যে টুকু প্রাণ অবশিষ্ট থাকে, সামরিক প্রয়োজনের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল বিধান তাকে আরো নির্জীব করে দেয়। রণাঙ্গনের নৈমিত্তিক প্রয়োজন সমূহ সর্বদাই এই সব আইনের সাথে সংঘর্ষশীল থাকেআর এই সব প্রয়োজনের মোকাবিলায় বই পুস্তকে লিখিত ও সম্মেলনে রচিত আইন সমূহ সব সময়ই পরাস্ত হয়। অধ্যাপক নিপোল্ড লেখেনঃ

"আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য অংশের তুলনায় যুদ্ধ আইনের বিধিমালায় বিরোধ ও বৈপরিত্য অনেক বেশী হয়ে থাকে। কেননা যুদ্ধ আইন ও সামরিক প্রয়োজনের মধ্যে সংঘাত বাঁধে সহজেই। এ কারণে যুদ্ধ আইনকে আন্তর্জাতিক আইনের অংশ হিসাবে বহাল রাখার অবশ্যম্ভবী ফল হবে এই যে, যুদ্ধ আইন যে স্থিতিহীনতার শিকার সেই স্থিতিহীনতায় পেয়ে বসবে আন্তর্জাতিক আইনকেও।"২৭১

একই গ্রন্থকার অন্যত্র লিখেছেনঃ

"সাধারণভাবে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি সর্বদাই কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনের অধীন থাকবে, অন্য কোন জিনিসের অধীন নয়। নিজেকে নিজে সাহায্য করা এই অবস্থার জন্য যে, আইনগত বিধিমালা তৈরী হবে, তা তৈরী করতে গিয়ে পূর্ণ সমতা ও বিশেষ বিশেষ সীমার দিকে নজর রাখতে হবে। তা

যদি না করা হয়, তাহলে আইনগত বিধিনিষেধ সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা হতে পারে। মহাযুদ্ধ এ ধারণার সত্যতা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। সুতরাং ভবিষ্যতের যুদ্ধ আইন প্রণয়নে এদিকে সর্বাবস্থায়ই লক্ষ্য রাখতে হবে।[২৭২]

লোক দেখানো আইন ও বাস্তবের পার্থক্য

হেগ সম্মেলনে যখন যুদ্ধ আইন প্রণয়ন করা হচ্ছিল, তখন ইউরোপের রাজনীতিকদের মন মস্তিক লোক দেখানো সভ্যতার প্রভাবে সমাচ্ছন্ন ছিল। এ জন্য তারা জাতি সমূহের স্বাভাবিক ও প্রকৃত সামরিক ঝোঁক প্রবণতা এবং তাদের অসভ্যগত জঙ্গীপনাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করে কতগুলো অবাস্তব আইন তৈরী করে ফেলে। সে আইন বাহ্যত অত্যন্ত ভদ্র ও সভ্যজনোচিত, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও সর্বাধিক পরিমান মানবতা সুলভ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের সামরিক কর্তারা তা মেনে চলতে আদৌ প্রস্তুত ছিলনা। জার্মানীর সামরিক প্রতিনিধি মার্শাল বি ব্রান্ডাইন সম্মেলনের শুরুতেই এই বলে হুশিয়ার করে দেন যেঃ

"আমরা এমন আন্তর্জাতিক আইন প্রবর্তন করতে চাই যার ধারাগুলো সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও পালন করা সম্ভব।" কিন্তু সে সময়ে এই সতর্কবাণীকে গ্রাহ্য করা হয়নি। ফলে হেগ সম্মেলনের বার বছর পর যখন প্রথমবারের মত ত্রিপোলি ও বলকান যুদ্ধে এইসব আইনের বাস্তবায়নের সুযোগ এল, তখন প্রকাশ্যে তা ভঙ্গ করা হলো। এর মাত্র বছর খানেক পরই মহাযুদ্ধের ভয়াবহ হিংস্রতার বন্যায় সমস্ত বিধিনিষেধের বন্ধন ভেসে গেল। এ অবস্থা দেখে ইউরোপের রাজনীতিক ও আইনজ্ঞদের হুশ হলো। তারা স্বীকার করতে লাগলেন যে, যুদ্ধকে কাল্পনিক আইন ও প্রদর্শনীমূলক বিধিনিষেধ দিয়ে সীমিত করার চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা। এরপর থেকে তারা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের উপলব্ধি ও ধ্যান–ধারনা ব্যক্ত করতে শুরু করেন। বিশিষ্ট জার্মান পন্ডিত ম্যাক্স হোবারের নিম্নলিখিত কথাগুলিতে এই নতুন উপলব্ধি পরিস্ফুটঃ

"ভবিষ্যতে আন্তর্জাতক আইন শক্তিকে একটি নয়া দায়িত্ব হাতে নিতে হবে। সমস্ত কাল্পনিক ও অস্বচ্ছ আইনসমূহের বিলোপ সাধন করে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক আইনের ত্বরিৎ ব্যাপক উন্নতি সাধনের আকাংখার বশে 'অসম্পূর্ণতা' ও 'অনিশ্চয়তা' নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া চলবে না। শুধুমাত্র জনমত অনুসরণের তাগিদে কূটনীতিকরা

আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নের অর্থহীন ধুয়া তুলে যে খোলস পুজার প্রবর্তন করেছিল কঠোর হস্তে তা প্রতিহত করতে হবে।"[২৭৩]

অধ্যাপক নিপোল্ড তো যুদ্ধ আইনের এই ব্যর্থতায় এত বেশী বিচলিত হয়েছেন যে, যুদ্ধ আইনকে আন্তর্জাতিক আইনের চৌহদ্দি থেকে একেবারেই বহিস্কার করার পরামর্শ দিয়েছেন। অধিকন্তু যুদ্ধ আদৌ আইনের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে, বা তাকে কোন আইন দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করা বৈধ, এটাও স্বীকার করেন না। তিনি বলেনঃ

"আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধের প্রশ্নে ভূমিকা রাখতে গিয়ে এ যাবৎ তার আসল সীমা অনেকখানি ছড়িয়ে গেছে। যুদ্ধকে আইনানুগ মর্যাদা দেয়ার চেষ্টায় তাকে এ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হয়েছে যে, যুদ্ধ একটা আইনগত সংস্থা। এই তাত্ত্বিক আলোচনায় সে অধিকাংশ সময় বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে বহু দুরে চলে গেছে। কিন্তু আইন যে কখনো যুদ্ধের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তারে সক্ষম হয় না এবং তাকে সকল দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও পারে না সে কথা ঐ তাত্ত্বিক পন্ডিতদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এর কারণ হলো, যুদ্ধ মুলতঃই আইনের বিপরীত বস্তু। যুদ্ধে আইনগত প্রয়োজন নয়–সামরিক প্রয়োজনই মানুষকে পরিচালিত ও উদ্দীপ্ত করে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যুদ্ধ কোন আইনগত সংস্থা নয় বরং বলপ্রয়োগে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা মাত্র। যুদ্ধ হলো একটা দ্বন্দ্ব ও শক্তি প্রয়োগমূলক কাজ আপন শক্তি প্রয়োগে আপন দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হয় বলে যুদ্ধ একটা স্বনির্ভর কাজ। সমর বিজ্ঞানে যুদ্ধের এই সংজ্ঞাই দেয়া হয়েছে এবং সংজ্ঞা যদি অগ্রাহ্যও করা হয় তবুও যুদ্ধ যে সামগ্রিকভাবে আইনের গন্ডীবহির্ভূত, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। একে যদিও নানা উপায়ে আইন–শৃংখলার আওতায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে এবং একটা নয়া যুদ্ধ–আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে।[২৭৪]

অপর এক আইন বিশারদ হরউইটস (Hwrqits) লিখেছেনঃ

"যুদ্ধের প্রকৃতি ও চরিত্রের সাথে আইন এত সামঞ্জস্যহীন যে, যুদ্ধাবস্থায় যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ–আইন দেশসমূহের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে তার চরিত্র এক কথায় বলতে গেলে নিছক নৈরাজ্যবাদী (Anarchical)। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ–আইন আপন প্রকৃতিও চরিত্রের দিক দিয়ে কেবলমাত্র একটি পারস্পরিক সমঝোতায় পৌছার চেষ্টা। ভবিষ্যতেও তা এমনিই থাকবে।"[২৭৫]

ম্যাক্‌স হোবরও এই মতের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

"মহাযুদ্ধের পুর্বেই এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হতে শুরু করে যে, যুদ্ধ প্রাগ সভ্যতা যুগের শেষ চিহ্ন এবং যুদ্ধ–আইনসমূহের অস্বাভাবিক উন্নতি ও বিস্তৃতি নিছক জালিয়াতি ও ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা এই আইন আমাদেরকে যুদ্ধের চরিত্র ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রতারিত করে। রাজনীতির একটা সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, জনগণের হয় শান্তিপূর্ণ আইনানুগ অবস্থা বহাল রাখা উচিত, নচেত জোর–জবরদস্তিমূলক অরাজক অবস্থায় লিপ্ত হওয়া উচিৎ। কিন্তু যুদ্ধ–আইন আমাদেরকে এই রাজনৈতিক মূলনীতি সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়।"২৭৬

এই লেখকই অন্যত্র লিখেছেনঃ"যুদ্ধকে একটা আইনগত প্রতিষ্ঠান মনে করে এর কার্যকলাপ সমূহকে আদালতের মামলার মত আইনের আওতায় নিয়ে আসার খোশ খেয়াল পোষণ আন্তর্জাতিক আইনের ভ্রান্তি এটা রোমীয় ও মধ্যযুগীয় খোশ খেয়ালেরই অন্তর্ভুক্ত।"২৭৭

উপরোদ্ধৃত এই উক্তিগুলো করেছেন ইউরোপের সর্বজনমান্য আন্তর্জাতিক আইন বিশারদগণ। তাদের গৌরবোদ্দীপক যুদ্ধ আইন সমূহের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা স্বীকার করতে গিয়ে নিশ্চয়ই তাদের মনে দুঃখ লেগে থাকবে। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রথম আন্তরাষ্ট্রীয় যুদ্ধেই যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, এত পরিশ্রম করে তারা যুদ্ধ আইনের যে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন তা মাকড়সার জাল ও পানির বুদবুদের চেয়েও দুর্বল ও অস্থায়ী, তখন তারা ভাবনায় পড়ে গেলেন যে, আন্তর্জাতিক আইনের এই যুদ্ধ সংক্রান্ত অংশটির স্থিতিহীনতা ও দুর্বলতা যেন গোটা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। এজন্য তারা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করে নেন যে, যুদ্ধকে কোন আইন ও বিধির আওতায় আনা আদৌ সম্ভব নয়। যুদ্ধ ও আইনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ বিদ্যমান। যুদ্ধ আইনের মেজাজেরই বিরোধী। তারা স্বীকার করলেন যে, হেগ ও জেনেভাতে যে যুদ্ধ–আইন তৈরী হয়েছে, তা প্রকৃত যুদ্ধ–আইন নয়। রণাঙ্গণে তোপ ও সঙ্গীন যে আইন প্রণয়ন করে, সেটাই প্রকৃত যুদ্ধ আইন।

বস্তুতঃ এই হলো বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সভ্য ও ভদ্র যুদ্ধ–আইনের রহস্য এবং তার আসল চেহারা।

সমরবিদ ও আইনবিদের মধ্যকার মতবিরোধ

বাইরের জৌলুস ও অন্তরের আসল চেহারার মধ্যকার এই বৈপরিত্যের মূল কারণ হলো ইউরোপে প্রথম থেকেই ভিন্ন দৃষ্টিকোণের অধিকারী দুটো গোষ্ঠী রয়েছে। একদিকে রয়েছেন নৈতিকতাবাদী দার্শনিক, আইন–জীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এই গোষ্ঠীটি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা ও প্রদর্শন প্রিয়তার বশে যুদ্ধকে নৈতিক গন্ডীর মধ্যে সীমিত করতে এবং একে কেবল একটি মার্জিত ও ভদ্রজনোচিত সংঘর্ষের রূপ দিতে চেষ্টা করছে। কিছু সংখ্যক লোক আপন সুকুমার বৃত্তির চাপে পড়েও যুদ্ধকে নৈতিক গন্ডীতে সীমিত করতে চায়। তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। দ্বিতীয় গোষ্ঠী সমর কুশলীদের। এদের নিকট যুদ্ধ একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বনিয়ন্ত্রিত কাজ। তাদের মতে এটি এমন কাজ যা মানুষ সকল আইনানুগ কলা–কৌশল গ্রহণ করে

ব্যর্থ হওয়ার পর যেন–তেন প্রকারে শত্রুকে পর্যুদস্ত করে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য গ্রহণ করে। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক বিরোধ ও বৈপরীত্য রয়েছে। একটি গোষ্ঠী কেবল আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধিকেই আসল কাজ মনে করে। অপরটি নৈতিকতা ও ভদ্রতাকে সমুন্নত রাখতে উৎসুক। একটি গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী হলো, আইন ভঙ্গ করে আইনেরই আনুগত্য করার কোন অর্থ হয়না। অপর গোষ্ঠী মনে করে, আইনের আনুগত্য সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই সভ্য মানুষের উচিত আইন ভঙ্গ করলেও তা কিছুটা আইনের আনুগত্যের মধ্য দিয়েই করা উচিত। এ মৌলিক মতপার্থক্য কেবল চিন্তা ও ধ্যান–ধারণার ক্ষেত্রেই সীমিত নয় বরং উভয়ের কর্মক্ষেত্রও আলাদা। আইনবিদ ও রাজনীতিবিদগণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমূহ ও সংস্থা সমূহে প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। এজন্য তারা আপন–আপন প্রভাব খাটিয়ে যুদ্ধকে একটা কাগুজে বিধি–নিষেধের মধ্যে বেধে দেয়। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে এই বিধি নিষেধের বন্ধনকে অক্ষুণ্ন রাখা তার সাধ্যাতীত ব্যাপার। সৈন্যদের পরিচালনা ও নেতৃত্বদান, সামরিক বিভাগ সমূহের সংগঠন ও শৃংখলা রক্ষা, যুদ্ধরত সৈন্যদের দেখা–শুনা করা এবং যুদ্ধকালীন নেতৃত্বদান, এ সবই পুরোপুরি ভাবে সামরিক গোষ্ঠীর আয়ত্বাধীন। এ কারণে যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয় তখন তারা এই বিধিনিষেধ অকাতরে ভঙ্গ করে। তারা আইনবিদ গোষ্ঠীর উপস্থিতি সত্ত্বেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নির্বিচারে সেই সমস্ত কাজ করে যা হেগের আইনে অবৈধ হলেও সামরিক প্রয়োজনের আইনে বৈধ।

এটা বলা বাহুল্য যে প্রকৃত গুরুত্ব ও নির্ভরতা কথার নয়, কাজের। বক্তা যাই বলুক, আমাদের দেখতে হবে, কর্তা কি করে। আমরা মনে করি, লিখিতভাবে পাশ্চাত্যের যে আইন আমরা পাই, আসলে পাশ্চাত্যের যুদ্ধ আইন সেটি নয়। পাশ্চাত্যবাসী যুদ্ধাবস্থায় যে বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করেন সেটিই তাদের যুদ্ধ আইন। এজন্য আইনবিদদের গোষ্ঠী নয় বরং সমরবিদদের গোষ্ঠীই আমাদের নিকট একমাত্র নির্ভরযোগ্য এবং একমাত্র কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠী। যুদ্ধ আইন সমূহ সম্পর্কে এই গোষ্ঠীটির ধ্যান ধারণা পড়ে দেখলেই পাশ্চাত্যবাসীর প্রকৃত মনোভাব জানা যায়। বস্তুতঃ এটাই প্রকৃত পক্ষে জানবার উপযুক্ত পন্থাও।

ইউরোপের প্রখ্যাত যুদ্ধ আইন বিশারদ ক্লাউস উইট্স্ (Clause Witz) তদীয় গ্রন্থ (Yom Kriege) এ লিখেছেনঃ

"যুদ্ধ আইন হলো স্ব–আরোপিত বিধিনিষেধ মাত্র। তবে এ গুলো অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও অনুল্লেখযোগ্য। আসলে পরিভাষায় যে গুলিকে 'যুদ্ধ প্রথা' বলে, সেগুলোই যুদ্ধ আইন। এখন মানবতাবাদী জনগণ স্বাভাবিক ভাবেই এ ধারণা পোষণ করবেন যে, শত্রুকে কোন বড় রকমের রক্তপাত ছাড়াই বিপর্যস্ত ও নিরস্ত্র করার একটা বিশ্বজনোচিত পন্থা রয়েছে। এই পন্থাটিই যুদ্ধবিদ্যার লক্ষ্য বস্তু। কিন্তু এ ধারণা যতই চিত্তাকর্ষক মনে হোকনা কেন, আসলে সম্পূর্ণ ভুল। এ ধারণা যত শীঘ্র দূর করা যায় ততই ভালো। কেননা যুদ্ধের মত ভয়াবহ কাজে দয়া দাক্ষিণ্যের প্রবেশাধিকার দিলে যে কুফল সমূহ দেখা দেয় তা আরো খারাপ জিনিস।... ... ... যুদ্ধের দর্শনে নম্রতা ও মধ্যম পন্থার নীতিকে ঢুকতে দেয়াই ভুল।... ... আসলে যুদ্ধ হলো, একটা বল প্রয়োগ ও জোর জবরদস্তিমূলক কাজ। এ কাজে কোন রকমের বিধিনিষেধ মেনে চলার বাধ্যবাধকতার অবকাশ থাকতে পারেনা।"[২৭৮]

ইতিপূর্বে আলোচিত জার্মানীর অপর একটা যুদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থে (Kriegs brauch) বলা হয়েছেঃ

"সৈনিককে ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। সে দেখতে পাবে, যুদ্ধে এক ধরণের কাঠোরতা প্রয়োগ করা সর্বাবস্থায়ই জরুরী। অনেক সময় প্রকৃত মানবতাই তার অবাধ প্রয়োগ দাবী করে।"[২৭৯]

একই পুস্তকের অন্যত্র হেগের সভ্য যুদ্ধ আইন এবং অনুরূপ অন্যান্য আপোষ চুক্তি সমূহকে 'যুদ্ধের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী' "সুক্ষ্ম ও হালকা আবেগের ঢেউ" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এডমিরাল আওবে (Admiral Aube) তার এক নিবন্ধে লেখেনঃ

"যুদ্ধের সংজ্ঞা আমাদের দৃষ্টিতে এরূপ যে, যুদ্ধ হলো অধিকার হরণকারী শক্তির বিরুদ্ধে অধিকারের জন্য ফরিয়াদ। এর দ্বারা স্বভাবতই এটা অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় যে শত্রুকে সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করাই যুদ্ধের প্রধানতম লক্ষ্য। যেহেতু একটি জাতির প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য্যের উপকরণ সমূহই আসলে যুদ্ধের স্নায়ূকেন্দ্র, তাই যে জিনিস শত্রুজাতির সম্পদের ওপর এবং সবচেয়ে বেশী তার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের উপকরণ সমূহের ওপর আঘাত হানে, তা বৈধই নয় বরং অপরিহার্য, চাই দুনিয়ার মানুষ তাকে যে চোখেই দেখুক এবং যে রকমই মনে করুক না কেন।"২৮০

ইউরোপের নৈতিকতাবাদী ও রাজনীতিবিদগণ পৃথিবীতে আপন সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্য যে চিত্তাকর্ষক ও মানবতাসুলভ যুদ্ধ–আইনসমূহ তৈরী করেছে তার বাস্তবায়ন যে গোষ্ঠীটির পছন্দ ও মর্জির ওপর নির্ভরশীল তারা উক্ত আইনগুলোকে যে কিরূপ বাজে ও নিষ্প্রয়োজন মনে করে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনের মোকাবিলায় এগুলো মেনে চলতে যে তাদের কত অনীহা, তা উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝা যায়। প্রথমদিকে আইনবিদ গোষ্ঠী উক্ত সমরবিদ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপন মানবতা ও সভ্যতার দাবী নিয়ে সংগ্রাম করতে থাকেন। কিন্তু যখন মহাযুদ্ধে সমরবিদ গোষ্ঠী আপন দোর্দন্ড ক্ষমতা কার্যকরভাবে জাহির করলো তখন উক্ত খোশখেয়ালধারী চিন্তাবিদগণকে তিক্ত বাস্তবতার সামনে পরাজয় স্বীকার করতে হলো। আর বাস্তব শক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সমরবিদদের গোষ্ঠী যে মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করলো তারাও তা মেনে নিল। অধ্যাপক নিপোল্ড ও ম্যাক্স হোবারের মুখে এই পরাজয়ের স্বীকারোক্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় এইসব জঙ্গীপনার চাপে পড়ে যুদ্ধ আইনের খুটিনাটি বিধিতে কিরূপ রদবদল করা হয়েছে তাও দেখা যাবে।

৩ – পাশ্চাত্য যুদ্ধ আইনের নীতিগত মর্যাদা

নীতিগতভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আন্তর্জাতিক আইন ও তার সমর বিভাগের প্রকৃত স্বরূপ আমি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। এই আইন কি, আইনের

মর্যাদা কতখানি, অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক দিয়ে তা কিরূপ গুরুত্বের অধিকারী, তাছাড়া তার নিজের দৃষ্টিতে তার সমর বিভাগ কিরূপ, এতে যুদ্ধকে নৈতিক সীমার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষমতা কতখানি আছে, নীতিগতভাবে ও বাস্তবে যুদ্ধকে নিয়ম–শৃংখলা ও সংযমের অধীনে নিয়ে আসার ব্যাপারে তা কতখানি কার্যকর হতে পারে।–এসব প্রশ্নের জবাব উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ঐ আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যে আইনকে পাশ্চাত্যের যুদ্ধ আইন বলা হয় আসলে তা কোন আইনই নয়।

এখন আমরা দেখতে চাই, এই তথাকথিত যুদ্ধ আইন যেমনই থাক না কেন, যুদ্ধকে শৃংখলার মধ্যে আনা ও নৈতিকতার গন্ডীর মধ্যে সীমিত করার ব্যাপারে তা কতখানি সফল হয়েছে? এ আইন যেসব বিধি–নিষেধ আরোপ করেছে, তা ইসলামী আইনের আরোপিত বিধি–নিষেধের তুলনায় কিরূপ? তার কৃত্রিম প্রদর্শনীমূলক বিধিমালা ও আসল বিধিমালায় প্রভেদ কি? এই আইন থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে মানবীয় চিন্তার যে উন্নতি ও বিকাশ প্রতিফলিত হয় তার সাথে ইসলামী আইনের সম্বন্ধ কি? এ আইন বাস্তবিক পক্ষে মানবতার কতটুকু সেবা করেছে?

যুদ্ধ আইনের ইতিবৃত্ত

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ইউরোপবাসী যুদ্ধ আইনের কথা কল্পনাও করতে পারতো না। নীতিগতভাবে এবং বাস্তবে যুদ্ধকে নৈতিক সীমারেখা ও বিধি–নিষেধের বাধ্যবাধকতার ব্যতিক্রম মনে করা হতো। যুদ্ধরত লোকদের পরস্পরের ক্ষতি করার অবাধ ও সীমাহীন অধিকার ছিল। সে সময়কার যুদ্ধবিগ্রহের যে বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে, যুদ্ধের সময় একে অপরের প্রতি কঠোরতম জুলুম ও নৃশংসতম অপরাধ করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করতো না। এটা শুধু যে রণাঙ্গণেই ঘটতো তা নয়, চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও সামরিক ও বে–সামরিক লোকজনের মধ্যে কোন পার্থক্য করার মনোভাব ছিলনা। গ্রোটিয়াসের ন্যায় নীতিবাগীশ আইন রচয়িতারও অভিমত ছিল যেঃ "আইন অনুসারে শত্রুর সীমার মধ্যে যত লোক পাওয়া যাবে তাদের সকলকে হত্যা করা বৈধ। এতে নারী ও শিশুরা ব্যতিক্রম নয়। এমনকি যুক্তিসঙ্গত মেয়াদের মধ্যে ঐ এলাকা ত্যাগ না করলে বিদেশীরাও রেহাই পাবে না।" [২৮১]

১৬১৮ ও ১৬৪৮ সালের তিরিশসালা যুদ্ধে উল্লিখিত সীমাহীন অধিকার এমন অবাধে ব্যবহৃত হয়েছে যে, সমগ্র ইউরোপ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধের মর্মন্তদ ও হৃদয় বিদারক ঘটনাবলী ইউরোপের চিন্তাশীল মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে যে, যুদ্ধ তৎপরতার ওপর কোন না কোন ধরনের নৈতিক বিধি–নিষেধ আরোপিত হওয়া প্রয়োজন। এই ভাবনা সর্বপ্রথম হল্যান্ডের আইন রচয়িতা গ্রোটিয়াসের মনে স্পষ্টভাবে দানা বাঁধে এবং তাঁকে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। তার সেই গ্রন্থ Dijuri Beliac Pacis-কে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি বলে মনে করা হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৬৬৫ সালে এবং তা হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে চালু হয়। এতে করে ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা সাধারণ মানসিক জাগরণ আসে এবং লেখক–সাহিত্যিকগণ এই নতুন পথ ধরে পাশ্চাত্য চিন্তার বিকাশ সাধনে নিয়োজিত হন। গ্রোটিয়াসের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর তার শিষ্য পাফেনডরফ (Puffendorff) Dejure Natureet Gentium নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর পর এই বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত এসে এই গ্রন্থাবলী আন্তর্জাতিক আইনের একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার রূপায়নে সক্ষম হয়। ১৭৮০ সালে বৃটেনের প্রখ্যাত আইন রচয়িতা জারমি বেনথেম (Jermy Benthem) এই চিন্তাধারাকে 'আন্তর্জাতিক আইন' নাম দেন। সেই থেকেই এটা আন্তর্জাতিক আইন নামে পরিচিত।

বাস্তবক্ষেত্রে ইউরোপীয় যুদ্ধ তৎপরতার ওপর এই উন্নত চিন্তাধারার প্রথম প্রভাব প্রতিফলিত হয় ওয়েষ্টফলিয়া (westphalia) সম্মেলনে। এখানে ইউরোপিয় চিন্তাবিদগণ তিরিশসালা যুদ্ধশেষে ১৬৪৮ সালে গ্রোটিয়াসের এই সুপারিশ গ্রহণ করেন যেঃ

"যুদ্ধে একটা সৌজন্যমূলক সুবিধা হিসেবে (আইন হিসেবে নয়) শিশু, বৃদ্ধ, নারী, ধর্মযাজক, কৃষক, ব্যবসায়ী ও যুদ্ধবন্দীদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা উচিত।" ২৮২

হযরত ঈসার জন্মের ১৬৪৮ বছর পর ইউরোপের এক তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে এই প্রথম একটু আলোর আভা দেখা গেল। এরপর তিরিশসালা যুদ্ধের মত অমন পাশবিক ও বীভৎস ক্রিয়াকান্ডের তীব্রতা ও ব্যাপকতা আর কোনো

যুদ্ধে দেখা যায়নি। কিন্তু সৈন্যদের সামরিক নৈতিকতার কার্যকর উৎকর্ষ ও উন্নয়নে এবং যুদ্ধ তৎপরতার সত্যিকার পরিশুদ্ধি সাধনে দুশো বছর পর্যন্ত ইউরোপ কোন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের আজাদী সংগ্রামের (১৮৫৭ সালে তথাকথিত বিদ্রোহে) সময় ইংরেজ সৈন্যরা এমন ভয়াবহ নির্যাতন ও অত্যাচার চালায়, যা কল্পনা করতেও মানবীয় বিবেক শিউরে ওঠে। আমাদের যতদূর জানা আছে, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপে সমর আইন সংক্রান্ত এমন কোন বিধির অস্তিত্ব ছিলো না যা ইউরোপীয় দেশসমূহ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং যা ইউরোপীয় সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ–আইনরূপে চালু করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে আমেরিকাই সর্বপ্রথম এই দিকে অগ্রসর হয়। ১৮৬৩ সালে আমেরিকা তার সৈন্যদের জন্য একটি নির্দেশনামা তৈরী করে। এর উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যদের কর্মপদ্ধতিকে শৃংখলাবদ্ধ করা। এরপর জার্মানী,ফ্রান্স, রাশিয়া এবং ইংল্যান্ডও এ ধরনের নির্দেশাবলী জারী করতে আরম্ভ করে। ক্রমে ইউরোপের সকল জাতি সেই কর্মপন্থাটি অবলম্বন করলো যা তাদের থেকে প্রায় ১২ শো বছর পূর্বে "অসভ্য" আরবদেশে এক নিরক্ষর নবী ও তাঁর নিরক্ষর খলিফারা চালু করেছিলেন।

এর এক বছর পর ১৮৬৪ সালে সুইজারল্যান্ড সরকার জেনেভায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করেন। এতে প্রথমবারের মত রুগ্ন, আহত ও চিকিৎসকদের সম্পর্কে আইন রচিত হয়। ১৮৬৮ সালে আর একটি সম্মেলনে ঐ আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তৎসহ অনেক নুতন বিধি সংযোজিত হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত ইউরোপে যুদ্ধ আইনের ক্ষেত্রে শূণ্যতা বিরাজমান থাকে। ১৯০৬ সালে জেনেভায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন এই অভাব পূর্ণ না করা পর্যন্ত ঐ শূণ্যতা অব্যাহত থাকে।[২৮৩]

ধ্বংসাত্মক অস্ত্র–শস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারে ইউরোপে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কোন বিধি বিধানের বালাই ছিল না। এ বছর সর্বপ্রথম সেন্ট পিটাসবার্গে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশন পাশ্চাত্যবাসীর নিকট চারশো গ্রাম পর্যন্ত ওজনের বিষ্ফোরক গোলা, দেহের মধ্যে সম্প্রসারণশীল বিষ্ফোরক গুলি এবং বিষাক্ত গ্যাস যুদ্ধে ব্যবহার না করার আহবান জানায়। এ আহবান অনুযায়ী ১৮৬৮ সালে ২৯ শে নভেম্বর স্পেন ও আমেরিকা ব্যতীত সকল পাশ্চাত্য দেশ একটি অঙ্গীকার নামায় সই

করে। এরপর রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের উদ্যোগে ১৮৭৪ সালে ব্রাসেলস্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানেই সর্বপ্রথম স্থল যুদ্ধের আইন তৈরী করা হয়। কিন্তু কোনো দেশই তা অনুমোদন করেনি। বিশেষ করে জার্মানী ও ইংল্যান্ড তা স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে।

ব্রাসেলস প্রস্তাবাবলী ২৫ বছর পর্যন্ত পড়ে থাকে হিমাগারে। অবশেষ ১৮৯৯ সালে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের উদ্যোগে প্রথম হেগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বের ২৬টি দেশ অংশ গ্রহণ করে এবং যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিম্নরূপ সমঝোতা ও অঙ্গীকার নামা তৈরী করেঃ

(১) আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা।

(২) যুদ্ধের আইন ও রীতি–প্রথা প্রবর্তন।

(৩) ১৮৬৪ সালে জেনেভা কনভেশনে নৌ যুদ্ধে পীড়িত ও আহতদের সম্পর্কে যে আইন সমূহ গৃহীত হয় তা কার্যকর করা।

(৪) (পাচঁ বছরের জন্য) বিস্ফোরক গোলা (Explosive Projectiles) সংক্রান্ত সেন্ট পিটার্সবার্গের অঙ্গীকার নামা অনুমোদন।

(৫) বিস্ফোরক গুলি সম্পর্কে সেন্ট পিটার্সবার্গের অঙ্গীকার নামা অনুমোদন।

(৬) বিষাক্ত গ্যাস সংক্রান্ত সেন্ট পিটাসবার্গ অঙ্গীকার নামা অনুমোদন।

কিন্তু এ সম্মেলন তার কাজ সমাপ্ত করতে পারেনি। ৮ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ আইন প্রণয়নে আর কোন অগ্রগতিও হয়নি। ১৯০৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাসের উদ্যোগে পুনরায় হেগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের কল্যাণে ইউরোপবাসী প্রথম বছরের মত একটি পরিপূর্ণ যুদ্ধ আইনবিধি লাভ করে। এবারে ১৮৯৯ সালের আপোষ চুক্তি সমূহ ও অঙ্গীকার নামা সমূহের সংশোধন ও পরিবর্ধন ছাড়াও নিম্নলিখিত চুক্তি সমূহও সম্পাদিত হয়ঃ

(১) ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ সীমিত করণ।

(২) যুদ্ধ শুরু করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করার অপরিহার্যতা।

(৩) স্থল যুদ্ধে নিরপেক্ষ লোকদের কর্তব্য ও অধিকার।

(৪) যুদ্ধকালে শত্রুর বাণিজ্যিক জাহাজ সমূহের মর্যাদা।

(৫) বাণিজ্যিক জাহাজ গুলোকে যুদ্ধ জাহাজে রূপান্তরিত করা সংক্রান্ত আইনসমূহ।

(৬) ধাক্কা লাগা মাত্র আপনা আপনি ফেটে যাওয়া সামুদ্রিক মাইন সমূহ ব্যবহার সংক্রান্ত আইন।

(৭) আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সংক্রান্ত সংস্থা গঠন।

(৮) সামুদ্রিক যুদ্ধে নিরপেক্ষদের অধিকার ও কর্তব্য।

এই সম্মেলন যদিও একটি ব্যাপক ভিত্তিক আইন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব বিধি সকল প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয়নি এবং এজন্য তাকেও স্বয়ং সম্পূর্ণ বলা চলেনা। কেননা এর পরে ডুবো জাহাজ, হাওয়াই জাহাজ ও বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে আরো কিছু আইন তৈরীর প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯২২ সালের ওয়াশিংটন সম্মেলন এ প্রয়োজন পূর্ণ করে। ভবিষ্যতে নিত্যনুতুন সমস্যাবলী সম্পর্কে আরো কত সম্মেলনের প্রয়োজন হবে তা এখনো বলা যায় না।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত থেকে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য জগত সভ্য যুদ্ধ আইনের সাথে পরিচিত হবার পর এখনো ৬০ বছর অতিক্রান্ত হয়নি। আর প্রথম আইন রচনার সময়ের কথা বাদ দিয়ে যদি শুধু পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরীর সময়টুকু ধরা হয় তাহলে বলা যায়, তারা সভ্যজন সূলভ যুদ্ধ সম্পর্কে আজ থেকে ২০ বছর আগেও অবুঝ ছিল। এর তুলনায় ইসলামের দিকে একবার নজর বুলান তো দেখি। সাড়ে তেরশো বছর আগে সে পূর্ণাঙ্গ আইন লাভ করেছে এবং এর মৌলিক বিধি সমূহের সংশোধন, রদবদল বা পরিবর্ধনের জন্য আজ পর্যন্ত কোন সম্মেলন, আপোষ চুক্তি বা অঙ্গীকার নামার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। অথচ আজও তার নীতিমালা এমন আদর্শ যে, পাশ্চাত্য জগত অনেক ক্ষয়–ক্ষতি সহ্য করার পর এখন তাকেই গ্রহণ করেছে। আর বহু নীতি এমনও রয়েছে, পাশ্চাত্য জগত এখনো যার সন্ধান পায়নি।

হেগ চুক্তি সমূহের আইনগত মর্যাদা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ১৯০৭ সালের সম্মেলনের কার্যবিবরনীতে তৎপূর্বেকার সমস্ত আন্তর্জাতিক আপোষ চুক্তি ও অঙ্গীকারনামা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই পাশ্চাত্যের যুদ্ধ আইন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে হেগ সম্মলনের অনুমোদিত ও প্রণীত চুক্তি সমুহের পর্যালোচনা করাই যথেষ্ট।

কিন্তু এই পর্যালোচনা শুরু করার পূর্বে ঐ সম্মেলনের আইনগত মর্যাদা কিরূপ এবং তার চুক্তি সমূহ ও অঙ্গীকার নামা সমূহ আইন হিসেবে কতখানি গুরুত্ব রাখে তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এ জন্য আমাদের স্বয়ং হেগ চুক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং পাশ্চাত্য আইন বিশারদগণ তা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উপরই নির্ভর করতে হবে।

এই চুক্তি সমূহের আইনগত মর্যাদা নিরূপন করার জন্য প্রথমে সরকার সমূহ তা মেনে চলতে কতখানি বাধ্য, সেটা অবগত হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে এই চুক্তি সমূহে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোন সরকারই এই বিধি সমূহ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে বাধ্য নয়। তারা কেবল তাদের যুদ্ধ আইন তৈরীর বেলায় এই চুক্তি সমূহের দিকে লক্ষ্য রাখবে, এটুকু দায়িত্ব নেয়।

যুদ্ধের আইন ও রীতি সংক্রান্ত চতুর্থ হেগ চুক্তির প্রথম ধারার ভাষা লক্ষণীয়ঃ "স্থল যুদ্ধের আইন ও রীতি সম্পর্কে যে বিধিমালা এই চুক্তির সাথে সংযোজিত হলো, চুক্তিবদ্ধ দেশ সমূহ সেই অনুযায়ী নিজ নিজ সশস্ত্র স্থল বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করবেন।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, এই আইন সমূহের কর্মসীমা কি?এ জবাবে আমরা হেগ চুক্তি সমূহে যতটা পাই তা হলো এই যে, এ সব চুক্তি ও অঙ্গীকার নামা কেবলমাত্র সেই সব যুদ্ধে কার্যকরী হবে যার দুই প্রতিপক্ষ এই চুক্তি ও অঙ্গীকার নামারও দুই পক্ষ। যদি এক পক্ষ এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী না হয় অথবা কোন স্বাক্ষরকারীর সাথে কোন অ-স্বাক্ষরকারীও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাহলে এই চুক্তি সমূহ কার্যকর করা হবেনা। এই চতুর্থ হেগ চুক্তির দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছেঃ

"এই বিধিসমূহ কেবল সেই সব যুদ্ধে কার্যকর হবে যার উভয় পক্ষ এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী। কোন এক পক্ষ যদি স্বাক্ষরকারী না হয় তাহলে তা কার্যকরী হবেনা।"

প্রত্যেক চুক্তির শেষেই এ ধরণের একটা ধারা রাখা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায় যে, এই সভ্য আইন সমূহ নৈতিক কর্তব্য রূপে গৃহীত হয়নি। এগুলো কেবল কতিপয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থের নিরাপত্তা বিধানকারী হিসেবে গৃহীত। এতে একটি দেশ অন্য দেশের সাথে কেবল এই শর্তে মানবিক ও ভদ্র জনোচিত আচরণের প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অপর দেশটিও তার সাথে অনুরূপ আচরণ করবে।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, এই আইনের মধ্যে বাধ্যকারী (Coercive Power) শক্তি কতখানি? এ সম্পর্কে হেগ চুক্তি দ্বার্থহীন ভাষায় বলেছে যে, কোন সরকার সব সময় এটা মেনে চলতে বাধ্য নয়। বরং যে কোন সময় এর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রত্যেক চুক্তির শেষে এ মর্মে একটা ধারা রয়েছেঃ

"চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কেউ যদি এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চায় তাহলে সে নেদারল্যান্ড সরকারকে জানিয়ে তা করতে পারে। নেদারল্যান্ড সরকারের কর্তব্য, কোন দেশের নিকট থেকে এ ধরণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই চুক্তিবদ্ধ সকল দেশকে তা জানিয়ে দেয়া। দায়িত্ব থেকে অব্যহতির এই নোটিশ নোটিশদাতা দেশের পক্ষে বলবৎ হবে নেদার ল্যান্ড সরকারকে অবহিত করার এক বছর পরে।"

এই ধারাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। তথাপি বিষয়টি আরো একটু পরিষ্কার করার জন্য আমরা মিঃ জেমস ব্রাউন স্কটের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি। মিঃ স্কট আন্তর্জাতিক আইনের একজন বিশিষ্ট মার্কিন বিশেষজ্ঞ। হেগ চুক্তি সংকলনের ভূমিকায় তিনি লিখেছেনঃ

"হেগ সম্মেলনকে প্রায়ই মানব জাতির পার্লামেন্ট বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এটা ভুল ও বিভ্রান্তকর। প্রচলিত অর্থে তা পার্লামেন্ট নয়। এর সিদ্ধান্ত সমূহ কেবলমাত্র যে সব দেশ এতে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে তাদের

"এ ধরণের একটা সমাবেশ যে নিছক একটা সম্মেলনই, কোন আইন সভা নয়, সেটা তার নাম থেকেই স্পষ্ট। এই চুক্তি সমূহ নিছক সুপারিশ। যোগদানকারী দেশ সমূহের কাছে এগুলো এই উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে যেন তারা তাদের আইন কানুন মোতাবেক এগুলোকে গ্রহণ করে। – হেগে কোন অঙ্গীকার নামায় কোন দেশের প্রতিনিধির সই করার অর্থ এ নয় যে, ঐ দেশের ওপর একটা আইনগত দায়িত্ব চেপে বসলো। তবে প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ সরকারের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে নির্বাচিত বিধায় তাদের সই করার দরুণ এতটুকু নৈতিক দায়িত্ব অবশ্য চাপে যে, ঐ সব চুক্তি ও ঘোষণাবলীকে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠানো উচিৎ এবং তা রীতিমত মনজুর করিয়ে ঐ দেশে তাকে আইনের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা উচিৎ। এই চুক্তি সমূহের সরকারী অনুমোদন হেগে দাখিল করার পরই তা অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হয়।"

অধ্যাপক মার্গন স্বীয় পুস্তক 'যুদ্ধ', তার আচরণ ও আইনগত ফল (War, its Conduct and Legal results) –এ লিখেছেনঃ

"হেগের চুক্তি সমূহের প্রভাব, সীমা ও আইনগত ক্ষমতা যে অনেকাংশে অস্পষ্ট ও সন্দেহ যুক্ত, তা অত্যন্ত পরিষ্কার। তথাপি যে সব চুক্তিকে সকল চুক্তিবদ্ধ দেশ মেনে নিয়েছে তাকে আমরা অনেকটা সাধারণ আইন বিধির কাছাকাছি মনে করতে পারি এবং এগুলির ভিত্তিতে চুক্তি বদ্ধ দেশের সামরিক কার্যকলাপ সভ্য দেশ সমূহ পরখ করে দেখতে পারে।"

এই সুস্পষ্ট বক্তব্য সমূহের দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে অবগত হওয়া যায় যে, হেগে প্রণীত যুদ্ধ আইন সমূহ আপন আইনানুগ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিচারে কোন রকমেই ইসলামের যুদ্ধ আইন সমূহের সাথে তুলনীয় নয়। ইসলামের আইন সমূহ সকল মুসলমানের জন্য মেনে চলা সম্পূর্ণরূপে বাধ্যতামুলক। কোন মুসলমান মুসলমান থাকা অবস্থায় এগুলোর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। কোন ব্যক্তির পক্ষে ইসলামকে পরিত্যাগ করে ইসলামের যুদ্ধ আইনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি লাভ করা এক রকম সম্ভব। কিন্তু এটা সম্ভবও নয়, বৈধও নয় যে, কোন ব্যক্তি মুসলমানও থাকবে আবার এই সব আইনের অন্ততঃ আকিদা–বিশ্বাস ও চিন্তার ক্ষেত্রে আনুগত্য করবেনা, কিংবা এগুলোকে নিজের জন্য অবশ্য পালনীয় মনে করবেনা কিংবা এসব

আইনকে আপন খেয়াল খুশী মোতাবেক পরিবর্তন বা বাতিল করে নতুন আইন তৈরী করে নেবে ও সেগুলিকে ইসলামী আইন নামে অভিহিত করবে। পাশ্চাত্যের আইনের মত ইসলামের আইন মুসলমানদের তৈরী করা নয়। এ আইন তৈরী করেছে এক উর্দ্ধতন মহা পরাক্রান্ত শক্তি। মুসলমানদের নিকট এ আইন তাদের অনুমোদন বা পরামর্শের জন্য পেশ করা হয়নি। পেশ করা হয়েছে কেবল মেনে চলার জন্য, আপন আপন জীবনে হুবহু বাস্তবায়িত করার জন্য। এখন এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবলম্বন করার মত কেবল দুটোই পথ রয়েছে। তারা যদি মুসলমান থাকতে চায় এবং সেই উর্দ্ধতন মহাপারাক্রান্ত শক্তির কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব যদি স্বীকার করে তাহলে এ আইনগুলোও তাদের মেনে নিতে হবে। আর যদি এ সব আইনকে মেনে নিতে না চায় তা হলে সেই উর্দ্ধতন শক্তিকেও তাদের অস্বীকার করতে হবে এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এই দুই পথ ছাড়া তৃতীয় পথ মুসলমানদের জন্য খোলা নেই। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য আইনের রচয়িতা পাশ্চাত্যবাসী নিজেই। কাজেই নিজেদের তৈরী করা আইনকে বাতিল করলেই তা বাতিল করে নতুন আইন তৈরী করার অধিকার তাদের রয়েছে। আইন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তারা প্রথম আইনকে বাতিল করলেই তা বাতিল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় আইন তার স্থলাভিষিক্ত হবে। কিন্তু মুসলিম জনগণ যদি ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হাজার হাজার আইনও তৈরী করে নেয় তবে তার কোনটিই ইসলামী আইন বলে পরিগণিত হবে না। ইসলামের আইন রূপে পরিগণিত হবে কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে আইন তৈরী করেছেন সেটাই।

আর এক দিক দিয়েও ইসলামের যুদ্ধ আইন পাশ্চাত্য যুদ্ধ–আইনের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। পাশ্চাত্যের আইন আসলে আইন নয়–চুক্তি। তার আনুগত্য কেবলমাত্র চুক্তিবদ্ধ অন্য পক্ষরাও তার আনুগত্য করবে এই শর্তেই সম্ভব, কিন্তু ইসলামী আইন আদৌ কোন চুক্তি নয়–বরং সত্যিসত্যিই তা আইন। এতে এমন কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি যে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষও যদি এর আনুগত্য করে তবেই এর আনুগত্য করা হবে। যে সময়ে এইসব আইন তৈরী হয়েছিল তখন অমুসলিম সাম্রাজ্যসমূহের সাথে এ ধরনের কোন চুক্তি সম্পাদন সম্ভবই ছিল না। বরং প্রকৃত অবস্থা ছিল এই যে,অমুসলিম যোদ্ধারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যখনই যুদ্ধ করতো, অসভ্য ও অমানুষিক পন্থায় করতো। আর এর জবাবে মুসলমানরা একই রকম অমানুষিক আচরণ

করতে না পারায় তাদের ধৃষ্টতা আরো বেড়ে গিয়েছিল। এই সকল দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামী আইন পাশ্চাত্য আইনের চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠতর। বস্তুতঃ এ এক অকাট্য সত্য।

৪—যুদ্ধের বিধিমালা

এবার নীতিগত ও মৌলিক আলোচনা বাদ দিয়ে আমরা খুটিনাটি বিধিমালার দিকে মনোনিবেশ করতে চাই। এ প্রসঙ্গে আমরা দেখতে চাই যে, বিভিন্ন সামরিক তৎপরতার ক্ষেত্রে হেগ চুক্তি কি ধরনের বিধান দিয়েছে এবং পাশ্চাত্য জাতিসমূহই বা তাকে কতখানি কার্যোপযোগী মনে করে থাকে।

আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা

সামরিক তৎপরতার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয় তা হলো এই যে, যুদ্ধের শুরুটা কিভাবে হওয়া উচিত। প্রাচীন যুগের রীতি ছিল, দূত পাঠিয়ে শত্রুকে জানিয়ে দেয়া হতো। প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক আইনের রচয়িতারাও আগে থেকে চরমপত্র প্রদান, হুশিয়ারী উচ্চারণ ও যুদ্ধ ঘোষণার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। অনেকে এত দূরও মত প্রকাশ করেছেন যে, আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা না করে আক্রমণ করা মোটেই বৈধ নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আইনবিদদের মনোবৃত্তি পাল্টে গেছে। তারা মনে করেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষনার কোন প্রয়োজন নেই।[২৮৪] ফলে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই আক্রমণাত্মক তৎপরতা শুরু করা ক্ষমতাদর্পী রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়ালো। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে ১২০ টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র দশটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[২৮৫] এর মধ্যে কোন কোন যুদ্ধ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ারও আগে শুরু হয়। ১৮১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ছিন্ন করার আগেই তার বন্দরে অবস্থিত সমস্ত বৃটিশ জাহাজ আটক করে এবং ঘোষণা না দিয়েই কানাডার ওপর আক্রমণ চালায়। এমনিভাবে ১৮৫৪ সালে বৃটেন কৃষ্ণ সাগরে অবস্থানরত রুশ নৌবহরের ওপর হামলা চালায় এবং তাকে সাবাষ্টপোলের দিকে তাড়িয়ে দেয়। অথচ তখন পর্যন্ত উভয় পক্ষের রাষ্ট্রদূতদ্বয় নিজ নিজ দেশে ফিরেও আসেননি।[২৮৬]

এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপ পুনরায় আগের পদ্ধতিতে ফিরে আসে এবং সাধারণভাবে যুদ্ধের পূর্বে যুদ্ধ ঘোষণা করার রীতি

মান্য করা হতে থাকে। ১৭৭০ সালের জার্মানী ও ফ্রান্সের যুদ্ধ ১৮৭৭ সালের রুশ–তুরস্ক যুদ্ধ, ১৮৯৮ সালের স্পেন–মার্কিন যুদ্ধ এবং ১৮৯৯ সালের বোয়ার যুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা দিয়েই যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকের রুশ–জাপান যুদ্ধ ছিল অঘোষিত যুদ্ধ। জাপান রাশিয়াকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করা সম্পর্কে কোন বিধির অস্তিত্ব ছিলনা। ক্ষমতাদর্শী দেশ যখন যাকে ইচ্ছা নিজের খেয়াল খুশী মত অতর্কিতে আক্রমন করে বসতো। আবার যখন ইচ্ছা হতো ঘোষণা দিয়েও যুদ্ধে লাফিয়ে পড়তো। ১৯০৭ সালে হেগ সম্মেলনে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে একটা বিধি রচণার আবশ্যকতা অনুভব করা হলো। নিম্নলিখিত ধারা সম্বলিত একটি চুক্তিও সম্পাদিত হলোঃ

প্রথম ধারাঃ চুক্তিবদ্ধ দেশ সমূহ অংগীকার করছে যে, একটা সুস্পষ্ট হুশিয়ারী না হওয়া পর্যন্ত তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবেনা। এই হুশিয়ারী উচ্চারণ কারণ দর্শানো সহ যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারাও হতে পারে, অথবা চরম পত্র দানের মাধ্যমেও হতে পারে। শোযোক্ত পন্থায় শর্তাধীন যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় দফাঃ যুদ্ধাবস্থার যে উদ্ভব হয়েছে সে কথা অবিলম্বেই সকল নিরপেক্ষ দেশকে জানিয়ে দিতে হবে। তাদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তির প্রাপ্তি স্বীকার পত্র (তার মারফত) না আসা পর্যন্ত নিরপেক্ষদের ব্যাপারে যুদ্ধআইন বলবৎ হবে না। অবশ্য যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা নিশ্চিতভাবে জানার পর নিরপেক্ষ দেশগুলোর যুদ্ধ–বিজ্ঞপ্তির জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়।[২৮৭]

ইউরোপে এই সভ্য আইনটি তৈরী হয়েছে আজ থেকে মাত্র বিশ একুশ বছর আগে।[২৮৮] তাও কেবল চুক্তিতে যে সব দেশ অংশীদার তাদের জন্য। কিন্তু ইসলামে পৌনে ১৪ শো বছর আগে থেকে এ বিধি চালু রয়েছে যে, যে জাতির সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ তাদের ওপর অর্তকিত যুদ্ধ চাপিয়ে দিও না। আক্রমণ করার আগে জানিয়ে দাও যে, তোমাদের অমুক অমুক আচরণের দরুন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি ভেঙ্গে গেছে। তাই এখন আমরা পরস্পরের দুশমন। এ আইন শুধু অঘোষিত যুদ্ধ চাপিয়ে না দেয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ অন্যান্য দেশের বেলাই বলবৎ হবে না, বরং সকল দেশের বেলাই প্রযোজ্য হবে।[২৮৯]

সামরিক ও বেসামরিক লোকজনের অধিকার

দুটি জাতির মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর সবচেয়ে গুরুতর যে প্রশ্নটি উদ্ভুত হয় তা হলো এ যে, যুদ্ধরত জাতির লোকদের সাথে কি রকম আচরণ করা হবে? ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ যুদ্ধরত (Belligerent) ও প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক (Combatant) লোকের মধ্যে পার্থক্য করতে জানতই না। তাদের যুদ্ধরত জাতির প্রতিটি লোক প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক লোক রূপে গণ্য হতো এবং তাকে হত্যা করা ও তার যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন বা ধ্বংস করা বৈধ ছিল, তাই সে নারী হোক, শিশু হোক, বৃদ্ধ হোক, পীড়িত হোক, অথবা অন্য কোন বেসামরিক শ্রেণীর লোক হোক। এর পর ১৭শ ও ১৮শ শতকে আন্তর্জাতিক আইনের যে সব পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়, তারা সামরিক ও বেসামরিক লোকদেরকে তৎপরতার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সকলের গ্রহণযোগ্য হয় এবং যুদ্ধাবস্থায় কার্যকর করা যায় এমন কোন শ্রেণী বিন্যাস সম্ভব হলোনা। উনবিংশ শতকে এ সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বের করা হয়। যারা সামরিক তৎপরতায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় তাদেরকে সামরিক এবং যারা অংশ নেয় না তাদেরকে বেসামরিক বলে গন্য করা হয়। কিন্তু এ সমাধানও অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। ফলে খুটিনাটি ব্যাপারে এর বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে উঠলো। এরপর পুনরায় এরূপ নীতি নির্ধারণ করা হলো যে, প্রতিপক্ষের কেবল নিয়মিত সামরিক বলে গণ্য করা হবে। আর বাদবাকী সকল শ্রেণীকে ধরা হবে বেসামরিক। কিন্তু এতে আরো কয়টি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হলো। ডঃ লোয়েদারের উক্তি অনুসারে "যে কোন দেশের অধিবাসীর নিজ পিতৃভুমির প্রতিরক্ষার অধিকার রয়েছে। কোন যুক্তি সংগত প্রমাণ দ্বারাই এ অধিকার অস্বীকার করা যায় না।" এ জন্য স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, কোন দেশের অধিবাসী যদি দেশকে রক্ষা করার জন্য সাধারণভাবে হাতিয়ার নিয়ে রুখে দাঁড়ায় এবং কোন নিয়ম শৃংখলা ছাড়াই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয় তাহলে তাদের মর্যাদা কিরূপ দাঁড়াবে? তাদেরকে কি সামরিক ধরে নিয়ে শত্রুর নিয়মিত সৈন্যদের জন্য যে অধিকার নির্দিষ্ট, তাই দিতে হবে? তাদেরকে বেসামরিক গণ্য করে যুদ্ধ আইন মোতাবেক এদেরকে লুটেরা ও দস্যু শ্রেণীভুক্ত করা হবে? উপরোল্লিখিত আইন এ প্রশ্নের যে জবাব দেয় তা হলো এই যে, বেসামরিক লোকেরা যদি সামরিক তৎপরতায় অংশ নেয় তাহলে তাদেরকে সামরিক লোকদের অধিকারও দেয়া হবেনা,

বেসামরিকদেরও না। অর্থাৎ ধরা পড়লে তাকে হত্যা করা হবে, আহত হলে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার সাথে যুদ্ধ করার সময় কোন প্রকার সামরিক শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রদর্শন করা হবেনা। এ আইনের আলোকে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে পার্থক্য করার যে নীতি নির্ধারণ করা হলো তা যারা স্বাধীনতা অর্জন কিংবা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং কোন নিয়মিত সামরিক বাহিনীভুক্ত নয়, তাদের জন্য মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

১৮৭০ সালের যুদ্ধে যখন ফ্রান্স সাধারণ নাগরিকদেরকে অনিয়মিত সেনাদলের (Frances Tireurs) আকারে ভর্তি করা শুরু করলো এবং জার্মানী তাদেরকে সামরিক যোদ্ধার অধিকার দিতে অস্বীকার করলো তখন আন্তর্জাতিক আইনের সামনে এ সমস্যা গুরুতর হয়ে দেখা দিল। ১৮৭৪ সালের ব্রুসেলস সম্মেলনে এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক হলো। অবশেষে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট মানদন্ড স্থির করা হয়। এতে করে সামরিক বলে গণ্য করা হয় কেবল তাদেরকে, যারাঃ

(১) এমন একজন অধিনায়কের অনুগত যিনি অধীনস্থদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী,

(২) এমন নির্ধারিত পার্থক্যসূচক চিহ্ন দেহে ধারণ করে যা দূর থেকে দেখে চেনা যায়,

(৩) প্রকাশ্যে অস্ত্র ধারণ ও বহন করে,

(৪) যুদ্ধকালে যুদ্ধের আইনকানুন ও রীতিনীতি মেনে চলে। [২৯০]

পার্থক্যের এই মাপকাঠিকেই স্বীকার করে নেয়া হয় ১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালের হেগ সম্মেলনে। হেগ বিধিমালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারায় এ কথাও স্পষ্ট করে বলা হয় যেঃ

"বিজিত হয়নি এমন কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি শত্রুর আগমন টের পেয়েই কোন শৃংখলা ও সংঘবদ্ধতা ছাড়াই হাতিয়ার নিয়ে রুখে দাঁড়ায় তাহলে তারা সামরিক যোদ্ধার অধিকার লাভ করবে। কেবল শর্ত এই যে, তাদেরকে প্রকাশ্যে অস্ত্র বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং যুদ্ধের আইনকানুন ও

রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। যুদ্ধরত উভয়পক্ষের সশস্ত্র সৈনিকগণ সামরিক ও বেসামরিক এই উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। প্রতিপক্ষের কাছে ধরা পড়ার পর উভয়ই যুদ্ধবন্দীর অধিকার ও সুযোগ সুবিধা লাভ করবে।”

এভাবে একটা সমস্যার সমাধান হলো বটে। কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন শুধু স্বাধীন জাতিরই হয় না। আধা–স্বাধীন ও পরাধীন জাতিগুলোও হারানো অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন বোধ করতে পারে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য যুদ্ধ করা প্রত্যেক জাতির ন্যায্য অধিকার। সে যদি একটা প্রবল পরাক্রান্ত জাতির কাছ থেকে মুক্তিলাভের জন্য হাতিয়ার তুলে নেয় তাহলে কোন যুক্তিতেই তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। সুতরাং প্রশ্নটা এই দাঁড়ায় যে, কোন জাতি যদি পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃংখল ভাঙ্গার জন্য যুদ্ধ করে তাহলে কি তার সকল সদস্যই অপরাধী হয়ে যাবে? তাদেরকে কি সামরিক লোকদের সমান অধিকার দেয়া হবে না? তাদেরকে কি লুটেরা ও দস্যুর মত ধরে ধরে হত্যা করা হবে?

হেগ সম্মেলন এসব প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করেনি। কার্যতঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহ এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দিচ্ছে যে এহেন জাতি সামরিক লোকদের অধিকারও পাবে না, বেসামরিকদের সুযোগ সুবিধাও না। কামান বন্দুকের খাদ্য হওয়া এবং পাইকারী হত্যা ও গণহত্যার শিকার হওয়াই তাদের ভাগ্যের লিখন। বৃটেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে,স্পেন রীফ অঞ্চলে এবং ফ্রান্স সিরিয়ায় আমাদের চোখের সামনে যে বীভৎস অত্যাচার চালিয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবর্তিত যুদ্ধ আইন কোন জাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার অধিকার স্বীকার করে না।

সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে পার্থক্য করার এই মাপকাঠি আরো একটি দিক দিয়ে ভ্রান্ত। যুদ্ধে প্রকাশ্যে হাতিয়ার বহন করে না, এমন সমস্ত লোককেই এতে বেসামরিক বলে গণ্য করা হয়েছে। পাশ্চাত্যবাসী আগে গর্বের সাথে বলতো যে, তারা শত্রুতাকে কেবল সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই সীমিত রেখেছে এবং অসামরিক সংগঠন ও বাহিনী সমূহকে যুদ্ধের ফলাফল থেকে মুক্ত রেখেছে। কিন্তু আজ তারা স্বয়ং স্বীকার করছে যে, নিয়মিত সৈনিক ও অনিয়মিত সৈনিক হওয়ার ভিত্তিতে সামরিক লোকদের মধ্যে পার্থক্য করা

নীতিগতভাবে ভুল এবং কার্যতঃ অসম্ভব। হেগ সম্মেলনে দুই যুদ্ধরত দেশের মধ্যে বাণিজ্য অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলোও এটা চাইতো। কিন্তু বাস্তবে তা কখনো সম্ভব হয়নি। বিশেষতঃ মহাযুদ্ধেও প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা অসম্ভব। এ সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত না করে খোদ ইউরোপীয় মনীষীদের উক্তি উদ্ধৃতি করাই অধিকতর সঙ্গত মনে করি। কেননা মহাযুদ্ধের চাক্ষুস অভিজ্ঞতা দ্বারাই তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে পার্থক্য করে এত কাল তারা যে গর্ব বোধ করছিলেন, তা একেবারেই অসার ও ভিত্তিহীন।

অধ্যাপক নিপোল্ড লিখেছেনঃ

"সাম্প্রতিকতম অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান বাণিজ্যিক যুগে যখন অসংখ্য লোক বিদেশে ছড়িয়ে থাকে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে চলাচল করে–যুদ্ধকে কেবল সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহের সামরিক লোকজনদের সংঘর্ষ বলে গণ্য করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এসব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা গেছে যে, একটা বড় রকমের যুদ্ধ হলে যুদ্ধরত দেশে তো বটেই, এমনকি নিরপেক্ষ দেশের মানুষও কোন না কোনভাবে তা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে আজকাল জীবনের বিভিন্ন বিভাগে এমন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, এ ধরনের যুদ্ধের প্রভাব থেকে কোন ব্যক্তিই মুক্ত থাকতে পারে–না। এসব প্রভাব সীমিত করার ও এর পথ রুদ্ধ করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। সুতরাং এটা একটা অর্থহীন মতবাদ যে, যুদ্ধ কেবল একটা আন্তরাষ্ট্রীয় ব্যাপার এবং যুদ্ধের যাবতীয় কার্যকলাপ কেবল সামরিক লোকদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই বাণিজ্যিক যুগে যুদ্ধ মূলতঃ জনগণের ব্যাপার। জনগণই তাদের সমস্ত দৈহিক ও আর্থিক শক্তি সামর্থ্য দিয়ে একে পরিচালিত করে।" ২৯১

এই গ্রন্থকার কিছুদুর গিয়ে পুনরায় বলেনঃ

"শত্রুদেশকে পরাজিত করা ছাড়া যুদ্ধের আর কোন উদ্দেশ্যই থাকেনা। এদিক থেকে উক্ত উদ্দেশ্যের সহায়ক নয়–এমন ক্ষতিকর কার্যকলাপ বন্ধ হওয়া উচিত। তবে মনে রাখা দরকার যে, দেশ কেবল সেনাবাহিনীরই আবাসভুমি নয়। সাধারণ জনগণও তার বাসিন্দা। এই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই মোলকে (Moltkey) এই মতবাদ অস্বীকার করেছেন যে, "যুদ্ধের উদ্দেশ্য

শুধু শত্রুর সামরিক শক্তি দুর্বল ও খর্ব করা।” তিনি বলেন, “যুদ্ধরত দেশের পক্ষে নিজেদের সকল উপায়–উপকরণ, অর্থসম্পদ, রেলপথ, খাদ্যদ্রব্য – এমনকি আপন নৈতিক প্রভাবও যুদ্ধে ব্যবহার করা অপরিহার্য। শত্রুকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করাই যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তার পক্ষে সামরিক উপায়–উপকরণ কেবল শত্রুসেনার বিরুদ্ধে নয়–বরং শত্রুর সকল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা উচিত।..... এখন যেহেতু একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তি সেই দেশের জনশক্তি দ্বারাই গঠিত, তাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে যতটা প্রয়োজন ও সহায়ক, ঠিক ততখানি জনগণের জানমাল ও অর্থনৈতিক স্বার্থেরও ক্ষতিসাধন করতে হবে।” ২৯২

একই গ্রন্থকার অপর এক জায়গায় লিখেছেনঃ

“দেশ সমূহ তাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগে যেমন যুদ্ধের চাহিদা ও প্রয়োজনের অনুসরণ করে থাকে, তেমনি অর্থনৈতিক যুদ্ধেও করা উচিত। উভয় অবস্থাতেই যে সব উপকরণ দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করা যাবে বলে আশা করা যায়, তার সবই প্রয়োগ করা উচিত। সুতরাং অর্থনৈতিক যুদ্ধ কেবল বাণিজ্যের প্রতিরোধ পর্যন্ত সীমিত থাকা উচিত নয়, বরং তার উচিত প্রতিপক্ষের অর্থনৈতিক জীবনের ওপরও ধ্বংসাত্মক আঘাত হানা। এভাবে অসংঘর্ষরতদের ওপর আঘাত হানা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।” ২৯৩

অধ্যাপক নিমোয়র (NEIMEYER) ‘নৌ যুদ্ধের আইন ও নীতিমালা’ নামক পুস্তকে লিখেছেনঃ

“নৌযুদ্ধে শত্রু জাতির জীবন সম্ভাব্য সকল উপায়ে এমনকি চরম পাশবিক উপায়েও দুর্বিসহ করে তোলা উচিত।” ২৯৪

বার্কহার্ড (Barckhardt) লিখেছেনঃ “একটি ধারণা এই যে, কেবলমাত্র সশস্ত্র বাহিনী সমূহের মধ্যে সংঘর্ষকেই যুদ্ধ বলা হয় এবং এর দ্বারা বেসামরিক লোকদের শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের ওপর কোনই প্রভাব পড়ে না। কিন্তু এটা নিছক খেয়ালী স্বর্গ এবং খোশ–খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। সেনাবাহিনীও নিজেকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। রাষ্ট্রও পারেনা সমাজ থেকে আলাদা হতে। সকল ধ্যান ধারণা ও মতবাদকে এক পাশে রেখে এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, যুদ্ধ সর্বদাই জাতি সমূহের

মধ্যেই সংঘঠিত হয়ে থাকে। কেননা সকল শ্রেণীর জনগণই এতে অংশ নিয়ে থাকে– যদিও সকলের হাতিয়ার এক রকম নয়। রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। রাষ্ট্র ও জনগনের মধ্যে ভেদ রেখা টানা সম্ভব নয়। সুতরাং যুদ্ধ যেমন দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা সামরিক সংঘাত বিশেষ, তেমনি দুই জাতির মধ্যে একটা অর্থনৈতিক বোঝাপড়াও।"[২৯৫]

একই গ্রন্থকার অন্যত্র বলেনঃ

সমুদ্র গর্ভে বাণিজ্য সম্ভারকে ডুবিয়ে দেয়া মানুষকে ডোবানোর চেয়ে বহু গুন বেশী মানবিক রণপদ্ধতি। একটু তলিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যাবে, দুশমন যখন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এত ক্ষমতাশালী যে, সে আত্মসমর্পনের প্রয়োজনই বোধ করে না–তখন তার সামরিক শক্তিকে খর্ব করার চেষ্টা বৃথা যেতে বাধ্য। এ জন্য প্রত্যেক যুদ্ধরত দেশের উচিত, প্রতিপক্ষের অর্থনৈতিক শক্তি চুর্ণ করার চেষ্টা করা। একটি দেশের সামরিক প্রতিরক্ষা ক্ষমতা তার অর্থনৈতিক শক্তির সাথে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করাই যায় না। তার সুস্থ সবল সৈনিক তার যুদ্ধ পরিচালনার কাজে যত খানি সহায়ক, তার সমৃদ্ধ শিল্পকারখানাও ঠিক ততখানি সহায়ক। এই জন্য কোন যুদ্ধকারী দেশ শত্রুর অর্থনৈতিক শক্তির ক্ষতি সাধন না করে পারে না। শত্রুর বেসামরিক জনবসতিকে অনাহারে ধুকিয়ে মেরে ফেলা যতই নিষ্ঠুরতার কাজ হোক না কেন, আমার মতে একটা যুদ্ধ প্রক্রিয়া হিসাবে তা অবৈধ কিছু নয়।

এই গ্রন্থকার পরবর্তী এক স্থানে লিখেছেনঃ

"যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে সামরিক বাহিনী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হোক এটা অনেক কল্পনা বিলাসীর খোশ খেয়াল। জলে ও স্থলে ব্যক্তিগত সম্পদ সুরক্ষিত থাকুক, যুদ্ধরতদের মধ্যে বানিজ্য পণ্যের লেন–দেন অব্যাহত থাকুক এবং যুদ্ধটা যুদ্ধরত দেশদ্বয়ের প্রজা সাধারণের মধ্যে না হয় কেবল সামরিক বাহিনী সমুহের মধ্যে সীমিত থাকুক–এটাই তাদের কাম্য। কিন্তু কোন বাস্তবমুখী মানুষ এখন আর এ রকম খোশ খেয়ালে লিপ্ত নেই। শুধু একটা অবাস্তব ব্যাপার বলেই নয়, বরং একটা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ব্যাপার বলেও এ খোশ খেয়ালকে কেউ প্রশ্রয় দেয় না। শুধু তাই নয়–বরং সামরিক তৎপরতার সন্নিহিত নিকটতম অঞ্চলের পারস্পরিক বাণিজ্যেও সে অবশ্যই বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতঃ একদিকে দেশের হাজার হাজার তরুন

যুদ্ধের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, অপর দিকে শত্রুকে দিব্বি আরামে বাণিজ্যও করতে দেয়া হবে, একদিকে শত্রুর বন্দরে গোলা বর্ষন করতে গিয়ে জান ও মালের অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করা হবে, অপর দিকে তার আমদানী রপ্তানী কার্যধারাও অব্যাহত থাকতে দেয়া হবে, এটা সংগতিহীন ও যুক্তি বিরুদ্ধ বলে মনে হয়। ২৯৭

অপর এক লেখক এলভস বাশির লিখেছেনঃ

যেহেতু শত্রুর সামরিক শক্তির মূল তার গোটা জাতির সামগ্রিক শক্তির অনেক গভীরে নিহিত, এ জন্য এই শক্তিকে সর্বশক্তি প্রয়োগে চূর্ণ করা প্রয়োজন। এ ভাবে যে যুদ্ধ শত্রুদেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু করা হয়, তা তার সমগ্র জনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। যুদ্ধ যখন এই পর্যায়ে পৌঁছে তখন আন্তর্জাতিক আইন তার পেছনে পেছনে চলতে বাধ্য হয়। আগের যুগে এই নীতি মেনে নেয়া হয়েছিল যে, যুদ্ধ কেবল শত্রুর সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সীমিত থাকা উচিত এবং যুদ্ধরত দেশদ্বয়ের বা দেশ সমূহের সাধারণ জনগণ পর্যন্ত কতিপয় নির্দিষ্ট বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া যুদ্ধ সম্প্রসারিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সে নীতি এখন তামাদি হয়ে গেছে, এ যুগের যুদ্ধ সেই নীতিকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। শুধু বিচ্ছিন্ন কতিপয় ঘটনায়ই এ গুলি লংঘন করা হয়নি, বরং তা চিরতরে ও সম্পূর্ণরূপে লংঘন করা হয়েছে। ভবিষ্যতের যুদ্ধ বিগ্রহে ঐ নীতি আর পালিত হবে না। কেননা অতীতের সাথে যা তামাদি হয়ে যায় তা আর ফিরে আসেনা।২৯৮

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি সমূহ থেকে প্রামাণিত হচ্ছে যে, যুদ্ধে সকল শ্রেণীর নিরস্ত্র জনতাকে বেসামরিক বলে স্বীকার করা, তাদেরকে সামরিক তৎপরতা থেকে নিরাপদ রেখে অবাধে ব্যবসায় বাণিজ্য করতে দেয়া এবং সামরিক লোকদের জন্য যে সব অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নির্দিষ্ট তা তাদেরকে দেয়া শুধু যে বাস্তবেই অসম্ভব তা নয় বরং নীতিগতভাবেও ভুল। এ কথা অবিসংবাদিত যে, যুদ্ধে বেসামরিক লোকদেরকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ও বিশেষ ভাবে আক্রমণ করা এবং যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা অবশ্যই একটা জুলুম বিশেষ। কিন্তু সেই সাথে যে সব বেসামরিক লোকজন শত্রুর জঙ্গী ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সামরিক লোকদের মতই সহায়তা করে তাদেরকে বেসামরিক লোকদের অধিকার দিয়ে দেয়াও কম জুলুম নয়।

এ দিক থেকে পাশ্চাত্য আইন সামরিক ও বেসামরিক লোকের মধ্যে যে ভেদরেখা টেনেছে, তা কোন রকমেই সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ নয়। একদিকে তা সামরিক লোকদের অধিকার পাওয়ার যোগ্য– এমন বহু লোককে তা থেকে বঞ্চিত করেছে। অপরদিকে বেসামরিক লোকদের অধিকার পাওয়ার যোগ্য নয়–এমন বহু লোককে সে এই অধিকার প্রদান করেছে। এই দুই চরম অবস্থার মাঝে ইসলাম একটা সরলরেখা টেনে দিয়েছে। এতে সামরিক ও বেসামরিক লোকদেরকে তাদের পেশার বিচারে বিভক্ত করা হয় না, বরং বিভক্ত করা হয় সামরিক যোগ্যতার বিচারে। ইসলাম যুদ্ধরত জাতিকে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ভিত্তিতে বিভক্ত করেছে। যারা সক্রিয়ভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত অথবা প্রকৃতি বা স্বভাবের দিক দিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার যোগ্য, তারা সকলে সামরিক। আর যারা প্রকৃতি ও স্বভাবের দিক দিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা –যেমন নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পীড়িত, অক্ষম, পঙ্গু দেউলে ইত্যাদি তারা সব বেসামরিক বলে গণ্য। শত্রু জাতির যে ব্যক্তিই মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে, চাই সে নিয়মিত সেনাবহিনীর লোক হোক বা না হোক–তাকে সামরিক লোক বলেই ধরা হবে এবং সামরিক লোকদের জন্য যেসব অধিকার নির্ধারিত, তার সবই তাকে দেয়া হবে। কেবল শর্ত এই যে, সে যেন বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দায়ে দোষী না হয়। অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করার যোগ্য তাকে সামরিক লোক বলে ধরা হবে এবং তাকে অত্যাবশ্যকভাবে না হলেও যুদ্ধের প্রয়োজনে সামরিক তৎপরতার শিকার হতে হবে। সে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে তাকে অবশ্যই তা দেয়া হবে। সে যদি মুসলিম দেশ ও অমুসলিম দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বাণিজ্য করতে চায় তবে তাকে তারও অনুমতি দেয়া যেতে পারে। সে যদি সামরিক তৎপরতা থেকে বিরত থেকে কারবার চালিয়ে যায় তবে তাকে বেসামরিক লোকের উপযুক্ত নিরাপত্তাও দেয়া যাবে। কিন্তু নাগরিক হিসাবে সে যুদ্ধরতদেরই শ্রেণীভুক্ত হবে। বেসামরিক লোকদের অধিকার তাকে কেবল একটা সুবিধা হিসাবে দেয়া হবে। বেসামরিক ও সামরিক লোকদের মধ্যে পার্থক্য করার এটাই একটা স্বাভাবিক পন্থা। উপরে বর্ণিত দুই চরম পন্থার মাঝখানে এই মধ্যবর্তী বিন্দুতে সামরিক ও আইনগত গ্রুপ সমূহের মিলন সম্ভব।

সামরিক লোকদের অধিকার ও কর্তব্য

যুদ্ধরত সামরিক ও বেসামরিক এ দুটি প্রধান শ্রেণী নিজেদের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে নানা রকমের আইনের অনুগত। এ জন্য আমরা উভয়ের সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করবো। ধারাবহিকতার দিক দিয়ে প্রথমেই আসে সামরিক লোকদের প্রসঙ্গ।

আগেই বলেছি যে, ইউরোপে সামরিক লোকদের অধিকারের সার্বিক চেতনা জন্মে ১৯ শতকের শেষের দিকে। অবশ্য এর আগেই তত্ত্বগতভাবে তা নিয়ে আলাপ আলোচনার সূচনা হয়েছিল। সমাজ চেতনার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে কিছু কিছু অধিকার বাস্তবে গৃহীতও হয়েছিল। কিন্তু এসব অধিকারের পুরাপুরি স্বীকৃতি পাওয়া গেছে অনেক পরে। ১৮২৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট আইন মেনে নিতে সম্মত ছিলনা। যুদ্ধরতদের মধ্যে কাকে সামরিক অধিকার দেয়া হবে, কাকে দেয়া হবে না– সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক দেশ নিজেকেই পূর্ণ ক্ষমতার মালিক ভাবতো। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যেঃ

যুদ্ধরতদেরকে কখন তাদের যথাযোগ্য অধিকার দিতে হবে, তা জাতি নিজেই নির্ধারন করবে, চাই যুদ্ধরতরা সেই জাতিরই অংশ হোক এবং তাদের বিবেচনানুসারে জালেম সরকারের হাত থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার প্রত্যাশী হোক অথবা উভয়ে স্বাধীন জাতি এবং পরস্পর যুদ্ধলিপ্ত হোক।[২৯৯]

কিন্তু প্রত্যেক জাতির নিজের ভালো মন্দের বিচারক নিজেই হওয়া কখনো অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণে যথেষ্ট নয়। এতে বরং যুদ্ধরতদের অধিকার ও কর্তব্য একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্য বাসীরা এ সমস্যাটি উপলব্ধি করেছে এবং ক্রমে ক্রমে এ নীতি নিয়েছে যে, সকল অবস্থাতেই যুদ্ধরতদের অধিকার দেয়া হবে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্বয়ং যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের স্বাধীন ক্ষমতার ওপর ছেড়ে দেয়াও ঠিক হবে না।

সর্বপ্রথম সেন্ট পিটার্সবার্গে একটা মৌলিক বিধি প্রণয়ন করা হয়। এর অংশ বিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

" যুদ্ধরত দেশগুলোর শুধুমাত্র শত্রুর সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করা কর্তব্য। এটাই যুদ্ধের একমাত্র বৈধ উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শত্রুপক্ষের যত বেশী সংখ্যক লোককে পারা যায় অকর্মন্য করে দিয়েই ক্ষান্ত থাকা উচিত। অকর্মন্য করে দেয়ার পরও তাদেরকে নিষ্প্রয়োজনে অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া বা হত্যা করা বাড়াবাড়ির শামিল হবে।"

এটা ১৮৬৮ সালে প্রণীত প্রথম বিধি। এর কয়েক বছর পর ব্রুসেলস সম্মেলনে কিছু সংখ্যক কর্তব্য ও অধিকার নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ১৯ শতকের শেষ অবধি এ বিষয়ে এমন কোন আইন তৈরী করা সম্ভব হয়নি, যা সকল পাশ্চাত্য দেশ মেনে নিতে পারে। শতাব্দীর অবসানে যখন প্রথম হেগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো, তখন সেখানে এই মুলনীতি তৈরী হলো।

" যুদ্ধরতদের পরস্পরের ক্ষতিসাধনের উপকরণ ব্যবহারের অধিকার সীমাহীন নয়।"[৩০০] উক্ত সম্মেলন সামরিক লোকদের কর্তব্য ও অধিকারও নির্ধারন করে। হেগ বিধির ২৩ ধারায় বলা হয়ঃ

" বিশেষ চুক্তিসমূহে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ, তাছাড়াও নিম্নলিখিত কাজ সমূহ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হলোঃ

(ক) বিষ অথবা বিষাক্ত অস্ত্র ব্যবহার করা।

(খ) যুদ্ধরত জাতির বা সৈন্যদের কোন ব্যক্তিকে প্রতারণা পূর্বক হত্যা জখম করা।

(গ) যে শত্রু অস্ত্র সংবরণ করে কিংবা আত্মরক্ষার সমস্ত উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিপক্ষের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, তাকে হত্যা বা জখম করা।

(ঘ) কাউকে নিরাপত্তা দেয়া হবে না এরূপ ঘোষণা করা।

(ঙ) সীমাতিরিক্ত ক্ষতিসাধন করে– এমন সরঞ্জামাদি,অস্ত্রশস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করা।

(চ) সন্ধির পতাকা, শত্রুর জাতীয় পতাকা অথবা সামরিক নিদর্শন সমূহ বা পোশাক কিংবা জেনেভা চুক্তির নির্ধারিত বিশিষ্ট চিহ্নসমূহ অবৈধ পন্থায় ব্যবহার করা।

(ছ) সামরিক চাহিদার দিক থেকে একান্ত অপরিহার্য না হলে শত্রুর সম্পদের ক্ষতি সাধন করা।"

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে সংঘর্ষরতদের অধিকার ও কর্তব্য কবে ও কিভাবে নির্ধারিত হয়েছিল তা জানা গেল। অতঃপর আমরা বিশেষ বিশেষ অধিকার ও কর্তব্য আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করবো।

১–যুদ্ধ বিধি মেনে চলা

সামরিক লোকদের সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো, সামরিক নিয়ম শৃংখলার আনুগত্য করা ও যুদ্ধবিধি মেনে চলা। যে সমস্ত লোক নিয়মবিধি লংঘন করে যুদ্ধ চালায়, যুদ্ধরত হিসাবে তাদের সমস্ত অধিকার প্রায় সকল দেশই অস্বীকার করেছে। জার্মানীর আইনে তাদের জন্য কমপক্ষে দশ বছর কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড নির্ধারিত রয়েছে। মার্কিন আইনে তাদেরকে দস্যু বলা হয়েছে এবং তাদের জন্য দস্যুবৃত্তির শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। যুদ্ধরতদের স্বীকৃত অধিকার তো দূরের কথা, তাদেরকে ন্যুন্যতম মানবাধিকারও দেওয়া হয়নি। ১৮৯৯ সালের হেগ সম্মেলনে বৃটেন প্রবল ভাবে দাবী জানায় যে, অসভ্য ও অনুন্নত জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধ করার সময় ডমডমের গুলী ব্যবহার করতে দেয়া উচিত। বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড লেন্স ডাউন বক্তৃতাকালে জোর দিয়ে বলেন যে, ১৮৯৫ সালের চিত্রলযুদ্ধে প্রচলিত ধরনের গুলী ব্যবহার করে উপজাতীয় শত্রুদের গতিরোধ করা সম্ভব হয়নি এবং ডমডমের গুলীতে তাদের তেমন ক্ষতি হয় না।[৩০১] অথচ ইউরোপীয়রা এই ডমডমের গুলীর কথা শুনলেই শিউরে ওঠে এবং " সভ্য" জাতিগুলোর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার কেউ পছন্দ করেনা। কিন্তু বিধি–বহির্ভূত যুদ্ধে লিপ্ত " অসভ্য" জাতিগুলোর বেলায় সেই মানবতাবিরোধী অস্ত্রটি ব্যবহার করা এতখানি বৈধ ও প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে যে, সর্বাপেক্ষা সভ্য বলে কথিত ইউরোপীয় দেশটি হেগ চুক্তিতে সই করতেই চায়নি। চুক্তিটিকে কেবলমাত্র চুক্তিবদ্ধদের পারস্পারিক যুদ্ধের মধ্যে সীমিত করে দেয়ার পরই সে তাতে সই করে।

২–আশ্রয় ও নিরাপত্তাদান

সামরিক লোকদের প্রথম ও মৌলিক অধিকার এই যে, সে শত্রুর নিকট নিরাপত্তা চাইলে তাকে নিরাপত্তা দিতে হবে। ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে

নিরাপত্তা দেয়ার প্রথার প্রচলন ছিল না। ইংল্যন্ডের গৃহযুদ্ধে পার্লামেন্ট আইরিশদেরকে নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করেছিল। ১৮শ শতাব্দীর শেষ অবধি যুদ্ধরতদের পরস্পরকে নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করার অধিকার ছিল। এই অধিকারের ভিত্তিতেই ১৭৯৪ সালে ফরাসী কনভেনশন ঘোষণা করে যে, ইংরেজ সৈনিকদের নিরাপত্তা দেয়া হবে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘর্ষরতদের এ অধিকার স্বীকার করা হয় যে, তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে তাদের ওপর আর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় এবং তাদেরকে যুদ্ধবন্দীদের সমান অধিকার দেয়া উচিত।

তবে এ আইন শুধুমাত্র রনাঙ্গনে নিরাপত্তা প্রার্থনাকারীদের জন্য।[৩০২] কিন্তু যুদ্ধাবস্থা শুরু হওয়ার সময় যারা শত্রুপক্ষের নিয়ন্ত্রনে থাকে তাদের কি করা হবে, সে সম্পর্কে এখনো কোন সুনির্দিষ্ট আইন তৈরী হয়নি। ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত সাধারণ নিয়ম ছিল এই যে, এ ধরনের লোকদেরকে গ্রেফতার করা হতো এবং সাধারণ অপরাধীদের মতো যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা হতো। ১৭৬৫ সালে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ড ফ্রান্সকে একটা সুবিধা দেয়। যুদ্ধের প্রারম্ভে যেসব ফরাসী নাগরিক ইংল্যান্ডে ছিল তাদেরকে সে এই শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করে যে, তারা সততার সাথে নিরপেক্ষ থাকবে। অনুরূপভাবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, পারস্পারিক যুদ্ধে তারা একে অপরের সৈনিকদেরকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেবে। কিন্তু ১৮০৩ সালে আমিনস (AMIENS) চুক্তি ভেঙ্গে যাওয়ার পর নেপোলিয়ন পুনরায় পুরানো পদ্ধতিতে ফিরে গেলেন এবং ফরাসী ভূ–খন্ডে অবস্থানরত সমস্ত বৃটিশদেরকে গ্রেফতার করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বহিস্কারের প্রক্রিয়াও অনুসৃত হয় এবং তিনটি প্রক্রিয়াই বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত হতে থাকে। ১৮৫৪ সালের ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ১৮৯৭ সালের তুরস্ক ও গ্রীসের যুদ্ধ এবং ১৮৯৮ সালের মার্কিন স্পেন যুদ্ধে উভয়ে পরস্পরের সৈন্যদের নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু ১৮৭০ সালে জার্মানী ও ফ্রান্সের যুদ্ধে সমস্ত জার্মানদেরকে ফরাসী এলাকা থেকে বহিস্কার করা হয়। ১৮৯৯ সালে বোয়ার যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার উভয় দেশ ইংরেজদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। এরপর বিংশ শতাব্দীতেও এর জন্য কোন বিধি তৈরী হলো না। ১৯০৪ সালের রুশ জাপান যুদ্ধে, ১৯১১ সালের তুরস্ক ইটালীর যুদ্ধে (কিছুকালের জন্য) উভয়পক্ষ নিরাপত্তাদানের নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে

বৃটেন, ফ্রান্স ও ইটালী নিজ সীমায় অবস্থানরত শত্রুপক্ষীয় সমস্ত লোককে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়। যারা দেশ ত্যাগ করেনি তাদেরকে কঠোর ব্যবস্থাধীনে অন্তরীনাবদ্ধ করে রাখা হয়। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া অসামরিক বয়সের লোকদের বাদ দিয়ে অন্য সকলকে অন্তরীন করে। পর্তুগাল অসামরিক বয়সের লোকদেরকে বহিস্কার এবং সামরিক বয়সের লোকদের অন্তরীন করে। আমেরিকা ও জাপান সকলকে নিরাপত্তা দেয়।

এ সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কোন আইন তৈরী হয় নি। কিন্তু বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ ভাবধারা হচ্ছে, অসামরিক বয়সের লোকদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত এবং সামিরক বয়সের লোকদের যেতে দেয়া অনুচিত। ৩০৩ পক্ষান্তরে ইসলামে চৌদ্দশো বছর ধরেই এরূপ সাধারণ আইন বিদ্যমান যে, অমুসলিম এলাকার কোন লোক যদি মুসলিম এলাকায় আশ্রয় নিয়ে থাকতে বা আসতে চায় তবে তাকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দেয়া হবে। আর যদি সে নিজের পছন্দসই 'নিরাপদ' এলাকায় যেতে চায় তবে তাকে সহি সালামতে পৌঁছে দেয়া হবে। এছাড়া ইসলাম তার সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে যে ব্যাপক অধিকার দিয়েছে পাশ্চাত্যের আন্তর্জাতিক আইনে তার বিন্দুবিসর্গও দেয়া হয়নি। ৩০৪

৩–যুদ্ধবন্দী

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ইউরোপীয় আইন অনেকটা পূর্ণত্ব লাভ করেছে বলা চলে। তবে অধ্যাপক মর্গানের বক্তব্য অনুসারে এ আইন যে এতটা পূর্ণত্ব লাভ করেছে তার কারণ এই যে, যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সকল দেশের স্বার্থ সমান। প্রত্যেক দেশই চায়, তার সৈন্যরা শান্তিতে থাকুক। এ জন্য তারা কেবলমাত্র প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বিনিময়ে একই রকম ব্যবহার পাওয়ার আশায় বিরুদ্ধপক্ষের সৈন্যদের শান্তিতে রাখতে সম্মত হয়ে থাকে। ৩০৫

কিন্তু এই সভ্য আইনগুলো খুবই নিকট অতীতের সৃষ্টি। ১৭ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস দাসীতে পরিণত করা হতো। গ্রোটিয়াস এই প্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন এবং খৃষ্টান জাতিগুলোকে পরামর্শ দেন যে তারা যেন একে অপরকে দাস দাসীতে পরিণত করে বিক্রি করার পরিবর্তে যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে যুদ্ধপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু এক শতাব্দী

পর্যন্ত তার পরামর্শ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুদ্ধপণ ও যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের প্রথা চালু হয় এবং শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ তা কার্যকর করা অব্যাহত রাখে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধপণ ও বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে একজন জওয়ানের মূল্য এক পাউন্ড,একজন এডমিরাল বা মার্শালের মূল্য ৬০ পাউন্ড অথবা ৬০ জন

জওয়ান নির্ধারিত হয়। কিন্তু ১৯ শ শতাব্দীতে ইউরোপ যুদ্ধপণ বিনিময়ের রীতি ত্যাগ করে এবং শুধুমাত্র বন্দী বিনিময়ের রীতি চালু রাখে। কিন্তু সভ্যতার এই ভরা যৌবন কালেও যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার রীতি একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এইযে, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সভ্য ইউরোপের সবচেয়ে বড় 'সমরনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইয়াফার চার হাজার তুর্কী সৈন্যকে এক খোড়া অজুহাত তুলে হত্যা করিয়ে দেন। এই সৈন্যদেরকে তিনি প্রাণ ভিক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নতি স্বীকার করিয়েছিলেন। অথচ পরে এই বলে তাদের হত্যা করেন যে, তাদেরকে খাবার সরবরাহ করার বা মিসর পাঠানোর সামর্থ্য তার ছিল না।[৩০৬]

এর প্রায় এক শতাব্দী পর পাশ্চাত্য জগতে এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কিউবার স্পেনীয় সমরনায়ক জেনারেল ওয়েলার যুদ্ধবন্দীদেরকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে হত্যা করেন এবং হাজার হাজার নিরীহ দেশবাসীকে পাকড়াও করে পোকা মাকড়ের মত ক্ষুধা পিপাসায় ধুকিয়ে ধুকিয়ে মেরে ফেলেন।

যাহোক, যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক বিধি রচনা সম্পন্ন হয় ১৮৭৪ সালের ব্রুসেল্‌স সম্মেলনে। এরপর ১৮৯৯ সালের হেগ সম্মেলন সেই বিধিকে অনুমোদন করে এবং ১৯০৭ সালের দ্বিতীয় হেগ সম্মেলন উক্ত বিধিকে আরো বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ করে একটা আন্তর্জাতিক আইনের রূপ দেয়। এই সব বিধি হেগ চুক্তির চতুর্থ ধারা ও তার সংযুক্ত ধারা সমূহে রয়েছে। ঐ ধারা সমূহের সংক্ষিপ্তসার এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।ঃ

৪ নং ধারাঃ যুদ্ধবন্দীরা যুদ্ধরত সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকবে–যারা তাদের গ্রেফতার করেছে তাদের নিয়ন্ত্রনে নয়। তাদের সাথে মানব সুলভ

আচরন করতে হবে। তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ও সামরিক কাগজ পত্র ছাড়া যে সব জিনিস পাওয়া যাবে তা তাদেরই মালিকানা ভুক্ত থাকবে।

৫ নং ধারাঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে সাধারণত অন্তরীনাদ্ধ রাখা উচিত। তবে নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য হলে তাদেরকে কারাগারে আটক করেও রাখা যেতে পারে।

৬ নরং ধারাঃ যুদ্ধবন্দীরা যে সকল সরকারের নিকট কারারুদ্ধ থাকবে, সেই সরকার যুদ্ধবন্দীদের পদমর্যাদা বিবেচনা পূর্বক তাদের নিকট থেকে শ্রম নিতে পারে। তবে অফিসারদের নিকট থেকে কোন অবস্থাতেই শ্রম নেয়া যাবে না। এ জন্য শর্ত হলো, শ্রম যেন সীমাতিরিক্ত না হয় এবং সামরিক তৎপরতার সাথে সম্পর্কহীন না হয়। তাদেরকে সেই শ্রমের মজুরী দিতে হবে এবং তা ঐ সরকার অনুরূপ পদমর্যাদার অধিকারী মানুষকে যে হারে দেয়, সেই হারেই দিতে হবে।

৭ নং ধারাঃ যুদ্ধবন্দীরা যে সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকবে, সেই সরকার তার ভরণ পোষনের জন্য দায়ী হবে। বিশেষ অবস্থা ছাড়া যুদ্ধবন্দীদেরকে ঐ সরকারের সমমর্যাদা সম্পন্ন চাকুরেদের যে মানে বসবাস করার সুযোগ দেয়া হয়, সেই মানে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮ নং ধারাঃ যুদ্ধবন্দীরা কারারুদ্ধকারী দেশের আইনের অনুগত থাকবে। যে কোন অবাধ্যতামুলক কাজ করলে ঐ দেশে তাদের ওপর প্রয়োজনীয় কঠোরতা প্রয়োগ করতে পারবে। পলাতক কয়েদী যদি নিজ সৈন্যদের কাছে পৌছার পূর্বে ধরা পড়ে তাহলে শাস্তির যোগ্য হবে। আর যদি নিজ সৈন্যদের কাছে পৌছার পর পুনরায় ধরা পড়ে তাহলে তাকে পূর্বেকার অপরাধের শাস্তি দেযা যাবেনা।

৯ নং ধারাঃ যে কোন যুদ্ধবন্দীকে তার নাম ও পদমর্যদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তার উচিত যাথাযথভাবে জবাব দেয়া। জবাব না দিলে কিংবা ভূল জবাব দিলে তার সুযোগ সুবিধা কমিয়ে দেয়া হবে।

১০ নং ধারাঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে তারা আর যুদ্ধে অংশ নেবেনা–এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করে মুক্তি দেয়া যায়। কোন যুদ্ধবন্দী যদি এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি পায় তাহলে উক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা তার কর্তব্য। তার সরকার তাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বাধ্য করতে পারবে না।

১১ নং ধারাঃ কোন যুদ্ধবন্দীকে শর্তাধীন মুক্তি লাভে বাধ্য করা চলবে না। কোন সরকারও বাধ্য নয় যে, যে কোন অবস্থায় যে কোন যুদ্ধবন্দীর মুক্তির আবেদন গ্রহণ করবে।

১২ নং ধারাঃ কোন যুদ্ধবন্দী যদি শর্তাধীন মুক্তি লাভের পর পুনরায় সেই সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে তাহলে সে যুদ্ধবন্দীর অধিকার পাবে না। ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা হবে।

১৩ নং ধারাঃ সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করে না এবং সেনাবাহিনীর সাথে কোন নিয়মিত সম্পর্কও রাখে না– এমন কোন লোক যদি সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত থাকে যেমন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি প্রভৃতি, তাহলে তাকে গ্রেফতার করে যুদ্ধবন্দীহিসাবে রাখা যেতে পারে।

১৪ নং ধারাঃ যুদ্ধ চলা কালে প্রত্যেক দেশ একটি তথ্য বিভাগ গঠন করবে। এই তথ্য বিভাগে প্রত্যেক বন্দী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তাদের সরকারকে মাঝে মাঝে তাদের অবস্থা জানাতে থাকবে।

১৫ নং ধারাঃ যুদ্ধরত দেশে আইন অনুসারে গঠিত যুদ্ধবন্দী সাহায্যকারী সমিতি থাকতে পারে। এ ধরণের সমিতি সমূহকে সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেয়া প্রত্যেক যুদ্ধরত দেশেরই কর্তব্য। যুদ্ধবন্দীরা বন্দী কিংবা অন্তরীন যে অবস্থায়ই থাক না কেন, সমিতির প্রতিনিধিদেরকে তাদের কাছেযেতে ও দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। অবশ্য শর্ত এই যে সমিতির লোকদেরও স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করতে হবে।

১৬ নং ধারাঃ তথ্য বিভাগটির ডাক মাশুল লাগবে না। চিঠিপত্র, মনিঅর্ডার মূল্যবান জিনিসপত্র ও পার্সেলাদি– যা যুদ্ধবন্দীদের নামে

আসবে কিংবা যুদ্ধবন্দীরা পাঠাবে, তা যুদ্ধরত উভয় দেশেই ডাক মাশুল, শুল্ক বা রেলওয়ে মাশুল মুক্ত হবে।

১৭ নং ধারাঃ গ্রেফতারকৃত অফিসারদেরকে গ্রেফতার কারী সরকার সমমর্যাদার কর্মচারীদেরকে যে হারে বেতন দিয়ে থাকে সেই হারে বেতন দেবে। এই টাকা পরবর্তীকালে স্বয়ং তার সরকার পরিশোধ করে দেবে।

১৮ নং ধারাঃ বন্দীদের আপন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা থাকবে এবং আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য যেসব বিধি প্রবর্তীত হবে তার অধীন তারা উপাসনালয়ে যেতে পারবে।

১৯ নং ধারাঃ আপন দেশের সৈন্যদের মৃত্যুকালীন ওছীয়ত যেভাবে বাস্তবায়িত করা হয়, সেইরূপ যুদ্ধবন্দীদের ওছিয়তও বাস্তবায়িত করা হবে। কোন বন্দী মারা গেলে জাতীয় সেনাবাহিনীর সমমানের লোকদের যেরূপ মানবিক মর্যাদায় শেষকৃত্য পলিত হয়, বন্দীর শেষ কৃত্যও সেইরূপ সামরিক মর্যাদায় পালিত হবে।

২০ নং ধারাঃ সন্ধি হলে যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধবন্দী বিনিময় করা হবে।

এসব বিধি কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর লোকদের জন্য। কিন্ত অন্তরীণাবদ্ধ বেসামরিক লোকদের এসব অধিকার দেয়া হবে কি না, সেটা এখনও অনিশ্চিত। এই বিধিগুলোকে যদি খুটিনাটি থেকে পৃথক করে কেবল মৌলিক বিধি হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এতে ইসলামী মূলনীতি সমূহের চেয়ে অতিরিক্ত তেমন কিছু নেই।[৩০৭] পাশ্চত্য আইন যুদ্ধবন্দীদেরকে যে সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দেয় তা হলো, যুদ্ধরত দেশ তার নিজের সমমর্যাদা সম্পন্ন সৈনিক অফিসারকে যেটুকু সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে তার সমান। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধবন্দীদেরকে নিজেদের চেয়েও উত্তম খাবার খাওয়াতেন এবং নিজেদের চেয়েও উত্তম পোশাক পরাতেন। অথচ শত্রুরা মুসলিম যুদ্ধবন্দীদেরকে খোরপোশ দেয়া দূরে থাক পাল্টা দৈহিক নির্যাতন চালাতো। পাশ্চাত্য দেশ সমূহ যুদ্ধ বন্দীদের ভরণ পোষণের একটা বিরাট অংশ স্বয়ং তাদের দেশের

কাছ থেকেই আদায় করে থাকে অথচ বিশ্ব নবীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র এমন অবস্থায়ও শত্রুপক্ষের যুদ্ধবন্দীদের জন্য অর্থ ব্যয় করেছে, যখন তা আদায় করার ব্যাপারে কোন বুঝাপড়া হওয়াই সম্ভব ছিল না। পাশ্চাত্য দেশসমূহ বন্দীদেরকে কেবল বিনিময়ের ভিত্তিতেই মুক্তি দিতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। অথচ ইসলাম অধিকাংশ সময় বিনিময় ছাড়াই তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে এবং কৃপা ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে মুক্তি দেয়াকেই সব সময় শ্রেয় মনে করেছে।

অবশ্য এ সব বিধিতে বাহ্যত কিছু সুযোগ সুবিধা যে ইসলামের দেয়া সুযোগ সুবিধার চেয়ে বেশী বেশী দেখা যায়, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে কোন মতামত প্রতিষ্ঠার আগে একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি দেশ অপর দেশের সৈনিকদেরকে এসব সুযোগ সুবিধা দিতে রাজী হয়েছে কেবল তার সৈন্যদেরকেও একই রকম সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে এই মর্মে চুক্তি হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইসলাম কোন চুক্তি বা সমঝোতা ছাড়াই যুদ্ধবন্দীদেরকে এসব সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। এমনকি যখন শত্রুপক্ষের দিক থেকে কোন রকমের সুবিধা লাভের কোনই আশা ছিল না, তখনও সে শত্রুপক্ষের বন্দীদেরকে সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। কোরেশদের কাছে আটকা পড়া মুসলমান বন্দীদেরকে যখন উত্তপ্ত বালুকার ওপর শুইয়ে দেয়া হতো, সে সময়েও বদর যুদ্ধের বন্দীদের ওপর অনুগ্রহ দেখানো হয়েছিল। তখন আজকের মত সমঝোতা বা চুক্তি সম্পাদন সম্ভব ছিল না। এ জন্য ইসলাম যুদ্ধবন্দীদেরকে যতটুকু সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, তখনকার পরিবেশে তার চেয়ে বেশী দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ যখন এ ব্যাপারে চুক্তি ও সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে, তখন ইসলাম তার পুর্ববর্তী আওতা সম্প্রসারণ ও সংবর্ধনে কিছুতেই অস্বীকৃতি জানাবে না। বস্তুতঃ অমুসলিমদের সাথে সমতার ভিত্তিতে কোন সুযোগ সুবিধার বিনিময়ের পথ সুগম হয় এমন চুক্তি সম্পাদন ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য বৈধ।

৪–আহত, পীড়িত ও নিহত

আহত ও পীড়িত সৈন্যদের জন্য ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতেই সর্বপ্রথম সামরিক হাসপাতাল প্রতিষ্টা এবং রণাঙ্গনে জরুরী চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ও সার্জন রাখা আরম্ভ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯ শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে পীড়িত ও

আহতদের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। এবং হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সম্পর্কেও কোন ধারণা ছিল না। আহত ও পীড়িত লোকদের অনেক সময় হত্যা করা হতো, কখনো কখনো যাতে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ধুকে

ধুকে মরে যায় তার ব্যবস্থা করা হতো। হাসপাতালগুলোকে নির্বিচারে সামরিক আক্রমণের লক্ষ্য বানানো হতো। চিকিৎসক ও নার্সদেরকে যুদ্ধ বন্দীরূপে গণ্য করা হতো এবং সাধারণ সংঘর্ষমান লোকদের মতই তাদেরকে বন্দী করা হতো। ১৯ শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ডাক্তার ও নার্সদেরকে যুদ্ধবন্দীরূপে গণ্য করা হবে কিনা, তা নিয়ে মতবিরোধ চলতে থাকে।[৩০৮] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিপক্ষীয়দের ডাক্তারদের প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগে কাজ করতে বাধ্য করার বৈধতা স্বীকার করে। মোট কথা ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপ আহত, পীড়িত ও চিকিৎসকদের সংক্রান্ত সভ্য আইনকানুনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সুইজারল্যান্ডের জনৈক খ্যাতনামা মানব প্রেমিক হেনরী ডোনান্ট (Henry donant) যখন ইউরোপের সভ্য জাতি গুলোকে তাদের পৈশাচিক কার্যকলাপ সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এক করুণ আহবান জানান, তখনই প্রথম তারা এই সভ্য আইনের সাথে পরিচিত হয়। ১৮৫৯ সালের জুন মাসে ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার সম্মিলিত বাহিনী এবং অষ্ট্রিয়ার বাহিনীর মধ্যে সোল ফার্নিওতে এক মারাত্মক সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে অন্যান্য পৈশাচিক ক্রিয়া কলাপের পাশাপাশি যুদ্ধাহত দের সাথেও এমন অমানুষিক আচরণ করা হয় যে, তাতে করে সমগ্র ইউরোপে মানবতা আর্তনাদ করে ওঠে। হেনরী ডোনান্ট এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ১৮৬২ সালে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে তিনি ঐসব অমানুষিক ঘটনাবলীর প্রতিকারের জন্য ইউরোপীয় জনমতকে আন্দোলিত করেন। ১৮৬৩ সালে সুইজারল্যান্ড সরকার জেনেভায় একটি বেসরকারী নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করা যায়, সম্মেলনে তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা হয়। এই সম্মেলনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরবর্তী বছর জেনেভায় একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্তর্জতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের পর একটি চুক্তি তৈরী হয় এবং তাতে ১৮৬৪ সালের ২২ শে আগষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাড়া পৃথিবীর সকল দেশ সই করে। এ চুক্তিতে সামরিক হাসপাতাল ও তার কর্মচারীদেরকে নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়। তাদেরকে যুদ্ধবন্দী করা কিংবা তাদের চিকিৎসালয়গুলোর ওপর আক্রমণ

পরিচালনা নিষিদ্ধ করা হয়। আর পীড়িত ও আহতদের সেবা শুশ্রুষা ও চিকিৎসায় অন্তরায় সৃষ্টি করাকে অবৈধ করে দেয়া হয়। এতে আহত পীড়িতদের সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিসপত্রে সাদার মধ্যে লাল ক্রশের চিহ্ন অংকনের প্রস্তাব করা হয়, যাতে দূর থেকে দেখে তা চেনা যায় এবং এরূপ চিহ্নিত কোন জিনিস সামরিক তৎপরতার শিকার না হয়। সেই সঙ্গে প্রত্যেক যুদ্ধরত পক্ষের জন্য শত্রুর আহত সৈন্যদের চিকিৎসা করা নিজের আহত সৈন্যদের চিকিৎসার মতই অবশ্য কর্তব্য বলে সাব্যস্ত হয়। আরোগ্য লাভের পর পুনরায় যুদ্ধে অংশ না নেয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদেরকে ছেড়েও দিতে পারে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক বা অন্তরীন করে রেখে দিতেও পারে।

এই চুক্তি নানা দিক থেকে ত্রুটিপুর্ণ ছিল। এতে সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এই যে, এইসব আইনের বিরুদ্ধাচরণ করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়নি। এই ত্রুটি শুধরানোর জন্য ১৮৬৮ সালে পুনরায় জেনেভাতেই আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৪দফা ভিত্তিক আর একটি ক্ষুদ্র চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ৫টি ধারা স্থল যুদ্ধ এবং ৯টি ধারা নৌযুদ্ধের জন্য। এই সম্মেলন বিভিন্ন সরকারের নিকট এই মর্মে সুপারিশ করে যে, তারা যেন নিজ নিজ যুদ্ধ আইনে এই চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গন্য করে। কিন্তু কোন দেশ ঐ সুপারিশ গ্রহণ করেনি কিংবা চুক্তিটিও অনুমোদন করেনি। এজন্য দ্বিতীয় জেনেভা সম্মেলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

১৮৭৪ সালের ব্রুসেলস সম্মেলন পুনরায় এই সমস্যাটি নিয়ে বিচার বিবেচনা করে এবং কতিপয় সুপারিশ পেশ করে। কিন্তু দ্বিতীয় জেনেভা সম্মেলনের যে দশা হয়, ব্রুসেলস সম্মেলনের সুপারিশ সমুহেরও সেই দশা হয়। এর ২৫ বছর পর ১৮৯৯ সালে হেগ সম্মেলনে সকল দেশ আহত ও পীড়িতদের সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাই তারা আর একটি জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠান করে। এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সুইজারল্যান্ড সরকারকে অনুরোধ করে।

এই অনুরোধ অনুসারে সুইজারল্যান্ড সরকার ১৯০১, ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালে পাশ্চাত্য দেশসমুহকে ক্রমাগত আমন্ত্রন জানাতে থাকে। কিন্তু কোন দিক থিকেই উৎসাহ ব্যাঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯০৬ সালের

গ্রীষ্মকালে সম্মেলনটি বসে এবং এতে ৬ই জুলাই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিই আজকের পাশ্চাত্য জগতের প্রচলিত আইন।

এরপর ১৯০৭ সালের হেগ সম্মেলন উল্লিখিত চুক্তির ভিত্তিতে আর একটি চুক্তি সম্পাদন করে।[৩০৯] সেই চুক্তিতে উক্ত আইনগুলোকে নৌযুদ্ধেও প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী ৪৪টি দেশের মধ্যে ১৭টি দেশ উক্ত চুক্তি অনুমোদন করেনি। এর মধ্যে বৃটেন, ইটালী, গ্রীস, বুলগেরিয়া ও সার্ভিয়া ঐ ১৭টি দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য চুক্তিটি কার্যতঃ নিষ্ক্রিয়ই থাকে। ফলে ১৯১৪-১৮ এর মহাযুদ্ধে হাসপাতালযুক্ত সামুদ্রিক জাহাজগুলো পাইকারীভাবে ধ্বংস করে ডুবিয়ে দেয়া হয়।[৩১০]

এই সমস্ত চুক্তির মুল কথা এই যে, যে শত্রু যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, জখম কিংবা ব্যাধি যাকে অকর্মন্য করে দিয়েছে, তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া মানবতার পরিপন্থী। এই মুলনীতি থেকেই জেনেভা ও হেগ চুক্তিতে সন্নিবেশিত হাসপাতাল ও হাসপাতাল কর্মীদের সংক্রান্ত বিধিসমুহ রচিত হয়েছে। এই বিধিমালার একটি বৃহৎ অংশ কোন বাস্তব ক্ষেত্রের খুটিনাটি বিধি নিয়েই তৈরী। আর এ সব খুটিনাটি বিধি যে অবস্থা ও কর্মপন্থার পরিবর্তনের সাথে সাথেই পরিবর্তিত হতে থাকবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই গুরুত্ব দিতে হবে কেবল মুলনীতিগুলোকে। পাশ্চাত্যজগত এসব মুলনীতি এখন আবিষ্কার করলো। কিন্তু ইসলাম ১৪শ বছর আগেই এগুলো চুড়ান্ত করেছে। পার্থক্য শুধু এই যে, পাশ্চাত্য জগত এগুলোর চুড়ান্ত রূপ দিয়েছে কেবল সে সকল দেশ যখন এই মুলনীতি মেনে নিয়েছে তখনই। কিন্তু ইসলাম এসব মুলনীতিকে তার স্থায়ী যুদ্ধ আইনের অঙ্গীভুত করেছে এমন অবস্থায়-যখন অমুসলিম জগত তার সাথে কোন চুক্তি সম্পাদনে প্রস্তুত ছিল না এবং যুদ্ধবিগ্রহে আহত মুসলিম জওয়ানদেরকে যখন নির্বিবাদে হত্যা করা হতো। এহেন অবস্থায় ইসলাম আপন সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেয় যে, প্রতিপক্ষ তোমাদের সাথে ভালো আচরণ করুক কিংবা মন্দ আচরণ করুক, তোমরা নিজেদের কর্তব্য মনে করে আহত ও অক্ষম লোকদের ওপর দয়া প্রদর্শন কর।

৫—ধ্বসাত্মক দ্রব্যাদির ব্যবহার

আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে যুদ্ধের নতুন নতুন ধ্বংসাত্মক সাজসরঞ্জাম তৈরী হওয়ার পর থেকে ইউরোপে নতুন করে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়েছে যে, এই

ধ্বংসাত্মক দ্রব্যাদির ব্যবহার কিভাবে রোধ করা যায়? বিষাক্ত গ্যাস, দেহের অভ্যন্তরে ফেটে ছড়িয়ে পড়ে এরূপ গুলি, অগ্নুদ্দীপক দ্রব্য এবং এই ধরণের অন্যান্য জিনিস মানবদেহের ওপর এমন ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, তা দেখে ইউরোপীয় বিবেক বিচলিত ও নিন্দামুখর হয়ে উঠেছে। মানবিক অনুভুতিসম্পন্ন নৈতিকতাবাদিদের একটি দল জনমতকে জাগিয়ে তুলেছে এবং রাজনীতিকদের ওপর এহেন অমানুষিক অস্ত্র ও দ্রব্যাদি ব্যবহার বন্ধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সামরিক শ্রেনী যুদ্ধের উদ্দেশ্য সফল করার ব্যাপারে এই সমস্ত জিনিস ব্যবহারে যে ফায়দা পেয়েছে তার দরুন তারা এর ব্যবহার ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে না। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্ধ বিরাজ করছে। রাজনৈতিক নেতারা এই দ্বন্ধ প্রশমনের একটি চমৎকার ঔষধ আবিস্কার করেছে। নৈতিকতাবাদীদের সান্তনা দেয়ার জন্য তারা আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদি অনুষ্ঠিত করে এবং তাতে মানবিক মুল্যবোধের লালন ও বিকাশের আশ্বাস সম্বলিত অঙ্গীকারনামা প্রণয়ণ করে। অপরদিকে সামরিক গোষ্ঠীকে তারা এই জাতীয় সকল দ্রব্যাদি ব্যবহারের অনুমতিই শুধু দেয় না, বরং আরো নতুন নতুন ধ্বংসাত্মক সরঞ্জামাদি তৈরী ও প্রবর্তন করারও অবাধ লাইসেন্স দিয়ে দেয়।

এই ধ্বংসাত্মক দ্রব্যাদির কয়েকটি বাহ্যতঃ অপেক্ষাকৃত বীভৎস আকৃতি সম্পন্ন। তাই ইউরোপবাসী তা এখন আর ব্যবহার করে না। বিষ মিশ্রিত অস্ত্র ব্যবহার সম্ভবতঃ ১৮শ শতাব্দী থেকেই বর্জিত। পেরেক, কাঁচের টুকরো, চাকুর ফলা এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিস কামানে ভরে নিক্ষেপ করাও এক শতাব্দী ধরেই নিষিদ্ধ রয়েছে। কিন্তু অন্য যেসব জিনিস মুলগতভাবে এগুলোর চেয়েও বহুগুন বেশী পৈশাচিক ও ধংসাত্মক, তা আজও একইভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইউরোপের সভ্যতম বলে কথিত দেশগুলি এগুলো ব্যবহার করতে সর্বাপেক্ষা উদগ্রীব ও অনমনীয়। ১৮৬৮ ও ১৯০৭ সালের সম্মেলনে নীতিগতভাবে সকল দেশ স্বীকার করে যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কোন সাহায্য করে না অথচ শত্রুর যন্ত্রনা অস্বাভাবিক রকমে বাড়িয়ে দেয় এমন দৈহিক ক্ষতিসাধন করা অনুচিৎ। এই মুলনীতির অধীন নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

১–১৪ আউন্সের কম ওজনের বিস্ফোরক ও অগ্নুদ্দীপক দ্রব্য।

২–দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেই ফেটে ছড়িয়ে পড়ে এমন বিষ্ফোরক গুলি।

৩–বিষাক্ত ও শ্বাসরোধক গ্যাস।

৪–বেলুন ও বিমানে করে বিষ্ফোরক গোলা বর্ষণ করা।

এর মধ্যে ৪র্থ নম্বর দুটো দেশ ছাড়া আর কেউ গ্রহণ করেনি। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ৪র্থ নম্বর ভুমিষ্ট হওয়া মাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ৩ নম্বরকে প্রথম শুধু আমেরিকা ও ইংল্যান্ড প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু পরে প্রায় সব কয়টি সভ্য দেশ তার বিরুদ্ধাচরণ করে মহাযুদ্ধের সময় সকলে মিলে একে লংঘন করে। যুদ্ধের পর ওয়াশিংটন সম্মেলনে পুনরায় এই নিষেধাজ্ঞার নবায়নের চেষ্টা করা হয় এবং একটা নতুন অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কেউ অনুমোদন করেনি। দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সমর বিশেষজ্ঞরা একমতই হতে পারেন নি। বিষ্ফোরক গুলির সংজ্ঞা কি তা নিয়েই তাদের মধ্যে রয়েছে তীব্র মতবিরোধ। আর সংজ্ঞা নির্ণিত না হওয়া পর্যন্ত তার নিষিদ্ধ হওয়ার কোন অর্থ হয় না। এরপর আসে প্রথমটির কথা। এটা নিছক কাগুজে নিষেধাজ্ঞা। বাস্তব জগতে এর কোন অস্তিত্বই নেই। বিশ্ব যুদ্ধের সময় সব ধরণের বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি যেরূপ বল্গাহীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে করে হেগ সম্মেলন ও সেন্টপিটার্সবার্গের অঙ্গীকারনামার কথা উল্লেখ করা লোক হাসানোর উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।[৩১১]

ইসলাম কিন্তু এ ব্যাপারে ধরাবাঁধা কোন বিধান দেয়নি। কারণ কোন বিশেষ ধরণের সমরাস্ত্র বা যুদ্ধ সরঞ্জামের ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা যুদ্ধরতদের পারস্পরিক সমঝোতার উপর নির্ভরশীল। একটি যুদ্ধরত পক্ষ যদি একটি ধ্বংসাত্মক দ্রব্য ব্যবহার করে তাহলে অপর পক্ষ তা ব্যবহার না করে পারেনা। তার জন্য সেই দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করা তার পরাজয়ের স্বপক্ষে অগ্রিম রায় দেয়ারই শামিল। এজন্য ইসলাম মুসলমানদের জন্য তাদের যুগে প্রচলিত যাবতীয় সমরাস্ত্র ও সমর পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমতি দিয়েছে। আবার অন্যান্য জাতির সাথে যদি কোন বিশেষ সমরাস্ত্র বা সমর কৌশল সমতার ভিত্তিতে বর্জন করার জন্য কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় তাহলে তাদেরকে উপস্থিত কল্যাণের ভিত্তিতে সেই চুক্তিতে অংশগ্রহণেরও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

৬–গোয়েন্দা

গোয়েন্দাকে কোন আইনে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। অন্যান্য আইনের মত পাশ্চাত্য আইনেও তার কোন আইনানুগ মর্যাদা স্বীকার করেনা। হেগ বিধির ৩০নং ধারায় তাকে শুধু একটি সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, মামলা না চালিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া চলে না। ৩১নং ধারায় তাকে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, কেউ যদি গোয়েন্দাগিরি করে পালিয়ে নিজের সৈন্যদের সাথে মিলিত হয় এবং তার পরে গ্রেফতার হয় তবে তাকে প্রথম অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া যাবে না। এই দুটো বিধি দিয়েই হেগ বিধি সামরিক কর্মকর্তাদেরকে গোয়েন্দা বলে প্রমাণিত ব্যক্তিকে যেমন খুশী সাজা দেয়ার পুর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করে।

এই ক্ষেত্রে ইসলামী আইনও পাশ্চাত্য আইন থেকে পৃথক নয়। উভয় আইনে কোন পক্ষের কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকে গোয়েন্দা বলা হয় যে গোপনে শত্রুর দেশে ঢুকে পড়ে এবং তার গোপন তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি কোন প্রকারের ধোকা প্রতারনা ছাড়াই প্রকাশ্যে শত্রুর অবস্থা জানার জন্য যায় তাকে দুই আইনের কোনটাতেই গোয়েন্দা বলা হয় না। অবশ্য পাশ্চাত্য আইনে গোয়েন্দাদেরকে যে অধিকার দেয়া হয়েছে ইসলামী আইনে সে অধিকার দেয়া হয়নি। কিন্তু তাই বলে এগুলো দেয়া চলবেনা তাও বলা হয়নি। আসলে এ গুলো পারস্পরিক ভিত্তিতে প্রদত্ত ও স্বীকৃত সুযোগ সুবিধা। উভয় পক্ষ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই একে অপরের গোয়েন্দাদেরকে এসব সুযোগ–সুবিধা দিয়ে থাকে। যেহেতু সকল দেশই গোয়েন্দা নিয়োগ করে থাকে এবং এমন নিবেদিত প্রাণ লোক গুলিকে পুরোপুরিভাবে শত্রুর দয়া মায়ার ওপর ছেড়ে দিতে কোন দেশই চায় না, তাই তারা আপোষে তাদেরকে কিছু কিছু সুযোগ–সুবিধা দিয়েছে। ইসলামী সরকারের গোয়েন্দারা যদি এসব সুযোগ সুবিধা লাভ করে তা হলে ইসলামও তার বিনিময়ে যুদ্ধরত দেশ সমুহের গোয়েন্দাদেরকে অনুরূপ সুযোগ–সুবিধা দিতে পারে।

৭–যুদ্ধে ধুর্তামী প্রয়োগ

যুদ্ধে ধুর্তামী প্রয়োগ করতঃ শত্রুকে বিভ্রান্ত করা বৈধ। ফ্রেডারিক দি গ্রেট বলেনঃ "যুদ্ধে কখনো কখনো লোকে সিংহের চামড়া পরে। কখনো কখনো যেখানে শক্তি প্রয়োগ ব্যর্থ হয় সেখানে শৃগালের চতুরতা সফল হয়।" ৩১২ তবে ধুর্তামী ও প্রতারণা এক কথা নয়। গুপ্ত ঘাটিতে ওৎ পেতে বসা, শত্রুকে

প্রকৃত অবস্থা জানতে না দিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় টেনে আনা, ভুল তথ্য পরিবেশন করে তাকে বিভ্রান্ত করা, এগিয়ে যাওয়ার ভান করে তাকে ভুল ধারণায় লিপ্ত করা ও পিছিয়ে যাওয়ার ভান করে তার ওপর অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়া ইত্যাদি সামরিক চাল ধুর্তামীর শামিল। প্রত্যেক যুদ্ধরত পক্ষের উচিৎ এসব চালের মোকাবিলার জন্য সদা সতর্ক থাকা। পক্ষান্তরে শত্রুকে বিপদ সংকেত দেখিয়ে নিকটে ডেকে আনা এবং তার ওপর আক্রমন চালানো, সন্ধির কথাবার্তা চালানোর ছলে সাদা পতাকা উত্তোলন করা এবং তার পরই তার ওপর ঝাপিয়ে পড়া, হাসপাতালের জন্য নির্দিষ্ট পতাকা সৈন্যদের ঘাটি ও অস্ত্রশস্ত্রের গুদামের ওপর উত্তোলন করা, নারী ও শিশুদেরকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের পেছন থেকে বোমা বর্ষণ করা এবং এই ধরণের ক্রিয়াকলাপ ধোকা ও প্রতারণার শামিল। কোন সেনাবাহিনীর জন্যই এসব বৈধ নয়। তবে কিছু সংখ্যক কাজ এমনও রয়েছে যা ধোকার পর্যায়ে পড়ে না, ধুর্তামীর পর্যায়ে তা স্থির করা সম্ভব নয়। যেমন শত্রুর পতাকা বা পোশাক ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক আইনের বিজ্ঞ পন্ডিতগণ বৈধ রেখেছেন। কিন্তু সামরিক মহল একে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। জার্মানীর আইনে এ একটা নিষিদ্ধ পদ্ধতি। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের যুদ্ধ আইনের দৃষ্টিতে এটা একটি মারাত্মক বেঈমানী। এ অপরাধ করার কারণে শত্রু কোন সুযোগ সুবিধা লাভের উপযুক্ত থাকে না। [৩১৩] সুতরাং বুঝা গেল, ধুর্তামী ও ধোকাবাজী সম্পর্কে এমন কোন আইন তৈরী করা সম্ভব নয় যার আওতায় সকল খুটিনাটি বিষয় এসে যায়। এ প্রশ্নটি একটি জাতির সামরিক চরিত্র ও নৈতিকতা বোধের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেক জাতি স্বীয় সম্ভ্রম বোধ ও সৌজন্য চেতনার ভিত্তিতে নিজেই স্থির করতে পারে যে, কি কি কাজ তার বীরত্ব ও পৌরুষের পরিপন্থী এবং কি কি তার পরিপন্থী নয়। এ জন্যই হেগ বিধিতে ধুর্তামীর কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র এটুকু বলে ক্ষান্ত থাকা হয়েছে যে, যুদ্ধে ধুর্তামী অবলম্বন (Ruses of war) এবং শত্রুর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার উপকরণ সমূহ ব্যবহার করা বৈধ। [৩১৪]

ইসলামের আইন এক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের আইনের সাথে একমত। মৌলিক ভাবে সামরিক ধুর্তামীর সেও বৈধ বলে রায় দিয়েছে এবং খুটিনাটি বিধি রচনার ভার সমসাময়িক ফিকাহবিদদের ওপর অর্পন করেছে। তারাই

সমসাময়িক অবস্থা ও পরিবেশের আলোকে স্থির করবেন কি কি জিনিস ধূর্তামীর সংজ্ঞার আওতায় আসে এবং কি কি জিনিস আসে না।

৮–প্রতিশোধ মূলক কার্যকলাপ

হেগ বিধিমালা এবং তার পূর্বের বা পরের আইন কানুনে প্রতিশোধ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। পাশ্চাত্য দেশ সমুহের স্বীকৃত আইন কানুনের একটিতেও জানা যায় না যে, শত্রুর দিক থেকে বাড়াবাড়ি করা হলে তার প্রতিশোধ নেয়া বৈধ কিনা আর বৈধ হলে তা কতদূর। সম্ভবত হেগ সম্মেলনে এ প্রশ্নটি ইচ্ছা করেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কেননা সামরিক মহল এ সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা মুঠোর মধ্যে রাখতে চায়। ব্যাক্তিগতভাবে আন্তর্জাতিক আইনের কোন কোন পন্ডিত এ শর্তাবলী নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। বিশেষত অধ্যাপক হল্যান্ডের প্রস্তাবিত শর্তাবলী আইন বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। এর সংক্ষিপ্ত সার এইঃ

১–যে অপরাধের প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা, প্রথমে তার পর্যাপ্ত তদন্ত করতে হবে।

২–উক্ত অপরাধ দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে, অন্য কোন উপায়ে সেই ক্ষতি পুরণ এবং প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দেয়া যদি সম্ভব না হয়।

৩–বিশেষ অবস্থা ছাড়া প্রত্যেক প্রতিশোধ মুলক পদক্ষেপ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির অনুমতি নিয়েই গ্রহণ করতে হবে।

৪–প্রতিশোধ যেন কোন ক্রমেই মুল অপরাধের তুলনায় বেশী বা কঠোরতর না হয়।[৩১৫]

কিন্তু এ সবই হচ্ছে আইন বিদদের ব্যক্তিগত অভিমত। সামরিক মহল কখনো এগুলো গ্রহণ করেনি। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সমাজের রীতি হলো, এক পক্ষ বাড়াবাড়ি করলে অন্য পক্ষের জন্যও অনুরূপ বাড়াবাড়ি বৈধ হয়ে যায়। অন্ততঃ মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে এটাই বাস্তব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে নির্যাতন করা, হাসপাতালযুক্ত জাহাজগুলিতে আক্রমন পরিচালনা করা, বাণিজ্যিক জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেয়া,অরক্ষিত ও অসামরিক বসতিতে গোলা বর্ষণ করা, বিষাক্ত গ্যাস ও

ফাটন্ত গুলি ব্যবহার যুদ্ধ আইনে সম্পূর্ণ অবৈধ। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় অন্যপক্ষ অনুরূপ আচরণ করেছে এই অজুহাতে প্রত্যেক পক্ষই সবরকমের অবৈধ আচরণ করেছে।

এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। ইসলাম ঘোষণা করেছেঃ

جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ

عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ه (الشورى : ٤٠)

"মন্দের বদলা সমপরিমান মন্দ। অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেবে এবং সংশোধন করবে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে প্রাপ্য। তিনি অবশ্যই বাড়াবাড়ি ভালো বাসেন না।"

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط وَلَئِنْ

صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ه (النحل : ١٢٦)

কাউকে শাস্তি দিতে হলে তোমাদেরকে যে পরিমাণ কষ্ট দেয়া হয়েছে, সেই পরিমাণ শাস্তি দাও। আর যদি ধৈর্য ধারণ করতে পার তা হলে ধৈর্য ধারণ কারীদের জন্য সেটাই সর্বোত্তম।"

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى

عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ (البقرة : ١٩٤)

"যে ব্যক্তি তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তোমরা তার ওপর সেই পরিমাণ বাড়াবাড়ি কর যতটা সে তোমাদের ওপর করে থাকে। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো।"

قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ه (البقرة : ١٩٠)

"তোমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করে তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করোনা সীমালংঘনকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন না।"

এই আয়াত সমুহে প্রথমতঃ প্রতিশোধ না নেয়া এবং ধৈর্য ধারণ করাকে উত্তম বলা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে অপরিহার্য সে ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে বটে। তবে শর্ত এই যে, সীমা লংঘন করা চলবে না এবং যে বাড়াবাড়ির বদলা নেয়া হচ্ছে, প্রতিশোধ তার অতিরিক্ত হতে পারবে না। তা ছাড়া প্রতিশোধ গ্রহণে তাকওয়া ও খোদা ভীতি যেন অক্ষুন্ন রাখা হয় এবং কোন অবস্থাতেই শরীয়তের সীমা লংঘন করা না হয় এই তাকিদও দেয়া হয়েছে। তাকওয়া অবলম্বন ও শরীয়তের সীমার আনুগত্য করার অর্থ এই যে, শরীয়তে যে সব কাজ মূলতই হারাম ও অবৈধ তা কোন অবস্থাতেই করা চলবে না। যেমন শত্রু সেনারা যদি আমাদের দেশে অনু প্রবেশ করতঃ আমাদের নারীদের শ্লীলতা হানি করে এবং আমাদের নিহতদের লাশ বিকৃত করে তা হলে তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাদের স্ত্রীদের সাথে ব্যভিচার করা এবং তাদের লাশ গুলোকে বিকৃত করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। অথবা যুদ্ধকালে তারা যদি আমাদের নারী, শিশু, বৃদ্ধ, জীবিত ও আহতদেরকে হত্যা করে তা হলে আমাদের উক্ত অপ–কর্মের অনুসরণ করা উচিৎ নয়। কিন্তু যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে গ্যাস প্রয়োগ করে এবং আমাদের ওপর বিস্ফোরক বোমা বর্ষণ করে তা হলে অনুরূপ শক্তি ও গুণ সম্পন্ন যুদ্ধাস্ত্র তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অধিকার আমাদের রয়েছে।

বেসামারিক লোকদের অধিকার ও কর্তব্য

এ পর্যন্ত সামরিক লোকদের পারস্পরিক বিষয়াদি আলোচিত হলো। এবারে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের পারস্পরিক বিষয় ও তদসংক্রান্ত আইন কানুনের দিকে আমরা দৃষ্টি দেব।

আগেই বলেছি যে, ইউরোপে বেসামরিক লোকদের অধিকার সংক্রান্ত অনুভূতি অনেক পরে জন্মেছে। চিন্তার দিক থেকে যদিও ১৮শ শতাব্দীতেই এর সুচনা হয়েছিল। কিন্তু কার্যতঃ ১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এমন কোন যুদ্ধ আইন তৈরী হয়নি যা তাদেরকে সামরিক লোকদের থেকে পৃথক করার ওপর জোর দেয়। ফ্রান্স আলজিরিয়ায়, বৃটেন দিল্লী "বিদ্রোহে" এবং উপদ্বীপের যুদ্ধে peninsulas ware মিত্র শক্তির সেনাবাহিনী যেরূপ বল্লাহীনভাবে বেসামরিক লোকদের পাইকারী গণহত্যা চালায় তাতে প্রাগসভ্যতা যুগের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। আইনবিদদের পক্ষ থেকে তাদের অধিকার

নির্ণয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল গ্রোটিয়াসের আমল থেকেই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ কাজ সর্বপ্রথম ১৮৭৪ সালে ব্রুসেলস সম্মেলনে শুরু হয়। ১৮৯৯ সালে হেগ সম্মেলনে এ কাজে নিয়মতান্ত্রিকতা আসে। আর একে পুর্ণতা দেয় ১৯০৭ সালের হেগ সম্মেলন। সুতরাং বেসামরিক লোকদের সম্পর্কে পাশ্চাত্য আইনের বয়স বড় জোর ৫৪ বছর। (মনে রাখতে হবে যে, এ উক্তি ১৯২৭ সনের–অনুবাদক)

এই আইন বেসামরিক লোকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ণয় অত্যন্ত ব্যাপক ভিত্তিতে করে। আর খুটিনাটি বিধি রচনায় প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মাথা খাটায়। কিন্তু এর পাশাপাশি ইউরোপে যুদ্ধের যে সব অত্যাধুনিক রীতি নীতি প্রবর্তিত হয়েছে তার দরুন সামরিক ও বেসমরিক লোকদের মধ্যে পার্থক্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ অবস্থার আলোকে বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ যুগের যুদ্ধ বেসামরিক লোকদের পক্ষে প্রাগ সভ্যতা যুগের যুদ্ধের চেয়েও বিপজ্জনক। খোদ ইউরোপের বড় বড় আইন বিশারদগণও সত্য উপলব্ধি করেছেন। বার্কেনহীত স্বীয় গ্রন্থ "আন্তর্জাতিক আইন"–এ লিখেছেনঃ "এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, বিশ্বযুদ্ধ যেভাবে পরিচালিত হয়েছে তাতে সন্দেহাতীতভাবে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বেসামরিক জনবসতি ও সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের মধ্যে পার্থক্য করার প্রগতিশীল মুলনীতি সমুহ এখন হয়ে যাওয়ার আশংকার সম্মুখীন।"[৩১৬]

এই আশংকার একটি প্রধান কারণ এই যে, যে আইনের ভিত্তিতে দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে সে আইনই একেবারে ভিত্তিহীন। একই বক্তব্য রেখেছেন গার্নার তদীয় 'আন্তর্জাতিক আইন ও মহাযুদ্ধ' নামক গ্রন্থেঃ

"১৯০৭ সালের হেগ চুক্তির ধারা গুলোকে যখন আমরা ১৯১৪–১৮ সালের মহাযুদ্ধের ঘটনাবলীর সাথে মিলিয়ে দেখি তখন একথা মনে রাখা জরুরী হয়ে দেখা দেয় যে মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সকল দেশ এ চুক্তিকে অনুমোদন করেছিল না। সুতরাং উক্ত চুক্তির বিধি গুলো মেনে চলা সকলের জন্য বাধ্যতামুলক কিনা, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছিল।"[৩১৭]

কিন্তু এর প্রকৃত কারণ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। অধ্যাপক ওপেনহাইম তার সারগর্ভ গ্রন্থ "আন্তর্জাতিক আইন"-এ এই কারণ গুলো উল্লেখ করেছেন। তাঁর

মতে আধুনিক যুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে পার্থক্য না থাকার কারণ চারটিঃ যথা–

(১) সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামুলক নিয়োগের রীতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার। একটি জাতির সমগ্র জন বসতির এমনভাবে সামরিক তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করা যে, সবল দেহী লোকেরা রণাঙ্গনে চলে যাবে এবং তাদের স্থলে নারীরা ও দুর্বল পুরুষেরা যুদ্ধ সরঞ্জাম নির্মান ও অন্যান্য দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

(২) যুদ্ধে বিমানের ব্যবহার। এর বিধি দ্বারা কেবল দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি সমুহের ওপরই আক্রমণ পরিচালনা করা হয়না বরং যোগাযোগ ও পরিবহনের ব্যবস্থাকেও ধ্বংস করা হয়।[৩১৮]

(৩) নির্বাচক মন্ডলীর মতামত সম্পর্কে গণতান্ত্রিক সরকার গুলোর ঔদাসীন্য।

(৪) শত্রুর ওপর অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ এবং তার প্রাচুর্যের উৎস গুলোকে ধ্বংস করার সামরিক গুরুত্ব।[৩১৯]

সুতরাং বর্তমান যুগের 'সভ্য' যুদ্ধে বেসামরিক লোকদের অধিকার যে বিপন্ন হয়ে পড়েছে তার কারণ শুধু পাশ্চাত্য আইনের ভিত্তির দুর্বলতা নয় বরং এর আসল কারণ এই যে, এ যুগের যুদ্ধে যে সব উপকরণ ব্যবহৃত ও যে সব পদ্ধতি অনুসৃত হয় সে সব উপকরণ ও পদ্ধতিতে বেসামরিক লোকদেরকে সামরিক লোকদের থেকে পৃথক করা এবং তাদের স্বতন্ত্র অধিকারের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

কিন্তু এসব মৌলিক ত্রুটি সত্বেও পাশ্চাত্য আইন বেসামরিক লোকদের জন্য কি কি অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে এবং তার নিজস্ব মুল্য ও মর্যাদা কতখানি তা আমাদের অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

১–বেসামরিক লোকদের প্রাথমিককর্তব্য

বেসামরিক লোকদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো কোন রকমের সামরিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ না করা। সকল যুদ্ধরত পক্ষই বেসামরিক লোকদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করে। তথাপি কার্যতঃ অংশ নেয়া না নেয়া তাদের

ইচ্ছাধীন। শত্রুপক্ষকে দেখামাত্রই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে কিনা। যদি তারা যুদ্ধে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত করে তা হলে তাদের উচিৎ জাতীয় সেনাবাহিনীতে যথারীতি ভর্তি হওয়া আর যদি অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে শান্তিপুর্ণভাবে নিজ নিজ কায়কারবারে নিয়োজিত থাকা। যারা এই দুই পন্থার একটিও অবলম্বন করবেনা এবং অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে যুদ্ধ করবে তারা পাশ্চাত্য যুদ্ধ আইন অনুসারে সামরিক লোকদের অধিকারও পাবে না, বেসামরিক লোকদেরও না। অর্থাৎ তাদের প্রতি মোটেই কৃপা প্রদর্শন করা হবে না। তাদেরকে কোন অবস্থাতেই নিরাপত্তা দেয়া হবে না এবং ধরা পড়লে তাদেরকে যুদ্ধবন্দীর সমমর্যাদাও দেয়া হবে না।[৩২০]

এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন আন্তর্জাতিক আইনের সাথে ঐক্যমত ও অংশতঃ দ্বিমত পোষণ করে। ইসলাম এ পর্যন্ত একমত যে, বেসামরিক লোকেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তারা বেসামরিক লোকদের সমঅধিকার পাবে না। কিন্তু তাদেরকে সামরিক লোকদের সমঅধিকারও দেয়া হবে না– এ ব্যাপারে সে একমত নয়। সাময়িক তৎপরতায় যেই লিপ্ত হয়, ইসলাম তাকে সামরিক লোকদের সমঅধিকার দিয়ে থাকে। কিন্তু সামরিক তৎপরতার সাথে সাথে তারা যদি প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতাও করে তাহলে সে তাদেরকে কোন সুযোগ সুবিধাই দিতে প্রস্তুত নয়। যেমন কোন মহিলা যদি গোপনে মুসলমানদের খাবার পানিতে বিষ মিশিয়ে দেয় তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি মুসলমানদের আশ্রয়ে এসে প্রতারণার মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করে তাহলে তার ওপর কোনক্রমেই দয়া দেখানো হবে না। উক্কাল ও উররাইনা গোত্রের লোকেরাও তাই করেছিল। হযরত রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আশ্রয় দেন এবং তারা প্রতারণাপূর্বক তাঁর রাখালদের হত্যা করে উট নিয়ে চলে যায়। এ জন্য হযরত তাদেরকে সামরিক ও বেসামরিক উভয়বিধ অধিকার থেকেই বঞ্চিত করেন। তাদেরকে ডাকাত ও দস্যুরূপে গণ্য করেন এবং দৃষ্টান্তমুলক কঠোর শাস্তি দেন।

বেসামরিক লোকদের আরো একটা কর্তব্য এই যে, শত্রু সেনারা তাদের এলাকা অতিক্রম করার সময় যদি গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পথের সন্ধান চায় তাহলে তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে হবে। তারা যদি পরিবহনের উপকরণাদি চায় তাহলে তাও তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে এবং তাদের

সামরিক তৎপরতায় কোন বাধার সৃষ্টি করা যাবে না। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে আক্রমণকারী সৈন্যরা তাদেরকে কঠিন সাজা দিতে পারবে। ৩২১ এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও পাশ্চাত্য আইন একমত।

২—বেসামরিক লোকদের নিরাপত্তা

উল্লিখিত কর্তব্য সমূহের পাশাপাশি বেসামরিক লোকদের একটা মৌলিক অধিকার এই যে, যুদ্ধে তাদের জানমাল নিরাপদ থাকা উচিৎ। অবশ্য একথা সত্য যে, যুদ্ধ চলাকালে কখনো কখনো তারাও সৈন্যদের আক্রমনের আওতায় না এসে পারে না। যেমন একটি রণক্ষেত্রে গোলাগুলি চলছে এবং সেখানে শিশু ও স্ত্রীলোক রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের একেবারে অক্ষত থাকা সম্ভব নাও হতে পারে। অথবা ধরা যাক, একটি রেলগাড়ীতে সামরিক ও বেসামরিক উভয় শ্রেণীর লোক রয়েছে। এমতাবস্থায় শত্রু যদি তাদেরকে আক্রমণ করে তাহলে অনিবার্যভাবেই কিছু বেসামরিক লোকও মারা যাবে। কিন্তু এরূপ অজ্ঞাতসারে কিংবা মাঝে মাঝে যুদ্ধের আওতায় আসার দ্বারা তাদের নিরাপত্তার মৌলিক নীতি প্রভাবিত হয় না। আইন অনুসারে আক্রমণকারী সৈন্যদের কর্তব্য এই যে, তারা যেন জেনে শুনে স্বেচ্ছায় সামরিক তৎপরতাকে বেসামরিক লোকদের দিকে চালিত না করে। যতদূর সম্ভব তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করাই তাদের কর্তব্য।[৩২২]

এ ব্যাপারেও ইসলামী আইন ও পাশ্চাত্য আইন পরস্পরের সাথে একমত। ইসলামী আইনে বেসামরিক লোকদের ওপর কেবল ইচ্ছাকৃত আক্রমণই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞাতসারে যদি যুদ্ধকালীন কোন আঘাত বা আক্রমণ তাদের ওপরও লেগে বসে তা হলে তার জন্য কোন দায় দায়িত্ব বর্তাবে না। তায়েফ অবরোধ কালে যখন কামানের ন্যায় দুর্গভেদী অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তখনও প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, এ সব অস্ত্র যে রূপ পাইকারী পাথর বর্ষণ করবে তাতে শহরের বেসামরিক অধিবাসীরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা আছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই যুক্তিতে যে উক্ত অস্ত্র সমূহ ব্যবহার করার আসল উদ্দেশ্য অবরোধ চূর্ণ করা--বেসামরিক জনগণকে আক্রমণের লক্ষে পরিণত করা নয়– হজরত রাসূলে করীম (দঃ) উক্ত অস্ত্র সমূহ ব্যবহার করেন।

৩–অরক্ষিত জনবসতির ওপর গোলাবর্ষন

বেসামরিক অধিবাসীদের নিরাপত্তার অধিকার স্বীকার করে নেয়ার পর প্রশ্ন জাগে যে, যুদ্ধ পরিচালনাকালে এ অধিকারটি কিভাবে রক্ষা করা যায়? এ ব্যাপারে সমরবিদ ও কৌশূলীদের মধ্যে বিরাট মতভেদ বিদ্যমান এবং বর্তমান কৌশুলীদের মতামত সমরবিদদের মতামতের নীচে চাপা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। যুদ্ধ যদি হাতাহাতি যুদ্ধ হয় কিংবা দুটো মুখোমুখি বাহিনীর মধ্যে হয় তা হলে বেসামরিক অধিবাসীকে অস্ত্রের আঘাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু যেখানে মাইলের পর মাইল ব্যবধান থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং বিশেষতঃ যেখানে প্রতিপক্ষের কোন শহর জয় করার ইচ্ছা পোষণ করা হচ্ছে সেখানে বেসামরিক অধিবাসীকে যুদ্ধের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা কিভাবে সম্ভব। এ প্রশ্নের জবাব কৌশূলীদের নিকট এই যে, গোলা বর্ষণের অধিকারটির ওপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করা উচিৎ। আর সমরবিদরা বলেন, কোন নিয়ন্ত্রন আরোপ করো উচিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বেসামরিক অধিবাসীদের রক্ষা করার যে পন্থা উদ্ভাবন করা হয়েছিল তা হচ্ছে এই যে, গোলা বর্ষণের পূর্বে বেসামরিক অধিবাসীদেরকে শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য সময় দেয়া হতো। ১৮৭০ সালের যুদ্ধে জার্মানী কয়েকটি ক্ষেত্রে এ নীতি কার্যকরীও করে। কিন্তু পরে সমরবিদগণ ঐক্যমত সহকারে সিদ্ধান্ত নেন যে এ ধরনের সময় দেয়া যুদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে ক্ষতিকর। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর জার্মান সৈন্যরা প্যারিসে গোলা বর্ষণ করে এবং সেখানে বেসামরিক লোকদের বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়নি।

তারা বরং একথাই স্পস্ট করে বলে দিয়েছিল যে, বর্তমান অবস্থায় শহরে বেসামরিক অধিবাসীর উপস্থিতি কাম্য। এতে প্রতিপক ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত হয়ে শহর আমাদের হাতে তুলে দেবে। এর অল্প কিছুদিন পর এডমিরাল আওবের এ বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং তা সমরবিদদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি যুদ্ধে প্রতিপক্ষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যের উৎসগুলোকে ধ্বংস করার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন। তাতে তিনি এতদূর লেখেন যেঃ

" আগামী দিনের যুদ্ধে আমাদের প্রত্যাশা এই যে, সশস্ত্র নৌবহর গুলো তাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের গতি উপকুলবর্তী শহরগুলোর দিকে ঘুরিয়ে

দেবে,চাই সে শহর প্রাচীর বেষ্টিত হোক বা না হোক, চাই তার প্রতি রক্ষার ব্যবস্থা থাক বা না থাক। তাদেরকে জ্বালাবে , ধ্বংস করবে এবং অন্ততঃ নির্মমভাবে যুদ্ধপণ তো অদায় করবেই। ” ৩২৩

এর কয়েক বছর পর ১৮৮৮ সালে ইংল্যান্ডের নৌবহরের কৃত্রিম যুদ্ধ হয় এবং তাতে অন্যান্য কার্যকলাপ ছাড়াও “ উপকুলবর্তী” জনবসতির ওপর আক্রমণ চালানো হয় ও যুদ্ধপণ আদায় করা হয়। অধ্যাপক হল্যান্ড এতে কঠোর আপত্তি তোলেন এবং লন্ডন টাইমসে ধারাবহিক নিবন্ধ লেখেন। এর ফলে পুনরায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করে যে, বেসামরিক অধিবাসীর ওপর গোলা বর্ষণ করা যাবে কিনা। কৌশূলীদের অভিমত ছিল এই যে, এটা অন্যায় কাজ। কিন্তু নৌবাহিনীর নেতৃত্ব একে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ বলে মত দেয়। ১৮৮৯ সালে নৌ সেনাপতিদের এক কমিটি ঐক্যমত সহকারে এই মর্মে এক রিপোর্টও দেয়। ৩২৪

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম হেগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন ঐ প্রশ্নটি নতুন করে তোলা হয়। সে সময়ে সম্মেলনের ওপর কৌশূলীদের প্রভাব বেশী ছিল এবং সমরবিদরাও রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নীরবতা অবলম্বন করেছিল। এজন্য স্থল যুদ্ধের বিধিতে গোলাবর্ষণের অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ১৯০৭ সালের সম্মেলনে এই নিয়ন্ত্রণ নৌযুদ্ধেও প্রবর্তিত হয়। এই নি..ন্ত্রনকারী বিধিনিষেধ সমূহ নিম্নরূপঃ

“ অরক্ষিত শহর, গ্রাম, জনবসতি ও ভবন সমূহে গোলাবর্ষণ বা অন্য কোন ভাবে আক্রমণ পরিচালনা করা নিষিদ্ধ।” (হেগ বিধি, ২৫শ ধারা)

“ আক্রমণকারী সৈন্যদের অধিনায়কের কর্তব্য হলো গোলাবর্ষণ শুরু করার পূর্বে অবরুদ্ধ জনপদের শাসকদের হুশিয়া.. করে দেবে এবং এ জন্য তার ইখতিয়ারাধীণ যে সব উপায় উপকরণ আছে তার সবই ব্যবহার করবে। তবে অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করা যদি একান্তই অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় তাহলে অবশ্য সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। ” (ধারা–২৬)

“ গোলাবর্ষণ ও অবরোধ করার সময় যতদুর সম্ভব সেই সব ভবনগুলোকে অক্ষত রাখার চেষ্টা করা উচিতঃ যা ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী অথবা দাতব্য ধরনের কাজের জন্য নিবেদিত। তা ছাড়া ঐতিহাসিক স্মৃতি, হাসপাতাল এবং যেসব জায়গায় আহত ও পীড়িতদের রাখা হয় সেই

সব স্থানকে যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবে যদি এসব জায়গা সামরিক তৎপরতায় ব্যবহৃত না হয়।”

অনুরূপভাবে নৌযুদ্ধের আইনবিধি প্রসঙ্গে দ্বিতীয় হেগ সম্মেলনের চুক্তির নবম ধারায় গোলাবর্ষণ ও অবরোধের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়।”

১ম ধারাঃ অরক্ষিত শহর বন্দর গ্রাম বসতি এবং ভবন সমূহের ওপর রণপোত গুলোর গোলাবর্ষণ নিষিদ্ধ। কোন বন্দরের কাছে স্বয়ংক্রিয় মাইন বসানো রয়েছে কেবল এই অজুহাতে গোলাবর্ষণ করা যায় না। ৩২৫ (এই ধারার শেষ বাক্যটিতে বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান ও জার্মানী দ্বিমত প্রকাশ করে)।

২য় ধারাঃ সামরিক কারখানা, সামরিক বা নৌবিভাগ, অস্ত্র-ভান্ডার, যুদ্ধ সরঞ্জামের গুদাম, প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনী বা নৌবাহিনীর উপকারে আসতে পারে এমন কারখানা বা ইঞ্জিন এবং বন্দরে অবস্থানরত জঙ্গী জাহাজ ইত্যাদি এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। নৌবাহিনীর অধিনায়ক প্রাথমিক নোটিশ দিয়ে পর্যাপ্ত সময় অপেক্ষা করার পর এ গুলো ধ্বংস করে দিতে পারে। শত্রু নিজে যদি ঐ সব জিনিস ধ্বংস না করে এবং এমতাবস্থায় যদি কিছু অনিবার্য ক্ষতি হয় তা হলে সে তার জন্য দায়ী নয়। যদি সামরিক কারণে অবিলম্বে আক্রমণ করা প্রয়োজন হয় এবং শত্রুকে কোন সুযোগ দেয়া সম্ভব না হয় তা হলে শহরের অরক্ষিত অংশের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে এবং অধিনায়ককে চেষ্টা করতে হবে যেন শহরের যথা সম্ভব কম ক্ষতি হয়।

৩য় ধারাঃ স্থানীয় প্রশাসকগণ যদি কোন নৌবাহিনীর আনুষ্ঠানিক তলব সত্ত্বেও তাকে অত্যাবশ্যকীয় রসদপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ না করে তা হলে তাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সময় দেয়ার পর অরক্ষিত বন্দর; শহর, গ্রাম, বসতি অথবা ভবনের ওপর গোলাবর্ষণ করা যেতে পারে।

৪র্থ ধারাঃ আর্থিক উপঢৌকনাদি না দেয়ার অপরাধে কোন অরক্ষিত এলাকার ওপর গোলাবর্ষণ করা যাবে না।

৫ম ধারাঃ কোন নৌবাহিনী যখন কোন শহরের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করবে তখন অধিনায়ককে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যেন পবিত্র ভবনসমূহ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা চর্চা এবং জনকল্যাণমূলক তৎপরতার জন্য নিবেদিত ভবনসমূহ, হাসপাতালসমূহ এবং রোগী ও আহতদের অবস্থান

কেন্দ্রসমূহের কোন ক্ষতি না হয়– অবশ্য এই সব স্থান যদি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়। উক্ত শহরের অধিবাসীদের কর্তব্য তারা যেন এ ধরনের ভবনগুলোকে দর্শনীয় নিদর্শনাবলী দ্বারা চিহ্নিত করে। এই সব নিদর্শন বড় বড় লম্বা আকৃতির রেখা সম্বলিত হবে এবং তাতে দুই রং–এর ত্রিভুজ বানানো হবে। ওপরের ত্রিভুজ কালো এবং নীচের ত্রিভুজ সাদা।

৬ষ্ঠ ধারাঃ সামরিক পরিস্থিতিতে যদি সংকুলান হয় তাহলে আক্রমণকারী বাহিনীর অধিনায়কের কর্তব্য গোলাবর্ষণের পূর্বে স্থানীয় প্রশাসককে তার ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করা।

এই নিয়ন্ত্রণ বিধিসমূহ মূলতঃই অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এর সর্ব প্রথম ত্রুটি হলো, এতে অরক্ষিত জায়গার কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। এতে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি জায়গাকে রক্ষিত বলা যাবে এবং কি কি বৈশিষ্ট্য না থাকলে তাকে অরক্ষিত মনে করতে হবে তা মোটেই বুঝা যায় না। দ্বিতীয় ত্রুটি হলো গোলাবর্ষনের পূর্বে নগরবাসীকে সতর্ক করার ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে আক্রমণকারী বাহিনীর অধিনায়কের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।(এমনকি ইচ্ছা করলে সে সতর্ক না করতে পারে এ ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে।)

তৃতীয় ত্রুটি এই যে একদিকে পবিত্র ভবনসমূহ, জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রসমূহ, ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং হাসপাতাল সমূহের পবিত্রতার জন্য উপর্যুপরি তাকিদ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে এই শর্তও আরোপ করা হয়েছে যে, এই ভবনগুলো যেন সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়। এই শর্তের ছুতা অধিনায়ক অজুহাত খাড়া করতে পারে যে, তার জানা মোতাবেক ঐ সব ভবন সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছিল তাই গোলাবর্ষন তার সঙ্গত অধিকার ছিল। কিন্তু এর সবচেয়ে বড় খুঁত এই যে, এতে আক্রমণকারী বহিনীকে প্রয়োজনীয় রসদপত্র সাজ–সরঞ্জাম সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলেই শহরবাসীর ওপর আক্রমণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই একটি খুঁত সমস্ত বিধিমালাকে অর্থহীন করে দিয়েছে। কেননা একটা আক্রমণকারী বাহিনীর জন্য এটা খুবই সহজ কাজ। সে যখনই কোন "অরক্ষিত' জনবসতির ওপর আক্রমণ চালাতে চাইবে তখন সে তার নিকট হতে বেশী পরিমাণে রসদ চাইবে যা তারা কোন অবস্থাতেই দিতে না পারে। এ ভাবে যখন তারা দিতে ব্যর্থ হবে অমনি তাদের উপর গোলাবর্ষন শুরু করবে। এ কথা সত্য যে, নবম

সমঝোতার ৩য় ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, রসদপত্র তলব করলে সেই জায়গার সম্পদ ও উপায়–উপকরনের অনুপাতে তা করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, স্থানীয় সম্পদ ও উপায় উপকরণের অনুপাত স্থির করবে কে? আক্রমণকারী সৈন্যরা যদি একটা বিশেষ পরিমাণ রসদকে এ জায়গার জন্য সংগত মনে করে এবং স্থানীয় প্রশাসকগণ তা সংগত মনে না করে তা হলে কোন্ পক্ষের কথা সত্য, সেটা স্থির করার জন্য কোন্ আদালত আসবে?

কিন্তু এত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সমরবিদগণ এই সব বিধি নিষেধের ব্যাপারে খোলাখুলি দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। গোলাবর্ষনের পুর্বে শত্রুকে সতর্ক করা ও সুযোগ দেয়া সম্পর্কে তারা বলেন যে, এটা করার অর্থ মূল্যবান সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়।[৩২৬] রসদ পত্র তলব করার ব্যাপারে স্থানীয় সম্পদ ও উপায় –উপকরণের অনুপাতের দিকে নজর রাখার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সমরবিদরা বলেন, " তত্ত্ব হিসাবে এটা চমৎকার। কিন্তু একে কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়"[৩২৭] (Kriegs brauch)। সব চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, সমরবিদদের মতে গোলাবর্ষনের পূর্বে বেসামরিক নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা দেয়া শুধু নিষ্প্রয়োজনই নয়–বরং তাদেরকে বিশেষ ভাবে সামরিক তৎপরতার লক্ষ্যে পরিণত করা যুদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে খুবই সহায়ক।

তারা বলেন, "যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে অবরুদ্ধ স্থানে নারী, শিশু ও অন্যান্য বেসামরিক নাগরিকের থাকাই চাই। কেননা কেবলমাত্র এই পন্থায়ই অবরোধকারী বাহিনী অবরুদ্ধদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে অতিশীঘ্র আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করতে পারবে।"[৩২৮]

এসব মতামত কেবল মুখে এবং লেখনীতে প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি। কাজের মাধ্যমেই হেগ সম্মলনের প্রবর্তিত বিধি নিষেধগুলোর দফা রফা করা হয়েছে। ১৯০৭ সালের হেগ সম্মেলনের পর ইউরোপে প্রথম যুদ্ধ হয় ইটালী ও তুরস্কের মধ্যে। ইটালী বৈরুতে গোলাবর্ষণ করে অরক্ষিত বেসামরিক জনপদের একটি অংশকে ধ্বংস করে দেয়। এর পর দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় বলকান ও তুরস্কের মধ্যে। এ যুদ্ধে থ্রেস ও মেকডোনিয়াতে বেসামরিক লোকদের প্রকাশ্যে হত্যা করা ও তাদের সম্পদ লুটপাট করা হয়। এক মাত্র

পশ্চিম থ্রেসের কথা জানা যায় যে, সেখানে ২ লক্ষ ৪০ হাজার বেসামরিক মুসলমানকে হত্যা করা হয়। ৩২৯ এর পর যখন ১৯১৪ সালে ইউরোপের সুসভ্যতম দেশগুলোর মহাযুদ্ধ বেধে গেল তখন এসব বিধি নিষেধ পাইকারী ভাবে লংঘিত হতে লাগলো। বার্কেনহীত স্বীয় গ্রন্থ "আন্তর্জাতিক আইন"-এ লিখেছেনঃ

"মহাযুদ্ধের পূর্বে রক্ষিত ও অরক্ষিত জনপদের মধ্যে যে পার্থক্য করা হতো মহাযুদ্ধ তার বিলোপ সাধন করে। এর পর থেকে রক্ষিত ও অরক্ষিত জনপদের সংজ্ঞা ও সীমা নির্ধারণেই নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সীমা নির্ধারণ ও ভেদ রেখা টানার কোন চেষ্টাও করা হয়নি।"৩৩০

এর মধ্যে যে জিনিসটি হেগের বিধিনিষেধ সমূহের বিলোপ সাধনে সব চেয়ে বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে তা হলো, সামরিক তৎপরতায় বিমানের ব্যবহার। মূলতঃ বিমান এই অর্থে কোন সমরাস্ত্রই নয় যে, এর দ্বারা যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে কোন অগ্রগতি হতে পারে। যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য হলো শত্রুর সামরিক শক্তি চূর্ণ করা এবং যথা সম্ভব শত্রুর অধিকতর এলাকা দখল করা। কিন্তু বিমান এই উভয় কাজ করতে সক্ষম নয়। বিমান শুধু আকাশ থেকে সাধারণ জন বসতির ওপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করতে পারে, নারী, শিশু, পীড়িত ও আহত সমেত সকলকে ধ্বংস করতে পারে। শহর নগরকে বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। শত্রু জাতিকে এতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে যে তারা যুদ্ধ করতে আর সাহস না পায়। আর পারে শত্রুর নৈতিকবল ও মনোবল চূর্ণ করে দিতে। মহা যুদ্ধের পূর্বে কৌশূলীরা যুদ্ধের এই পন্থাকে অবৈধ মনে করতো। কিন্তু মহা যুদ্ধের সময় যখন এটা একটা সাধারণ যুদ্ধ রীতিতে পরিণত হলো তখন স্বয়ং কৌশুলীদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন সূচিত হলো। তারা একে একটা অপরিহার্য্য পন্থা মনে করতে লাগলো। এই দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যক্ত হয়েছে গ্রন্থকার এটস্ বাসিরের নিম্নোক্ত কথা গুলিতেঃ

"কিছু সংখ্যক সামরিক তৎপরতা এমন আছে যা শুধুমাত্র এইজন্য বৈধ যে, তার একমাত্র লক্ষ্য শত্রুর সামরিক শক্তির অন্তর্নিহিত ভিত্তি দুর্বল করে দেয়া। (অরক্ষিত উপকূলবর্তী শহরে গোলাবর্ষণও এই ধরনের বৈধ ক্রিয়া

কলাপের অংশ বিশেষ। কেননা এতে করে শত্রুর অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া শত্রুপক্ষিয় জনসাধারনের মধ্যে বিশেষ ধরনের ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার হয়)।...... এই যুক্তির ভিত্তিতেই বিমান থেকে বোমা বর্ষণে কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়া উচিৎ নয়। এই সব আক্রমণের ব্যাপারে রক্ষিত অরক্ষিত স্থানের মধ্যে পার্থক্য করা নিরর্থক। কেননা অধিকাংশ সময় এলাকা জয় করার উদ্দেশ্যে বোমা বর্ষণ করা হয় না–বরং বোমাবর্ষণ করা কেবলমাত্র শত্রুর অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় আনা এবং শত্রুর মনে ভীতি ও যুদ্ধ বিমুখতা সৃষ্টি করার জন্য। বলাবাহুল্য অরক্ষিত অঞ্চল গুলোতে গোলা বর্ষণ দ্বারাই এ উদ্দেশ্যটি সফল হয়ে থাকে।" ৩৩১

মহা যুদ্ধের পর সকলের মনে ভাবনা দেখা দিল, আর না হোক অন্ততঃবিমানের গোলাবর্ষণের একটা সীমা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ প্রবলভাবে দাবী তুললো যে, বিমান হামলার জন্য বিধি নিষেধ প্রণয়ন করতে হবে। ১৯২২ সালে ওয়াশিংটন সম্মেলন এ উদ্দেশ্যে একটা কমিশন নিয়োগ করে। বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, হল্যান্ড, জাপান ও আমেরিকার প্রতিনিধিবর্গ নিয়ে কমিশনটি গঠিত হয়। এই কমিশন বহু চিন্তা গবেষণার পর ১৯২৩ সালে কতিপয় সুপারিশ পেশ করে। সুপারিশ কয়টির সারমর্ম নিম্নে দেয়া যাচ্ছেঃ

(১) বিমান থেকে গোলা বর্ষণ করা কেবল তখনই বৈধ যখন তার আক্রমণের লক্ষ্য হবে সামরিক বিষয় সমূহ। আর সামরিক বিষয় বলতে বুঝায় সামরিক ঘাঁটি, অস্ত্র কারখানা, অস্ত্র গুদাম, সমর বিভাগ ও কর্মচারীবৃন্দ। যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম নির্মাণকারী কারখানা সমূহ, যুদ্ধে ব্যবহৃত পরি-বহণের উপকরণাদি ও যাতায়াত ব্যবস্থায়।

(২) এই সব সামরিক বিষয়গুলো যদি এমন জায়গায় অবস্থিত হয় যার ফলে বেসামরিক অধিবাসীদের ক্ষতি না করে তাদেরকে আঘাত হানা সম্ভব না হয় তাহলে এসব সামরিক জায়গার ওপর গোলাবর্ষণ করা উচিত নয়।

(৩) যে সব জনপদ ও ভবন সরাসরি যুদ্ধ এলাকার অন্তর্ভূক্ত এবং যেসব ভবন ও জনপদে সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে বলে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মানোর কারণ বর্তমান, তাদের ওপর বিমান যোগে গোলা বর্ষণ করা বৈধ। তবে যুদ্ধ এলাকার বাইরে কোন জনপদের ওপর গোলাবর্ষণ করা বৈধ নয়। এ হিসাবে

বলা যেতে পারে যে, বেসামরিক অধিবাসীদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনষ্ট করা যে বিমান হামলার উদ্দেশ্য, তা নিষিদ্ধ।

(৪) যে যুদ্ধ–বিমানের চালক প্যারাসুটের সাহায্যে জান বাঁচানোর চেষ্টায় নিয়োজিত, তার ওপর আক্রমণ করা নিষিদ্ধ।৩৩২

কিন্তু এই সব বিধি এখন কাগজেরই শোভা বর্ধন করছে। কোন দেশ এগুলিকে অনুমোদন করে নিজ রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়নি। ৩৩৩ শুধু তাই নয়। যুদ্ধে এসব বিধি কার্যে পরিণত করা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কেও এখনো সন্দেহ রয়েছে। বার্কেনহীত লিখেছেনঃ "বিমান থেকে গোলাবর্ষণকে শৃংখলার আওতায় আনার উদ্দেশ্যে যে বিধিসমূহের প্রস্তাব করা হয়েছে তা নিয়ে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। এসব বিধিমালাকে যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে ১৮১৯ সালের অবসান কালে যে রূপ বিমান যুদ্ধের কল্পনা করা সম্ভব ছিল তার চেয়ে বড় আকারের বিমান যুদ্ধে ঐ বিধিমালার আনুগত্য করা সম্ভব হবে কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।" ৩৩৪

এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য যুদ্ধ আইনে রক্ষিত ও অরক্ষিত জনপদের যে পার্থক্য করা হয়েছে এবং অরক্ষিত জন বসতির জন্য যে অধিকার সমূহ নির্ধারন করা আছে তা শুধু চোখে ধুলো দেয়ার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য আইনের "বেসামরিক লোকদের জান মালের নিরাপত্তা বিধান করা উচিত' এই একটি মাত্র মতবাদ ছাড়া আর কোন পূঁজি নেই। কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগের প্রশ্নে বলা যায় যে, এর বাস্তব প্রয়োগ গ্রোটিয়াসের আমলে যে তিমিরে ছিল আজও সেই তিমিরেই রয়েছে।

৪–যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত জনবসতির আইনগত মর্যাদা

বেসামরিক লোকদের অধিকার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, কোন শহর বা জনপদ যখন পূর্ণ প্রতিরোধের পর শক্তি প্রয়োগে বিজিত হয় তার অধিবাসীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে? প্রাচীন কালের সৈন্যদের এটা স্বাভাবিক অধিকার রূপে গণ্য হতো যে, প্রতিরোধ চূর্ণ করে সামরিক শক্তি বলে যে শহরকে তারা জয় করতো তার অধিবাসীদেরকে তারা পাইকারীভাবে কচুকাটা করতে পারতো। ইউরোপে নিকট অতীতেও এ প্রথা

বিদ্যমান ছিল। স্পেনের বিরুদ্ধে সংযুক্ত নেদার ল্যান্ডস–এর বিদ্রোহ এবং তার পরবর্তী ধর্মীয় যুদ্ধ সমূহে উভয়পক্ষ একেবারে বল্গাহীনভাবে পরস্পরের শহরে ঢুকে গণহত্যা চালাতো। অবশ্য ৩০ সালা যুদ্ধের পর এ ধরণের কাজ ইউরোপীয় বিবেক জুলুম বলে নিন্দা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তা নিষিদ্ধ হয়নি। ডিউক অব ওয়েলিংটনের মতে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত শহরের প্রহরীরা নিরাপত্তামূলক আশ্রয় লাভের অধিকারী নয়।[৩৩৫] ফ্রান্স একাধিকবার অবরুদ্ধ শহরবাসীকে হুমকি দিয়েছে যে, তারা প্রতিরোধ অব্যাহত রাখলে তাদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হবে।[৩৩৬] বাস্তবেও ফরাসী সৈন্যরা কিউডাড রোডরিগো (Cudad Rodrego), বাডাজোস (Badajos) এবং সান সাবাস্তিয়ান (San Sabastian) বিজয়ের পর গণহত্যা ও গণলুটের রেকর্ড সৃষ্টি করে। ১৭৯০ সালে রুশ–তুর্কী যুদ্ধে যখন রুশ সৈন্যরা ইসমাইলে প্রবেশ করে তখন তারাও সামরিক ও বেসামরিক লোকদের নির্বিচারে হত্যা করে। ১৮৩৭ সালে যখন ফ্রান্স আলজিরিয়ার রাজধানী কুনতিনা জয় করে তখন তার সৈন্যরা তিন দিন ধরে হত্যা ও লুটতরাজ চালায়। ১৮৫৭ সালে যখন বৃটিশ সৈন্যরা দিল্লী জয় করলো তখন শহরে বেপরোয়া গণহত্যা করে এবং তারা বিজিত রাজপরিবারের লোকদের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখায়নি।

তখনও এ কাজটিকে অপরাধ বলে গন্য করে এমন আইন ইউরোপে তৈরী হয়নি। ১৮৭৪ সালের ব্রুসেলস সম্মেলনে এ বিধি পাশ হয় বটে যে, কোন শহর জয় করার পর সৈন্যদেরকে হত্যা ও লুটতরাজের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আগেই বলেছি যে, এ সম্মেলন প্রবর্তিত বিধিমালাকে কোন সরকার অনুমোদন করেনি। এ জন্য তা ইউরোপীয় দেশ সমূহের আইন বলে গণ্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি। ইউরোপে এ কাজকে প্রথমবারের মত নিষিদ্ধ করেছে ১৮৯৯ সালের হেগ বিধি। এর ২৮ নং ধারার শক্তির বলে বিজিত শহরে লূটপাট নিষিদ্ধ করা–হয়েছে– যদিও বাস্তবে তা এখনো নিষিদ্ধ হয়নি। ১৯১৯–১৯২০ সালে ইউরোপের সবচেয়ে সভ্য দেশসমুহের তত্ত্বাবধানে গ্রীক সৈন্যরা স্মার্ণা ও ফ্রেজ শহরে ঢুকে বেসামরিক অধিবাসীদের প্রতি যে পৈশাচিক আচরণ করে তা কেবল প্রাগসভ্যতা যুগের আদিম পাশবিকতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তথাপি যদি নিছক তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখা হয় তা হলেও বলতে হয়, ইউরোপবাসী সভ্য জনোচিত ভাবে বিজয় লাভ ও বিজিত শহরে

সভ্য জনোচিতভাবে প্রবেশ করার পদ্ধতিটা আজ থেকে মাত্র ৩০ বছর আগে (স্মরণ থাকে যে, এ গ্রন্থ খানা ১৯২৭ সালে রচিত) শিখেছে। অথচ তা আজ থেকে ১৩৪০ বছর আগে হজরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় পেশ করেছেন এবং মুসলিম সৈনিকেরা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও আফ্রিকার শত শত শহর বিজয়ের সময় বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

৫–দখলদালী সংক্রান্ত আইন কানুন

দখলদারী Occupation একটি নতুন পরিভাষা। বস্তুতঃ এর ধারণাটাও নতুন। প্রাচীন কালের রীতি ছিল, যখন কোন সাম্রাজ্য কর্তৃক অন্য কোন দেশ বিজিত হতো তখন সেই বিজিত দেশ বিজেতার বৈধ সম্পত্তিতে পরিণত হবে। ইসলামী আইনেও কোন দেশের বিজিত হওয়ার অর্থ তার ইসলামী রাষ্ট্র ভুক্ত হওয়া এবং তার প্রজাদের জিম্মীর মর্যাদা ও অধিকার লাভ করা।[৩৩৭]

কিন্তু আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে একটা দেশের প্রতিপক্ষের দখলে এসে যাওয়ার অর্থ পুরোপুরিভাবে তার সার্বভৌমত্বের আওতায় আসা নয়। বরং সাবেক সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তার মালিকানা অধিকার যত দিন না বিজেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় ততদিন দখলদার শক্তি শুধুমাত্র তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। এই অবস্থাকে পরিভাষায় 'দখলদারী' বলা হয়। যে ভূখন্ড এইরূপ দখলদারীর আওতাভুক্ত থাকে তার অধিবাসী কার্যত সাবেক সরকারেরও প্রজা নয়, নীতিগতভাবে তাদের বর্তমান ক্ষমতাশীন সরকারের অধীনে পরাজিত ও বিজিত জাতি হিসাবে জীবন যাপন করে। ১৮৯৯–১৯০৭ সালের হেগ বিধি এই বিজিতদের ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করেনি। দখলদার সরকার তার সার্বভৌম ক্ষমতা তাদের ওপর কতখানি কার্যকরী করতে পারে আর কতখানি পারেনা, তাও স্থির করে দেয়নি। অবশ্য দখলীকৃর্ত এলাকায় সরকার ও জনগণের কর্তব্য ও অধিকার কি সে সম্পর্কে কতিপয় আইন তৈরী করে দিয়েছে। নিম্নে আমরা সেই আইন কয়টি উদ্ধৃত করছিঃ

(১) দখলদার বাহিনীর হাতে সরকারী ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তরিত হওয়ার পর দখলদার বাহিনী তাদের সম্ভাব্য সকল উপায় উপকরণ দ্বারা সাধারণ আইন শৃংখলা ও জন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা ও অক্ষুন্ন

রাখার চেষ্টা করবে এবং যথা সম্ভব পূর্বে যে সব আইন ঐ দেশে চালু ছিল তা চালু রাখবে। (ধারা নং ৪৩)

এই ধারাটি দখলদার সরকারের জন্য কেবল একটি সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে। মূলতঃ এটি একটি অর্থহীন ধারা। সাবেক আইন কানুন চালু রাখা না রাখার জন্য 'যথা সম্ভব' এর যে সীমা এতে নির্ধারণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। এতে দখলদার সরকার পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে যেরূপ দখলীকৃত এলাকায় নিজেদের যাবতীয় আইন কানুন চালু করতে পারতো সেরূপ যাবতীয় আইন কানুন চালু করার ক্ষমতা লাভ করে। কেননা সে অনায়াসেই অজুহাত দিতে পারে যে, সাকেব আইন কানুন বহাল রাখা তার পক্ষে 'সম্ভব' নয়। কাজেই এই ধারাটির বলে দখলদারী ক্ষমতা ও নিয়মতান্ত্রিক সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে খুব কম পার্থক্য থেকে যায়।

(২) যুদ্ধরত পক্ষের জন্য আপন দখলকৃত এলাকার বাসিন্দাদেরকে প্রতিপক্ষীয় সৈন্য অথবা উপায়–উপকরণ ও সহায় সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করা নিষিদ্ধ।

এই ধারাটি জার্মানী, জাপান, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করে। সমরবিদগণ এ ধারাটির ওপর কঠোর আপত্তি জ্ঞাপন করে। কেননা সমর কৌশলের দিক থেকে আপন তথ্য মাধ্যম সম্পর্কে কোন বিধি নিষেধ মেনে নিতে তারা প্রস্তুত নয়। জার্মানীর 'যুদ্ধ পুস্তকে' এর যে সমালোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

"একটি দেশের অধিবাসীদেরকে আপন জাতীয় সেনাবাহিনী, জাতীয় সামরিক তৎপরতা, জাতীয় সম্পদ ও উপায়–উপকরণ এবং জাতীয় সামরিক গোপন তথ্যাবলী সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করা অবশ্যই একটা কঠিন ও নিষ্ঠুর কাজ। এ ধরণের কাজকে সকল দেশের লেখকদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ নিন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন সামরিক অধিনায়ক সব সময় এটা এড়িয়ে চলতে পারে না।সে যখনই এই নিষ্ঠুর কাজটি সম্পাদন করবে দুঃখের সাথেই করবে বটে। তবে যুদ্ধের বাস্তব প্রয়োজন অনেক সময় তাকে এই কর্মপন্থা অবলম্বনে বাধ্য করবে।[৩৩৮]

একই গ্রন্থের পরবর্তী একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

"একজন মানুষকে মাতৃভূমির ক্ষতি সাধনে এবং আপন জাতীয় সেনাবাহিনীর পরাজয় সহজ করে দেয়ায় বাধ্য করা মানবিক চেতনা ও অনুভূতির পক্ষে যতই কষ্টদায়ক হোক না কেন, কোন প্রতিপক্ষের দেশে অবস্থানরত কোন যুদ্ধরত সেনাবাহিনী তথ্য সংগ্রহের এই মাধ্যমটি উপেক্ষা করতে পারে না।"[৩৩৯] এ মতামত শুধু জার্মান সমরবিভাগেরই নয়, সমগ্র ইউরোপের সামরিক সম্প্রদায়ের। আমাদের যতদুর জানা আছে, আজ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে হেগ বিধির ৪৪ নং ধারাকে বাস্তবায়িত করা হয়নি।

(৩) একটি যুদ্ধরত দেশের পক্ষে স্বীয় শত্রু পক্ষের নাগরিকদেরকে তাদের আপন জাতির বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করা অবৈধ, চাই সে নাগরিক যুদ্ধের পূর্বে তার চাকুরে থেকে থাকুক। (ধারা নং ২৩) অধ্যাপক মর্গানের ভাষায় এ ধারাটি কেবল একটি সাধারণ মূলনীতি বর্ণনার চেয়ে বেশী মর্যাদা রাখেনা। বিস্তারিত ও খুটিনাটি বিধিমালার প্রশ্নে এটি সরকারগুলিকে আপন নীতি নির্ধারণের অবাধ ক্ষমতা প্রদান করে।[৩৪০] এটা কারো অজানা নয় যে, যে ক্ষেত্রে সরকারগুলিকে স্বাধারণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়– যা প্রকৃত পক্ষে সামরিক বাহিনীকেই প্রদান করার শামিল– সে ক্ষেত্রে এ ধরণের সাধারণ মূলনীতির বর্ণনা দেয়া নিন্দনীয় সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সৈন্যরা যে তাদের সামরিক প্রয়োজন অনুসারেই কাজ করবে তা সর্বজন বিদিত। মহাযুদ্ধে এই স্বাধীনতাকে কাজে লাগানোও হয়েছে। যুদ্ধরত শক্তিবর্গ পরস্পরের প্রজাদেরকে শুধু যে যোগাযোগের ক্ষেত্রেই কাজ করতে বাধ্য করেছে তা নয় বরং পরিখা খনন , সৈন্যদের পেছনে প্রাচীর ও অবরোধ নির্মাণে ও বল প্রয়োগে তাদেরকে কাজ করতে বাধ্য করেছে।[৩৪১]

(৪) দখলীকৃত এলাকার অধিবাসীদেরকে শত্রু পক্ষীয় সরকারের আনুগত্যের শপথ গ্রহণে বাধ্য করা নিষিদ্ধ। (ধারা নং ৪৫)

(৫) পারিবারিক ও বংশগত সম্মান ও অধিকার এবং জান, মাল ও ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা নিষিদ্ধ। (ধারা নং ৪৬)

(৬) লুটতরাজ যথারীতি নিষিদ্ধ। (ধারা নং ৪)

এই তিনটি ধারা ও মূলনীতি বর্ণনারই মর্যাদা রাখে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এর কোন আইনগত মুল্য নেই।

(৭) দখলীকৃত এলাকার সরকার যদি এমন কোন শুল্ক বা কর আদায় করে যা সরকারের উপকারার্থে আরোপ করা হয়ে থাকে, তাহলে তা যথা সম্ভব ঐ দেশের প্রচলিত আরোপ বিধি ও হার অনুসারে করা উচিত। অনুরূপভাবে দখলীকৃত এলাকার সরকার পরিচালনার ব্যয় বরাদ্ধ সেখানকার বৈধ সরকার যে হারে আদায় করতো সেই হারেই আদায় করা কর্তব্য।(ধারা নং৪৮)

(৮) এই সব কর শুল্ক ছাড়াও দখলদার সরকার যদি দখলীকৃত এলাকার অধিবাসীদের ওপর আরো আর্থিক উপঢৌকনাদির বোঝা চাপিয়ে দেয় তা হলে তা শুধুমাত্র সেনাবাহিনী অথবা সেই এলাকার প্রশাসন খাতে ব্যায়িত হওয়া উচিৎ। (ধারা নং ৪৯)

(৯) কোন চাঁদা বা দান লিখিত নির্দেশ ব্যতীত আদায় করা যেতে পারে না। লিখিত নির্দেশ জারী করতে হবে প্রধানসেনাপতির দায়িত্বে। এ ধরণের দান বা চাঁদা সেই দেশের প্রচলিত আরোপ বিধি ও শুল্ক হার অনুযায়ী আদায় করা যেতে পারে। এ ধরণের প্রতিটি দানের জন্য নিয়মিত রশিদ দিতে হবে। (ধারা নং ৫১)

(১০) মিউনিসিপ্যালিটি ও সাধারণ অধিবাসীদের নিকট থেকে শ্রম কিংবা দ্রব্যাদির আকাঁরে রসদ চাওয়া যাবে না। তবে দখলদার বাহিনীর একান্ত প্রয়োজনে চাওয়া যাবে। এ ধরণের রসদপত্র তলব করতে হলে ঐ দেশের সম্পদের অনুপাতিক হারেই তা করতে হবে। এমন হারে হওয়া উচিত নয় যা দেয়ার অর্থ হয় দেশবাসীর আপন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা। যতদুর সম্ভব এ ধরনের উপঢৌকন বা রসদপত্রের নগদ দাম দেয়া উচিত। যদি তা না হয় তবে একটা রশিদ দেয়া কর্তব্য এবং পরে যত শীঘ্র সম্ভব টাকা দিয়ে দেয়া উচিত। (ধারা নং ৫২)

(১১) একটি দখলদার বাহিনী শুধুমাত্র সেই সব জিনিসপত্র হস্তগত করতে পারে যা শত্রু দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যা সামরিক তৎপরতায় ব্যবহৃত হতে পারে। তবে যেসব সাজ সরঞ্জাম ও উপায়–উপকরণ জলে–স্থলে

অন্তরীক্ষে তথ্য সরবরাহ কিংবা পরিবহনের কাজে ব্যহৃত হয় তা বিনা দ্বিধায় বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে। সমস্ত অস্ত্র কারখানা ও সাজ–সরঞ্জামের গুদাম চাই তা ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্তই হোক না কেন, বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে। তবে সন্ধির পর এসব ফিরিয়ে দিতে হবে। (ধারা নং ৫৩)

এই সমস্ত ধারায় দখলদার সরকারের দখলীকৃত দেশের সম্পদ ও সরঞ্জামাদি দখল, ব্যবহার ও ভোগের ওপর নিয়ন্ত্রন আরোপের চেষ্টা করা হয়েছে। দখলীকৃত এলাকার জনগণকে সামরিক কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারমুলক তৎপরতা থেকে রক্ষা করার কিছু কাগুজে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সামরিক মহল এগুলো কার্যকর করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং বিজিত এলাকা থেকে সকল রকমের সুযোগ– সুবিধা অর্জনে কৃতসংকল্প। জার্মানীর ' সমরপুস্তক'-এ এই মহলের মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছেঃ

"সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে সকল রকমের বাজেয়াপ্তি, স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে জবরদস্তিমূলক হস্তগত করণের সকল প্রক্রিয়া অনিষ্ট করা বা ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানো বৈধ।"[৩৪২]

দেশের উপায় –উপকরণ ও তার সহনশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখার যে পরামর্শ হেগ বিধিতে দেয়া হয়েছে তার জবাবে সামরিক মহল বলেনঃ

"অনুপাতের এই মতবাদ তাত্বিক দিক দিয়ে চমৎকার। কিন্তু একে কার্যে পরিণত শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভবও।"[৩৪৩]

এ প্রসঙ্গে দার্শনিক ক্লাউসোটস– এর অভিমত সামরিক মহলে খুবই সমাদৃত ও জনপ্রিয়। তার মত হলো, দখলীকৃত দেশে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন পুরনের জন্য যে উপকরনই পাওয়া যাক, নির্বিচারে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ জন্য তিনি শুধু স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগকেই যথেষ্ট মনে করেন না। বরং জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শন করে যে কোন বাঞ্ছিত জিনিস তাদের হাতে সমর্পন করতে বাধ্য করাও অত্যাবশ্যক মনে করেন। তিনি বলেনঃ 'দখলীকৃত এলাকায় দখলদার বাহিনীর ভোগদখলের কোন সীমা পরিসীমা নেই,তবে যদি দখলীকৃত দেশ একেবারেই দরিদ্র ও দেউলে হয়ে যায় এবং তার একটা দানা বা কানাকড়িও দেয়ার সামর্থ না থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা।"[৩৪৪]

এখানেও সামরিক মহলের অভিমত আইনজ্ঞ মহলের প্রস্তাবাবলীর ওপর বিজয়ী হয়েছে। ফলে কোন যুদ্ধেই হেগের ন্যায়সঙ্গত দখলদারী বিধিসমূহ বাস্তবায়িত হতে দেখা যায় না।[৩৪৫]

(১২) বেসরকারী লোকেরা ব্যক্তিগত পর্যায়ের যে সব কাজ করে তার ওপর কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া যাবে না, চাই তা আর্থিক শাস্তি হোক কিংবা অন্য কোন রকমের শাস্তি হোক। (ধারা নং ৫০)

বিশ্ব যুদ্ধের সময় এই বিধিও পালিত হয়নি। কেননা যুদ্ধরত দেশসমূহ নিজ নিজ দখলীকৃত এলাকা সমূহে অবাধে ও নির্বিচারে পাইকারী গণজরিমানা আরোপ করেছে। বিশেষতঃ যেখানে কোন অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি সেখানে এ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৪৬]

৬—

১৭ শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের সাধারণ প্রথা ছিল এই যে, কোন সেনাবাহিনী শত্রু দেশে ঢুকে পড়লে যা সামনে পেত ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যেত। শত্রুর ধ্বংস ও লুটতরাজের অধিকার ছিল তখন সীমাহীন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই অধিকার প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত মেলে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডার কতিপয় গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। তার জবাবে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনারা ওয়াশিংটনের ভবন সমূহ ধ্বংস করে। ১৮৩৭ সালে ফরাসী সৈন্যরা আলজিরিয়ায় ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অভিযান চালায়। ১৮৫৭ সালে ইংরেজ সৈন্যরা কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী অঞ্চলে আগুন লাগায়, লুটতরাজ, হত্যা ও ধ্বংস সহ ব্যাপক নারকীয় কান্ড করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পূর্বে রাশিয়া তুরস্কের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাতে রুশ সৈন্যরা সব সময়ই তুর্কী এলাকায় অগ্রাভিযান কালে ব্যাপক ধ্বংসাভিযান চালিয়েছে। তথাপী তাত্তিক দিক দিয়ে এই অধিকারকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার ধারণা ১৭ শ শতাব্দীতেই দানা বাঁধে। গ্রোটিয়াস এ উদ্দেশ্যে নিম্নের মূলনীতিটি তৈরী করেনঃ

"ধ্বংসাভিযান শুধু এতটুকু করা যেতে পারে যাতে করে শত্রু অল্প সময়ের মধ্যেই সন্ধি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।"[৩৪৭]

এর পর ১৮শ শতাব্দীতে ভাটেল (Vatel) আরেকটা মূলনীতি তৈরা করেন। এতে শত্রুর দেশে ধ্বংসাভিযান পরিচালনাকে মাত্র তিন অবস্থায় অনুমতি দেয়া হয়েছেঃ

১– যখন উদ্দেশ্য থাকে জালিম ও অসভ্য শত্রুর পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা।

২– যখন উদ্দেশ্য হয় সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি অবরোধ সৃষ্টি করা।

৩– সামরিক ক্রিয়াকলাপ কিংবা অবরোধের সময় যখন এর প্রয়োজন হয়[৩৪৮]।

১৯ শ শতাব্দীর শেষের দিকে পাশ্চাত্যের চিন্তা ও দর্শন সভ্যতা অভিমুখে আর এক ধাপ অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। এই সময় নিম্নলিখিত সাধারণ নীতি প্রণয়ন করা হয়ঃ

"যুদ্ধের জন্য যতটুকু একান্ত অপরিহার্য--কেবল ততটুকু ধ্বংসাভিযান চালানো বৈধ।" ৩৪৯

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ও সমরবিদদের অভিমত এই যে, সামরিক প্রয়োজন অনুসারে সকল রকমের ধ্বংসাভিযান চালানো যেতে পারে। তবে নিছক ধ্বংসের জন্যই ধ্বংসাভিযান বৈধ নয়। লরেন্স স্বীয় "আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতি" নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"অবরুদ্ধরা যাতে আশ্রয় নিতে না পারে কিংবা কামান যাতে অবাধে কাজ চালাতে পারে সে জন্য শহরতলীকে ধ্বংস করা যুদ্ধ আইনের দৃষ্টিতে বৈধ। এ উদ্দেশ্যে দালান সমূহ মিসমার করে দেয়া যেতে পারে। গাছপালা কেটে ফেলা যেতে পারে। এমনকি পিছিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পথ পরিস্কার রাখার জন্য গ্রামও ভস্মীভূত করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ সব পদক্ষেপ তখনই নেয়া উচিৎ যখন যুদ্ধের তাৎক্ষনিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এসব করা অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।"[৩৫০]

অধ্যাপক ওয়েস্টলেক লিখেছেনঃ

"কেবলমাত্র চলতি সামরিক অভিযানকে সফল করার জন্য অত্যাবশ্যক হলেই শত্রুর দেশে ব্যাপক ধ্বংসাভিযান পরিচলনা করা যেতে পারে।"[৩৫১]

জার্মানীর 'সমর পুস্তক'–এ প্রশ্নে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"বিনা প্রয়োজনে সামান্য পরিমাণও ধ্বংসাভিযান চালানো যাবে না। কিন্তু প্রয়োজন হলে অনেক বড় ধ্বংসাভিযানও চালানো যাবে।[৩৫২]

এখানে এসে ইসলামী আইনের সাথে পাশ্চাত্য আইনের কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী আইনেরও বিধান এই যে, কোন শহর অধিকার করা কিংবা অন্য কোন সামরিক অভিযানের জন্য প্রয়োজন হলে ধ্বংসাভিযান চালানো বৈধ। তবে সেই পরিমাণ করা যাবে যা উক্ত সামরিক অভিযানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ একই গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে "ধ্বংসাভিযানের অবৈধতা" শীর্ষক অধ্যায়ে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু একটি অংশে ইসলাম ও পাশ্চাত্য আইনের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইসলাম সভ্য ও অসভ্য শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করে না। তার মতে অসভ্য শত্রুর ফসল নষ্ট করা এবং জনপদ ধ্বংস করা সভ্য শত্রুর ফসল ও জনপদ ধ্বংস করার মতই অন্যায় ও জুলুম। বরঞ্চ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামী আইন যে যুগে তৈরী হয়েছে সে যুগে "সভ্য দুশমন কোথাও ছিল না। চারদিকে কেবল অসভ্যতাই বিরাজ করতো। কিন্তু পাশ্চাত্য আইন এই উভয় প্রকারের শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করে। তার মতে ধ্বংসাভিযানের জন্য "প্রয়োজনের" শর্ত কেবল সভ্য শত্রুর জন্য। "অসভ্য" শত্রুকে ধ্বংস করার অধিকার সভ্য জাতিগুলোর জন্য সীমাহীন। অধ্যাপক লরেন্স দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেনঃ

"অসভ্য কিংবা আধা অসভ্য জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধ করার সময় ভাটেলের প্রথম নীতি অনুসৃত হয়েছে। অসভ্য জাতিগুলোর গবাদি পশু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, তাদের ফসল ধ্বংস করা, তাদের ছাপড়া ও ঝুপড়ি গুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া তাদের মন মস্তিষ্কে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই সব ধ্বংসাভিযান যদি গোলাবর্ষণের মাধ্যমে করা হয় এবং এতে করে যদি বেশ কিছু সংখ্যক লোকও মারা যায়, তাহলে এতে অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী ফল লাভ হয়। এতে সেই জাতির অবশিষ্ট লোকদের মনে শ্বেতাঙ্গ লোকদের ন্যায়–নীতি ও তাদের শক্তি সম্পর্কে একটা স্বতন্ত্র অনুভূতি বিকাশ লাভ করবে।[৩৫৩]

নিরপেক্ষ লোকদের অধিকার ও কর্তব্য

পাশ্চাত্য যুদ্ধ আইন সমূহের মধ্যে এখন শুধু নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইন নিয়ে আলোচনা করা বাকী। এটি আলোচনা করেই আমি এই দীর্ঘ অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটাবে।

নিরপেক্ষতার ইতিবৃত্ত

পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মধ্যে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভব খুব অল্প দিন আগে হয়েছে। দুশো বছর আগে তাদের মনে এই ধারণার অস্তিত্বই ছিল না অথবা থাকলেও নিতান্ত অসম্পূর্ণ ছিল। এজন্য পাশ্চাত্য জগতের ভাষা গুলোতে এই ধারণা ব্যক্ত করার উপযুক্ত কোন শব্দ ছিল না। গ্রোটিয়াস এই ধারণা Medit বা 'মধ্যম' শব্দটি দ্বারা এবং বাইংকার শুয়েক (Non Hostes) মিত্র দ্বারা ব্যক্ত করেন। ১৭শ শতাব্দীর শেষের দিকে সর্বপ্রথম ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় 'নিউট্রাল' Neutral (নিরপেক্ষ) শব্দটি ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। ১৮ শ শতাব্দীয় মধ্যভাগে ভাটেল আন্তর্জাতিক আইনে এ শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন।

১৬ শ ও ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে নিরপেক্ষতাকে অসম্ভব ও ক্ষতি কর মনে করা হতো। এমনকি কার্যতঃ তার কোন অর্থই ছিলনা। মেকিয়াভেলীর (Machiavelli), মতে প্রতিবেশী দেশ গুলোর মধ্যে যুদ্ধ বাধলে পার্শে অবস্থিত দেশের উচিত কোন না কোন পক্ষের সাথে যোগদান করা। এর এক শতাব্দী পর গ্রোটিয়াসও বলেন যে, একটি দেশের সরকারের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ রত পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে যাকে সে ন্যায়বান মনে করে তার সাথে সহযোগীতা করা এবং যাকে অন্যায়পন্থী মনে করে তার বিরোধিতা করা। তবে যখন কে ন্যায় ও কে অন্যায়ের পক্ষ,তা নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে পড়ে তখন তার উভয়ের সাথে সমান ব্যবহার করা উচিত। [৩৫৪] বস্তুতঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নিরপেক্ষদের কোন অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়নি। যুদ্ধরত জাতি সমূহ যুদ্ধ করতে করতে নিরপেক্ষ দেশ গুলোর সীমান্তের মধ্যে অবাধে ঢুকে পড়তো। নিরপেক্ষ দেশগুলিও যে পক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতো তাকে সাহায্য দিতে কুণ্ঠিত হতো না। যুদ্ধ আইনের এই বিভাগটিতে অধিকার, কর্তব্য ও বিধিনিষেধ নির্ণয়ের সূচনা হয় ১৭৯৪

সালে, যখন মার্কিন কংগ্রেস সর্বপ্রথম মার্কিন সরকার যে সব দেশের সাথে যুদ্ধরত নয় তাদেরকে সামরিক সাহায্য দেয়া মর্কিন জনগণের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়। এরপর এই বিভাগের আইন প্রণয়নের কাজ অব্যাহত থাকে। ১৮১৮ সাল পর্যন্ত নিরপেক্ষতার একটা পূর্ণাঙ্গ আইন প্রস্তুত হয়ে যায়। ১৮১৯ সালে বৃটেন আমেরিকার অনুসরণ করে এবং কংগ্রেসের তৈরী আইন আপন গ্রন্থে সংযোজন করে। এরপর অন্যান্য দেশও এই ধরণের আইন নিজ এলাকায় করে। দেখতে দেখতে ১৯ শ শতাব্দীর মধ্যেই সকল পাশ্চাত্য দেশে নিরপেক্ষতার আইন তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু তথাপি সঠিক অর্থে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ১৯০৭ সালের হেগ সম্মেলনেই তৈরী হয়। কেননা এখানেই প্রথম বারের মত পাশ্চাত্য দেশ সমূহ মিলিত হয়ে নিরপেক্ষদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে।

বর্তমান যুগে নিরপেক্ষদের মর্যাদা

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বিংশ শতাব্দীতে নিরপেক্ষতার আইন তৈরীর কাজ সুসম্পন্ন হলেও এই বিংশ শতাব্দীতেই তা আবার মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হয়। দ্বিতীয় হেগ সম্মেলন আইন তৈরীর কাজটি সম্পূর্ণ করার পর সাতটি বছরও অতিক্রান্ত হতে পারে নি ইউরোপে বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হযে যায় এবং তাতে নিরপেক্ষতার গোটা আইন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়।[৩৫৫] ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে নিরপেক্ষদের প্রতিটি আইনসম্মত অধিকার নির্মমভাবে পদদলিত হয়। তাদের সীমান্ত অতিক্রম করা হয়। জাহাজ ডোবানো হয় বাণিজ্য ধ্বংস করা হয়। তাদের গৃহে তল্লাশী চালানো হয় এবং গ্রেফতার করা হয়। মোট কথা যুদ্ধরতদের সাথে যে আচরণ করা হয়ে থাকে তার সবই নিরপেক্ষদের সাথে করা হয়। এর ফলে নিরপেক্ষদের সত্যই কোন অধিকার আছে কিনা তা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং নিরপেক্ষতার মর্ম কি তাও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু যুদ্ধ এখন আর কেবল সামরিক যুদ্ধের মধ্যেই সীমিত নেই বরং তা অর্থনৈতিক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছে তাই এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, যে দেশ অন্য কোন দেশের শত্রুর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখে, তাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং তার অর্থনৈতিক জীবনের স্থিতি ও সংহতির উপকরণ সরবরাহ করে, সে দেশ কি নিরপেক্ষ দেশ? সে দেশ কি ন্যায়সঙ্গত ভাবে তার উক্ত কাজের জন্য অবাধ অধিকার দাবী করতে পারে?

এ প্রশ্ন নিরপেক্ষতার ভিত্তিমূলকে নাড়া দিয়েছে। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক আইন এই সব যুগ–জিজ্ঞাসার আলোকে নিরপেক্ষদের কিকি অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করবে, তা এখনো স্থির করতে পারেনি।

এটা কোন অতিরঞ্জিত আনুমানিক কথা নয়। মূলতঃ এ প্রশ্নগুলো আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞগণকেও চিন্তান্বিত করে তুলেছে। অধ্যাপক নিউপোল্ড তাঁর 'মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশ' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বড় বড় আইন বিশারদদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। নিম্নে আমি অধ্যাপক নিউপোল্ডের উক্ত গ্রন্থ থেকে আইনবিদ এন্টস্ বাসিরের মতামত উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেনঃ

"এ যুগের যুদ্ধ নিরপেক্ষদের মর্যাদা মারাত্মক ভাবে ক্ষুন্ন করেছে। তাদের বহু অধিকার এমনভাবে লংঘিত হয়েছে যে সেই সব অধিকার আদৌ আইনে বিধৃত হয়েছে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।.... যেহেতু এই অধিকার সমূহ সীমাতিরিক্ত ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তাই ভবিষ্যত যুদ্ধ সমুহে আর বেশী দিন এগুলিকে স্বীকার করা হবে না। সত্য ও ইনসাফের নতুন ধারণা বিশ্বাস পুরানো অধিকারগুলাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। ফলে এক অপুরনীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বেকার আইন–বিশেষতঃ প্যারিস চুক্তি নৌ বিধির ২ ও ৪ নং ধারা আন্তর্জাতিক আইনে যে মর্যাদার অধিকারী ছিল এখন এক বিপ্লবাত্মক পুনর্বিন্যাস কার্য ধারার ফলে সেই মর্যাদার ওপর প্রবল হয়ে উঠেছে নতুন এক অলিখিত আইন। এ আইন নিরপেক্ষ দেশসমূহের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে সূদূর প্রসারী হস্তক্ষেপকে বৈধ করে দিয়েছে। [৩৫৬]

পরবর্তী এক স্থানে একই গ্রন্থকার লিখেছেনঃ

"বিশ্ব যুদ্ধের যুগ শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেক বৃহৎ দেশের এটা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখা উচিৎ যে তাকে বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা হবেই। আন্তর্জাতিক আইন চুড়ান্ত বিষয়ে বৃহৎ দেশ সমূহের ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল। কেননা তাদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া আন্তর্জাতিক আইনের কোন বিধি প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষুন্ন থাকতে পারে না। সুতরাং এ যুগে যখন নিরপেক্ষদের নিরপেক্ষতা অলংঘনীয় হওয়া অধিকাংশ বৃহৎ শক্তির কাছে অনভিপ্রেত ও বিরক্তিকর মনে হচ্ছে তখন আন্তর্জাতিক আইনেও যদি নিপেক্ষদের মর্যাদা ক্রমান্বয়ে নষ্ট হতে থাকে তাহলে বিস্ময়ের কিছু থাকবেনা " [৩৫৭]

এ উক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে পাশ্চাত্য আইনে নিরপেক্ষতার গুরুত্ব ও মর্যাদা কতখানি। এখন আমরা নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইনের খুটি–নাটি বিষয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা করে এ আইন আসলে কতখানি পূর্ণাঙ্গ এবং কতখানি মজবুত, তার বিচারে প্রবৃত্ত হতে চাই।

নিরপেক্ষদের প্রতি যুদ্ধরতদের কর্তব্য

হেগের ৫ ও ১৩ নং সমঝোতা অনুসারে স্থল ও নৌ যুদ্ধ নিরপেক্ষদের সম্পর্কে যুদ্ধরতদের যে সব কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) নিরপেক্ষ দেশের সীমান্তে কোন প্রকার সামরিক তৎপরতা চালানো নিষিদ্ধ।

(২) সেনাবাহিনী, যুদ্ধ রসঞ্জাম ও রসদপত্র নিরপেক্ষ এলাকার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

(৩) নিরপেক্ষ এলাকাকে সামরিক পদ্ধতির ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। সেখানে সৈন্যদের সজ্জিত করা, সামরিক শক্তি সমূহের সমন্বয় করণ ও বিন্যাস সাধন ইত্যাকার কার্যাবলী নিষিদ্ধ।

(৪) নিরপেক্ষ এলাকায় বা পানিতে ঢুকে শত্রুকে গ্রেফতার করা বা তার ওপর আক্রমণ চালানো নিরপেক্ষতা লংঘনের শামিল এবং এ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

(৫) নিরপেক্ষ দেশ আপন নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য যে আইন কানুন প্রণয়ন করবেন যুদ্ধরতদের তা মেনে চলা কর্তব্য।

(৬) জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে কখনো কোন নিরপেক্ষ দেশের অধিকার লংঘন করা হলে লংঘনকারী দেশের তার ক্ষতি পুরণ দেয়া কর্তব্য।

এই সমস্ত কর্তব্য খুটিনাটি বিধির অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মূলনীতি একই এবং তা হলো, "নিরপেক্ষ দেশের সীমান্ত পবিত্র ও অলংঘনীয়।" এই মূলনীতি হুবহু ইসলামে বিদ্যমান। ইসলামী আইনের চিরন্তন বিধিমালার মধ্যে একটি হলো এই যে, যে জাতির সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবং যে জাতি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

করেনা তার সীমান্তে কোন প্রকার সামরিক তৎপরতা চালানো যাবে না। শত্রু যুদ্ধ করতে করতে নিরপেক্ষ দেশের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে তার পশ্চাদ্ধাবন করা চলবে না। শত্রু পক্ষের যে সব লোক ঐ দেশে আছে, তাদের ওপর আক্রমণ চালানো যাবে না। মোটের ওপর যুদ্ধের সময় সেই দেশের অধিবাসীদের সাথে বা সেই দেশের সীমান্তে কোন প্রকার আক্রমণাত্মক কাজ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম।[৩৫৮]

যুদ্ধরতদের প্রতি নিরপেক্ষদের কর্তব্য

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন নিরপেক্ষ লোকদের ওপর যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের ব্যাপারে যে কর্তব্য সমূহ আরোপ করেছ তা নিম্নরূপঃ

(১) যুদ্ধরত কোন পক্ষকে যুদ্ধে সশস্ত্র সাহায্য দিতে পারবে না। এবং উভয় পক্ষের সাথে একই রকম আচরণ করবে।

বস্তুতঃ এটা নিরপেক্ষতার মৌলিক দায়িত্ব। নিরপেক্ষতা শব্দটির ধাতুগত অর্থের মধ্যেই এ দায়িত্বটি এমনভাবে নিহিত রয়েছে যে, এ দায়িত্বের কথা না ভেবে নিরপেক্ষতার ধারণা মনে স্থান দেয়াই সম্ভব নয়।

(২) যুদ্ধরতদের মধ্যে কাউকে বা উভয়কে যুদ্ধ সরঞ্জামাদি ও টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যুদ্ধ চলাকালে কোন নিরপেক্ষ দেশ যুদ্ধরত দেশের নিকট যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধ সরঞ্জামাদি বিক্রি করতে পরবে না। এবং তাকে ঋণও দিতে পারবে না কিন্তু এই বিধিটির কর্তৃত্বসীমা কি সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি দুই পন্থায় বিক্রি করা যায়। প্রথমতঃ বিশ্বের কোন যুদ্ধরত দেশের কাছে সরাসরি বিক্রি করা। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ সরঞ্জামাদির প্রকাশ্য নিলাম করা এবং সেই নিলামে যুদ্ধরত দেশের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকা। প্রথম প্রক্রিয়াটি সর্ববাদী সম্মতরূপে নিষিদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি নিষিদ্ধ কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এই প্রক্রিয়া কোন কোন বৃহৎদেশে চালু রয়েছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ১৮৭০ সালে যখন জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ হয় তখন মার্কিন সরকার স্বীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম নিলামে বিক্রি করে। ফরাসী সরকারের প্রতিনিধি সেই নিলামের সরঞ্জাম কিনে ফ্রান্সে

পাঠায় এবং তা যুদ্ধে ব্যবহৃতও হয়। এতে যখন আপত্তি উঠলো, তখন মার্কিন সিনেট একটি কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি রিপোর্ট দেয় যে, "স্বয়ং ফরাসী প্রেসিডেন্ট যদি ক্রেতারূপে উপস্থিত হতেন তাহলে তার কাছে যুদ্ধ সরঞ্জাম বিক্রি করা দোষণীয় হতো না। কেননা নিলাম ছিল সার্বজনীন ও প্রকাশ্য। যুদ্ধরত পক্ষ সমূহের প্রতি কোন ভেদাভেদের অবকাশ ছিল না।"[৩৫৯] সিনেট কমিটির এ সিদ্ধান্ত দ্বারা বৈধ ও অবৈধের মধ্যে খুব বেশী আর পার্থক্য থাকে না এবং নিরপেক্ষদের ওপর উক্তকর্তব্য আরোপেরও কোন সার্থকতা থাকে না।

এই বিধির দ্বিতীয় অংশটি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য সংক্রান্ত। এরও দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমতঃ নিরপেক্ষ দেশ কর্তৃক সরকারী উদ্যোগে কোন যুদ্ধরত পক্ষকে সাহায্য কিংবা ঋণ দান। দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষ দেশের জনগণের বেসরকারী ভাবে তার নিকট সাহায্য প্রেরণ। প্রথম পদ্ধতিটা সর্ববাদী সম্মতরূপে নিষিদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সাধারণ রীতি এই যে, নিরপেক্ষ দেশের বেসরকারী অর্থ যোগানদারের নিকট থেকে যুদ্ধরত দেশ সমূহ অবাধে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। ১৮১৪ সালের চীন জাপান যুদ্ধে, ১৯০৪ সালে রুশ জাপান যুদ্ধে, ১৯১১ সালে তুর্কি ইরান যুদ্ধে এবং ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধে উভয় পক্ষ নিরপেক্ষ দেশের জনগণের নিকট থেকে সাহায্য ও ঋণ লাভ করে। ১৮২৩ সালে বৃটিশ সরকার আন্তর্জাতিক আইন বিশারদদের নিকট প্রশ্ন করে যে সাধারণ নাগরিকদেরকে যুদ্ধরতদের আর্থিক সাহায্য থেকে বিরত রাখাও কি নিরপেক্ষ দেশের কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত? এর জবারেব লর্ড লেন্ড হার্স্ট লেখেনঃ আইন গ্রন্থ প্রণেতাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ কাজ নিরপেক্ষতার পরিপন্থী নয়।"[৩৬০] বস্তুতঃআন্তর্জাতিক আইন সরকার ও জনগণের মধ্যে পার্থক্য করেছে। সরকারের ওপর নিরপেক্ষতা বজায় রাখাকে সে বাধ্যতা মূলক করে দিয়েছে। কিন্তু জনগণকে যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের কোন একটির বা উভয়ের যুদ্ধ সজ্জায় সাহায্য করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। এতে করে বিধিটা নিষ্ফল সাব্যস্ত হতে বাধ্য। কেননা একটি দেশের সমগ্র সহায় সম্পদ যদি কোন যুদ্ধরত পক্ষের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে তাহলে সেই দেশের নিরপেক্ষতা একটি প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

৩) কোন যুদ্ধরত দেশের সৈন্যদের আপন এলাকার ওপর দিয়ে চলাচল করতে না দেয়া।

এ বিধিটা অনেক পরের সংযোজন। দেশ সমূহের আচরণ এবং গ্রন্থকারদের অভিমত উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যুদ্ধরতদেরকে চলাচলের জন্য রাস্তা দেয়ার পক্ষেই ছিল। সপ্তদশ শতকের গ্রন্থকার গ্রোটিয়াস লিখেছেনঃ "যুদ্ধকারীরা নিরপেক্ষ এলাকার ওপর দিয়ে সৈন্য নিয়ে যাওয়ার অধিকারী। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এ অধিকার দিতে অস্বীকার করা হলে তা বলপ্রয়োগেও আদায় করা যায়।" ১৮শ শতাব্দীর আইনবেত্তা ভাটেল লিখেছেনঃ "যুদ্ধরত দেশ নিরপেক্ষ প্রতিবেশীর নিকট আপন সৈন্য চলাচলের জন্য রাস্তা চাইতে পারে, কিন্তু তীব্র প্রয়োজন ব্যতীত জোরপূর্বক রাস্তা আদায় করতে পারে না।'"[৩৬১] ওয়েটন (Wheaton) তার ১৮৩৬ খৃষ্টব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ "আন্তর্জাতিক আইন"–এ রাস্তা পাওয়ার অধিকার স্বীকার করেন। তবে নিরপেক্ষ দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা আদায় করাকে বৈধ মনে করেন না।[৩৬২] ম্যানিং (Manning) তাঁর ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ "আন্তজার্তিক আইন"–এ সৈন্য চলাচলের অনুমতি দেয়াকে নিরপেক্ষতার পরিপন্থি বলেন নি। তবে বলেছেন , অনুমতি দিলে উভয় পক্ষকে সমানভাবে দিতে হবে।[৩৬৩] অবশ্য ১৮৮০ সালের লেখক (Hall) এবং তাঁর নিকটবর্তী সময়ের লেখকগণ একে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন।

দেশ সমূহের আচরণও একই সাক্ষ্য দেয়। ১৮১৫ সালে অষ্ট্রিয়া দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সে আক্রমণ পরিচালনার জন্য সুইজারল্যাণ্ডের কাছ থেকে বল প্রয়োগে রাস্তা আদায় করে।[৩৬৪] ১৮৭৭ সালে মেক্সিকোর সৈন্যরা আমেরিকার এলাকায় ঢুকে শত্রুর সাথে লড়াই করে।[৩৬৫] একই বছর রুশ–তুর্কী যুদ্ধে রুশ সরকার রুমানিয়ার সাথে এই মর্মে চুক্তি সম্পন্ন করে যে, রুমানিয়া রাশিয়াকে ইউরোপীয় তুরস্কের উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য আপন ভূ–খণ্ডের ওপর দিয়ে সৈন্য নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে। এই চুক্তির ভিত্তিতে রাশিয়ার পাঁচ লাখ সৈন্য রুমানিয়ার ওপর দিয়ে চলাচল করে এবং রুমানীয় রেলওয়ে ও অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থা বেপরোয়া ভাবে ব্যবহার করে।[৩৬৬] এর সব চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে সাম্প্রতিক মহাযুদ্ধে। ১৯১৪ সালের এই বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী বেলজিয়ামের ওপর দিয়ে বল প্রয়োগে সৈন্য চলাচলের পথ করে নেয় এবং বেলজীয় সরকারের প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও জার্মান সৈন্যদের বেলজীয় ভূ–খন্ডের ওপর দিয়ে পরিচালিত করে। এই শেষোক্ত কাজটি নিরপেক্ষতার অধিকারের ওপর সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত হয়ে

থাকে। কিন্তু হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতের যুদ্ধবিগ্রহে যখনই শক্তিধর দেশগুলো জীবন মরণ সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন দুর্বল প্রতিবেশী দেশগুলোকে সৈন্য চলাচলের পথ দিতে বাধ্য করবে।৩৬৭ সুতরাং এ অনুমান ভুল নয় যে, আন্তর্জাতিক আইন এখন আবার 'হল' (Hall) এর পূর্ববর্তী গ্রন্থকাররা যে সব মতবাদ প্রচার করে গেছেন, সেই সব মতবাদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে।

(৪) যুদ্ধকারীদেরকে আপন সীমান্তে সামরিক অভিযান সংগঠন এবং যুদ্ধ জাহাজ সজ্জিত করার অনুমতি দেয়া চলবেনা।

এটা নিরপেক্ষতার একটা আনুসঙ্গিক কর্তব্য। সম্ভবতঃ ১৮৭১ সালের ওয়াশিংটন চুক্তিতে সর্ব প্রথম এই বিধিটি রচিত হয়। অন্যথায় নিরপেক্ষ দেশ সমূহের চতুঃসীমার মধ্যে ইতিপূর্বে সামরিক প্রস্তুতি ও মহড়া অনুষ্ঠানের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে।

(৫) আপন নাগরিকদেরকে যুদ্ধকারীদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। এটিও নিরপেক্ষতার আনুসঙ্গিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এটি নিরপেক্ষতার অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। কিন্তু এই দায়িত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীর সচেতনতা অতি সাম্প্রতিক কালের ব্যাপার। ১৭৯৩ সালের ইঙ্গ ফরাসী যুদ্ধের সময় মার্কিন নাগরিকরা দলে দলে ফরাসী সৈন্য বাহিনীতে ভর্তি হয়। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে লর্ড বায়রনের নেতৃত্বাধীন বহু ইংরেজ নাগরিক তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৮৭৬ সালের সার্ভিয়া বিদ্রোহে হাজার হাজার রুশ নাগরিক তুরুস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। আর সুইজারল্যান্ড তো ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত রীতিমত একটা সামরিক চাকুরী বিনিয়োগের কেন্দ্রের রূপ পরিগ্রহ করে। যুদ্ধমান দেশগুলো তার নিকট থেকে যোদ্ধা সংগ্রহ করতে থাকে। অবশেষে ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইনের এ অংশটির বিধিবদ্ধকরণ সম্পূর্ণ হয়। আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, এ ধরনের যোদ্ধা সংগ্রহের অনুমতি দেয়া নিরপেক্ষতার পরিপন্থী।

আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে নিরপেক্ষ লোকদের ওপর যে সব কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পিত হয় উপরের আলোচনায় তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো। এই আইনের খুটি নাটি বিধি মালায় যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে,

তা উক্ত আলোচনায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সব বিধির মূল কথা হলো, "নিরপেক্ষ জাতির কোন যুদ্ধরত পক্ষকেই সাহায্য করা উচিত নয় এবং সাহায্যের পর্যায়ে পৌছে এমন কোন কাজও করা উচিত নয়।" এই মূলনীতি হুবহু ইসলামে বিদ্যমান। ইসলামী আইনে 'নিরপেক্ষ' এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এ রূপঃ

الذى لم يظاهر علينا احدا ولم ينقصنا شيئا،

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করে না এবং মুসলমানদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেনা।" [৩৬৮] এই মূলনীতির আলোকে খুটিনাটি আইন প্রণয়ন করা যায়। যে কাজ দ্বারা কোন যুদ্ধরত পক্ষের 'সাহায্য' কিংবা 'ক্ষতি' হয়, তা নিরপেক্ষতার পরিপন্থী বিধায় তা থেকে দূরে থাকতে হবে।

৫–পর্যালোচনা

বর্তমান অধ্যায়টি আশাতীতভাবে দীর্ঘ হয়ে গেল। তথাপি অধ্যায়টি সমাপ্ত করার আগে পেছনের আলোচিত বিষয় গুলোর ওপর একটা চূড়ান্ত পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার মাধ্যমেই আমি দেখাতে চাই যে, ইসলামী আইন কোন্ বিচারে ও কিসের জন্য পাশ্চাত্য আইনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর? পেছনের বিষয়গুলো যদি পাঠকের মনে থাকে তা হলে বিষয়গুলোর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। কেবল শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলো উল্লেখ করা যথেষ্ট।

প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতপক্ষে কোন "আইন"ই নয়। এ আইন তার মৌল বিধি ও শাখা প্রশাখার দিক দিয়ে পুরোপুরিভাবে শক্তিমান রাষ্ট্র সমূহের খেয়াল খুশীর ওপর নির্ভরশীল। ঐ সব দেশ আপন ইচ্ছানুসারে আপন স্বার্থের তাকিদে আইন তৈরী করে ও তার রদবদল ঘটায়। আর যে আইনকে শক্তিমান দেশ গুলো পছন্দ করেনা তা শেষ পর্যন্ত আইনই থাকেনা। আইন প্রকৃতপক্ষে সরকারের চরিত্র ও গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করেনা। বরং সরকারই এই আইনের চরিত্র ও গুণাগুণ নিয়ন্ত্রন করে থাকে। পক্ষান্তরে ইসলামের আইন সঠিক অর্থে 'আইন'। এক উচ্চতর সার্বভৌম শক্তি এ আইনের রচয়িতা। মুসলমানদের এই আইনের সংশোধন বা রদবদলের কোন অধিকার নেই। এই আইন প্রণীত হয়েছে শুধু এই জন্য যে, যারা ইসলামের অনুগত তারা এই আইন নির্বিবাদে মেনে চলবে, আর যারা মেনে চলবেনা তারা নাফরমান ও

আইন অমান্যকারী বলে আখ্যায়িত হবে। পাশ্চাত্য বাসীর আন্তর্জাতিক আইন এমন ঠুনকো যে, তারা এই আইন অমান্য করলে আইন অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানরা যদি সকলে মিলে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে তা হলেও ইসলামী আইন যথার্থ আইন হিসেবে বহাল থাকে।

দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক আইনের যে অংশটিকে যুদ্ধ আইন বলা হয়, সেটি আসল আন্তর্জাতিক আইনের চেয়েও বেশী অনির্ভরযোগ্য ও ক্ষণভঙ্গুর। যুদ্ধের বাস্তব প্রয়োজনের সাথে এ আইন সব সময়ই সংঘর্ষমুখর এবং এই সংঘর্ষে তা পর্যুদস্ত। তা ছাড়া সমরবিদ ও আইনবিদদের বিরোধ এই আইনকে আরো দুর্বল করে দিয়েছে। আইনবিদেরা একটি জিনিসকে আইনের অন্তর্ভুক্ত করেন আর সমরবিদেরা তাকে খারিজ করে দেন। আইনবিদেরা একটি আইন তৈরী করেন আর সমরবিদেরা তা অগ্রাহ্য করেন। যেহেতু কার্যকর ক্ষমতা সমরবিদদের হাতেই নিহিত এজন্য পুস্তকে লেখা আইন পুস্তকেই পড়ে থাকে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যবাসীর যুদ্ধ আইন পার্লামেন্টে আইন বিদদের দ্বারা রচিত হয় না, রচিত হয় রণাঙ্গনে সমর নায়কদের বন্দুকের নলে। পক্ষান্তরে ইসলামের যুদ্ধ আইন গোটা ইসলামী আইনের মতই পাকা পোক্ত, সুসংহত ও অপরিবর্তনীয় আইন। এতে সামরিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে যে বিধিমালা তৈরী করা হয়েছে, তা এখন কেউ পরিবর্তণ করতে পারে না। কোন ইসলামী সেনাবাহিনী বা সমর নায়ক এতে কোন রকমের সংশোধন বা রহিত করণের অধিকারী নয় এবং কেউ এর একটি শব্দ অমান্য করারও ক্ষমতা রাখেনা।

তৃতীয়তঃ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের ভিত্তি হচ্ছে যুদ্ধকারীদের পারস্পরিক সমঝোতা। কতিপয় দেশ মিলিত হয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা যখন পরস্পরে লড়াই করবো তখন অমুক অমুক বিধিনিষেধ মেনে চলবো। এই চুক্তিতে যে সব দেশ অংশীদার হয় না তাদের সাথে যুদ্ধ হলে এই আইন পালিত হয় না। যে সব জাতি এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাবে তারাও এই আইনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে এবং সভ্য জাতিসুলভ শালীন আচরণের তারা অধিকারী হবে না। এমনকি চুক্তিবদ্ধদের মধ্য থেকেও কেউ যদি চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে তা হলে চুক্তির অন্যান্য অংশীদার তার ব্যাপারে যুদ্ধ আইন অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে না। মোট কথা আইন অমান্য করার ফলে খোদ আইনই পাল্টে যায়। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য যুদ্ধ আইন কোন নৈতিক দায়িত্ব বোধের ভিত্তিতে তৈরী

হয়নি, তৈরী হয়েছে নিছক পারস্পরিক সুযোগ সুবিধা বিনিময়ের ভিত্তিতে। সদাচরণ করা উচিৎ এই বিশ্বাস নিয়ে একটি যুদ্ধরত পক্ষ অপর যুদ্ধরত পক্ষের সাথে সদাচারণ করেনা। বরং শুধু এইরূপ শর্তে সদাচরণ করে যে, দ্বিতীয় পক্ষ যদি তার সাথে সদাচরণ করে তা হলে প্রথম পক্ষও সদাচরণ করবে। আর দ্বিতীয় পক্ষ সদাচরন না করলে প্রথম পক্ষও তা করবেনা। কিন্তু ইসলামী আইন এ ধরনের পারস্পরিক চুক্তি বা সুবিধা বিনিময়ের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইসলাম যে সব বিধি প্রচলন করেছে তা মেনে চলা মুসলমানদের জন্য সর্বাবস্থায় অপরিহার্য, চাই অমুসলিম তার বিনিময়ে তার সাথে সদাচরণ করুক বা না করুক। ইসলামী আইন কোন মুসলমানের জন্য কোন অবস্থাতেই ইসলামী আইনের আনুগত্যে শৈথিল্য দেখানোর বা দায়মুক্ত হওয়ার অধিকার দেয় না। মুসলমান থাকতে হলে সর্বাবস্থায় ইসলামী আইনের নিরংকুশ কর্তৃত্ব মান্য করতেই হবে।

চতুর্থতঃ পাশ্চাত্যের সভ্য আইন তৈরী হয়েছে এখন থেকে অর্ধ শতাব্দীর বেশী নয়। (পাঠক এখন এর সাথে আর অর্ধ শতাব্দী যোগ করতে পারেন। কেননা এ গ্রন্থ ১৯২৭ সালের লেখা।–অনুবাদক) অথচ ইসলামী আইন সাড়ে ১৩ শো বছর ধরে বিশ্বময় সভ্যতার পতাকা সমুন্নত রেখেছে। সময়ের এত বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও মৌলিকতার দিক দিয়ে পাশ্চাত্য আইন ইসলামী আইনে একটি অক্ষরও সংযোজন করতে পারেনি। আর খুটিনাটি বিধি সমূহ সম্পর্কেও বলা যায় যে, প্রত্যেক যুগের সামরিক প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় বাস্তব বিধির কথা বাদ দিলে সামগ্রিক ভাবে ইসলামী আইন পাশ্চাত্য আইনের চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠতর।

পঞ্চমতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষকে কয়েকটি কার্যকর আইনের অনুগত করে দেয়ার পর স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছে। সে যেখানে যে উদ্দেশ্যে খুশী, নিজের শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। তাকে শুধু বলা হয় যে, কাউকে আঘাত করতে হলে অমুক পন্থায় আঘাত কর এবং অমুক পন্থায় করো না। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে আঘাত করতে হবে এবং কি উদ্দেশ্যে করতে হবে না তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। পাশ্চাত্যের 'সভ্য জাতিগুলোর বাস্তব কার্যধারা যদি লক্ষ্য করা যায় তা হলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা দেশ জয়, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সম্পদ ও পদমর্যাদা লাভ, সম্প্রসারণবাদী শোষণ ও লুটতরাজ এক কথায় যাবতীয় জৈবিক প্রয়োজন পুরণ ও পাশবিক প্রবৃত্তি

চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। অথচ ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কেবল সভ্য ও শালীন পন্থায় যুদ্ধ করতে বাধ্য করেনা বরং তাকে কি কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা যায় এবং কি কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা যায় না, সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়। এ ব্যাপারটিকে সে মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ–অপছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়নি। বরং তার ওপর বিশেষ কতগুলো নৈতিক বিধানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং এ ব্যাপারে তাকে কোন শৈথিল্য প্রদর্শনের ইখতিয়ার দেয়নি। এ জন্য ইসলামের যুদ্ধ আইন পাশ্চাত্য যুদ্ধ আইনের তুলনায় অধিকতর বিশুদ্ধ, কল্যাণকর, যুক্তিসঙ্গত ও মজবুত।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পাশ্চাত্য আইনের গুনাগুণ বিচারের বেলায় পাশ্চাত্যবাসীর বাস্তব কার্যধারাকে বিবেচনা করা হলো কিন্তু ইসলামের বেলায় বিচার করা হলো কেবল ইসলামের কিতাবী আইনকে–এটা কতখানি ন্যায় সঙ্গত? কিন্তু পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করলে এ প্রশ্নের জবাব আপনা থেকেই পাওয়া যায়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামী আইন ও মুসলমানদের কার্যধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। ইসলামী আইন রচনায় মুসলমানদের কাজ তো দূরের কথা, তাদের ইচ্ছারও কোন দখল নেই। কাজেই আইনের গুণাগুণ যখন বিচার করা হবে তখন মুসলমানদের কাজ বা চরিত্র বিবেচনা প্রশ্নটা স্বভাবতই অবান্তর ও অসংলগ্ন গণ্য হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য আইন এবং পাশ্চাত্যবাসীর চরিত্র ও কার্যধারা স্বতন্ত্র জিনিস নয়। পাশ্চাত্য আইন তৈরীতে পাশ্চাত্যবাসীর ইচ্ছাই শুধু নয় বরং তাদের কার্যধারাও সক্রিয় অবদান রেখেছে। ইতিপূর্বেই প্রমাণ করা হয়েছে যে, যুদ্ধ আইনের ব্যাপারে পাশ্চাত্যবাসীর কার্যধারা সামনে চলে আর আইন তাদের পদানুসরণ করে থাকে। তাই আমরা পাশ্চাত্য আইনের গুনাগুণ বিচার করতে গিয়ে তাদের কাজের গুণাগুণ বিচার না করে পারি না।

–সমাপ্ত–

নির্দেশিকা

১। কেউ হয়তো বলবে যে, স্ত্রীদেরকে স্বামীর চিতায় জোর পূর্বক ফেলে দিয়ে পোড়ানো হতোনা বরং তারা নিজেরাই পুড়ে মরতো। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন উপায়ে সমাজের চাপের দরুণই তারা এহেন ভয়াবহ আত্মহত্যায় বাধ্য হতো।

২। নাফিরে আম, ইসলামী ফিকাহর (আইন শাস্ত্র) একটা পরিভাষা। এর অর্থ হলো "যুদ্ধের জন্য সাধারণ ডাক।" ইসলামী সরকার যখন কোন অঞ্চলের বা সারা দেশের জনগণকে প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসার নির্দেশ দেয় তাকেই বলা হয় 'নাফিরে আম।'

৩। মা আরিফ ইবনে কুতাইবা, হযরত ওমরের সন্তানদের প্রসঙ্গ।

৪। এই ঘটনা তাবারী ও ইবনে আসিরের ইতিহাস গ্রন্থদ্বয়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বালাজুরীও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

৫। ইকদুল ফরিদ, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ৭৪–৭৭, ইবনে আসির প্রথম খন্ড পৃঃ ৩৮৪–৩৯৭।

৬। ইবনে আসির, প্রথম খন্ড পৃ ৪৯৪–৫১১

৭। ইকদুল ফরিদ, ৩য় খন্ড পৃঃ ৮৬

৮। ইবনে আসির, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪৩৯–৪৪৫

৯। ইবনে আসির, প্রথম খন্ড পৃঃ ৪০৯

১০। ইবনে আসির, প্রথম খন্ড পৃঃ ২৭৬

১১। ঘটনা গুলি তাবাকাতে ইবনে সাদ, ফাতহুলবারী ও উসুদুল গাবাহ নামক গ্রন্থ সমূহে বর্নিত আছে।

১২। তিবরিজী প্রণীত হামাসাহর টীকা দ্রষ্টব্য।]

১৩। History of Persia, Sykes, Vol, Ip. 482

১৪। Gibbon, Roman Empire, Vo, V., Ch. xlvi

১৫। E.A. Ford, Byzantine Empire,

১৬। Gibbon, Roman Empire, Vol, 1, Ch. Xlvi

১৭। Sykes, Vol, I, P 448

১৮। Sykes, Vol, I, P 426

১৯। Ibid, Vol, IP, 494

২০। Byzantine Empire, P, 10l

২১। Gibbon, Vol, V, Ch, XIV.

২২। Sykes, Vol, I, P .49

২৩। Grote, History of Greece

২৪। Gibbon, Vol, V, Ch. XL III

২৫। Ibid, Vol, V.Ch, XL III

২৬। Ferrar, Early Days of Christianity Pp. 488-89

২৭। Gibbon, Sykes, Ford

২৮। Sykes. Vol,1,P.P 427-28

২৯। Politics, Bk. I, Ch. II. VI,

৩০। Ibid, Book I, Ch. VIII

৩১। Ferrar, P.2

৩২। Rev. Cutts. Constantine the Great, P. 57

৩৩। Byzantine Empire, P. 99

৩৪। Ferrar, P. 2

৩৫। Sykes. Vol. I

৩৬। Sykes. Vol. I

৩৭। এই অধ্যায়ে যে হাদিস সমূহ উদ্ধৃত হয়েছে তার অধিকাংশ বুখারীর

কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল মাগাজী, মুসলিমের কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার ও কিতাবুল ইমারাহ, আবু দাউদের কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল ফাই ওয়াল ইমারাহ, নাসায়ীর কিতাবুল জিহাদ, ইবনে মাজার আবওয়াবুল জিহাদ, তিরমিজীর আবওয়াবুল জিহাদ ও আবওয়াবুস সিয়ার এবং মুয়াত্তা ইমাম মালেকের কিতাবুল জিহাদ থেকে গৃহীত।

৩৮। ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ৪৭

৩৯। হিদায়াহ, বাব কাইফিয়াতুল কিতাল ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৯০–২৯২ বাদায়েউস সানায়ে ৭ম খন্ড, পৃঃ ১০১

৪০। অর্থাৎ যে ধন–সম্পদ শত্রুর দেশে সৈন্যদের চলাচলের সময়ে সাধারণ নাগরিকদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হয় এবং গণিমতের যে সম্পদ সরকারীভাবে বন্টন করার আগেই নেয়া হয়।

৪১। ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃঃ২৩৪

৪২। Lawrence, Principles of international Law, P441

৪৩। ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ৪৭

৪৪। এ হলো যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইসলামের সাধারণ আইন। তবে যুদ্ধ বন্দী যদি এমন কেউ হয় যে ইসলামের একজন চরম শত্রু অথবা যে মুসলমানদের ওপর মারাত্মক রকমের জুলুম অত্যাচার চালিয়েছে, অথবা কোন মারাত্মক দাঙ্গা–হাঙ্গামার আসল নায়ক তবে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ইসলামী সরকারের রয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধের পর নবী করীম (সঃ) যুদ্ধ বন্দী উকবা ইবনে আবু মুয়াইতকে হত্যা করিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ইসলামী সরকার যে ব্যবস্থাই নেবে, কোন রাখ ঢাক না করেই নেবে। দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের পর মিত্রশক্তির মত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রহসন করবেনা।

৪৫। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ১১৬

৪৬। ফাতহুল বারী ৮ম খন্ড, পৃঃ ৪২

৪৭। এর অর্থ শুধুমাত্র এই যে, ঐ সব মুসলমানকে সামরিক সাহায্যের পর্যায়ের কোন সাহায্য দেয়া যাবে না এবং তাদের সমর্থনে অবাঞ্ছিত

হস্তক্ষেপের আওতায় পড়ে এমন পদক্ষেপও নেয়া যাবে না। তবে এর অর্থ এও নয় যে, কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের ওপর জুলুম হতে থাকলে মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমানরা নির্বিকার ভাবে নীরব দর্শক হয়ে তা দেখতে থাকেবে। তা কখনো হতে পারেনা। তারা শুধু চুক্তি ভঙ্গ করাটা এড়িয়ে চলবে। এছাড়া তাদের মজলুম মুসলমান ভাইদের নৈতিক, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সাহায্যার্থে চুক্তিতে এবং প্রচলিত আন্তর্জাতিক রীতিতে যা কিছু করার অবকাশ থাকে তারা করতে পারে এবং করাও উচিত।

৪৮। একটি মাত্র ক্ষেত্রে এই সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। সেটি হলো, যখন দ্বিতীয় পক্ষ সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ভঙ্গ অথবা খোলাখুলি সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে বসে। এরূপ ক্ষেত্রে ইসলামী সরকারের ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই তার ওপর হামলা চালাতে পারে। মক্কা বিজয়ের সময় হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

৪৯। বালাজুরী রচিত ফুতুহুল বুলদান পৃঃ১৬২–১৬৩

৫০। কারো কারো মতে এই আয়াতে বর্নিত 'সৌজন্য মূলক' আচরণ অর্থ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তিদান অথচ বন্দী অবস্থায় রেখে সদ্ব্যবহার করার সৌজন্যমূলক আচরণের আওয়াতায় পড়ে।

৫১। ফাতহুলবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড পৃঃ ১০১

৫২। ফাতহুল কাদীর ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩০৬

৫৩। বালাজুরীর মূল বক্তব্যটি এ রূপঃ

فوقع سباؤهم بالمدينة فردهم عمر بن الخطاب وصيرهم وجماعة القبط اهل الذمة

ফুতুহুল বুলদান, মিশরীয় প্রকাশনা, পৃঃ ২২৩

৫৪। নিহায়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, (মালিকানাভুক্ত) শব্দটি দ্বারা গোলাম বা দাসকেই বুঝানো হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) কথাটা দ্বারা চাকর গোলামদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার তাকিদ দিতে চিয়েছিলেন। কেউ কেউ এ শব্দটি জাকাত অর্থেও গ্রহণ করেছেন। তবে

সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত এই যে, হজরত রাসুলুল্লাহ(সঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে ইবাদাতের ক্ষেত্রে নামাজের এবং পারস্পরিক দাস–দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহারের তাকিদ দিয়েছিলেন।

৫৫। আবু দাউদ, সদাচার অধ্যায়, গোলাম–বাঁদীর অধিকার সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

৫৬। রোম সাম্রাজ্যের সাধারণ রীতি ছিল যে, কোন গোলাম–বাঁদীর মেয়ের বিয়ে হলে তাকে প্রথম রাত কাটাতে হতো তার মনিবের সাথে। খৃষ্টান পাদ্রীরা পর্যন্ত এহেন লজ্জাকর জুলুম থেকে বিরত থাকতো না। সৈয়দ আমীর আলীর স্পিরিট অব ইসলাম দেখুন। পৃ ঃ২২৪

৫৭। তাবারী, মিশরীয় প্রকাশনা, ২য় খন্ড, পৃ ঃ ২৬৭

ইবনে আসীর, মিশরীয় প্রকশানা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪২,৪৩

৫৮। তাবারী, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৬৭

কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১২২ তিরমিজী, কিতাবুত তফসীর।

৫৯। বুখারী কিতাবুল মাগাজী, কুরআনের হোনাইন সংক্রান্ত আয়াত প্রসঙ্গ।

৬০। এখানে একটি ঘটনার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। আবু হোরাইরা (রাঃ) নিজেই অন্য এক হাদিসে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, “তোমাদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হয়েছে” রাসুলুল্লাহর এই উক্তি সংক্রান্ত অধ্যায়।

৬১। মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, নাসায়ী, গোপন সামরিক অভিযান সংক্রান্ত অধ্যায়।

৬২। আবু দাউদ, পশু ভাড়া দেয়া সংক্রান্ত অধ্যায়।

৬৩। নাসায়ী, জানাজা সংক্রান্ত অধ্যায়, শহীদদের নামাজ প্রসঙ্গ।

৬৪। এ ছিল হজরত ওমরের (রাঃ) ইজতিহাদ। সেনাবাহিনী যখন ইরাকের দখলীকৃত এলাকা ভাগ করে তাদের মধ্যে বিতরনের দাবী করে তখন তিনি এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরে ঐ দাবী নাকচ করেন। তিনি বলেন, এ সম্পদ সমগ্র দেশবাসীর। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ১৫।

৬৫। ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ২৭৪ কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ (সামান্য পার্থক্য সহ) পৃঃ ১৩–১৪

৬৬। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৮২

৬৭। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধের সময় যে সৈনিক যা কিছুই হাতে পাবে নিয়ে নেবে, ইসলাম তা অনুমোদন করে না। এরূপ করলে সেটা গনিমতের মাল নয়, চোরাই মাল বলে গণ্য হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ হারাম। গনিমত সম্পর্কে ইসলামের বিধি এই যে, যুদ্ধের সময় কুড়িয়ে পাওয়া যাবতীয় জিনিস–এমনকি সুই, সুতা ও দড়ির টুকরো পর্যন্ত যুদ্ধ শেষে সেনাপতির কাছে জমা দিতে হবে। কোন কিছুই লুকিয়ে রাখা চলবে না। সেনাপতি তা থেকে এক পঞ্চমাংশ সরকারী কোষাগার (বাইতুল মাল)–এর জন্য রেখে বাকিটা ন্যায় সঙ্গত ভাবে সৈনিসদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। কেবল খাদ্য ও পানীয়ের বেলায় এ বিধি প্রযোজ্য নয়। খাদ্য ও পানীয় প্রত্যেক সৈনিক প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারে।

৬৮। পাশ্চাত্য আইনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পূর্ণ সরকারের প্রাপ্য বিবেচিত হওয়ায় সৈনিকদের মধ্যে হোক অনিচ্ছায় হোক চুরির অভ্যাস সৃষ্টি হয়। তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লুকিয়ে রাখে। এভাবে তাদের মধ্যে দুর্নীতি ও আত্মসাৎ করার প্রবণতা জন্মে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন সৈনিকদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে না। তাদের মধ্যে সততা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টির জন্য এভাবে ট্রেনিং দেয় যে, প্রথমে তাদের কাছ থেকে সব কিছুই নিয়ে নেয়। তারপর গরীবদের জন্য এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকীটা তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়।

৬৯। তাদের জন্য পয়লা শর্ত হলো ঢুকবার সময় তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ঢুকতে হবে। তা না হলে গোয়েন্দা রূপে গণ্য হবে এবং গোয়েন্দার জন্য অন্যান্য আইনের মত ইসলামেও মৃত্যুদন্ড নির্ধারিত রয়েছে।

৭০। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ১১৭ হিদায়া, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিধি, নিরাপত্তা প্রার্থী প্রসঙ্গ, কোন ফিকাহবিদদের মতে নোটিশ দেয়া হোক বা না হোক, এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার জাতীয়তা আপনা আপনি বদলে যাবে। মাবসুত গ্রন্থেও এই মত সমর্থন করা হয়েছে।

৭১। রদ্দুল মোখতার ২য় খন্ড, পৃঃ ২৭৩।

৭২। আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ।

৭৪। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৩৫।

৭৫। ডঃ স্প্রিঙ্গারের মতে প্রতিবেশী বলে এখানে ইহুদী বুঝানো হয়েছে। (সীরাতে মুহাম্মদ , ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫০২) প্রকৃত পক্ষে প্রতিবেশী অর্থে সেখানে বসবাসরত সকল শ্রেণীর লোকই বুঝানো হয়েছে।

৭৬। অর্থাৎ গীর্জায় রাখা হয় এমন সব ক্রুশ ও ছবি ইত্যাদি।

৭৭। চুক্তির শরীক পক্ষের মালিকানাভুক্ত ও উৎসর্গীকৃত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা দেওয়াই এ কথার উদ্দেশ্য।

৭৮। এই শর্তের দাবী এই যে, ইসলামী সেনাবাহিনী নিজেরাও তাদের ভূমিতে পদার্পণ করবেনা, অন্য কোন বিদেশী শক্তিকেও সেখানে ঢুকতে দেবেনা।

৭৯। অর্থাৎ কেউ চুক্তির আগে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিয়ে থাকলে এবং চুক্তির পর সে ঋণ গ্রহিতার বিরুদ্ধে সুদের দাবী তুললে আমরা তাকে সুদ দিতে বাধ্য করতে পারবো না। তবে ইয়াকুবী যে চুক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে "এর পর" এর পরিবর্তে "এ বৎসরের পর" লিখেছেন। দেখুন ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৬৩

৮০। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, হজরত আবু বকর (রাঃ) এই চুক্তিনামাই কার্যকরী করেছিলেন। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৮৪

৮১। বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হওয়ার পর এই চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়।

৮২। যখন অর্ধেক শহর তরবারীর জোরে বিজিত হয়েছে, তখন এই চুক্তি-নামা স্বাক্ষরিত হয়।

৮৩। সম্ভবতঃ এখানে বালাবাক শহরের শাসকের নাম ছিল।

৮৪। অবশ্য বনী কুরাইজার ব্যাপার ভিন্নতর। সে সম্পর্কে আলোচনা পরে আসছে।

৮৫। তাবারী, ইউরোপীয় সংস্করণ পৃঃ ২৪৬৭ ফুতুহুল বুলদান পৃঃ ২৭৭

৮৬। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১৩, ১৫

৮৭। বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খন্ড পৃঃ ১১১

৮৮। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৮২।

৮৯। ফাতহুল কদীর, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৫৯

৯০। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৩৬

৯১। বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১১, ১১২
ফাতহুল কদীর, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৭২, ৩৭৩ কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭০

৯২। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৮২

৯৩। বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৪

৯৪। এনায়াহ্ শরহে হেদায়াহ ৮ম খন্ড পৃঃ ২৫৬ দারকুতনীতে ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে انا اكرم من وفى ذمته।
অর্থাৎ অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিতকারীদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠতম।

৯৫। বুরহান শরহে মাওয়াহেবুর রহমান। ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৮৭

৯৬। বুরহান, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮৭, দিল্লীস্থ আর্মিনিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে বুরহানের হাতে লেখা যে কপিটি রয়েছে আমি সেখান থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছি।

৯৭। দুররুল মুখতার, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৭৩

৯৮। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১০৮, ১০৯

৯৯। ৩য় খন্ড, পৃঃ২৭৩

১০০। ৩য় খন্ড পৃঃ ২৭৩–২৭৪

১০১। ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১২

১০২। বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৩, ফাতহুলকাদীর ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৩৮১–৩৮২

১০৩। খাঁটি ইসলামী বস্তি বলতে ইসলামী পরিভাষায় যাকে 'ইসলামী জনপদ' বলা হয় তাই বুঝায়। অর্থাৎ যে জনপদের ভূমি মুসলমানদের

মালিকানাধীন এবং সমগ্র জায়গাটিকে মুসলমানরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপনের স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করে নেয়।

১০৪। বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৩

১০৫। ইসলামী জনপদ সমূহে এ শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে যেন দাঙ্গা সংঘর্ষ না বাঁধে। দুঃখের বিষয় পরবর্তী কালে লোকেরা এর উদ্দেশ্য অন্য রকম ধরে নিয়েছে।

১০৬। বাদায়ে, ৭ম খন্ড ১১৪ পৃঃ

১০৭। বাদায়ে, ৭ম খন্ড ১১৪ পৃঃ

১০৮। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৮৮

১০৯। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৮, ৮২

১১০। ফাতহুল বয়ান –৪র্থ খন্ড পৃঃ ৯৩,

১১১। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৯

১১২। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৮২

১১৩। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৭১

১১৪। আবু দাউদ, ভূমিকর, রাজস্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রসঙ্গ

১১৫। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৭০

১১৬। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৮৫

১১৭। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭২

১১৮। ফুতুহুল বুলদান, ইউরোপীয় সংস্করণ পৃঃ ১২৯

১১৯। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭০

১২০। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭০

১২১। এখানে বিষয়টির কেবল একটি দিক আলোচিত হলো। এর অন্যান্য দিক সম্পর্কে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।

১২২। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১১১

১২৩। বালাজুরী লিখেছেনঃ মুসলমানরা যখন হেমসে জিজিয়ার টাকা

ফেরত দেয়, তখন হেমস বাসীরা বলে, আমরা এ যাবত যে জুলুম অত্যাচার ভোগ করে আসছি, তার চেয়ে বরং তোমাদের ন্যায় বিচারকই আমরা বেশী ভালবাসি। এবার হিরাক্লিয়াসের কর্মচরীরা আসুক। আমরা তাদেরকে আমাদের জনপদে ঢুকতেই দেবনা। অবশ্য যুদ্ধ করে যদি হেরে যাই তবে ভিন্ন কথা। ফুতুহুল বুলদান, ইউরোপীয় প্রকাশনা, পৃঃ ১৩৭

১২৪। ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ১২২

১২৫। ফুতুহুল বুলদান, ইউরোপীয় প্রকাশনা, পৃঃ ১৫৬

১২৬। ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ১৬৯

১২৭। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৮৫

১২৮। ইবনে কাছীর, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৭৫

১২৯। বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৩

১৩০। ৭২ থেকে ৭৩ পৃঃ পর্যন্ত এই বিষয়গুলো সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৩১। দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষ যুগের ইসলামী আইনবেত্তাগণও এর উদ্দেশ্য অমুসলিমদের প্রতি তাছিল্য প্রদর্শন বলেই অভিহিত করেছেন। তারা আপন গ্রন্থ সমূহে লিখেছেনঃ هٰذا لاظهار آثار الذلة عليهم-
"তাদের (অমুসলিমদের) প্রতি তাছিল্য প্রদর্শণ হিসাবে এই বিধি সমূহ বিধিবদ্ধ হয়েছে।" কিন্তু প্রচীন ইমামরা এমন কোন উক্তি করেছেন বলে জানা যায়নি। হজরত ওমর (রাঃ) নিজে এই সব বিধির রচয়িতা হয়েও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। তিনি কখনো বলেননি যে, অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের মত দেখা যায় এমন পোষাক পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে অমুসলিমদেরকে হেয় করার উদ্দেশ্য।

১৩২। অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ পোষাক পরিচ্ছদ পরা সম্পর্কে আমি একটা আলাদা পুস্তিকা লিখেছি। পুস্তিকাটির নাম "পোসাক সমস্যা।"

১৩৩। এই কথাগুলো আমি অবিভক্ত ভারত থাকাকালে এবং বৃটিশ শাসন চলাকালে লিখেছিলাম। আশ্চার্য্য, ইংরেজরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেল।

ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো আলাদা স্বাধীন দেশও গঠিত হলো। তথাপি পোষাক পরিচ্ছদ অবস্থা আগের মতই রয়ে গেছে। ভারতের অবস্থা তো আমরা বিভাগোত্তরকালে দেখবার সুযোগ পাইনি। তবে পাকিস্তানে স্বাধীনতার আগে ও পরে অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। দীর্ঘ দিন গোলামীর যে প্রভাব মন ও মগজে বদ্ধমূল হয়েছে তার কারণে পাকিস্তানবাসী স্বাধীনতা লাভের পরও বুঝতে পারেনি যে, বৃটিশ বেশভূষায় এখন আর গর্বের কিছু নেই এবং জাতীয় পোশাক পরায় লজ্জারও কিছু নেই। মজার ব্যাপার এই যে, যে সব বৃটিশ নাগরিক পাকিস্তানে চাকুরে হিসেবে থেকে গেছে তারা শাসকের গদি থেকে নেমেও উপলব্ধি করতে পারলো না যে, এখন এ দেশে সম্মান লাভ করতে হলে তাদের পাকিস্তানী পোষাক পরা প্রয়োজন।

১৩৪। ইবনে হিশাম স্বীয় গ্রন্থে এই চুক্তি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

১৩৫। ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩১

১৩৬। ” ” ২৩৩

১৩৭। এই ঘটনাটি আবু দাউদের বনুনজীর সংক্রান্ত অধ্যায়ে এবং ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠায় সামান্য পার্থক্যসহ বর্ণিত হয়েছে।

১৩৮। তাবারী, মিসরীয় প্রকাশনা, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৭ ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৩২, ফুতুহুল বুলদান পৃঃ ২৪

১৩৯। উসুদুল গাবাহ, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৭ তালহা ইবনে বারা প্রসঙ্গ

১৪০। তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৮ ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৩৩ ফুতুহুল বুলদান পৃঃ ২৪

১৪১। তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৮

১৪২। ফুতুহুল বুলদান পৃঃ২৪

১৪৩। ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৩২

১৪৪। আবু দাউদ, ভূমিকর, রাজস্ব ও বনুনজীর প্রসঙ্গ

১৪৫। ইবনে আসীর মিসরীয় প্রকাশনা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৭, ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৮০

১৪৬। ইবনে আসীর, ২য় খন্ড পৃঃ ৬৮ ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড পৃঃ ২৮১

১৪৭। ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃঃ২৮১ ইবনে কাসীর ৮ম খন্ড, ৫২

১৪৮। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীর সাথে যুদ্ধ করার বৈধতা প্রসঙ্গ, ফুতুহুল বুলদান পৃঃ ২৯

১৪৯। প্রাগৈসলামিক যুগে হজরত সাদ–এর গোত্র ও বুনু কোরাইজা গোত্রের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন আরব সমাজের এ ধরনের মৈত্রী সম্পর্ক রক্ত সম্পর্কের চেয়ে কম মজবুত ছিল না।

১৫০। তাওরাতের বিধানটি এই "তুমি যখন কোন জনপদে যুদ্ধের জন্য যাবে তখন প্রথম সন্ধির আহবান জানাবে। তারা যদি জবাব দেয় যে সন্ধির জন্য প্রস্তুত আছে এবং তোমার জন্য দরজা খুলে দেয় তা হলে সেই জনপদের সকল অধিবাসী তোমাকে কর দেবে ও বশ্যতা স্বীকার করবে কিন্তু যদি সন্ধি না করে যুদ্ধ করতে চায় তা হলে তাদের অবরোধ করো। পরে আল্লাহ যখন তাদেরকে তোমার মুঠোর মধ্যে এনে দেবেন তখন প্রত্যেক পুরুষকে হত্যা করবে। তবে স্ত্রী, শিশু ও পশুদেরকে গনিমত হিসাবে গ্রহণ করবে। (ব্যতিক্রম পুস্তক, ২০শ অধ্যায়, আয়াত ১০–১৪)

১৫১। ইবনুল আসীর, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৩ ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড পৃঃ ২৩৬ তে আছে যে, সে মুসলিম নারীদের নিয়ে মনে ব্যথা দেয়ার জন্য তাদের নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখতো।

১৫২। আবু দাউদের জিহাদ সংক্রান্ত অধ্যায়ে মদিনা থেকে ইহুদী বিতাড়নের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "সে কোরাইশদেরকে উত্তেজিত করতো।"

১৫৩। আবু রাফে সম্পর্কে বুখারী শরীফে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, আবু রাফে হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত এবং অন্য যারা কষ্ট দিত তাদেরকে সাহায্য করতো। (যুদ্ধ অধ্যায়, আবু রাফের হত্যা প্রসঙ্গ) তবে ইবনে যায়েদ উরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, সে গাতফান সহ আরবের মুশরিকদেরকে প্রচুর টাকা দিয়ে সাহায্য করতো। (ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৪০)। তাবারী সংযোজন করেছেন যে, সে খন্দকের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহর বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করেছিল। (৩য় খন্ড পৃঃ ৭) ইবনে সাদ' তদীয়

তাবাকাত গ্রন্থে লিখেনঃ গুতফান ও অন্যান্য মুশরিক গোত্রগুলোকে নিয়ে হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এক বিরাট সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছিল। (২য় খন্ড, পৃঃ ৬৬) ইবনে আছীর বলেনঃ সে রাসুলুল্লাহর বিরুদ্ধে কাব ইবনে আশরাফকে সাহায্য যোগান দিত। (২য় খন্ড, ১১২, ইউরোপীয় সংস্করণ) এ সব ছাড়া এ কথাও প্রমাণিত যে, সেও কাব ইবনে আশরাফের মত কখনো প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধ করতে আসেনি। বরং নেপথ্যে থেকে ইসলামের দুশমনদেরকে টাকা ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতো

১৫৪। ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ২৯–৩৮। ইবনে হিশাম পৃঃ ৭৭৯, সাদ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৯–৮০

১৫৫। বুখারী, শর্ত আরোপ সংক্রান্ত অধ্যায়, ভাগ চাষে শর্ত আরোপ প্রসঙ্গ। ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ২৯

১৫৬। ফাতহুল বারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ২০৭

১৫৭। আবু দাউদ, খয়বরের ভু–সম্পত্তি প্রসঙ্গ

১৫৮। সহীহ বুখারীতে এ ঘটনা একাধিক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। খয়বর যুদ্ধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অধ্যায়ে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

১৫৯। উসুদুল গাবাহ, ৩য় খন্ড পৃঃ ১৭৯

১৬০। ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ৩১ ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৮০

১৬১। বুখারী, শর্ত আরোপ সংক্রান্ত অধ্যায়, ভাগচাষে শর্ত আরোপ প্রসঙ্গ

১৬২। বুখারী, ঐ

১৬৩। ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ৩৪

১৬৪। ফাতহুল বারী, ৫ম খন্ড, পৃঃ ২০৭

১৬৫। ফাতহুল বারী, , ৫ম খন্ড, পৃঃ ২০৭

১৬৬। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৪১, ফুতুহুল বুলদান পৃঃ ৭২

১৬৭। কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৪১

১৬৮। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৪২

১৬৯। ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ৭৩, ইবনে আসীর ২য় খন্ড, পৃঃ ১১২

১৭০। কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৪১

১৭১। হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয়ে পন্ডিতগণ খুব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। কেউ বলেন, "হিন্দুরা যা করে তাই হিন্দু ধর্ম।"

(Guru Parsad Sen, Introduction to The Study of Hinduism, P-9)

আবার কেউ বলেন, "ব্রাহ্মণদের শিক্ষায় যার বিস্তার ঘটেছে, ব্রাহ্মণদের পবিত্র গ্রন্থাবলী যা সমর্থন করেছে এবং ব্রাহ্মণদের নির্দেশে যা প্রতিপালিত হয়ে আসছে, সেই সব প্রথা, বন্দনা, আকিদা–বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও সংযোজন সমূহের সমাবেশকেই হিন্দু ধর্ম বলা হয়। (LYALL, Religious Systems of the World, P. 114) আবার কেউ বলেন, " যে সব ভারতবাসী ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, ইহুদী, পারসিক, অথবা দুনিয়ার আর কোন ধর্মের সাথে সম্পর্ক রাখে না, যাদের পূর্জা–অর্চনায় একত্ববাদ ও মুর্তি পূজা উভয়েরই অবকাশ রয়েছে এবং যাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতি ভাষায় লিখিত, তারাই হিন্দু।" (Census Report, Boroda, 1901, P, 120)

১৭২। আমি প্রধানতঃ মিঃ গ্রিফথ এর ইংরেজীতে অনুদিত বেদ সমূহের উপরেই নির্ভর করেছি। ম্যাক্স মুলারের অনুবাদ গুলোও পড়েছি। আমি দুঃখিত যে, সংস্কৃত না জানার কারণে আমি এই গ্রন্থ সমূহকে মূল ভাষায় পড়তে অক্ষম। ওদিকে ইউরোপীয় অনুবাদকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ সমূহের ব্যাপারেও পাশ্চত্য অনুবাদকদের ওপর তেমন আস্থা রাখতে পারি না। তাই আমি পন্ডিতদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, বেদের শ্লোক সমূহ সম্পর্কে আমি যে আলোচনা এই পুস্তকে করেছি তা যেন তারা সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেন। আর যদি কোথাও ভুল অনুবাদের উপর ভিত্তি করে আমি কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি তবে সে কথা যেন আমাকে জানান।

১৭৩। ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র তাঁর Indo Aryans নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে দাস্য আর্য্যদেরই ভিতরকার অনুন্নত উপজাতি গুলোর নাম। (প্রথম খন্ড, পৃঃ ২১০) কিন্তু বেদ পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায় আর্য্য হানাদাররা এই শব্দটি দ্বারা ভারত বর্ষের আদিম অধিবাসীদেরই বুঝাতো। কেননা তাদের সাথে আর্য্যরা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এটা শুধু যে আমার উপলব্ধি তা নয়। বেদ অধ্যায়নকারী অন্য লোকেরাও এটাই উপলব্ধি করেছেন। গ্রিফত লিখেছেন! ' আর্য্যদের ভারত বর্ষে আগমনে যারা বাধ সেধেছিল সেই আদিম ভারতবাসীদেরকেই দাস্য বলা হতো। পরবর্তীতে যারা বেদের নির্দেশিত পূজা অর্চনা করত না এবং নির্দিষ্ট নিয়মে ব্রাক্ষ্মান্য প্রথা মেনে চলতো না তাদের সবাইকে ঐ নামে অভিহিত করতে শুরু হয়। (অথর্ব বেদ অনুবাদ, প্রথম খন্ড পৃঃ৯) অধ্যাপক ব্লম ফিল্ড লিখেছেনঃ

"এক অজ্ঞাত অতীতকালে আর্য্য উপজাতিরা হিন্দুকুশ পর্বত মালার উত্তরে অবস্থিত ইরানের মাল ভূমি থেকে উত্তর পশ্চিম ভারতে অর্থাৎ সিন্ধুনদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আসতে আরম্ভ করে। সময়টা আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্ট পুর্বাব্দ অথবা তারও আগে। সে সময় ঐ এলাকায় আদিম অধিবাসীরা সহজেই পরাজিত হয়। আর্য্যদের থেকে পৃথক করার জন্য তাদের বলা হতো দাস্য। (Encyclopedia of Religions Vol. VII p. 107) অধ্যাপক ম্যাকডালিন লিখেছেন।ঃ

"কৃষ্ণ বর্ণের যে আদিম অধিবাসীদের আর্য্যরা পরাজিত করেছিল ঋকবেদে তাদের সাদ বা দাস্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।"

(Encyclopedia of Religions, Vol. XII, P.610) উইলিয়ম ক্রুক লিখেছেনঃ

"বড় বড় দেবতারা তাদের পূজারীদের জন্য অত্যন্ত সদয় অভিবাবক। তারা দাস্য বা কালো রং–এর আদিম অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আর্য্যদের নেতৃত্ব দেয়।"

(Encyclopedia of Religions Vol. VI. P. 69)

১৭৪। অর্থাৎ গৌরবর্ণের আর্যরা যারা মধ্য এশিয়া থেকে এসে ভারত বর্ষের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল তাদের তুলনায় ভারতের আদিম অধিবাসীরা

ছিল কৃষ্ণকায়। গ্রেফতাহ অনুদিত ঋগবেদ পৃঃ ১৩০

১৭৫। বৈদিক দেব গাথায় মহামারী জাতীয় রোগের দেবীর নাম 'অপয়া'। এখানে সম্ভবতঃ যুদ্ধকালীন সৈন্যদের মধ্যে যে সব রোগ ছড়ায় সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। (ঋজুর্বেদ, গ্রীফথ অনূদিত পৃঃ ১৫৪)

১৭৬। এই শ্লোক ও এর পরবর্তী শ্লোকে যে কৃষ্ণকায় লোকদের উল্লেখ রয়েছে তা থেকে সেই দাস ও দাস্য নামে অভিহিত দেশের আদিম অধিবাসীদেরই বুঝানো হয়েছে।

১৭৭। হলুদ রং এর জিনিস অর্থ সোনা। আরবীতেও প্রায়ই সোনা রূপার নাম না নিয়ে صفراء ও بيضاء অর্থাৎ হলুদ বা সাদা জিনিস বলা হয়।

১৭৮। ক্রোধের দেবতা।

১৭৯। পিশাচ বলা হয় কাঁচা গোশত ভক্ষক ভুত প্রেতকে। তবে এখানে এর অর্থ যে মানবীয় শত্রু তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

১৮০। মিঃ বলগঙ্গাধর তিলকের লিখিত ও শান্তিনারায়ন লাহোরী অনূদিত ব্যাখ্যাসহ গীতা এবং মিঃ কে,টি তিলং এর লিখিত এবং অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত প্রাচ্যের পবিত্রগ্রন্থাবলী সিরিজের অন্যতম ব্যাখ্যাসহ গীতা- এই দুইটি পুস্তক অধ্যায়ন করে আমি বর্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

১৮১। এই উপদেশ মূলতঃ মৌখিকভাবে দেয়া হয়েছিল। মহাভারতের প্রণেতা এগুলি লিখিতভাবে প্রকাশিত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, যখন কুরুদের নেতা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় বংশ নিপাত হওয়ার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে চাইলেন না তখন সঞ্জয় নামক এক ব্যক্তি যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ তার কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করার কাজে নিয়োজিত হয়। এই বর্ণনাকারী যুদ্ধের বিবরনের সাথে পান্ডবদের বাহিনীতে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল এবং অর্জুনের সাহস বৃদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন তাও বর্ণনা করে। এই সঞ্জয়ের দেয়া বিবরণই পরবর্তিকালে মহাভারতের 'ভীষ্ম পর্ব' নামক পুথিতে উদ্ধৃত করা হয় এবং তার নাম দেয়া হয় 'ভগবৎগীতা' (ভগবদগীতার ৩য় পৃঃ তিলং এর ভূমিকা এবং তিলংকৃত গীতার ব্যাখা, চতুর্থ খন্ড, প্রথম পৃষ্ঠা দেখুন)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশগুলো যে সরাসরি তার থেকে অথবা তার সমর্থকদের শিবির থেকে বর্ণিত হয়নি বিরোধী শিবিরের একজন বর্ণনাকারী ঐগুলি (সম্ভবত প্রজ্ঞার মাধ্যমে) শ্রবণ করে তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন তা সুস্পষ্ট।

১৮২। আমার এ আলোচনার ভিত্তি মনুসংহিতার দুটো ইংরেজী অনুবাদ। একটি হলো, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কোলকাতার ফোর্ড উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত স্যার উইলিয়াম জোনসের অনুবাদ। অপরটি অধ্যাপক হপকিন্‌সের সম্পাদিত ও প্রকাশিত ডাঃ বার্ণলের ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। এর মধ্যে প্রথম অনুবাদটি হয় সরকারী নির্দেশে এবং আজও এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১৮৩। স্যার ইউলিয়াম জোনসের ধারণা, মনুসংহিতার রচনা খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের মধ্যবর্তিকালে সম্পন্ন হয়েছে। অধ্যাপক মেনিয়ারের অনুমান অনুযায়ী এর রচনাকাল খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দ। জার্মান প্রাচ্যবিদ ইউহানিতিগানের মতে খৃঃ পূঃ ৩৫০ অব্দই এর সঠিক রচনাকাল। শ্লেগালের মতে এটি রচিত হয়েছে খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। অধ্যাপক ক্রুক বলেন, এ শাস্ত্র ২০০ খৃষ্টাব্দের চেয়ে প্রাচীন নয়। তবে ডাঃ বার্নালের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, তার রচনাকাল ১০০ থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। তার মনে চানক্য বংশের কোন রাজা হয়তো নিজ সাম্রাজ্যের বিধান হিসাবে এটি লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

১৮৪। মনুর টিকাকার ফ্লোকার মতে দেবতাগন অর্থ বিজিত দেশের দেবতাগণ। তবে সেই সাথে ব্রাক্ষ্ম শব্দটি সংযোগ দ্বারা মনে হয়, এ নির্দেশ অনার্য্য জাতিগুলির দেবতাদের সম্পর্কে নয়। আর মনু যে আর্য্য জাতিগুলোকে অনার্য্যদের দেবতাদের পূজা করতে বলবেন তাও আশা করা যায় না।

১৮৫। এ নির্দেশটিও শুধুমাত্র জাতিগুলোর পারস্পরিক যুদ্ধ সংক্রান্ত। কেননা ২০২ নং শ্লোক কোন স্বতন্ত্র শ্লোক নয়। বরং ২৬ থেকে ২০৩ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ধারা বাহিক কথারই অংশ। অন্যান্য সূত্রেও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। অধ্যাপক হপকিন্‌স বলেন "মজার ব্যাপার এই যে, মনু ও বিযুত উভয়েই বলেন, কোন রাজা তার বিদেশী শত্রুকে

পরাজিত করলে তার উচিত সেই দেশের (তার নিজের দেশের নয়) একজন যুবরাজকে সেখানকার রাজা বানিয়ে দেয়া এবং দুশমনের রাজ বংশ নিপাত করা উচিত নয়। অবশ্য সেই রাজ বংশ যদি নীচ জাতের হয় তবেই শুধু এ নির্দেশ পালন করতে হবে। কেমব্রিজ, হিষ্ট্রী অব ইন্ডিয়া, ভলিউম ১, পৃঃ ২৯০।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন এবং হিন্দু সভ্যতার প্রতি বিশেষ অনুকম্পাশীল অধ্যাপক হেভেল তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেনঃ

'আর্য্য উপজাতিগুলির পরস্পরের এবং অনার্য্য ও আর্য্য অসভ্য (দাস দাস্য) জাতিগুলোর মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। কিন্তু আর্য্যদের পারস্পরিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে এটা একটি সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল যে যুদ্ধ কেবল রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয় এবং পরাজিত আর্য্য রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না। বরং বিজয়ী রাজা তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে ও কর দিতে বাধ্য করবে। এ রূপ বিধান থাকায় উপজাতীয় যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে আর্য্যদের সামাজিক ব্যবস্থা বিনষ্ট হতে পারে নি।"

History of Aryan Rule in India PP33-34

১৮৬। "যে ব্যক্তি ব্রাক্ষ্মণ মহিলার পেটে ও শুদ্র পুরুষের ঔরষে জন্মগ্রহণ করে সে চন্ডাল।" (মনু ১০ঃ ১২)

১৮৭। এই শ্লোকের বক্তব্য পূর্ববর্তী শ্লোকের সম্পূর্ণ বিপরীত। মনুর টিকাকার ফ্লোকা ও মধ্যতিথি এই বৈপরিত্য উপলব্ধি করেছেন। তারা ব্যাখা দিয়েছেন যে, শুদ্র নারীর ছেলের উত্তরাধিকারের অংশ পাওয়া তার কাজের উপর নির্ভরশীল। সে যদি সৎকর্মশীল হয় এবং তার মা শাস্ত্র সম্মতবাবে পিতার বিবাহিতা হয়ে থাকে তা হলে সে অংশ পাবে।

১৮৮। অপস্তম্ভ ধর্ম শাস্ত্র অনুসারে হত্যা, চুরি ও ডাকাতির মত মারাত্মক অপরাধে ব্রাক্ষ্মনের সর্বোচ্চ শাস্তি অন্ধ করে দেয়া। (২ঃ ১৭) আর শুদ্রের মৃত্যুদন্ত। (২ঃ১৭, ১৬)

১৮৯। যদিও অধিকারের ক্ষেত্রে এতদসত্ত্বেও তারা উচ্চ বংশোদ্ভুত লোকদের সমান হতে পারে না। (মনু ৯,১৪৯–১৫৬ এবং ১১ঃ ১২৭)

১৯০। মর্যাদার সমান না হওয়ার অর্থ এই যে, ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাক্ষ্মণ ও

শুদ্রের মর্যাদা যা শাস্ত্রে নির্ধারিত আছে তাই থাকবে। তবে শুদ্রের ভালো কাজ ব্রাহ্মণের মন্দ কাজের চেয়ে উত্তম বলে অবশ্যই গণ্য হবে। অর্থাৎ ভালো কাজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত কিন্তু ভালো কাজ যে করে তার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকৃত।

১৯১। Vedic Index of Names and Subjects. Vol. 11, 265 -391

১৯২। Wilson, Indian Castes, Vol.1.P.111

১৯৩। Muir, Sanskrit Texts, P. 14

১৯৪। আরবী ভাষাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'কওম' বা সম্প্রদায় শব্দ শত্রু সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯৫। Vedic India, pp 282-85

১৯৬। Cambridge History of India, Vol.1 P. 54

১৯৭। Cambridge History of India, Vol.1.pp 84-86

১৯৮। Cambridge History of India, Vol.P 234

১৯৯। Cambridge History of India, Vol.1. P 246

২০০। Budhist sutras, pp. XI-XII

২০১। ম্যাক্স মুলারের সিকরেড বুক অব দি বুড্‌ডিষ্টস্‌ গ্রন্থের ভুমিকা দেখুন।

২০২। Hackmam, Budhism as a Religion pp.51-55

২০৩। প্রাচ্য ধর্ম গ্রন্থ সিরিজের ১১শ খন্ডের ভুমিকায় অধ্যাপক রাস ডিউডস–এর গবেষণালব্ধ বিস্তারিত বিবরণ দেখুন।

২০৪। Vinaya texts, Vol. 1. p.46

২০৫। Vinaya texts, VOl.1PP . 298-301

২০৬। Vinaya texts Vol. 1 P. 43

২০৭। নির্বাণ বলতে কি বুঝায় তা নিয়ে পন্ডিতদের মতভেদ রয়েছে। বেনিসন, উডেনবার্গ ও রাস ডিউড্‌স প্রমুখের মতে নির্বান হলো আত্মার এমন একঅবস্থার নাম যখন সে সকল পাপ ও কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, যখন সে পার্থিব জীবন সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হয় এবং পরিপূর্ণ

শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু ম্যাক্স মুলার, স্মিথ, হার্ডি, সান হিলার ও বরনাউভ প্রমুখ পন্ডিতরা এই অস্পষ্ট সংজ্ঞা যথেষ্ট বলে মনে করেন না। তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, নির্বান অর্থ মানুষের নিপাত হয়ে যাওয়া এবং জীবনের শৃংখল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাওয়া।

২০৮। এই চারটি সমস্যা হল এইঃ আপদ, আপদের কারণ, আপদ দূর করার উপায় ও আপদ দূর করার উপায় আয়ত্ব করার পন্থা। এই চারটি বৌদ্ধ ধর্মের মূল সূত্র।

২০৯। Vinaya text Vol. 1. pp. 91-97

২১০। Warren, Budhism in translations p. 373

২১১। Vinaya texts, Vol.1. p 211

২১২। বুদ্ধ–এ ধরনের বহু কষ্ট দায়ক সাধনার উপদেশ দিয়েছিলেন। " বুদ্ধের উপদেশ" (Dialogues of Budha pp. 226-32) নামক গ্রন্থে এ সব উপদেশ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

২১৩। এতে বৈধ অবৈধের কোন তারতম্য নেই। বিনয় পিটক গ্রন্থে আছে যে, একবার এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মীয় জীবন অবলম্বর করার পর নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে চাইল। তখন বুদ্ধ তাকে নিষেধ করে দিলেন। (প্রথম খন্ড, পৃঃ২৩৪)

২১৪। Vinaya texts part-1,pp,235-236

২১৫। বৌদ্ধ ধর্মের উপাখ্যানে এ ঘটনা প্রসিদ্ধ যে উরুবিল্ব গোত্রপতির মেয়ে মারা গেলে একদিন বুদ্ধ স্বয়ং তার কবর খুলে তার কাফনের কাপড় নিয়ে গেলেন এবং তা দিয়ে জামা বানিয়ে তা পরলেন। (সেন্ট হিলার, বুদ্ধ এন্ড হিজ রিলিজিয়ান, পৃঃ ৫০)

২১৬। বুদ্ধ নিজে স্বীয় আস্তানা থেকে বেরিয়ে প্রতিদিন ভিক্ষা করতে যেতেন। এ জন্য তিনি তার অনুসারীদের ভিক্ষু এবং নিজেকে মহাভিক্ষু বলে আখ্যায়িত করেন। সেন্ট হিলার, বুদ্ধ এন্ড হিজ রিলিজিয়ন। পৃঃ ১০১

২১৭। Vinaya texts, part 1,pp. 173-74

২১৮। Vinaya texts part 1 p 44

২১৯। Vinaya texts, part 1, p. 26-27

২২০। Vinaya texts, part 1, p. 24-25

২২১। বুদ্ধ বৈরাগ্য বাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তার পর্যালোচনায় বৈরাগ্যবাদ আলোচিত হবে। তাই এর বিস্তারিত পর্যালোচনা সেখানেই করা হবে।

২২২। রাস ডিউডস তার গ্রন্থ "বৌদ্ধ ভারত" (Buddhits India)–এ বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণ আলোচনা করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তরবারীর জোরে বৌদ্ধ ধর্মকে উচ্ছেদ করেনি এই কথা তিনি সেখানে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তার ঐতিহাসিক গবেষণাকে যদি স্বীকার করে নেয়া হয় তা হলে বৌদ্ধ ধর্ম আসলেই দুর্বল ধর্ম, সেই কথা আরো দৃঢ়ভাবে প্রামাণিত হয়। তরবারীর শক্তিতে নিপাত হয়ে যাওয়া নেহায়েত বস্তুগত দুর্বলতার লক্ষন। কিন্তু তরবারী প্রয়োগ ছাড়া কেবল শান্তিপূর্ণ উপায়ে মোকাবিলা করতে গিয়েই নিপাত হওয়া থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, এই ধর্ম অন্তর্নিহিত শক্তির দিক দিয়েও ব্রাহ্মাণ্য ধর্মের চেয়ে অনেক দুর্বল।

২২৩। স্মিথ, আরলী হিষ্ট্রী অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ২২৫

২২৪। হ্যাকম্যান, বুডডিজম অ্যাজ এ রিলিজিয়ন, পৃঃ ৮৩

২২৫। Ibid,pp. 90-91

২২৬। Vinaya texts, part 1,p.301

২২৭। Budha and his Religion pp.150-151

২২৮। Vinaya texts part 1, pp. 136-197

২২৯। Budhist India pp.10-11

২৩০। Budhist India, p. 16

২৩১। Smith, Early History of India p.349

২৩২। Budhism as a Religion, pp.73-74

২৩৩। Budhism as a Religion p. 177

২৩৪। এখানে খৃষ্টীয় ধর্ম অর্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনীত ধর্ম নয় বরং হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্ম বলে যাকে মনে করা

হয় তাই। বর্তমান খৃষ্টাব্দের শিক্ষা যে হজরত ঈসা (আঃ) দেননি সে সম্পর্কে আমাদের কাছে অকাট্য দলীল প্রমাণ রয়েছে। আসলে হযরত ঈসা (আঃ) মানব জাতির কাছে সেই ইসলামই উপস্থাপিত করেছিলেন, যা তাঁর আগে সকল নবী এবং তার পরে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থাপিত করেছিলেন। পরবর্তী অংশে আমরা সেই সব দলীল প্রমাণে কিছু কিছু বর্ণনা করবো। এখানে শুধু এই কথাটি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা এখানে খৃষ্ট ধর্ম নিয়ে যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি তা আসলে হযরত ঈসার প্রচারিত খোদায়ী জীবন ব্যবস্থা নিয়ে নয় বরং হজরত ঈসার নামে এক মন গড়া ধর্ম নিয়ে।

২৩৫। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ক্রুশে যাওয়ার সময় দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিল। তবে এ ধারণার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই।

২৩৬। বস্তুতঃ এ সব গ্রন্থ কুরআন তো দুরের কথা, কোন দুর্বলতম হাদিস সংকলনের সমানও নির্ভযোগ্য নয়। এই মর্যাদা বড় জোর আমাদের দেশের মৌলুদ শরীফের কিতাব গুলির মত।

২৩৭। আমার এই গোটা আলোচনার ভিত্তি নিম্ন লিখিত গ্রন্থ সমূহঃ Dumellow, Commentary on the Holy Bible, Y, K, Cheyne Encyclopedia Biblica, Millman, History of Christianity

২৩৮। মথি, মার্কস ও লুকের সম্মিলিত বর্ণনা অনুসারে হজরত ঈসা এমন এক ব্যক্তিকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে হত্যা, ব্যাভিচার, চুরি ও মিথ্যা থেকে বিরত থাকতো, নিজের মা বাপের খেদমত করতো এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভলো বাসতো। হযরত ঈসা তাকে বললেন, তুমি নিজের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দান খয়রাত করে দিলেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে।

২৩৯। Commentary on the Holy Bible, Dumellow, p, LXXX

২৪০। আমি এখানে পুনরায় পাঠকদের সাবধান করে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি যে, আমার এই সমগ্র আলোচনার ভিত্তি বর্তমান তাওরাত, ইঞ্জিল, ইসরাইলী ও খৃষ্টীয় বই কিতাব এবং বর্তমানকালের

ঐতিহাসিক গবেষণালব্দ তথ্যাবলী। কিন্তু কুরআন গোটা বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পেশ করেছে। এখানে সে বর্ণনা উপস্থাপিত করার অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে সবিস্তারে জানতে হলে আমার লেখা তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' পড়ুন।

২৪১। এ সত্য এখন খৃষ্টীয় পন্ডিতরাও স্বীকার করেছেন। কয়েক বছর আগের কথা। সেন্টপল গীর্জার উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন জনৈক খৃষ্টীয় পন্ডিত ডিন ইনজে কেম্ব্রিজের গর্টন কলেজে বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যেঃ

"হযরত ঈসা (আঃ) হযরম মুসার ধর্মকে পরিবর্তন করেননি, কোন নতুন শিক্ষাও তিনি দেননি, হযরত মূসার প্রচারিত ধর্মের মোকাবিলায় কোন নতুন ধর্মও তিনি প্রবর্তন করেন নি। আধ্যাত্মিক বিষয় তিনি স্বতন্ত্র চেয়েছিলেন এ কথা সত্য। তবে তিনি তার নিজ দেশ ও সময়ের জন্য যা উপযোগী তা গ্রহণ করেছেন। এ দিক থেকে হযরত মুসার ধর্ম থেকে পৃথক হওয়ার প্রয়োজন তো ছিল। কিন্তু হযরত ঈসা খৃষ্টীয়দের জন্য নিজে কোন আলাদা শরীয়ত রচনা করেননি।

২৪২। স্বয়ং সেন্ট পলের শিষ্য লুকের গ্রন্থ "কর্ম" পড়লে জানা যায় যে, হজরত ঈসার জীবদ্দশায় তিনি তার সাহচর্য্য ও দীক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ পাননি। তা ছাড়া তিনি যখন খৃষ্টীয় ধর্মকে বিকৃত করতে শুরু করেন তখন হজরত ঈসার বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিষ্যরা তার কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন। সুতারাং ইঞ্জিল নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেন্ট পলের প্রবর্তিত নীতি সমূহে খৃষ্ট ধর্মের মৌল প্রেরণারই কেবল বিরোধী নয় বরং স্বয়ং হজরত ঈসার সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীরও বিরোধী।

২৪৩। Millman, History of Christianity, Vol. 1,P. 377

২৪৪। Dumellow, Commentary on the Holy Bible P. Lxxxlx

২৪৫। Millman, History of Christianity Vol, 1, P. 393

২৪৬। Dumellow, commentary on The holy Bible, p. Lxxxlx

২৪৭। Millman, History of Christianity Vol. I p. 392

২৪৮। Gibbon, Vol. 11, Chap. 16, Early Days of Christianity. pp. 488-89

২৪৯। Rev Cutts, Constantine the great, pp. 55-60

২৫০। Rev Cutts. Constantine the Great. p.278

২৫১। এই লাইব্রেরীতে একমাত্র মার্ক এনথোনী দুলাখ বই দিয়েছিলেন। ডেসিভাস লিখেছেন যে, ২০০ বছর পর এই লাইব্রেরীর শুন্য আলমারীগুলো দেখে ধর্ম বিদ্বেষে পাষাণ না হয়ে থাকলে কারো মন দুঃখ, বেদনা ও ক্রোধে উদ্বেলিত না হয়ে পারেনি। অথচ কোন কোন খৃষ্টীয় ঐতিহাসিক এই লাইব্রেরী জ্বালিয়ে দেয়ার অপবাদ চাপিয়েছেন মুসলমানদের ওপর.

২৫২। এ সব বিবরণ গৃহিত হয়েছে গীবনের লেখা "রোম সাম্রাজ্যের উথান পতন" নামক গ্রন্থের ২৮শ পরিচ্ছেদ থেকে।

২৫৩। Encyclopedia Britanica Art inquisition,

২৫৪। Lawrence, Principles of International Law, p. 292

২৫৫। Development of International Law after the World War, Elizabeth Nippold, pp. 7-8

২৫৬। উল্লেখ্য যে, এ বইখানা লেখা হয়েছে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে। এ জন্য এখানে ঐ যুদ্ধের নৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ্ববাসী এর পর আরো একটা বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। সে যুদ্ধের নৈতিক দিক ছিল আরো জঘন্য।

২৫৭। Austria's Peace Offer, p. 103

২৫৮। Austria's Peace offer, p. 173

২৫৯। Austria's Peace offer, p. 28

২৬০। Austria's Peace offer, p. 173

২৬১। Austria's Peace offer, p. 139

২৬২। Austria's Peace offer p. 99

২৬৩। কথাটা ১৯৩৯ সালে সত্য হয়ে দেখা দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত পোলান্ডে জার্মান আক্রমণ দিয়েই শুরু হলো।

২৬৪। এরূপ অবস্থা এখনও দেখা দেয়নি সত্য। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে সব কান্ড কারখানা হয়েছে তার কারণে এ সম্ভাবনা জোরদার হয়ে উঠেছে।

২৬৫। নতুন সম্প্রসারণবাদী স্বপ্ন সফল করার জন্য নয় কি?

২৬৬। টাইম্‌স, ১লা আগষ্ট, ১৮৯৯

২৬৭। এই কথাগুলো লেখার কয়েক বছর পর যখন ইথিওপিয়ায় ইটালী এবং চীনের ওপর জাপান হামলা চালালো আর জার্মানী প্রতিবেশী দেশগুলোকে এক এক করে গ্রাস করতে আরম্ভ করলো তখন লীগ অব নেশনসের দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং শেষ পর্যন্ত এই আগ্রাসনই লীগ অব নেশনসের অপমৃত্যু ঘটালো।

২৬৮। এখানে 'তাকরীর' শব্দটি মূল আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট করা।

২৬৯। Encyclopedia Britanica Art war

২৭০। Kriegs Brauch P. 2

২৭১। Development of International Law after the World War P. 9

২৭২। Nippold P. 112

২৭৩। Development of International Law after the World War, P. 113

২৭৪। Nippold P. 7

২৭৫। Nippold P.8

২৭৬। Bippold P. 8

২৭৭। Nippold P.9

২৭৮। Yom Kriege,, Kap

২৭৯। Kriege brauch, P.3

২৮০। Revue Des Deuxmondes (1882) P. 314

২৮১। Lawrence, Principles of International Law, P. 330

২৮২। Paper on Growth of the Laws of War, Bernard, Oxford Essays 1856 pp. 100-4

২৮৩। Birkenhead, International Law P. 207

২৮৪। Lawrence P. 299

২৮৫। Birkenhead P. 191

২৮৬। Maurice, Hostilities Without Declaration of War, pp. 44-46

২৮৭। Hague conventions, 1907, (iii)

২৮৮। তথাপি এটা বাস্তব সত্য যে, এ আইন কেহ মেনে চলেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে দেশই অন্য দেশের ওপর হামলা চালিয়েছে, বিনা ঘোষণায়ই চালিয়েছে।

২৮৯। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় 'যুদ্ধ ঘোষণা' দেখুন।

২৯০। British State Paper No. 1 (1875) pp 252-57

২৯১। Nippold, p. 14

২৯২। Nippold p. 121

২৯৩। Nippold p. 122

২৯৪। Prinzipier Des, Sec Kriege Srecht p. 17

২৯৫। Nippold, p. 114

২৯৬। Nippold, p. 122

২৯৭। Nippold, p. 133

২৯৮। Nippold p. 133-134

২৯৯। Pariliamentary Papars, N. America (1872) No. 29 p. 17

৩০০। Hague Regulations Art. 22

৩০১। Birkenhead, p. 220

৩০২। প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে রণাঙ্গনের নিরাপত্তাদান এবং যুদ্ধাবস্থার নিরাপত্তাদানে পার্থক্য আছে। তবে আমি ইসলামী পরিভাষার কথা বিবেচনা করে উভয়টি একই সাথে আলোচনা করেছি।

৩০৩। Birkehead, pp. 197-98

৩০৪। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন এই বই-এর পঞ্চম অধ্যায় 'সন্ধি ও নিরাপত্তাদান' প্রসঙ্গ

৩০৫। War, It's Conduct and Legal Results,

৩০৬। Allison, History of Europe 111, XXV

'৩০৭। এই বই-এর পঞ্চম অধ্যায় যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গ দেখুন।

৩০৮। Lawrence, p. 348

৩০৯। Hague Conventios No, 10

৩১০। Oppenheim, International Law, Vol. 11, p. 205

৩১১। এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এটম বোমাও ব্যবহৃত হয় যার চাইতে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র অতীতে কখনো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

৩১২। Kriegs Brauchim Land Kriegs p.23

৩১৩। মার্কিন সামরিক নির্দেশাবলী, ধারা ৬৫

৩১৪। হেগ কনভেনশনস, ধারা ২৪

৩১৫। Holland, Laws of War on Land.

৩১৬। International Law p. 205

৩১৭। International Law and the World War pp. 16-18

৩১৮। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শত্রুর অর্থনৈতিক শক্তি এবং শিল্প কারখান ধ্বংস করাও বিমান লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রে ও বন্দরে ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ করা হয় এবং বড় বড় শহর তছনছ করে দেয়া হয়।

৩১৯। Lawrence, p. 345

৩২০। Lawrence,p. 345

৩২১। Lawrence, p. 345

৩২২। Lawrence, p. 345

৩২৩। Revue Deuxmondes 1882, pp. 314-46

৩২৪। Birkenhead p. 228

৩২৫। এই ধারার সর্বশেষ প্যারাটি নিয়ে বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান ও জার্মানীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে।

৩২৬। Kriegs brauch p. 19

৩২৭। Kriegs brauch p. 62

৩২৮। kriegs brauch p. 21

৩২৯। বোম্বে ক্রোনিকল, ৩১ শে জুলাই ১৯২২ মিঃ পিকথলের

৩৩০। Birken head, p. 226

৩৩১। Nippold, p. 124

৩৩২। Birkenhead, pp.226-227

৩৩৩। Birkenhead,p. 205

৩৩৪। Birkenhead, p. 227

৩৩৫। Despatches, 2nd Series 1. pp. 93-94

৩৩৬। Bernard, Growth of the Laws of War (Oxford Essays 1866) p. III note.

৩৩৭। ইসলামী আইনবিদগণ শুধু এতটুকু পার্থক্য করেছেন যে, যুদ্ধকালে যে এলাকা ইসলামী বাহিনীর দখলে আসবে এবং সে দখল স্থায়ী না অস্থায়ী সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকবে, সে এলাকা যুদ্ধরত অমুসলিম এলাকা বলে গণ্য হবে আর দখল পাকাপোক্ত হলেই ইসলামী রাষ্ট্র তাকে ইসলামী দেশের অঙ্গ বলে ঘোষণা করবে এবং মুসলিম দখলকৃত এলাকা সম্পর্কে ইসলামের যা বিধান ঐ এলাকা সম্পর্কেও সেই বিধান বলবৎ হবে।

৩৩৮। kriegs brauch, p. 48

৩৩৯। Kriegs brauch p. 48

৩৪০। War, its Conduct and Legal Results

৩৪১। Brikenhead, p. 225

৩৪২। Kriegs brauch, p. 53

৩৪৩। Kriegs brauch p. 62

৩৪৪। Vom Kriege, V. Kap.14

৩৪৫। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও জাপানের দখলীকৃত এলাকায় আমেরিকা বৃটেন ও রাশিয়া যে আচরণ করেছে তা দেখে কেউ বলতে পারবে না যে, পাশ্চাত্যের এই সভ্য জাতিগুলো অধিকৃত এলাকায় তাদের নিজেদের বিধি মেনে চলে।

৩৪৬। Oppenheim , Vol. II, p. 170

৩৪৭। Lawrence, pp. 440-41

৩৪৮। Lawrence, p. 441

৩৪৯। Brussels code, Art,13

৩৫০। Lawrence, p.44

৩৫১। Chapters on the Principles of International Law p.236

৩৫২। Birkenhead, p,261

৩৫৩। Lawrence, pp. 41-42

মজার কথা এই যে, লরেন্সের পুস্তকের সাম্প্রতিকতম সংস্করণ থেকে এই কথাটা বাদ দেয়া হয়েছে। সম্ভবত "অসভ্য" জাতিগুলোর মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জন্মাতে দেখে শ্বেতাঙ্গ মানুষদের মধ্যে খানিকটা লজ্জানুভূতি জন্মাতে শুরু করেছে।

৩৫৪। Lawrence , pp. 475-77

৩৫৫। জোট নিরপেক্ষতার এই নামাবলীর যে ক্ষুদ্র অংশটুকু অক্ষত ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাও ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। এই মহাযুদ্ধে উভয়

পক্ষ যে ধৃষ্টতার সাথে নিরপেক্ষ দেশগুলোর ওপর হামলা চালিয়েছে, তাদের সীমানার ভেতরে সেনাবাহিনী নামিয়েছে, তাদের মধ্যে দিয়ে গায়ের জোরে সৈন্য চলাচলের রাস্তা বানিয়েছে এবং বলপূর্বক তাদের উপায়–উপকরণ ব্যবহার করেছে, তার পর আর নিরপেক্ষতার কোন অর্থই নেই। সর্বশেষে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া বিশ্বশান্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য যখন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে তখন সকল নিরপেক্ষ দেশকে জানিয়ে দেয় যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলে তোমাদের জাতিসংঘের সদস্য করা হবে না এবং তোমরা সভ্য জাতি বা শান্তি প্রিয় জাতি বলে গণ্য হতে পারবেনা।

৩৫৬। Nippold, p. 14

৩৫৭। Nippold p. 146

৩৫৮। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন এ গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে "নিরপেক্ষদের অধিকার" প্রসঙ্গ।

৩৫৯। Wharton, International Law of the United states p. 391

৩৬০। Halleck, International Law pp. 110, and 195-197

৩৬১। Lawrence, p. 525

৩৬২। International Law pp. 4-7

৩৬৩। Law of Nations, ch, II

৩৬৪। Wheaton, International Law p. 418

৩৬৫। Wharton, p. 397

৩৬৬। Eyffe, Modern Europe, III 497

৩৬৭। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইরানের সাথে এই আচরণই করা হয়েছে। আমেরিকা ও বৃটেন রাশিয়াকে সাহায্য পৌঁছে দেয়ার জন্য ইরানের কাছ থেকে জোর পূর্বক সৈন্য চলাচলের রাস্তা আদায় করে এবং তার একটি বিরাট এলাকার ওপর সামরিক দখল প্রতিষ্ঠা করে। জার্মানীর উদাহরণ আমি দিচ্ছি না। কারণ জার্মানী সভ্যজনোচিত আন্তর্জাতিক রীতি নিতি ভঙ্গ করে অনেক দূর্ণাম কুড়িয়েছে।

৩৬৮। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ে "নিরপেক্ষদের অধিকার" প্রসঙ্গ দেখুন।